M. A. Modern & Islamic History

HISTORY OF MODERN INDIA

[1857—1947 A.D.]

আধুনিক ভারতের ইতিহাস

[১৮৫৭—১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ

General Editor :

***Prof.* S. GHOSE**

J. N. GHOSE & SONS
6, Bankim Chatterjee Street,
Calcutta-700 073
Phone : 34-6495

USHA PUBLISHING HOUSE
13/1, Bankim Chatterjee Street,
Calcutta-700 073
Phone : 32-6171

Published by :
S. P. Ghose
J. N. Ghose & Sons
6, Bankim Chatterjee Stree
Calcutta-700 073

Printed by :
G. S. Printers
Calcutta-9

CONTENTS : VOL. I

PART—I

PART-II

VOL. II

Part I

HISTORY OF INDIA
(ভারতের ইতিহাস)

Q. 1. Discuss briefly, the circumstances leading to the rise of national feeling among the Indians in the second half of the nineteenth century.

Ans. (১) ভূমিকা :

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই সময় একদিকে ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি আরও ব্যাপক ও দৃঢ় হয় অপরদিকে ভারতবাসীর মনে জাতীয় চেতনার পূর্ণবিকাশ দেখা যায় ও জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি রচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া-রূপে ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়।

(২) ব্রিটিশ শাসনের রূপান্তর :

জাতীয়তাবাদের উন্মেষের প্রথম কারণ হিসাবে বলা যায় যে মহাবিদ্রোহের পর ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে জঙ্গী চরিত্র ধারণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে ব্রিটিশ সরকার সৃজনশীল মনোবৃত্তি ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয় দেয় কিন্তু মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসকগণ সাম্রাজ্যবাদী নগ্ন শোষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসানের পরই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময়ে শিল্প-কেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয় এবং অবাধে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি অনুপ্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে। অতিরিক্ত মূলধন চা, রেলপথ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হতে শুরু করে। ফলে ব্রিটিশ পুঁজির উদ্যোগে ভারতের শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস হয় এবং ইংলণ্ডের শিল্প-জাত পণ্যদ্রব্য ভারতে আমদানি হতে শুরু করে। এইভাবে রপ্তানিকারী দেশ ভারত আমদানিকারী দেশে পরিণত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারত ব্রিটিশদের বাণিজ্য পুঁজির লুণ্ঠন ক্ষেত্র থেকে পুরোপুরি শিল্প পুঁজির লুণ্ঠন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থেই এই সময় ভারতে রেলপথ, রাস্তাঘাট, সেতু প্রভৃতি নির্মিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে ভারত শুধুমাত্র একটি কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়। এই সময় ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের প্রধান উদ্দেশ্যই হয় ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা। তবে শুধুমাত্র ভারতে অর্থনৈতিক শোষণ নীতি অনুসরণ করেই ব্রিটিশ শাসকগণ ক্ষান্ত হননি। তাঁরা সারাবিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদকে রক্ষণাবেক্ষণ ও মজবুত করে তোলার জন্য ভারতের সৈন্যবাহিনী ও সম্পদ

ব্যবহার করতে শুরু করেন। অর্থাৎ, এই সময় থেকে ভারত বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

(৩) ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া ঃ

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ শাসন ভারতে শোষণযন্ত্রের নগ্নরূপ গ্রহণ করলেও এই সময় ব্রিটিশ শাসন বিকাশের ফলে ভারতবাসীর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং একটি সৃজনশীল যুগের সূচনা করে। ব্রিটিশ শাসকদের চেষ্টায় এই সময় সমগ্র ভারতে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীর্ঘকাল পরে রাজনৈতিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব গড়ে ওঠে। তাছাড়া সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণ এবং রেলপথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় বিভিন্ন ভাষাভাষী-ভারতবাসীর মধ্যে মানসিক ঐক্য গড়ে ওঠার পথ সুগম হয়। মূলতঃ খ্রীস্টধর্ম প্রচার ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ভারতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের নীতি গৃহীত হলেও ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের ফলে ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসী পাশ্চাত্যের সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। ফলে পাশ্চাত্যজগতের উদার ও মানবতাবাদী শিক্ষা ভারতবাসীর মনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিবাদী চিন্তা-ভাবনার সঞ্চার করে। শিক্ষিত ভারতীয়গণ প্রথমে নিজ দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে সচেষ্ট হন এবং পরে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। প্রথমদিকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার ফলেই বাংলা তথা সমগ্র ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এক অভূতপূর্ব নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষতঃ মহাবিদ্রোহের পরই শিক্ষিত ভারতীয়দের মোহভঙ্গ ঘটে। রুশো, টম পেইন, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতির রচনার দ্বারা তাঁরা পাশ্চাত্য জগতের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। ফলে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ও নবজাগরণ একদিকে যেমন ভারতের সীমিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে স্বদেশ প্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলে অপরদিকে ব্রিটিশ শাসনে ভারতের ক্রমবর্ধমান দুরবস্থা সর্বস্তরের ভারতবাসীর মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে।

(৪) শোষণ মূলক শাসন ব্যবস্থা ঃ

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের দিকে মনোনিবেশ করে। এই লুণ্ঠিত অর্থ ব্রিটেনের শিল্পোন্নয়নে নিয়োজিত হতে থাকে। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা তাঁদের পণ্যদ্রব্য বিশেষতঃ বস্ত্রাদি ভারতে রপ্তানি করতে শুরু করেন। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে সুয়েজখাল খননের পর এবং ইংলণ্ডে অবাধবাণিজ্য নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে ভারতীয়

শিল্পের চরম সর্বনাশ ঘটে। ভারতে রেলপথের বিস্তার এই শোষণের অন্যতম প্রধান সহায়করূপে দেখা দেয়। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ইংলণ্ড ভারতের অর্থনীতির পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং ভারতের কুটির শিল্পের বিপর্যয় ঘটে। ভারতের কুটির শিল্পের অবলুপ্তির ফলে কুটিরশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা জীবিকার জন্য কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগ ক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং ব্রিটেনের শিল্পবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করতে বাধ্য হয়।

শিল্পক্ষেত্রের অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়াও ব্রিটিশ রাজত্বের আমলে ইংরেজগণ ভারতের অর্থনীতির উপর নানাপ্রকার আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ পায়। ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনিক ব্যয়ভার ভারতীয়দেরই বহন করতে হত। সামরিক বিভাগের ব্যয়ভারও ভারতীয়দের স্কন্ধে চাপান হয়। নানা উপায়ে ব্রিটিশদের শোষণের ফলে ভারতের ধনভাণ্ডার নিঃশেষিত হয় এবং ভারতের ঋণভার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ১৭৬০ থেকে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ এই বত্রিশ বছরের মধ্যে ভারতের ঋণভার প্রায় বিশগুণ বৃদ্ধি পায়।

(৫) **বৈষম্য মূলক নীতি ঃ**

ক্রমবর্ধমান অর্থ-নৈতিক শোষণ ও বৈষম্য ভারতীয় জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি করলেও বিদেশী শাসকবর্গ ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তিত ছিলেন না। বরং তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি আরও দৃঢ় করার জন্য সামরিক শক্তিবৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। তাছাড়া মহাবিদ্রোহের পর থেকেই ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময় থেকে সামরিক বাহিনীতে ভারতীয়দের আনুপাতিক সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয় এবং ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। তাছাড়া সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয়দের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নিযুক্ত করার নীতি গৃহীত হয় এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় সৈন্যগণ যাতে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে সেজন্য বিভেদমূলক নীতি অনুসরণ করা হয়।

বেসামরিক ক্ষেত্রেও ভারতীয়দের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শাসন বা বিচার বিভাগের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়দের নিয়োগ বন্ধ করা হয় এবং শুধুমাত্র ইয়োরোপীয়দের নিয়োগ করার নীতি গৃহীত হয়। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ অনুসারে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য অবাধ প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার পদ্ধতি প্রবর্তিত হলেও ইংলণ্ডে গিয়ে এই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ ভারতীয়দের পক্ষে খুবই অসুবিধা-জনক ছিল। তারপর ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সর্বোচ্চ বয়ঃ-সীমা কমিয়ে একুশ এবং ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে তা পুনরায় কমিয়ে উনিশ করা হলে ভারতবাসীর মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ সরকারের এই উদ্দেশ্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতের সর্বত্র তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত বৈষম্যমূলক নীতিই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ভারতীয়দের বিরাগ সৃষ্টির মূলে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৬) ধর্মীয় আন্দোলনের প্রভাব :

উনবিংশ শতকে ভারতের নবজাগরণের প্রথম ও প্রধান ফল হিসাবে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সংস্থাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা শুধুমাত্র ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না। পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র সেন সামাজিক সংস্কারের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং জাতীয় ধর্ম ও চেতনা সঞ্চার করেন। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পথিকৃৎ হলেও ক্রমশঃ তা ভারতের অন্যত্র প্রসার লাভ করে। ব্রাহ্ম-সমাজের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহারাষ্ট্রের মাধব গোবিন্দ রানাডে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইতে প্রার্থনা সমাজ স্থাপন করেন। প্রার্থনা সমাজ হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা আর্যসমাজ। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মার্চ বোম্বাই শহরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে লাহোর আর্যসমাজের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর্য-সমাজের প্রভাব বিস্তৃত হয়। বৈদিক মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে স্বামী দয়ানন্দ হিন্দু সমাজের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। হিন্দুধর্মের প্রসারের জন্য তিনি শুদ্ধি বা অহিন্দু এবং ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় হিন্দুধর্মে গ্রহণের জন্য আন্দোলন শুরু করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম ও সংস্কার আন্দোলনের আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী-বিবেকানন্দের প্রচারিত বাণী। তাঁরা পশ্চিমের আধুনিক চিন্তাধারার সহিত প্রাচীন ভারতের মূল্যবোধের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবন ও সাধনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের বিরোধ ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন। স্বামী-বিবেকানন্দ তাঁর কর্ম ও বাণীদ্বারা ভারতবাসীকে দেশপ্রেম ও মানবসেবার মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী ভারতীয় সমাজে আত্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

(৭) ব্রিটিশ সরকারের বিভেদ-মূলক নীতি :

মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার নিজেদের সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার নীতি গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষার জন্য দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতি নমনীয় নীতি অনুসরণ করতে শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকার ভারতে রাজ্যবিস্তার নীতি পরিত্যাগ করে, ফলে দেশীয় রাজন্যবর্গের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের প্রভুত্ব বিনা দ্বিধায় স্বীকার করতে সম্মত হন। অপরদিকে গ্রামীণ ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুরক্ষিত করার জন্য বড় বড় জমিদার এবং ভূস্বামীদের প্রতি ও সদয় ব্যবহারের নীতি গৃহীত হয়। ব্রিটিশ সরকারের কৌশলপূর্ণ নীতির ফলেই ভারতের অভ্যন্তরীণ শোষক-গোষ্ঠী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকদলে পরিণত হয়।

(৮) রাজনৈতিক সমিতি :

ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদী শোষণ ও বৈষম্যমূলক নীতি ভারতবাসীর মনে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে তা ক্রমশঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক সমিতির মাধ্যমে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক সমিতি গঠনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। বোম্বাই-এর দাদাভাই নৌরজি, বদরুদ্দিন তায়েবজি, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে এবং বাংলাদেশের আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সমিতি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে বিক্ষিপ্ত ও একক প্রতিবাদের পরিবর্তে সমিতির মাধ্যমে যুক্তভাবে অগ্রসর হলে ভারতবাসীর মধ্যে জনমত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক সমিতি গঠনের সূচনা হয়। সেজন্য এই যুগকে 'সমিতির যুগ' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এইসব সমিতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। এই-অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শেই পুণেতে ডেকান অ্যাসোসিয়েশন ও মাদ্রাজে মাদ্রাজ অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। পরবর্তীকালের সমিতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পুণের সর্বজনীন সভা, মাদ্রাজে মহাজন সভা, লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ও সর্বোপরি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত ভারতসভা।

(৯) সাহিত্য ও সংবাদপত্র :

সমিতি ও সংগঠন ছাড়াও সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতের নবজাগরণ ও নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনা প্রকাশিত হতে শুরু করে। প্রথমে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার চিন্তা ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হওয়ায় জাতীয়তাবাদী সাহিত্য ও সংবাদপত্র বাংলাভাষাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য, কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রবন্ধ প্রভৃতি স্বদেশচিন্তা সঞ্চারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গদ্যসাহিত্যে রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচার করে। কাব্যসাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি কবিগণ তাঁদের রচনার দ্বারা স্বদেশবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। পরবর্তীকালে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে পরিপুষ্ট করে তোলে।

তবে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে স্বাদেশিকতার প্রসার শুধুমাত্র বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও আঞ্চলিক ভাষায় অনেক কবি ও সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় স্বদেশপ্রেম প্রচার করেন। এইসব লেখকদের মধ্যে অসমীয়া সাহিত্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া, হিন্দি সাহিত্যে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, ওড়িয়া সাহিত্যে মধুসূদন রাও,

মারাঠা সাহিত্যে বিষ্ণুকান্ত বিপলঙ্কর, তামিল সাহিত্যে সুব্রহ্মন্যম ভারতী ও তেলেগুঃ সাহিতে বীরেশ লিঙ্গম পান্তলু জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চার করে।

অপরদিকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় স্বাদেশিকতার প্রতিফলন দেখা যায়। এইসব পত্রিকার মধ্যে রামমোহন রায় সম্পাদিত 'সংবাদ কৌমুদী', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষতঃ ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ও সরকারী শোষণ ও বৈষম্যের কথা তুলে ধরে জনমত গঠনে সচেষ্ট হয়। এই সময় ভারতীয়দের পরিচালনায় ইংরেজি ভাষায়ও কয়েকখানি সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। এইসব পত্রিকার মধ্যে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট', কেশবচন্দ্র সেনের 'ইণ্ডিয়ান মিরর', সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেঙ্গলী', শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী চিন্তা প্রসারে বিশেষ সহায়তা করে। সমসাময়িক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা-গুলোও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এইসব পত্রিকার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গদর্শন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সোমপ্রকাশ বিশেষ স্থান অধিকার করে। তা ছাড়া ঢাকা প্রকাশ, সঞ্জীবনী, বঙ্গবাণী প্রভৃতি পত্রিকা-গুলো খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ভারতের অন্যান্য স্থানেও এই সময় অনেকগুলি ভাষায় বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে লাহোরের 'ট্রিবিউন' মাদ্রাজের 'নেটিভ পাবলিক ওপিনিয়ন', 'হিন্দু', 'স্বদেশমিত্রম', 'অন্ধ্র প্রকাশিকা', বোম্বাইয়ের 'মারাঠা', 'ইন্দুপ্রকাশ', 'ভয়েস অফ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু দেশী ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে শুরু করলে গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড লিটন ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাশ করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা করেন। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট ভারতীয়দের মনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এই সময় এই আইনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরেজি সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়ে দেশবাসীকে বিস্মিত করে তোলে।

(১০) উপসংহার :

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে লর্ড লিটনের শাসনকালে ভারতের জাতীয়তাবাদ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। লিটনের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মনে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরবর্তী বড়লাট লর্ড রিপনের রাজত্বকালে 'ইলবার্ট বিল' কেন্দ্র করে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রচণ্ডভাবে প্রকাশ পায়। মিস্টার ইলবার্ট এই সময় বিচারালয়ে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে এবং ভারতীয় বিচারকগণকে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি দানের অধিকার দেওয়ার জন্য এই বিলটি উত্থাপন করেন। এই বিলের খসড়া প্রকাশিত হওয়ায় সঙ্গে

সঙ্গে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাঁরা শুধু বিক্ষোভ প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হলেন না, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তুলে তাঁরা প্রয়োজন হলে বল প্রয়োগ করার জন্যও প্রস্তুত হন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার শ্বেতাঙ্গ সদস্যরাও এই বিলের বিরোধিতা শুরু করেন। ফলে বাধ্য হয়ে রিপন ইউরোপীয়দের দাবি মেনে নেন এবং তাঁদের সুপারিশ অনুসারে সংশোধিত আকারে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে বিলটি গৃহীত হয়। কিন্তু এই বিলকে কেন্দ্র করে যে যে আন্দোলন শুরু হয় তার ফলে ভারতীয়গণ মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠীর হাতে তাদের করুণ অবস্থার কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এই ঘটনায় ব্রিটিশ এবং ভারতীয়দের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। শিক্ষিত ভারতীয়গণ বুঝতে পারেন যে তাঁদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার সংক্রান্ত যে কোন দাবি আদায় করতে হলে তাঁদের অবশ্যই সর্বভারতীয়ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। এই পরিস্থিতিতে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার অ্যালবার্ট হলে একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত বলে গণ্য করা যেতে পারে, কারণ এই সম্মেলনই প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সূচনা করে।

Q. 2. Why there was no industrial revolution after the introduction of railways in India?

Ans. (১) ভূমিকা :

১৮৪০ থেকে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ বণিকগণ ভারতে রেলপথ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন কোম্পানী গঠন করতে শুরু করেন। প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে কোম্পানীর সহিত ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে একটি চুক্তি সম্পাদন করে। এই বছরেই রেলপথ নির্মাণের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আর একটি চুক্তি সম্পাদন করে। প্রথম চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয় যে, বোম্বাই বন্দরের সহিত বেরারের এবং দেশের অপেক্ষাকৃত পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলোর সংযোগ স্থাপন করা। দ্বিতীয় চুক্তি অনুসারে পরীক্ষামূলকভাবে কলকাতা হতে রাজমহল পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করার প্রস্তাব করা হয় এবং এই রেলপথের একটি শাখা রাণীগঞ্জের কয়লা খনি অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত করার কথা স্থির হয়। মাদ্রাজ রেলওয়ে কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রথম চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে। একই বছরে বোম্বাই, বরোদা এবং সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীও গঠিত হয়। তিন বছর পরে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে করাচি থেকে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণের জন্য সিন্ধু রেলপথ কোম্পানী এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৮৪৪ থেকে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সর্বসমেত ১২টি রেলওয়ে কোম্পানী রেলপথ নির্মাণের জন্য ভারতে এসে উপস্থিত হয়।

(২) রেলপথ নির্মাণের কারণ ঃ

ভারতে রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণের আগ্রহের জন্য ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকটি উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এই উদ্দেশ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রসারের সম্ভাবনাই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইংলণ্ডের তুলা ব্যবসায়ী ও তুলাজাত শিল্প উৎপাদনকারিগণ যে আবেদনপত্র পেশ করেন তা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবেদনপত্রে তাঁরা উল্লেখ করেন যে গরুর গাড়ি করে দূর পাল্লার পথে তুলা বহনের ফলে তুলার সঙ্গে ধূলিকণা মিশে যায়। সুতরাং ল্যাঙ্কাশায়ারের কলগুলোর ব্যবহারের জন্য ভাল পরিষ্কার তুলা সরবরাহের জন্য রেলপথ নির্মাণ একান্ত অপরিহার্য। সেসঙ্গে এরূপ প্রত্যাশাও ছিল যে রেলপথ নির্মাণের ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের ব্রিটিশ বিক্রয়কারিগণের নিকট ভারতের বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার উন্মুক্ত হবে। তাছাড়া ভারতে রেলপথ নির্মাণের প্রথমদিকের অধিকাংশ উদ্যোক্তাগণের আশঙ্কা ছিল যে ভারতীয় যাত্রীগণ রেলভ্রমণকে খুব পছন্দ করতে রাজী হবে না। সুতরাং প্রধানতঃ মালপরিবহণের জন্যই রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও উপলব্ধি করা হয় যে রেলপথ নির্মাণের ফলে সৈন্যবাহিনী ও সামরিক সাজসরঞ্জাম চলাচলের সুবিধা হবে। সামরিক কৌশলের দিক থেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং তাঁর উত্তরাধিকারী লর্ড ডালহৌসী প্রেরিত সরকারী বার্তায় প্রাধান্য লাভ করে। এই দুজন গভর্নর জেনারেলের সমর্থন কোম্পানীগুলোর উৎসাহী উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে সহায়তা করে এবং ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীও এই প্রস্তাব সমর্থন করে।

(৩) ডালহৌসীর মতামত ঃ

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে লর্ড ডালহৌসীর ভারত পরিত্যাগের সময় ভারতে প্রায় ২৩০ কিলোমিটার রেলপথ যানবাহন চলাচলের জন্য খোলা হয় এবং আরও ২৩০ কিলোমিটার রেলপথ নির্মিত হতে শুরু করে। লর্ড ডালহৌসী ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গের নিকট যে বিখ্যাত প্রতিবেদন পাঠান তার ফলেই ভারতে রেলপথের উপযোগিতা সম্পর্কে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর যে প্রাথমিক দ্বিধা ছিল তার সমাপ্তি ঘটে এবং ভারতে রেলপথের ভবিষ্যৎ বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। লর্ড ডালহৌসী তাঁর প্রতিবেদনে লিখলেন, "কেবলমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প হিসাবে রেলপথ নির্মাণ যে বাস্তবে সম্ভব তাই নয়। তাছাড়া এই ধরনের রেলপথ নির্মিত হওয়ার পর বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসাবে এগুলো নির্মাণ করতে যে অর্থব্যয় হবে তার উপরও একটি বেশ ভাল পরিমাণে লাভজনক প্রতিদান পাওয়া যাবে। ফলে জনসাধারণ ভারতের অন্যান্য প্রান্তে অনুরূপ কার্যাদির জন্য তাদের মূলধন বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবে।" "প্রধানতঃ লর্ড ডালহৌসীর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই রেলপথ নির্মাণের কার্যভার বেসরকারী ভিত্তিতে গঠিত কোম্পানীগুলোর উপর ন্যস্ত করা হয়। লর্ড ডালহৌসী সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সরকারী কর্মচারীরা

যে অমিতব্যয়িতার প্রবণতা দেখাতে পারেন সে আশঙ্কাও প্রকাশ করেন। কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানীগুলোকে সম্পূর্ণভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখতেও তিনি রাজী ছিলেন না। তিনি এই সম্পর্কে বলেন যে, "এরূপ নিয়ন্ত্রণকে হস্তক্ষেপের স্বেচ্ছাচারী অধিকার হিসাবে দেখা উচিত হবে না। এই নিয়ন্ত্রণ আইনতঃ সিদ্ধ একটি নির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্বের অধীনে থাকবে, যার ফলে অনাবশ্যক এবং বিরক্তিকর সংঘাতের সৃষ্টি হবে না।"

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রেরিত রেলপথ নির্মাণ বিষয়ক তাঁর দ্বিতীয় প্রতিবেদনে লর্ড ডালহৌসী ভারতে রেলপথ প্রসারের কয়েকটি সাধারণ নীতি লিপিবদ্ধ করেন এবং রেলপথ থেকে কি কি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে সেই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করেন। প্রতি প্রেসিডেন্সীতে প্রধান বন্দরের সহিত তার পশ্চাদ্‌ভূমির সংযোগস্থাপন এবং প্রেসিডেন্সীগুলোর অভ্যন্তরে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য তিনি কতকগুলো প্রধান সড়ক নির্মাণের সপক্ষে ছিলেন। এই ব্যবস্থার সুবিধা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা এবং একস্থান থেকে অন্যত্র দ্রুত সৈন্য চলাচলের সামরিক সুবিধার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৮৫৭-১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় শেষোক্ত সুবিধাটির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

(৪) উপসংহার ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে রেলপথ নির্মাণের সূচনা হয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ভারতে প্রায় ৪০,০০০ হাজার কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ করা সম্ভব হয়। রেলপথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়া এবং যাত্রী চলাচলের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও ভারতের রেলপথ এদেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন অথবা শিল্পায়নে খুব সামান্য প্রভাব বিস্তার করে। তার মূল কারণ ছিল ইংলণ্ডের স্বার্থান্বেষী বণিকসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই ভারতে রেলপথ নির্মিত হয় এবং রেলপথ ভারতের অর্থনৈতিক শোষণের একটি নতুন উপায় রূপে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ভারতের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের সহযোগী ইংলণ্ডের পুঁজিপতিগণ ভারতের জনগণের মঙ্গল অপেক্ষা নিজেদের মঙ্গলের কথাই বিশেষভাবে চিন্তা করতেন। সেজন্য নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে তাঁরা রেলপথ নির্মাণ করার ব্যবস্থা করেন। ভারতের কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদকে কাঁচামাল হিসাবে স্বদেশে প্রেরণের জন্যই তাঁরা বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন। আবার এই কাঁচামাল সংগ্রহ করার মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজার দখল করা। সুতরাং রেলপথ নির্মাণের ফলে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে কোনরূপ বিপ্লব ত দূরে থাকুক, কোন প্রকার উন্নতি অথবা প্রসারের সম্ভাবনাও একেবারে দূরীভূত হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভারতে রেলপথ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ইংলণ্ড থেকে সংগৃহীত হয়। ইংলণ্ডের শিল্পপতিগণ তাঁদের উদ্বৃত্ত মূলধন রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে ভারতে বিনিয়োগ করে তাঁদের আয়ের একটি নতুন

উৎস এবং অর্থনৈতিক শোষণের একটি নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন। বিশেষতঃ চা, পাট, তুলা এবং নানাপ্রকার বনজ ও খনিজ সম্পদকে আহরণ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা সুবিধাজনক অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ করার চেষ্টা করেন। ভারতবাসীর মঙ্গলসাধন করা অপেক্ষা ভারতের সম্পদের দিকেই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ভারতীয় পুঁজিপতিদের মূলধনের বিনিয়োগের ফলে যদি এদেশে রেলপথ তৈরি হত তা হলে হয়ত এই বিরাট কর্মোদ্যোগের ফলাফল পৃথক রূপে দেখা দিত এবং ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সুফল আদায় করতে পারত এবং রেলপথ থেকে আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ পুনরায় শিল্পে বিনিয়োগ করে ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সাধন সম্ভব হত। তাছাড়া ভারতে রেলপথ নির্মাণের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সৈন্য ও সামরিক সাজ-সরঞ্জামের চলাচলের দ্রুত সুবন্দোবস্ত করা। এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারের অর্থানুকূল্যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে দীর্ঘ ও সুবিন্যস্ত রেলপথ নির্মাণ করা হয়। এই রেলপথের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল খুবই সামান্য কিন্তু সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সুতরাং এই অঞ্চলের রেলপথ ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের অর্থনীতিতে শ্বেতাঙ্গদেরই প্রাধান্য ছিল এবং তাঁরা ভারতে কোন প্রকার ভারী শিল্প গড়ে তোলার বিপক্ষে ছিলেন সুতরাং ভারতীয়দের প্রচেষ্টায় কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেই শিল্পবিপ্লব যুগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৃহৎ শিল্পের কলকারখানা এই সময় ভারতের কোথাও স্থাপিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। কার্ল মার্কসও ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃক রেলপথ নির্মাণকে শোষণের একটি নতুন উপায় বলেই বর্ণনা করেন। রেলপথ নির্মাণের ফলে ব্রিটিশ শাসক ও পুঁজিপতিগণ শুধুমাত্র শাসনতান্ত্রিক সুবিধাই লাভ করেননি, অর্থনৈতিক সুযোগও তাঁদের করায়ত্ত হয়। ফলে ভারতে শিল্প বিপ্লবের যে সামান্য সুযোগ দেখা দিয়েছিল তা-ও চিরতরে বিলুপ্ত হয়। মূলধন সঞ্চয় ও তার সদ্ব্যবহারের জন্য পুনর্বিনিয়োগের পরিবর্তে তা অন্যত্র প্রেরণের উদ্দেশ্যে ভারতে রেলপথ নির্মিত হয়। ফলে রেলপথ ভারতে শিল্প-বিপ্লবের সহায়কের পরিবর্তে শোষণের অন্যতম প্রধান অস্ত্র রূপে কার্যকরী করা হয় এবং রেলপথ নির্মাণের সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা থেকে বণিক-গোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়।

Q. 3. Discuss the causes of the predominance of British Capital in Indian industry. What changes were introduced after the First World War.

Ans. (১) ভূমিকা :

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম একশ বছর ভারতে ব্রিটিশ অর্থনীতির মূল লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, এদেশে শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করার দিকে শাসক-গোষ্ঠীর কোন প্রকার আগ্রহ ছিল না। ব্রিটিশ বাণিজ্যের বিকাশের জন্য ইতিমধ্যেই

ভারতীয় বাণিজ্য ও কুটির শিল্পের বিনাশ ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই অবস্থাই অব্যাহত ছিল, কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের ব্রিটিশ পুঁজি লগ্নী করার প্রবণতা দেখা দেয় এবং ফলে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের উদ্যোগে ভারতে আধুনিক শিল্পায়নের সূচনা হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতে যে শিল্পায়নের সূচনা হয় তাতে দুটি মূল বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, ভারতে শিল্পায়নে ব্রিটিশ পুঁজির একাধিপত্য ছিল এবং কাঁচামাল ও শ্রমের সাহায্যে সুলভে মুনাফা লাভের জন্যই ব্রিটিশ পুঁজি ভারতে বিনিয়োগ করা হয়। ফলে শিল্প সংগঠনে ভারতীয় পুঁজি লগ্নী করার সুযোগ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের শিল্পায়নের উদ্যোগ ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে পরিচালিত হওয়ায় এদেশে ভারী শিল্পের বিকাশের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। শুধুমাত্র ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ পুঁজি নিয়োজিত করা হয়।

(২) রেলপথ নির্মাণ ঃ

ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি লগ্নী করার সর্বাপেক্ষা লাভজনক ক্ষেত্র ছিল রেলপথ। রেলপথের বিস্তার ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থে ভারতে পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি করার এক অভাবনীয় সুযোগ দান করে। ভারতে রেলপথ স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে ভারতে রেলপথ গড়ে উঠলে ভারতে শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হবে। প্রথমদিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর ভারতে রেলপথ নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ব্রিটিশ সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির সর্ত অনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ রেল কোম্পানীগুলোর লগ্নীকৃত মূলধনের উপর সুদ প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে, ফলে রেল কোম্পানীগুলোর পক্ষে রেলপথ নির্মাণের কার্যে অগ্রসর হওয়া সহজতর হয়ে ওঠে। এই ধরনের বিশাল কার্যে স্বাভাবিক কারণেই ক্ষতির প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ভারতীয় রেল কোম্পানীগুলোর অংশীদারদের পক্ষে এই জাতীয় ঝুঁকির পরিমাণ ছিল নিতান্তই সামান্য। কারণ ব্রিটিশ সরকার রেল কোম্পানীগুলোকে কয়েকটি বিশেষ সুযোগ দান করতে সম্মত হয় : (১) ভারত সরকার ৯৯ বছরের ইজারার ভিত্তিতে বিনামূল্যে রেলওয়ে কোম্পানীগুলোকে রেলপথ নির্মাণের জমি দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ২) কোম্পানীগুলোকে তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর বার্ষিক সাড়ে ৪ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ পরিমাণ সুদ প্রদানের স্থির আশ্বাস দেওয়া হয় এবং কোম্পানীগুলোর ক্ষেত্রে টাকার বিনিময় হার সর্বদাই ১ টাকা= ১ শিলিং, ১০ পেন্স বজায় রেখে বিনিময় হারের ক্ষতির হাত থেকে তাদের রক্ষা করা হয়। (৩) এই চুক্তিতে আরও স্থির হয় যে সরকার সুদ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে তা পরবর্তী বছরে কোম্পানীগুলোর উদ্বৃত্ত আয় থেকে পুনরুদ্ধার করা হবে কিন্তু এই উদ্দেশ্যে এই ধরনের উদ্বৃত্তের শতকরা ৫০ ভাগের বেশি অর্থ ব্যবহার করা যাবে না। উদ্বৃত্তের অবশিষ্টাংশ কোম্পানীর অংশীদারদের প্রাপ্য হবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তার প্রাপ্য হিসাবের কোন অর্থ দিতে না হলে সমগ্র

উদ্বৃত্ত আয় কোম্পানীর নীট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৪) সরকার ২০ অথবা ২৫ বছর পরে কোম্পানীগুলোর নিকট থেকে রেলপথগুলো ক্রয় করে নেওয়ার অধিকার ভোগ করত, কিন্তু এর মধ্যবর্তী সময়ে ক্রয়ের এই অধিকার সরকারের ছিল না। (৫) রেল কোম্পানীগুলোর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারকে সাধারণভাবে কিছু ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু রেলের কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে রেল কোম্পানীগুলোর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। 'পুরাতন আশ্বাসমূলক ব্যবস্থা' নামে পরিচিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও রেলওয়ে কোম্পানীগুলোর মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ফলে ব্রিটিশ পুঁজিপতিগণ বিনা ঝুঁকিতে ভারতে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড বিনিয়োগ করার সুযোগ লাভ করেন।

(৩) **অন্যান্য শিল্প :**

রেলপথ ছাড়া ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের আর চারটি প্রধান ক্ষেত্র ছিল—চা বাগান, কাপড়ের কল, চটকল ও কয়লা শিল্প। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ সরকার ভারতে চা আবাদের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে কয়েকজন ব্রিটিশ পুঁজিপতি 'আসাম কোম্পানী' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আসাম বেঙ্গল-রেলপথের প্রতিষ্ঠা ও চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন হলে ভারতে চা শিল্পের অভাবনীয় প্রসার ঘটে এবং প্রচুর পরিমাণে ব্রিটিশ মূলধন এই শিল্পে লগ্নী করা হয়। চা শিল্পে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের প্রাধান্য কিরূপ ছিল একটি পরিসংখ্যান বিচার করে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ইয়োরোপীয় ডিরেক্টর পরিচালিত কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১৫৮; কিন্তু দশ বছর পরে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৪।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পাটশিল্পেরও দ্রুত প্রসার ঘটে। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার নিকটবর্তী রিষড়ায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। ক্রমে হুগলি নদীর উভয়-তীরে শতাধিক পাটকল স্থাপিত হয়। পাটকলগুলোর মালিকানা ব্রিটিশ মালিকদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কয়েক কোটি টাকা ব্রিটিশ মূলধন পাটশিল্পের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশী শিল্পপতিগণই এই শিল্পের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং বয়নশিল্প ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের উদ্যোগে ভারতে প্রথম গড়ে উঠলেও অল্পদিনের মধ্যেই এই শিল্পে ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগ শুরু হয় এবং ভারতীয় শিল্পপতিদের উদ্যোগেই এই দুটি শিল্প প্রসার লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের চেষ্টায় বাংলা ও মাদ্রাজে ইস্পাত শিল্পের ভিত্তি রচিত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ পুঁজিপতিগণ ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে উৎসাহিত না হওয়ায় ইস্পাত শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের দ্বারা অবহেলিত হলেও এই শিল্পে যুগান্তর আনয়ন করেন বিখ্যাত পার্শী শিল্পপতি জামসেদজি টাটা। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর উদ্যোগে টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে

এই কোম্পানী উৎপাদন শুরু করে। টাটার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে পরে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে মার্টিন ও বার্ন কোম্পানী ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী স্থাপন করেন। আবার বোম্বাই ও আমেদাবাদে বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন পার্শী ও গুজরাটী ব্যবসায়ীগণ। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ে ও গুজরাটে প্রায় ১৩টি কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। পরবর্তী পনের বছরের মধ্যে কাপড়ের কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৭টি। নানারূপ বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভারতীয়দের উদ্যোগেই বয়নশিল্প যথেষ্ট উন্নতি করার সুযোগ লাভ করে।

লৌহ ও ইস্পাতশিল্প এবং বয়নশিল্পের মতো কয়লাশিল্পেও ভারতীয় পুঁজিপতিদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে রাণীগঞ্জে প্রথম কয়লা আবিষ্কৃত হয় এবং ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তিনটি কয়লাখনির কাজ আরম্ভ হয়। সূচনাকালে ইয়োরোপ থেকে কয়লাখনি বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন এবং উদ্যোগ আমদানি করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতীয় ও ব্রিটিশ যৌথ উদ্যোগ এবং একক ভারতীয় উদ্যোগে কয়লাশিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটে।

লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, বয়নশিল্প এবং কয়লাশিল্পে ধীরে ধীরে ভারতীয়দের প্রভাব বিস্তৃত হলেও জাহাজ ও সামুদ্রিক পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কোম্পানীগুলোর একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল। পরে স্বদেশী চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে মাদ্রাজের চিদাম্বরম পিল্লাই স্বদেশী স্টিম শিল্প গঠন করেন। কিন্তু সরকারের বিরোধিতায় ও চিদাম্বরমের গ্রেপ্তারের ফলে এই প্রচেষ্টার অবসান ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্যন্ত জাহাজ ও সামুদ্রিক পরিবহণের ক্ষেত্রে ভারতীয় বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মাত্র পাঁচ শতাংশ। কিন্তু পরে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় মালিকানায় সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন স্থাপিত হলে স্বদেশী উদ্যোগে জাহাজ পরিবহণ শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়।

(৪) **আংশিক অগ্রগতি ঃ**

মূলধন ও উদ্যোগের ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হয়। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে মোট কলকারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৮৮টি। তবে এই শিল্পোন্নতির মূলে ছিল ব্রিটিশ পুঁজিপতির আধিপত্য। ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ এবং ভারতের ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় মালিকানায় ভারতে আধুনিক শিল্প বিকাশের বিরোধী ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পগুলোকে রক্ষার ব্যবস্থা না করে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতার পথ গ্রহণ করে। ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে ব্রিটেন থেকে আমদানি পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্কের হার হ্রাস করা হয়। ফলে ইংলণ্ডের পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্প বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া ভারতীয় সুতী-শিল্পগুলোকে বিনষ্ট করার জন্য অত্যধিক হারে উৎপাদন শুল্ক চাপান হয়। এই বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে ভারতীয় শিল্পগুলো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়।

(৫) **পরিবর্তনের সূচনা ঃ**

প্রকৃতপক্ষে লর্ড কার্জনের শাসনকালের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক দৃষ্টি-

ভঙ্গী নিয়ে ভারতে শিল্পনীতি পরিচালনা করেন। কিন্তু ঘোর সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন ভারতীয় শিল্প-উদ্যোগের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন এবং ভারতীয় শিল্পের বিকাশের জন্য তিনি ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে একটি পৃথক বাণিজ্য ও শিল্পবিভাগ গঠন করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজ সরকারও একটি শিল্পবিষয়ক সংস্থা গঠন করেন। এইসব প্রচেষ্টার ফলে ভারতে শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে থাকে এবং শিল্পে বিনিয়োগকৃত লগ্নীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে যে স্বদেশী আন্দোলন দেখা দেয় তার ফলে দেশে শিল্পের প্রসার ঘটতে শুরু করে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে লৌহ, ইস্পাত, তাঁত, সাবান, লবণ, চিনি, চামড়া প্রভৃতি শিল্পের জন্য কলকারখানা স্থাপিত হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকারও বিদেশী পুঁজিপতিদের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ভারতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ শুরু হয়।

(৬) উপসংহার ঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় শিল্পবিকাশে। নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের পর অবস্থার চাপে পড়ে ব্রিটিশ সরকার শিল্প-নীতির কিছু পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের সময় ব্রিটেনের কলকারখানাগুলো ব্রিটেনের সামরিক বিভাগের চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তাদের পক্ষে ভারতের বাজারে পণ্যদ্রব্য যোগান দেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এই সুযোগে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বাজার দখল করে নিতে উদ্যোগী হয়। ভারতের বাজার চিরদিনের জন্য হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পপতি শ্রেণীকে কিছু সুযোগ দিতে রাজী হয়। তাছাড়া যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড থেকে লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি ভারতে রপ্তানি করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং ভারতে ভারী শিল্প গঠনে সরকার উদ্যোগী হয়। অপরদিকে, ইংলণ্ডের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার সুযোগ নিয়ে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে ভারতীয় নেতৃবর্গকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভারতের শিল্প-উদ্যোগকে কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে রাজী হয়। অবস্থার চাপে পড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাদের বৈষম্যমূলক নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এই পরিবর্তনের ফলে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার ভারতীয় শিল্পের প্রসারের সম্ভাবনা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগের সম্ভাবনা বিচার বিশ্লেষণের জন্য স্যার টমাস হল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে একটি শিল্প কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন শিল্প প্রসারের জন্য সরকারকে 'উৎসাহ মূলক হস্তক্ষেপ' নীতি গ্রহণের সুপারিশ করে। এই কমিশন আরও কয়েকটি সুপারিশ করে যথা,—(১) সর্ব-ভারতীয় ও প্রাদেশিক শিল্প বিভাগের প্রতিষ্ঠা; (২) কারিগরী শিক্ষা সম্প্রসারণ; (৩) বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী চাকরীগুলোর সুষ্ঠু সংগঠন এবং (৪) যানবাহন ও যোগা-যোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। ব্রিটিশ সরকার কমিশনের সুপারিশগুলো কার্যকরী করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। হল্যাণ্ড কমিশনের সুপারিশ ক্রমে শুল্কনীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকার ভারতীয় শিল্পগুলোকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট

হয়। আমদানি ক্ষেত্রে শুল্কের হার শতকরা সাড়ে ৩ অংশ বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে ৭ অংশে দাঁড়ায় এবং ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে শুল্কের হার ১১ শতাংশে পরিণত হয়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেও এই শুল্ক নীতি গৃহীত হয়। পরে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্কার সম্পর্কে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে ভারতে শিল্পোন্নয়নের জন্য একটি গতিশীল নীতি অনুসরণের কথা বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে এই সময় থেকেই ভারতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়ন সরকারী নীতিরূপে গৃহীত হয়।

Q. 4. Discuss the tariff policy of the British Indian Government.

Ans. (১) **ভূমিকা :**

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার আইনের বলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটে। তাছাড়া ভারতে আমদানি ও রপ্তানি সামগ্রী অবশ্যই ব্রিটিশ জাহাজে পরিবহণ করতে হবে এই নিয়মটিও অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পরিত্যক্ত হয়। এই সব কারণে যদিও তখন অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্যিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার পথ পূর্বাপেক্ষা সহজ ছিল তবুও ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্যে ইংল্যাণ্ডের সহিত সম্পর্কই ছিল সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় শিল্পে ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সীসমূহের প্রাধান্য ব্রিটিশ ব্যবসায়ী এবং জাহাজ কারবারীগণের কায়েমী স্বার্থের পথ অনুসরণ এবং বিশেষ করে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের পরে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণের অনুকূলে এবং অন্যান্য বাণিজ্য সহযোগীদের প্রতিকূলে বিভেদমূলক আচরণের নীতি, এসব কারণের মধ্যেই ভারতের বহির্বাণিজ্যে বিটিশ আধিপত্যের ব্যাখ্যা নিহিত।

(২) **আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি :**

১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ভারতীয় রপ্তানির প্রসার ঠিক সমান গতিতে হয় নি। ১৮৫০-১৮৬০-এর দশকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ তুলা ব্যবসায়ীগণ আমেরিকার বদলে ভারত হতে তুলা ক্রয় করতে শুরু করলে রপ্তানি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে রপ্তানি বৃদ্ধির গতিবেগ অপেক্ষাকৃত ভাবে মন্থর হয়ে পড়ে। ভারতের অনেকাংশে গ্রামাঞ্চলে খরা ও দুর্ভিক্ষ বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলোতে বিশৃঙ্খলা, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের পর টাকার বিনিময় মূল্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা প্রভৃতি কারণে রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেতে শুরু করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে অবস্থার আবার যথেষ্ট পরিবর্তন হয় এবং রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের বিশাল সেচ প্রকল্পগুলোর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হওয়ার ফলে রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে টাকার বিনিময় মূল্যের অনিশ্চয়তা দূর হলে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ পায়। তাছাড়া জার্মানী ও জাপানের মতো নতুন শিল্পোদ্যোগী দেশ সমূহের আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় কাঁচামালের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই ভারতের

রপ্তানি বাণিজ্যের মূল্য বিশ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ অপেক্ষাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৮৬৫ থেকে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আমদানি বৃদ্ধির গতি রপ্তানি বৃদ্ধির গতি অপেক্ষা সামান্য দ্রুততর ছিল। বিশেষতঃ ভারতের বাজারে শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করার জন্য ইংলণ্ড, জার্মানী ও জাপানের মতো শিল্পক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা প্রবল আকার ধারণ করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য সম্পর্ক বিকাশের ব্যাপারটিকে দীর্ঘকাল উপেক্ষা করে। ভারতের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের অবনতি ঘটে। যুদ্ধের ফলে বাণিজ্যের স্বাভাবিক পথগুলো রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ভারতের বাণিজ্য সহযোগী দেশগুলোর অনেকেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে অথবা শত্রুভাবাপন্ন দেশ রূপে চিহ্নিত হয়। অপরদিকে জাহাজ পরিবহণের ঝুঁকি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ জাহাজের মাশুল ও বীমাজনিত ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এমন কি যুদ্ধে ব্যাপৃত ইংলণ্ডের পক্ষেও ভারত থেকে অনেক প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা বিপজ্জনক হয়ে পড়ায় উভয় দেশের মধ্যেকার বাণিজ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের মতো আমদানি বাণিজ্যও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই সময় ইংলণ্ড ও জার্মানী উভয় দেশই যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার জন্য ভারত অন্যান্য দেশ থেকে তার প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য আমদানি করতে শুরু করে। ফলে জাপান ভারতের অন্যতম প্রধান আমদানি বাণিজ্যের দেশে পরিণত হয়। আবার যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতের আমদানি বাণিজ্য অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পেলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় অনেক দেশ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যুদ্ধক্লান্ত ইয়োরোপের পুনর্গঠনের জন্য পুনরায় কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের মধ্যে পুনরায় প্রয়োজনীয় ভারসাম্য স্থাপিত হয়। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে মূল্যস্তরের বৃদ্ধি, শ্রমিক বিশৃঙ্খলা, রেল পরিবহণের সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং টাকার বিনিময় মূল্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ইত্যাদি নানা সমস্যার দরুণ প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুতহারে রপ্তানি বাড়তে পারে নি। তাছাড়া ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য যখন এরূপ সঙ্কটপূর্ণ স্থিতাবস্থার সম্মুখীন ঠিক সেই সময়ে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে বিশ্বব্যাপী মন্দা ভারতের রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনকারীদের উপর প্রচণ্ড আঘাত করে। বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে ভারতীয়দের ক্রয়ক্ষমতাও যথেষ্ট হ্রাস পায় এবং ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। আবার অপর দিকে মন্দা থেকে পুনরুজ্জীবনের পথে বেশি দূর অগ্রসর হতে না হতেই আমেরিকার বাণিজ্যে এক অভাবনীয় সঙ্কটের সূচনা হলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর মতো ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের মতবিরোধিতাকে কেন্দ্র করে পুনরায় আর একটি বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে সারা বিশ্বের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় ভারতের বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব অনুভূত হয়।

(৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে ইয়োরোপীয় বাজারগুলোতে ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কিন্তু অতিরিক্ত চাহিদা মেটাবার মতো সাংগঠনিক শক্তি ও পরিবহণের ব্যবস্থা ভারতের ছিল না। তথাপি ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে যুদ্ধের শেষ দিকে ভারত বাধ্য হয়ে কয়েকটি রপ্তানি বাণিজ্যসামগ্রীকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই ভারত পুনরায় রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করে এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তীকালে এই নীতি আরও সাফল্য অর্জন করে।

(৪) ভারতীয় রপ্তানির রূপান্তর :

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারত প্রধানতঃ বিদেশে কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করত। কিন্তু ধীরে ধীরে ভারতে শিল্প বিকাশের সূচনা দেখা দিলে কয়েকটি শিল্পজাত দ্রব্য, বিশেষতঃ পাট শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯১৩-১৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতের শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ ছিল ২২.৪ শতাংশ, ১৯১৮-১৯ খ্রীস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬.৬ শতাংশে পরিণত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতের পক্ষে নানাকারণে, বিশেষতঃ শিল্পোদ্যোগের বুনিয়াদ দুর্বল থাকার জন্য বেশি দিন এই সুযোগ ভোগ করা সম্ভব হয় নি। তবে ১৯২৪-২৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় শিল্পগুলোকে বিবেচনামূলক সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হলে ভারতে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে পুনরায় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ার সুযোগ পায়। প্রকৃতপক্ষে বৃহদায়তন শিল্পগুলোর উৎপাদন সূচক ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে ছিল ১০২.৭ ; ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে তা বেড়ে হয় ১২০.০। তবে এই সময় ভারতের মোট রপ্তানির প্রায় ৩১ শতাংশ পাটজাত শিল্পদ্রব্য, তুলাজাত শিল্পদ্রব্য এবং চা এই তিন প্রকার পণ্যদ্রব্য থেকে পাওয়া যেত। লৌহ, ইস্পাত বা অন্যান্য প্রকার ভারী শিল্পদ্রব্য থেকে খুব কম পরিমাণ অর্থই আমদানি করা সম্ভব হত।

(৫) উপসংহার :

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসকগণ কয়েকটি নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করত। তবে প্রয়োজন অনুসারে ও কালের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তারা এই নীতি কার্যকরী করার ব্যবস্থা করতেন। কোম্পানীর শাসনকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই তাঁদের আগ্রহ সবচাইতে বেশী দেখা যেত। কিন্তু কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার রহিত হওয়ার পর সামগ্রিকভাবে ইংলণ্ডের বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকারের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য নীতি নিয়ন্ত্রিত হত। বিদেশী অন্য কোন রাষ্ট্র ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে যাতে প্রবেশ না করতে পারে সেদিকেও তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বাধ্য

হয়েই বিদেশী কোন কোন রাষ্ট্রকে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ দেওয়া হয়। তথাপি ভারতের কাঁচামাল ও বাজার যাতে অন্য কোন রাষ্ট্রের অধিকারে চলে যাওয়ার সুযোগ না পায় সেজন্য সর্বদাই ব্রিটিশ শাসকগণ সতর্ক দৃষ্টি দিতেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অবস্থার চাপে পড়ে ব্রিটিশ সরকার তাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সামান্য শিথিল করতে বাধ্য হলেও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের মৌলিক কাঠামোর ব্যাপক কোন পরিবর্তন করতে তাঁরা সম্মত হন নি। এমন কি, কাঁচামালের পরিবর্তে ভারত বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করতে শুরু করলেও তার বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল কাঠামোর কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। সুতরাং বলা যায় যে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে ইংলণ্ড একটি নীতি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে, তা হল ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য নিজের স্বার্থে পরিচালনা করা এবং কঠোর হস্তে এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা। ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।

Q 5. Give a brief account of the traditional agrarian resistance to the British rule in the second half of the 19th century

Ans. (১) **ভূমিকা :**

ব্রিটিশ শাসনকালে ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বেশি বোঝা বহন করতে হয়েছে ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের, ফলে প্রতি পদক্ষেপে তাদের বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। আবার অনেক সময় জমিদারগণ ও ছোট ছোট দল-নেতাগণ যেসব বিদ্রোহ সংগঠিত করে তোলে, তাদের শক্তিরও প্রধান উৎস ছিল কৃষকশ্রেণী। কখনও কখনও ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত হয়েও কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিত। এই সব আন্দোলন প্রাথমিকভাবে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের জন্য শুরু হত, কিন্তু আন্দোলন শুরু হওয়ার পর তার প্রকৃতিগত পরিবর্তন দেখা দিত এবং আন্দোলন-কারিগণ ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে জমিদার, ভূস্বামী এবং মহাজনদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হত। অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূদের আক্রমণ করে তারা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদেরই অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করত। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ওয়াহাবি আন্দোলনের, কথা—যা এক সময় পাঞ্জাব, বিহার, মাদ্রাজ ও বাংলাদেশে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বাংলা-দেশের ফারাজি আন্দোলনকেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক প্রতিরোধের চরিত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। তখন থেকে কৃষকরা সরাসরি নিজেদের দাবির জন্য লড়াই শুরু করে ব্রিটিশ সরকার, বিদেশী ভূস্বামী এবং দেশীয় জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে।

(২) **কুকা বিদ্রোহ :**

নতুন ধরনের কৃষক আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত ঘটে পাঞ্জাবে কুকা বিদ্রোহের মধ্যে। ওয়াহাবি আন্দোলনের সঙ্গে কুকা আন্দোলনের অনেক সাদৃশ্য ছিল। ধর্মের শুদ্ধি-

করণের জন্য উভয় আন্দোলনই শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারিগণ ভারতে বিদেশী শাসনের অবসানের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সম্ভবতঃ ব্রিটিশ-শক্তি কর্তৃক পাঞ্জাব অধিকৃত হওয়ার অব্যবহিত উনবিংশ শতাব্দীর চার-এর দশকে শিয়ান সাহেব নামে বিশেষভাবে পরিচিত ভগৎ জওহর মল কুকা আন্দোলন শুরু করেন। শিখধর্ম থেকে বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করে গুরু গোবিন্দ সিংহের নির্দেশিত ধর্মমত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কুকা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সচেষ্ট হয়ে ওঠে। পাঞ্জাবে ব্রিটিশ অধিকার স্থাপিত হওয়ার পর তাদের আন্দোলনের গতিপথ পরিবর্তিত হয় এবং তারা ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে পাঞ্জাবে পুনরায় শিখকর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে রাম সিংহ কুকাদের অধিনায়কত্ব লাভ করেন এবং নিজেকে গুরু গোবিন্দ সিংহের অবতার বলে দাবি করেন এবং ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করে খালসা রাজত্ব স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। জাঠ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের বহু লোক তাঁর দলে যোগ দেয়। তিনি তাঁর অনুচরদের ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে নির্দেশ দেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, একলক্ষ পঁচিশ হাজার কুকা সৈন্য সংগৃহীত হলেই তিনি ইংরেজদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হবেন। লুধিয়ানা শহরের ২২ কিলোমিটার দূরে ভৈনি আলা নামক স্থানে তিনি তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে বিভিন্ন অঞ্চলে কুকাদের নতুন ঘাঁটি তৈরী করার জন্য 'সুবা' ও 'নায়েব সুবা' নামধারী কর্মচারীদের প্রেরণ করেন। এই আন্দোলনের প্রথম দিকে পাঞ্জাবের অধিবাসীদের অনেকেই কুকাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল কিন্তু পরে কুকা সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম নৈতিক অধঃপতন দেখা দিলে অনেকেই তাদের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে।

সম্ভবতঃ রাম সিংহ নেপাল রাজসভার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর অনুচরদের সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী করে তোলার জন্য জম্মুতে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। এই সংবাদে ব্রিটিশ সরকার বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে গোহত্যা ও গোমাংস বিক্রির ঘটনা কেন্দ্র করে কসাইদের সঙ্গে কুকাদের সংঘর্ষ দেখা দিলে কুকাদের হস্তে কয়েকজন কসাই নিহত হয়। ব্রিটিশ সরকার এই সময় সর্বপ্রথম কুকাদের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করে এবং ন'জন কুকাকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং দু'জন কুকাকে দ্বীপান্তর পাঠান হয়। কিন্তু রাম সিংহের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি।

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে কুকাদের একটি দল পাতিয়ালা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। রামসিংহ তাঁর অনুচরদের কার্যকলাপ সমর্থন করতে পারেন নি। সুতরাং তিনি গোপনে ব্রিটিশ সরকারকে এই সংবাদ জানিয়ে দেন। ফলে তাঁর অনুচরদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার রামসিংহের কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য প্রথমে তাঁকে ভৈনি আলায় অন্তরীণ করেন এবং পরে তাঁকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করেন। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে রামসিংহ রেঙ্গুনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পাতিয়ালার ঘটনা ও রামসিংহের নির্বাসনের ফলে আকস্মিকভাবে কুকা বিদ্রোহের অবসান হয়।

(৩) বীরসা মুণ্ডার আন্দোলন :

কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন বিস্তৃত হলে স্থানীয় অধিবাসীদের চিরাচরিত অনেক অধিকার ধ্বংস হয় এবং তাদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই এই বিক্ষোভ অনেকবার বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত কঠোর হস্তে এই সব বিদ্রোহীদের দমন করে। কিন্তু নির্যাতনের কঠোরতা আদিবাসীদের মনোবল দূর করতে অসমর্থ হয়। ফলে ১৮৮১ থেকে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আদিবাসী কৃষকগণ বহুবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং মুণ্ডা সম্প্রদায়ের বীর বীরসার নেতৃত্বে তাদের বিদ্রোহ এক ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করে; ওয়াহাবি ও কুকা আন্দোলনের মতো ধর্মীয় শুদ্ধিকরণের জন্য আদিবাসীদের আন্দোলন শুরু হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোষণকারী বিদেশী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের তাবেদার অত্যাচারী দেশীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয়। আন্দোলনের নেতা বীর বীরসা ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত। কিন্তু খ্রীস্টধর্ম তাঁকে মানসিক প্রশান্তি দিতে ব্যর্থ হলে তিনি পূর্বপুরুষের ধর্ম পুনরায় গ্রহণ করেন এবং হিন্দুধর্মের পবিত্রতা ও নৈতিকতার দিকেও আকৃষ্ট হন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি ঘোষণা করেন যে, শিঙ বোঙ্গার নির্দেশে তিনি একটি নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। এই ধর্মমতে বিশ্বাসীগণ আত্মশুদ্ধির জন্য নৈতিক ধর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে বাধ্য থাকবে এবং শিঙ বোঙ্গা ছাড়া অন্য কোন বোঙ্গার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারবে না। বীর বীরসার আদেশে তাঁর অনুচরবর্গ সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন, নিরামিষ আহার গ্রহণ, হাড়িয়া সহ সকল মাদক জাতীয় দ্রব্য বর্জন ও পবিত্র উপবীত ধারণ করতে শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর শিষ্যসংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এমন কি, খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত বহু ব্যক্তি স্বধর্ম পরিত্যাগ করে তাঁর এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। শিষ্যদের নিকট তিনি ধর্মপ্রবর্তক, ঈশ্বরের অবতার, ধরতীআবা অর্থাৎ বিশ্বজগতের জনক এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীরূপে পরিগণিত হতে শুরু করেন। তাঁর বাসস্থান চালকাদ গ্রাম সহস্র সহস্র মুণ্ডার তীর্থস্থানরূপে গণ্য হতে শুরু করে।

মুণ্ডাদের মধ্যে বীরসা 'ভগবানের' জনপ্রিয়তা ব্রিটিশ সরকারকে বিচলিত করে তোলে। তাঁর ধর্মমতকে তাঁরা বিপজ্জনক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে মনে করে। তাদের ধারণা হয় যে, ব্রিটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করে মুণ্ডাদের রাজত্ব স্থাপন করাই তাঁর আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার বীরসাকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রস্তুত হয় কিন্তু গ্রেপ্তারের ভয়াবহ ফলাফলের কথা চিন্তা করে প্রকাশ্য দিবালোকে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তারা শঙ্কিত হয়। সুতরাং রাঁচির পুলিশ বিভাগের ডেপুটি সুপার-ইনটেনডেন্ট, মিস্টার মিয়ারেস ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে অগাস্ট গোপনে চালকাদে পৌঁছান এবং অতর্কিতে বীরসার শয়নগৃহে প্রবেশ করে রুমালের সাহায্যে তাঁর মুখ বন্ধ করে নিঃশব্দে রাঁচিতে নিয়ে ফাঁসীর ব্যবস্থা করেন। বীরসার পনের জন সঙ্গীও অনুরূপভাবে

বন্দী হন। বীরসা ও তাঁর অনুচরদের কিছু আর্থিক জরিমানা সহ দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে বীরসা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই পুনরায় রাজদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হন। অভাবে ও অভিযোগে, দুঃখে ও দুর্দশায় জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পূর্বমর্যাদা ও জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুচর গয়া মুণ্ডার উপর একটি সুশিক্ষিত সৈন্যদল গড়ে তোলার দায়িত্ব অর্পণ করেন। নানাপ্রকার অস্ত্র তৈরী করার ব্যবস্থাও করা হয়। খুন্তি নামক স্থানে বীরসার প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়। তবে রাঁচি, চক্রধরপুর, বুণ্ডু, তামার, কারা, তোরপা, বাসিয়া, শিশাই প্রভৃতি স্থানে সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বীরসা প্রায়ই তাঁর অনুচরদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলিত হতেন এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের অত্যাচারী শাসন ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেষ্টা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের বড় দিনের সময় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য তিনি তাঁর অনুচরদের নির্দেশ দেন। ফলে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে বীরসার অনুচরদের সংঘর্ষ শুরু হয় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী বীরসার অনুচরগণ খুন্তি থানা আক্রমণ করলে এই সংঘর্ষ চরমে উপনীত হয়। এই সংঘর্ষের সময় রাঁচির ডেপুটি কমিশনার সশস্ত্র পুলিশ সহ খুন্তিতে উপস্থিত হয়ে মুণ্ডাদের শান্তিপূর্ণভাবে স্থান ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশ অমান্য করে মুণ্ডাগণ ডুমারি পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এই সংঘর্ষে প্রায় দুশ মুণ্ডা নিহত হয় এবং বাকি সকলে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। গয়া মুণ্ডা পরে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। বীরসা জনৈক মুণ্ডার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নিদ্রিত অবস্থায় বন্দী হন এবং পরে তিনি ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে মুণ্ডাদের দমন করতে সক্ষম হলে বীরসা ভগবানের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়।

(৪) নাইকদা আন্দোলন :

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পাঁচমহল অঞ্চলের দুর্বর্ষ উপজাতি নাইকদাগণ ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহী এই উপজাতিকে দমন করার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করলে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মার্চের মধ্যে এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়ে পড়ে। বিদ্রোহের নেতা রূপা সিং বা রূপা ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু কয়েক বছর পরে এই অঞ্চলে পুনরায় অশান্তির সৃষ্টি হয়। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে ভাদেক গ্রামের জোরিয়া নাইকদা নিজেকে 'পরমেশ্বর' বলে ঘোষণা করেন এবং নৈতিক আচার-আচরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একটি নতুন ধর্মমত প্রচার করতে শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর অনুচরদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে রূপা সিং তাঁর দলে যোগ দিলে এই আন্দোলন একটি

নতুন রূপ গ্রহণ করে। জোরিয়াকে ধর্মীয় গুরুর আসনে স্থাপন করে রূপা সিং নিজের জন্য একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। ভাদেকে রাজদরবার প্রতিষ্ঠিত করে তিনি ধর্মকর, ভূমি-রাজস্ব, পরিবহণ শুল্ক এবং নানাপ্রকার জরিমানা আদায় করতে শুরু করেন। কিছুদিন পরে তিনি বারিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজগড় থানা এলাকার রাজস্বের একাংশ দাবি করেন। তাঁর এই দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি প্রায় পাঁচশ সৈন্যসহ রাজগড় আক্রমণ করেন। রূপা সিং-এর অতর্কিত আক্রমণে তিনজন পুলিশ নিহত ও তিন জন আহত হয় এবং থানা লুণ্ঠন করে রূপা সিং নগদ আটশ টাকা ও থানার অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য লাভ করেন। রাজগড়ের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে রূপা সিং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলে লুঠ-পাট শুরু করেন। জোরিয়া পরমেশ্বরও রূপা সিং-এর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁর নেতৃত্বে ছোট উদেপুর রাজ্যের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। এই আক্রমণ ব্যর্থ হলেও স্থানীয় শাসনকর্তা এত শঙ্কিত হয়ে পড়েন যে, তিনি আত্মরক্ষার জন্য রাজধানী সুরক্ষিত করে তুলতে শুরু করেন। নাইকদাদের বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকারকেও চিন্তিত করে তোলে এবং এই বিদ্রোহের আগুন বেশি দূর বিস্তৃত হয়ে পড়ার পূর্বেই ব্রিটিশ সৈন্যগণ বিদ্রোহীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ভাদেক আক্রমণ করে। রূপা সিং ও তাঁর পুত্র গালালিয়া বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজিত হন। তাঁদের বন্দী করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। নেতৃবর্গের মৃত্যুর ফলে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং পাঁচমহল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হয়।

(৫) **ফড়কের বিদ্রোহী কার্যকলাপ :**

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে বাসুদেব বলবন্ত ফড়কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাপক এক সংগঠনের সাহায্যে ওয়াহাবিগণ যে পরিবর্তন আনয়ন করার চেষ্টা করেন, ব্যক্তিগতভাবে একক প্রচেষ্টার দ্বারা বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই অঞ্চলে তা সম্পাদন করার চেষ্টা করেন। ফড়কের রোজনামচা থেকেই তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭৬-১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে দক্ষিণভারতের অধিবাসীদের দুর্দশা চরম সীমায় উপনীত হয় এবং ফড়কে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতবাসীর এই দুর্দশার জন্য ব্রিটিশ শাসনই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। সুতরাং তিনি এদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁকে এই কাজে সাহায্য করতে অসম্মত হলে তিনি সমাজে অবহেলিত রামোসিস সম্প্রদায় ও কৃষকদের স্বদলে আনয়ন করার চেষ্টা করেন। ডাকাতি ও লুণ্ঠনের দ্বারা তিনি এই প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্রও তিনি সংগ্রহ করেন। কিন্তু ডাকাতি শুরু করার পরই ফড়কের সঙ্গে রামোসিসদের মতবিরোধিতা শুরু হয়। ফড়কের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর দলভুক্ত হওয়ার পরিবর্তে অনেকেই অর্থের লোভে তাঁর প্রচেষ্টার অংশীদার হয়। সুতরাং রামোসিসদের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে তাঁর কর্মসূচী পরিবর্তন করেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার ফড়কেকে বন্দী করার জন্য

তিন হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু এই সময় ফড়কে তাঁর বন্ধু রঘুনাথ মোরেশ্বর ভাটের সাহায্যে ইসমাইল খান রোহিলার সঙ্গে পরিচিত হন। ইসমাইল খান রোহিলা তাঁকে পাঁচশ সশস্ত্র সৈন্য সরবরাহ করেন। আরও চারশ সশস্ত্র সৈন্য এই দলে যোগদান করে। কিন্তু ইতিমধ্যে গুপ্তচরের কাছে সংবাদ পেয়ে মেজর ড্যানিয়েল ফড়কের বাসস্থান গাস্থরে উপস্থিত হন। বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে পলায়ন করতে সক্ষম হলেও তাঁর রোজনামচা ও অন্যান্য কাগজ-পত্র ইংরেজদের হস্তগত হয়। ফলে ফড়কের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সকলই তারা অবগত হতে সমর্থ হয়। ইংরেজদের সঙ্গে নিজামের পুলিশ বাহিনী যোগ দিয়ে পলাতক ফড়কেকে বন্দী করার চেষ্টা শুরু করে। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জুলাই এক মন্দিরে নিদ্রিত অবস্থায় ফড়কে পুলিশ বাহিনী কর্তৃক বন্দী হন। অস্ত্র সংগ্রহ, লুণ্ঠন, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিচারে তাঁর দ্বীপান্তর হয়। আন্দামানের পরিবর্তে এডেনের জেলে তাঁকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি কারাগার থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হন। পরে পুনরায় তাঁকে বন্দী করা হলে তিনি স্বেচ্ছায় আহারের পরিমাণ হ্রাস করে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন।

(৬) **নীলবিদ্রোহ :**

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের নীল উৎপাদক জেলাগুলোতে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। হিন্দু-মুসলমান কৃষকগণ মিলিতভাবে এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। নীলচাষীদের নেতা ছিলেন যশোহর জেলার ননীমাধব ও বেনীমাধব বিশ্বাস, নদীয়ার মেঘানা সরদার, হুগলির বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সরদার। নীল বিদ্রোহীরা জলে-স্থলে অত্যাচারী সাহেবদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। অগণিত নীল বিদ্রোহী সে সময় নীলকর সাহেব ও ইংরেজ সরকারের গুলিতে প্রাণ হারান। বিভিন্ন ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকায় নীলকর সাহেবদের ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হতে থাকে। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার প্রচেষ্টায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি প্রবল জনমত গঠিত হয়। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন। ফাদার লঙ নামক জনৈক পাদ্রী নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করলে ব্রিটিশ বিচারালয় তাঁকে শাস্তি প্রদান করে নীলকর সাহেবদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু ফাদার লঙ-এর কারাবাস ও নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ ইংলণ্ডের জনমতকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত ভারতের ও ইংলণ্ডের জনমতকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে নীলকর সাহেবদের প্রধান হাতিয়ার 'ইণ্ডিগো কন্ট্রাক্টস্ অ্যাক্ট' বাতিল করে দেয়। ফলে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। পরে কৃত্রিম উপায়ে নীলপ্রস্তুতির পন্থা আবিষ্কৃত হলে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ থেকে নীলচাষ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

(৭) **উপসংহার :**

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যেসব বিদ্রোহ দেখা দেয়

সেগুলোর কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। সাধারণতঃ এই সব বিদ্রোহ শুরুতে ধর্মীয় শুদ্ধিকরণ অথবা প্রতিবাদী কোন ধর্মমতকে কেন্দ্র করে দেখা দেয়। কুকা বিদ্রোহ ও নাইকদ-এর বিদ্রোহে এবং বীরসা ভগবানের আন্দোলনে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। ধর্মকেন্দ্রিক এই আন্দোলন পরিশেষে কৃষক বিদ্রোহ বা নিম্নবর্ণের বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। এই সব বিদ্রোহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাধারণতঃ দরিদ্র কৃষক এবং নিম্নবর্ণের ব্যক্তিরাই এই বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের প্রতিক্রিয়া রূপে ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং পরে সেই আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করার চেষ্টা করে। বাসুদেব বলবন্ত ফড়কের আন্দোলনে এই বৈশিষ্ট্যটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। তবে বাংলাদেশের নীল বিদ্রোহের প্রকৃতি সমসাময়িক অন্যান্য বিদ্রোহ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই বিদ্রোহ ছিল কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষকদের দ্বারা সংগঠিত এবং কৃষকদের পরিচালিত। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই আন্দোলন বাংলাদেশের একদল বুদ্ধিজীবীর সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। এরূপ সহযোগিতা সমসাময়িক অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের পাওয়া সম্ভব হয় নি। তবে নীলচাষীদের বিদ্রোহ ছিল নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নয়। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরাই ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ও নীলকর সাহেবদের মধ্যে অভিন্ন সম্পর্কের কথা যুক্তিসহকারে প্রদর্শন করে সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার চেষ্টা করেন।

Q. 6. Give a critical view of the politics of associations.

Ans. (১) **ভূমিকা :**

বিভিন্ন শ্রেণীর সমিতি গঠনের মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবাসী আধুনিক রাজনীতির ভাবধারায় পুষ্ট হওয়ার সুযোগ লাভ করে। প্রথম দিকে ধর্মীয় উদ্দীপনা, শ্রেণীগত সংহতি প্রভৃতি সমিতি গঠনে সহায়তা করলেও পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষতার কারণেও একদল ভারতীয়ের সমিতি গঠনে উৎসাহিত করে। অভিন্ন যোগ্যতা ও কর্মপদ্ধতি, অভিন্ন শিক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অভিন্ন বিদ্বেষ ও অসন্তোষ প্রভৃতি ও ভারতীয়দের পারিবারিক,জাতিগত ও আঞ্চলিক স্বার্থের উর্ধ্বে স্থাপন করতে এবং অভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁদের সমিতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই ভারতীয়গণ পরিবার, জাতি ও অঞ্চলের চিরাচরিত প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক যুগের সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার সুযোগ পান। তবে এই সব আধুনিক সমিতি প্রথম দিকে সাধারণতঃ প্রাদেশিক সংস্থা হিসাবে গড়ে ওঠে। কিন্তু পরে প্রাদেশিক সমিতিগুলোই প্রয়োজনে অন্যান্য প্রাদেশিক সমিতি সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে একটি জাতীয় সংস্থা গঠনের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রদেশের আঞ্চলিক সমিতিগুলোর কাঠামোর উপর নির্ভর করেই ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেস স্থাপিত হয়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহাসিক ডক্টর অনিল শীল উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ থেকে অষ্টম দশককে 'সমিতির যুগ' বলে চিহ্নিত করেন।

(২) কলকাতার প্রস্তুতি :

ব্রিটিশ ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সীর রাজধানীতেই সর্বপ্রথম সমিতি গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হওয়ার ফলে এই সব স্থানের চিরাচরিত শাসনব্যবস্থার ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনই ছিল সমিতি গড়ে ওঠার প্রধান কারণ। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত এবং শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ভারতীয়গণই সমিতি গঠনের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী কিন্তু এই বিষয়ে খ্রীস্টধর্ম প্রচারকদের উদ্যোগের বিরোধী একটি গোষ্ঠী এ বিষয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের দৃষ্টিতে অবহেলিত ব্যক্তিরাও এই বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফলে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার দশ বছরের মধ্যেই ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিত এই সংস্থার সদস্যগণ পৌত্তলিকতার অসারতা সদম্ভে ঘোষণা করে স্বাধীন চিন্তা, ধর্ম, সত্য প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেন। যুক্তিবাদী চিন্তাই ছিল তাঁদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। হেনরি ডিরোজিও ও ডেভিড হেয়ারের স্বাধীন চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরা রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের উপর তীব্র আঘাত করতে শুরু করেন। তবে ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যবৃন্দ কল্পনার জগতে বাস করতেন এবং মানব-অধিকার ও অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষার জন্য দাবি উত্থাপন করেন। অপরদিকে বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন একদল বাঙ্গালী নির্দিষ্ট অসন্তোষ ও তার প্রতিকার দাবি উত্থাপন করে আঞ্চলিক রাজনীতির ভিত্তি গঠন করার চেষ্টা করেন। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় 'অ্যাকুইজিসন অফ জেনারেল নলেজ' নামে আর এক ছাত্রসভা গড়ে ওঠে। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা দু'শ হয়ে দাঁড়ায়। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই সভার সহিত যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় এসব সংস্থা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অনেক পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৮২৮ থেকে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রগণ আধ ডজনের বেশি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ তদানীন্তন কলকাতার ছাত্রসমাজকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলে এবং বাংলার নবজাগরণের পথ তিনিই প্রশস্ত করে তোলেন।

(৩) বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রস্তুতি :

কলকাতার তুলনায় বোম্বাই অঞ্চলের অগ্রগতি ছিল অনেক মন্থর। কলকাতার হিন্দু কলেজের অনুকরণে ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউসন স্থাপিত হলে ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে এই সংস্থার প্রকৃত কোন অস্তিত্ব ছিল না। তবে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হলে পার্সি, গুজরাটি ও মারাঠা ছাত্রদের মিলনের এবং ভাবের

আদান-প্রদানের পথ উন্মুক্ত হয়। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে দাদাভাই নৌরজির সম্পাদনায় 'রাস্ত গোফ্‌তার' (সত্য-বক্তা) নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং এই পত্রিকা বোম্বাই অঞ্চলের জনমত গঠনে খুব সাহায্য করে। মাদ্রাজের ক্ষেত্রেও সমিতিগঠনের ইতিহাস প্রায় একই রূপ। ছাত্র ও যুব সমাজ সেখানে প্রথম সমিতি গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরে ঐ সমিতির মাধ্যমেই রাজনৈতিক চেতনার সূত্রপাত ঘটে।

(৪) সমিতি গঠনের প্রত্যক্ষ কারণ :

কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে এই সময় সমিতি গঠনের আর একটি বিশেষ কারণ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ নবীকরণের সময় উপস্থিত হলে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের পক্ষ থেকে কোম্পানীর কার্যকলাপ পর্যালোচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং ভারতীয়গণ নতুন সনদ মঞ্জুর করার পূর্বে পার্লিয়ামেন্টের সম্মুখে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর কলকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং এই সংস্থা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের রূপরেখা পরিবর্তনের জন্য, বিশেষতঃ স্থানীয় শাসনবিধির উন্নয়ন সাধনের জন্য পার্লিয়ামেন্টের নিকট আবেদনপত্র পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অপরদিকে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে অগাস্ট বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাই অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এই সমিতিতে যোগ দিয়ে এই সমিতিকে ঐ অঞ্চলের একশত জন প্রতিনিধিমূলক সংগঠন হিসাবে গণ্য করার দাবি করেন। গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই সমিতির পক্ষ থেকে কোম্পানীর সনদ সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের নিকট আবেদন পাঠান হয়। পুণে শহরেও ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে ডেকান অ্যাসোসিয়েশন এবং একই বছরে মাদ্রাজে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। পরে মাদ্রাজের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন নামে পরিচিত হয়। কলকাতা ও বোম্বাই-এর অ্যাসোসিয়েশনের মতো মাদ্রাজের অ্যাসোসিয়েশনও কোম্পানীকে নতুন সনদ মঞ্জুর করার পূর্বেই ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করে।

(৫) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বৈশিষ্ট্য :

প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজের সমিতিগুলো গঠিত হলেও, কলকাতার সমিতি প্রকৃতপক্ষে ছিল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামক সংস্থা দুটির উত্তরাধিকারী। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে জমিদারদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি বা জমিদার সমিতি গঠিত হয়। কিছুদিন পরে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে ইয়ংবেঙ্গলের সদস্যগণ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি গঠন করেন। কিন্তু এই দুটি সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার মধ্যে পার্থক্য থাকার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। জমিদারদের স্বার্থরক্ষাই ছিল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি জমিদারীপ্রথার সমালোচনা শুরু করে এবং কৃষকদের স্বার্থরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন পেশ করে। যা হোক

বাংলা প্রেসিডেন্সীর এই দুটি সমিতিই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। ফলে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং রাজা রাধাকান্ত দেব এই সমিতির প্রথম সভাপতি এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। যদিও এই সমিতি সকল শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হওয়ার নীতি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে তথাপি প্রকৃতপক্ষে বিত্তশালী জমিদারগণই এই সমিতির সদস্যপদ লাভ করতেন। আবার অপরদিকে ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগিতায় সকলশ্রেণীর উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টা এই সমিতির উদ্দেশ্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে রায়তদের বিরুদ্ধে জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করাই ছিল এই সমিতির প্রধান কর্মসূচী। ফলে বোম্বাই ও মাদ্রাজের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অপেক্ষা কলকাতার অ্যাসোসিয়েশনের চরিত্র স্বতন্ত্র ধরনের ছিল।

(৬) কলকাতার অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্ব বৃদ্ধি :

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় আটের দশক পর্যন্ত এইসব অ্যাসোসিয়েশনগুলোই প্রেসিডেন্সীর রাজনীতি পরিচালনা করত। এই সময় ব্রিটিশ-ভারতে অনেক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং অ্যাসোসিয়েশনগুলো ন'নারূপ শাসন সংস্কারের দাবি সম্বলিত আবেদন পেশ করতে শুরু করে। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীকে নতুন সনদ মঞ্জুর করার পূর্বেই তাদের কর্মতৎপরতা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীকালে স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় অধিকতরভাবে অংশ গ্রহণ করার জন্য তাদের পক্ষ থেকে লণ্ডনে নিয়মিত আবেদনপত্র প্রেরিত হতে থাকে। বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে আবেদন-পত্র প্রেরিত হলেও তাদের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিশেষতঃ বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলার চেষ্টা করত। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর বোম্বাইর অ্যাসো-সিয়েশনের কার্যকলাপ স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং মিস্টার জি. এল. চেট্টির মৃত্যুর পর মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে এই সময় একমাত্র কলকাতার অ্যাসোসিয়েশনই সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের নিকট ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া পেশ করতে শুরু করে।

(৭) উপেক্ষিত দাবি :

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কোন দাবিই পূরণ করে নি। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক সংস্কার এবং স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের অনু-প্রবেশের সুযোগের জন্য আবার দাবি পেশ করতে শুরু করে। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে সাংবিধানিক-ভাবে গঠিত আইনসভার ক্ষমতা সম্পন্ন কোন একটি সংস্থা গঠনের জন্য আবেদন করা হয়। কিন্তু মহাবিদ্রোহের পর ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে এবং মহারানীর ঘোষণাপত্র অনুযায়ী ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের উপর ভারতের শাসন-দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শাসনতান্ত্রিক এই পরিবর্তনের সময়ও ভারতবাসীদের

ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নি। এমন কি, ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিলস অ্যাক্টও তাদের হতাশ করে।

শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ ছাড়াও সম্মানিত, বিশ্বস্ত এবং উপযুক্ত ভারতীয়দের দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে নিযুক্ত না করার জন্য অ্যাসোসিয়েশন বারবার অভিযোগ করতে শুরু করে। কিন্তু ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ এই অভিযোগ প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করে নি। বিশেষতঃ উচ্চ রাজপদে নিযুক্তির জন্য ইংলণ্ডে পরীক্ষা গ্রহণের প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে কলকাতার অ্যাসোসিয়েশন জোরালো প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশনও এই প্রতিবাদকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে হেইলিবারি কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার দাবি করা হয় এবং ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে যুগপৎ ইংলণ্ড ও ভারতে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের দবি উত্থাপন করা হয়। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের পরীক্ষা সম্পর্কিত নতুন নিয়মাবলীর কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার্থীর বয়ঃসীমা হ্রাস করে একুশ করা হলে ভারতীয় ছাত্রদের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ না করার জন্য ভারত সচিবের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয়। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে লণ্ডনে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের নিকটও অনুরূপ দাবি করার জন্য অনুরোধ জানান হয়।

(৮) উপসংহার :

প্রায় তিন দশক যাবৎ কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের অ্যাসোসিয়েশনগুলো ব্রিটিশ সরকারের নিকট নানাপ্রকার দাবি পেশ করে। এইসব দাবির প্রধান দুটি লক্ষ্য ছিল উপযুক্ত ব্যক্তিদের ভারতীয়দের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন এবং আইন প্রণয়নে ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের অধিকার। দাবিগুলো ছিল খুবই সামান্য এবং আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হত এবং শেষ পর্যন্ত আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকত। মন্ত্রিসভা, পার্লিয়ামেণ্ট অথবা ভারতসচিবের নিকট আবেদনপত্র পেশ করেই তারা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করত। কোন কোন ক্ষেত্রে জনসভা আহ্বান-করে অ্যাসোসিয়েশন তাদের দাবির কথা জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করলেও তারা কখনও আন্দোলনের পথ গ্রহণ করে নি। আবার অপরদিকে এই সব অ্যাসোসিয়েশন কোনক্রমেই জনগণের প্রতিনিধিমূলক সংস্থা রূপে গণ্য হতে পারে না, কারণ মুষ্টিমেয় সদস্য নিয়েই এই সংস্থাগুলো গঠিত হত। তা ছাড়া, মফঃস্বলে অ্যাসোসিয়েশনের কোন শাখা গড়ে ওঠে নি অথবা গড়ে তোলারও কোন বন্দোবস্ত করা হয় নি। প্রেসিডেন্সী তিনটির অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যেও সম্পর্ক ছিল খুবই ক্ষীণ। কিন্তু সংস্থা-গুলোর এসব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও পরিচালক সমিতির অস্তিত্ব, সদস্যদের নিয়মিত চাঁদা প্রদান, নিয়মিত অধিবেশন আহ্বান প্রভৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবার, জাতি, ধর্ম ও অঞ্চলের গণ্ডী অতিক্রম এবং প্রাথমিক গঠনের বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করে এই সব সমিতিই ভারত উপমহাদেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের পথ প্রশস্ত করে তুলতে সমর্থ হয়।

Q 7 Discuss the causes of the growth of militant nationalism. What were its characteristics ?

Ans (১) ভূমিকা :

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ফলে মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলেও জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম বিশ বছরের ইতিহাস প্রধানতঃ আবেদন-নিবেদনের যুগ রূপেই চিহ্নিত। এই সময় কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন প্রকার জনস্বার্থ বিরোধী নীতির সমালোচনা করলেও তাঁরা ব্রিটিশ জাতির উদারনৈতিক চিন্তাধারা ও ন্যায়বোধের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতাদের অনুসৃত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও নরমপন্থী নীতি অনেকের নিকট অযৌক্তিক ও অর্থহীন বিবেচিত হয়। তাঁরা অধিকতর সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের পথ নির্বাচনের উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। এইরূপ মনোভাব উদ্ভবের ফলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে চরমপন্থী মতবাদ গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়। এই চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী মনোভাব সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ নামেও অভিহিত হয়।

(২) সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের কারণ :

সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের মূলে কয়েকটি কারণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান শোষণের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই সময় সারা বিশ্বে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক কার্যকলাপ তীব্র আকার ধারণ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংলণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়ে ইংলণ্ড ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণের মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করতে শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে শুল্কসংক্রান্ত আইন ও ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে কার্পাস বস্ত্র-বিষয়ক আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ভারতের বস্ত্রশিল্পে দারুণ সঙ্কট দেখা দেয়। অপরদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ-শক্তির সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের ফলে সামরিক খাতে ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এই ব্যয় বৃদ্ধির অধিকাংশই ভারতের বহন করতে হত।

ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ নীতির ফলে ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে যে সঙ্কট দেখা দেয়, অনিবার্যভাবেই ভারতের কৃষিক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শিল্পসঙ্কটের ফলে বহু শ্রমিক জীবিকাহীন হয়ে পড়ে এবং ফলে জমির উপর চাপ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অপর-দিকে জমির উন্নতি ও আধুনিক প্রথায় চাষ-বাস পদ্ধতি প্রচলিত না হওয়ার ফলে কৃষির উৎপাদনও ক্রমশঃ হ্রাস পায়। একদিকে ব্রিটিশ সরকারের আগ্রাসী শোষণনীতি অপর-দিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি উদাসীনতায় ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। এই পরিস্থিতির অনিবার্য ফলস্বরূপ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতে বারবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে শুরু করে। ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হয়ে অন্ততঃ নব্বই লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিদেশী শাসকগোষ্ঠী নিদারুণ এই জাতীয় সঙ্কট মোচনের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। ব্রিটিশ সরকারের এই নির্মম ঔদাসীন্য ভারতের জনসাধারণের মনে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে বিচলিত হয়ে ওঠেন। তৎকালীন ভারতের তিনজন শীর্ষস্থানীয় নেতা, যথা—দাদাভাই নওরোজি তাঁর 'Poverty And un-British Rule in India', রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'Economic History of India' এবং গোবিন্দ মহাদেব রানাডে তাঁর 'Economic Essays' গ্রন্থে ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন এবং ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতিকে দায়ী করেন। দাদাভাই নওরোজি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মতে ভারত থেকে অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের ফলে ভারতের মূলধন সৃষ্টির সুযোগ বিনষ্ট হয়, ফলে ভারতের শিল্পবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতির ফলে কৃষির উপর চাপ ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ভারতের অর্থনীতি অন্তঃসারহীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে রমেশচন্দ্র দত্ত মনে করেন যে, ভারত থেকে অর্থ নির্গমন ও অন্যদিকে অত্যধিক ভূমিরাজস্ব আদায়ের জন্যই ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যা হোক, ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর নীতি সম্পর্কে ভারতের নেতৃবর্গের অর্থনৈতিক লুণ্ঠন তত্ত্ব ভারতীয়দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ডঃ বিপানচন্দ্রও তাঁর "The Rise and Growth of Economic Nationalism in India" গ্রন্থে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই লুণ্ঠনতত্ত্ব একদিকে ভারতের জনমানসের উপর সবচাইতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং এই তত্ত্ব দ্বারা ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিদেশী ও শোষণমূলক চরিত্র সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হন। তা ছাড়া, এই সময় ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ পদ্ধতি এত বেশি নগ্নরূপ গ্রহণ করে যে, গোপালকৃষ্ণ গোখলের মতো নরমপন্থী নেতাও ওয়েলবি কমিশনের নিকট ভারতের অর্থনৈতিক লুণ্ঠন ও শোষণের কথা তুলে ধরে ব্রিটিশ বণিকগোষ্ঠী ও পুঁজিপতিদের স্বার্থে ভারতীয় অর্থনীতিকে পরিচালনার তীব্র সমালোচনা করেন। তবে শুধুমাত্র ভারতীয়রাই নন, ব্রিটিশ লেখক উইলিয়ম ডিগবিও তাঁর 'Prosperous British India' গ্রন্থে ভারতের অর্থনৈতিক ক্রমাবনতি ও দারিদ্র্যের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নীতিকে দায়ী করেন। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতের শোচনীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভারতবাসীর মনে তীব্র বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে ভারতের জনসাধারণের অধিকার অর্জনের সপক্ষে বারবার দাবি উত্থাপন করতে শুরু করেন। দাদাভাই নওরোজি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন যে, স্বায়ত্ত শাসনই হল ভারতের দারিদ্র্য ও দুর্বলতা দূর করার একমাত্র উপায়। "Without self-government, the Indians can never

get rid of their present drain and the consequent improvement, misery and destruction............Self-government is the only remedy for India's woes and wrongs". ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের অর্থ নৈতিক শোষণ ও তার প্রতি ভারতীয়দের গভীর ক্ষোভ সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী চেতনার অর্থ নৈতিক পটভূমিকা রচনা করে।

দ্বিতীয়তঃ, শুধুমাত্র অর্থ নৈতিক শোষণ নয়, সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিও সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দিকের নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল যে, তাঁদের গঠনমূলক সমালোচনা ভারতের শাসন-তান্ত্রিক পরিবর্তনে সাহায্য করবে এবং ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করতে সমর্থ হবে। কিন্তু তাঁদের এই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল আইনে যে সকল সংস্কারের কথা ঘোষণা করা হয় তা ভারতবাসীর নিকট নৈরাশ্যজনক বলে বিবেচিত হয় এবং জাতীয়তাবাদী মহলে প্রচণ্ড হতাশা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে তরুণ নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের ভিক্ষাবৃত্তি নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে সংগ্রামী আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভারতবাসীর এই মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করে এবং ভারতবাসীর সকল ন্যায্য দাবি-দাওয়া অগ্রাহ্য করতে শুরু করে। এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির চরম প্রকাশ পায় লর্ড কার্জনের শাসনকালে (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ)। লর্ড কার্জন ভারতের জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন এবং তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করাই তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জনের আমলে ব্রিটিশ সরকার কঠোর ও দমনমূলক নীতি অনুসরণ করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা খর্ব করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করার চেষ্টা করেন। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন আইন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতির দ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। লর্ড কার্জনের আমলের এই সব কার্যকলাপের ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা সরকারের নীতির বিরোধিতা করার জন্য বদ্ধপরিকর হন।

তৃতীয়তঃ, সমসাময়িক বৈদেশিক ঘটনাও ভারতবাসীকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই সময় আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয় জনগণ ও শ্রমিকদের উপর যে নির্মম অত্যাচার শুরু হয় তা ভারতের জনগণকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তা ছাড়া, উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জাপানের অভাবনীয় অগ্রগতি ও শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ১৯০৪ – ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের বিস্ময়কর সাফল্য ভারতীয়দের মনে আত্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

ইয়োরোপীয় দেশসমূহের শক্তি সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়। অপরদিকে এই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, যেমন চীন, তুরস্ক, রাশিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে জাতীয় আন্দোলনের যে উত্তাল প্রবাহ শুরু হয় তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে আরও সক্রিয় ও প্রাণবন্ত করে তুলতে সাহায্য করে।

চতুর্থতঃ, সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উন্মেষের মূলে একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণও দেখা যায়। ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকা প্রস্তুতিতে যেমন দার্শনিকদের প্রভাব দেখা যায়, রুশ বিপ্লবের সূচনায় যেমন রুশ সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের প্রভাব দেখা যায়, তেমন ভাবেই ভারতের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন মনীষীর সৃজনশীল রচনা ও আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সব মনীষীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও উপন্যাসে জাতীয়তাবাদের মন্ত্র প্রচার করেন। কৃষ্ণচরিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত 'আনন্দমঠ' সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রচারে বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। আনন্দমঠে বর্ণিত একদল দেশপ্রেমিকের আত্মোৎসর্গের কাহিনী ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আনন্দমঠ গ্রন্থ সে যুগের যুব সম্প্রদায়কে দেশপ্রেম ও সক্রিয় জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্দীপ্ত করে তোলে। তবে স্বাদেশিকতার প্রসারে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র ভারতজননীর বাস্তবরূপ অঙ্কন করেন এবং পরবর্তীকালে এই সঙ্গীত ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের মন্ত্রে পরিণত হয়।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ধর্মীয় মতবাদ সংগ্রামী-জাতীয়তাবাদ প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করে। বৈদিকসভ্যতার আদর্শের ভিত্তিতে তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের সংস্কার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই সংস্কার কার্য পরিচালনা করে তিনি আর্য সমাজ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর ভারতের জনগণের মধ্যে আর্যসমাজ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং ঐ অঞ্চলের হিন্দু সমাজের হতাশার ভাব দূর করে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারে স্বামী বিবেকানন্দের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিবেকান্দ জাতীয়তাবাদকে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শে পরিণত করেন। তিনি ভারতীয় যুব সমাজকে দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে দেশ মাতৃকার পূজায় আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। তবে শুধুমাত্র উপদেশ দিয়েই নয়, ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমেও তিনি দেশবাসীকে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করেন। চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে হিন্দু ধর্মের মূলসত্য তুলে ধরে তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতের সনাতন ধর্মকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। প্রকৃতপক্ষে বিবেকান্দের জীবন ও বাণী ভারতবাসীর মনে ঐক্যবোধ ও স্বদেশপ্রেম সঞ্চারে অপরিসীম ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৩) উপসংহার :

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে একাধিক কারণে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ হয়। সংগ্রামে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নতুন নেতৃবৃন্দ চরমপন্থী নামে অভিহিত হন এবং জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি নতুন সক্রিয় গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। এই নতুন নেতৃবর্গের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী আদর্শের চারটি মূল বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। (১) তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আবেদন নিবেদন পরিহার করে ভারতবাসীর আত্মশক্তি ও আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। (২) তাঁরা ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক গৌরব ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তার উপর ভিত্তি করে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। (৩) শুধুমাত্র শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁরা প্রকৃত স্বরাজ আদায় করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতির চেষ্টা শুরু করেন। (৪) ব্রিটিশ বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেও তাঁরা মনস্থির করেন।

Q. 8. Discuss the Ilbert Bill controversy and its significance. Assess the importance of the racial factor in the emergency of the Indian nationalism.

Ans. (১) ভূমিকা :

ঐতিহাসিকরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উত্থান ও অগ্রগতির আলোচনা করতে গিয়ে Racialism অথবা জাতিগত বৈষম্যের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। এদেশে ইংরেজরা আসার পর থেকে শাসক ও শাসিতের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের মত কোন ইংরেজ জাতিগত বিদ্বেষের উর্ধ্বে ভাবতে পারলেও কর্ণওয়ালিশের মত ইংরেজ প্রশাসক ভারতীয়দের সম্পর্কে অত্যন্ত নিম্ন মত পোষণ করতেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহ ইংরেজ ও ভারতীয় জাতির মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক অত্যন্ত বেশি মাত্রায় বাড়িয়েছিল। যদিও ভাইসরয়রা এই জাতিগত বিদ্বেষের নিন্দা করেছিলেন, তা হলেও ইউরোপীয়দের মধ্যে এই মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বিশেষ করে বে-সরকারী ইউরোপীয়রা এই বিষয়ে অত্যন্ত উগ্রপন্থী ছিল। শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে ভারতীয়রা জাতিগত বৈষম্যের শিকার হ'ত বলে অমিয় বাগচী মন্তব্য করেছেন। প্রশাসনের সকল স্তরে এই মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের সামাজিক সম্পর্ক খুব বেশি ছিল না। বস্তুতঃ ইউরোপীয়রা ভারতীয়দের সঙ্গে বসবাস করত না। ইউরোপীয়দের মধ্যে এই ধারণা হয়েছিল যে, তারা সকল ব্যাপারে ভারতীয়দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতীয়দের মনে এই অভিযোগ ছিল যে, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা যথোপযুক্ত স্বীকৃতি ও মর্যাদা পাচ্ছে না। তখনকার সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বে জাতিগত বৈষম্য নিহিত ছিল। Whiteman's burden-এর তত্ত্ব অনুযায়ী অনেক ইংরেজ মনে করতেন যে, প্রাচ্যে মানুষকে সভ্য করার পবিত্র দায়িত্ব

তাঁদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। Metcalf-এর মতে ১৮৬০-এর মধ্যে ইংরেজরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিল। তারা এর মধ্যে কোন অন্যায় অথবা অবৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিচয় পায় নি। তাদের ধারণা ছিল যে, তারা ভারতে উপর থেকে শাসন করবে এবং ভারতের মঙ্গলসাধন করবে। কিন্তু তারা কখনই ভারতীয়দের সঙ্গে এক আসনে বসবে না। এই ধারণা এত বদ্ধমূল হয়েছিল যে, এলগিনের মত ভাইসরয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয়দের প্রতি সুবিচারের চেষ্টা করলে ইংরেজরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

(২) ইলবার্ট বিল ঃ

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে এই বিষয়টি চরম আকার ধারণ করেছিল। ভাইসরয়ের কাউন্সিলের আইন সদস্য চার্লস ইলবার্টের সঙ্গে এই বিষয়টি জড়িয়ে আছে। এতদিন ভারতীয় বিচারকরা আদালতে ইউরোপীয়দের বিচার করতে পারতেন না। ইলবার্ট বিল ভারতীয় বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের এই ক্ষমতা দিতে চেয়েছিল। তৎকালীন ভাইসরয় রিপনের উদারনীতির সঙ্গে এর সঙ্গতি ছিল। কিন্তু এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় তাদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার আশংকায় এই বিলের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেছিল। ইংরেজরা একটি Defence Association ও বিভিন্ন অঞ্চলে তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে প্রচারের জন্য অনেক অর্থ সংগ্রহ করেছিল। তাদের নেতারা উত্তেজক বক্তৃতার মাধ্যমে জাতিগত বিদ্বেষ বাড়িয়েছিলেন। তাদের জনৈক নেতা Brenson এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁরা কলকাতা টাউন হলে সভার আয়োজন করে এই বিষয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন।

(৩) প্রতিক্রিয়া ঃ

ইউরোপীয়দের এই কার্যকলাপ ভারতীয়দের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা ইংল্যাণ্ডের Liberalism থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন সভার আয়োজন করেছিল। সেখানে বিলের সমর্থনে অনেক বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল। লালমোহন ঘোষ ও আরো অনেকে ভারতীয়দের বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। এই বিলটিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের মহৎ আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েসন একটি Petition করে সরকারের কাছে দিয়েছিল তথাপি এইসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের চাপের সামনে সরকারকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বাতিল না হলেও এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল যে পুরোনো উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

ইউরোপীয়দের পক্ষে এটি একটি বিরাট সাফল্য ছিল। তাদের সংগঠন ও প্রচার জয়যুক্ত হয়েছিল। সরকারি, বেসরকারি এই দুই শ্রেণীর ইংরেজরা সর্বশক্তি দিয়ে বিলটির

বিরোধিতা করেছিল। Charles Wood-এর মতো উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীও মনে করতেন যে, শাসকগোষ্ঠীর মানুষ কখনই বিচার ব্যবস্থায় শাসিতের আওতায় আসতে পারে না। Bemridge প্রমুখ লিবারেল ছাড়া অন্যান্য ইংরেজ সিভিলিয়ান বিলটির বিরোধিতা করেছিলেন। এমন কি রিপন-এর কাউন্সিল এ-বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভবিষ্যতে লিবারেলিজম্‌কে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হবে। ডক্টর গোপালের মতে রিপনের দুর্বলতার জন্যই বিলটি ব্যর্থ হয়েছিল। তবে ভারতীয়রা এর জন্য ইউরোপীয় আমলাতন্ত্রকে দায়ী করেছিল। এই আমলাতন্ত্রের সংগঠিত শক্তি কয়েকজন ইংরেজের লিবারেলিজম্ অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী ছিল।

(৪) **ফলাফল :**

এর ফলে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের পারস্পরিক সম্পর্ক আরো খারাপ হয়। ভারতীয়রা অত্যন্ত হতাশ হয়েছিল। কারণ তাদের এই বিল সম্পর্কে অনেক আশা ছিল। সমসাময়িক ইংরেজ Blunt ভারতীয়দের এই হতাশা আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, সরকার একটি ক্ষুদ্র ইংরেজ গোষ্ঠীর অন্যায় দাবির কাছে নতি স্বীকার করেছে। তার ফলে ভবিষ্যতে ভালো সংস্কারের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আমলাতন্ত্রকে সকলের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে।

তথাপি এই হতাশা ও ব্যর্থতা পরোক্ষভাবে ভারতীয়দের উপকার করেছিল। এর ফলে শিক্ষিত ভারতীয়রা তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরো বাস্তবসম্মতভাবে চিন্তা করতে পেরেছিল। তাঁরা ইউরোপীয়দের সাফল্যমণ্ডিত পদ্ধতি আহরণ করতে পেরেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউরোপীয়দের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ না হলে তাঁদের আশা কখনও পূর্ণ হবে না। তাঁরা আরো বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতে রিপনের মত মানুষ ব্যতিক্রম এবং অধিকাংশ ইউরোপীয় ভারতীয়দের কোন মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নয়। ভবিষ্যতে রিপনের মতো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজের উপর নির্ভর না করে তাদের উচিত হবে ইউরোপীয় অনুকরণে আন্দোলন করে দাবি আদায় করা। রিপনের অসহায়তা তাদের শিখিয়েছে যে, অনুরোধের পথে না গিয়ে জোর করে তাদের দাবী আদায় করতে হবে। এর জন্যে আত্মনির্ভর হতে হবে। Henry Cotton ইলবার্ট বিল-বিরোধী ইংরেজদের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে অধিকাংশ ইংরেজ অত্যন্ত অন্যায়ভাবে রিপনের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল।

সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয়রা ব্যর্থ হলেও এই ঘটনা থেকে ভারতীয়রা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিল তা ভবিষ্যতে তাদের সাহায্য করেছিল। ইংল্যাণ্ডের লিবারেলিজম্‌কে ভিত্তি করে ৮০-র দশকে ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস স্থাপিত হয়েছিল। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের দাবি ছিল যে, ভারতীয়রা ইংরেজদের দ্বারা শাসিত হবে। বলা বাহুল্য শিক্ষিত ভারতীয়রা এই যুক্তিকে অন্যায় বলে মনে করেছিল। সাধারণ পরিস্থিতিতে ইলবার্ট বিল সময়ের সাথে সাথে বিস্তৃত হতে পারত

কিন্তু যে সময়ে এই বিলটি উপস্থিত হয়েছিল সেই সময়ে রাজনীতির দিগন্ত প্রসারিত হয়েছিল বলে পরিস্থিতি অন্যদিকে চলে গিয়েছিল।

(৫) **সমালোচনা :**

তখনকার জনৈক নেতা এ. সি. মজুমদারের মতে এই তিক্ত অধ্যায় ভারতীয়দের শিখিয়েছিল কি ভাবে দাবি আদায় করতে হয়। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, অনুরোধ না করে সুগঠিত ও সম্মিলিতভাবে দাবি ছিনিয়ে নিতে হবে। এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যে দৃঢ়তা, আত্মনির্ভরতা ও সচেতনতার ভাব এসেছিল। এই মানসিকতা গড়বার ব্যাপারে সংবাদপত্রের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কারণ সেখানে জাতীয়তাবাদী আদর্শকে তুলে ধরা হতো। ইলবার্ট বিল-কেন্দ্রীভূত আন্দোলন ভারতের শিক্ষিত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং প্রয়োজনমতো পরিস্থিতি পরিবর্তনের পথ দেখিয়েছিল। এই আন্দোলন ও আনুষঙ্গিক বিষয় উত্তর ভারতে সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল। এর অব্যবহিত পরে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী আদালত অবমাননার দায়ে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তার প্রতিবাদে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভ হয়েছিল। আগ্রা, ফৈজাবাদ, অমৃতসর, লাহোর এবং পুনায় প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এর ফলে ভারতীয়রা বুঝতে পারছিলেন যে, ভবিষ্যতে বৃটিশ সরকার বা ভাইসরয়-এর ব্যক্তিগত উদারতার উপর নির্ভর না করে তাদের উচিত হবে দাবি আদায়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করা। ভারতীয়দের আরো বেশি দৃঢ় হতে হবে এবং নিজেদের সংগ্রাম নিজেদের বাড়ীতে গড়তে হবে। সংগ্রামের পদ্ধতি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে নিতে হবে। সংগঠন, শক্তি, আন্দোলন ও পরিকল্পনা। ১৮৮৩-তে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন কলকাতায় ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশন ডেকেছিল। অম্বিকা মজুমদার লিখেছেন যে, ভারতীয়রা ইলবার্ট বিলের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিতে আরো পরিপক্ক ও অভিজ্ঞ হয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, ভবিষ্যতে তাদের রাজনীতিকে আরো প্রসারিত করতে হবে এবং তার জন্য বিচ্ছিন্ন ও আবেগপ্রবণ কার্যকলাপের জায়গায় সুপরিকল্পিত রাজনীতির আশ্রয় নিতে হবে। সুতরাং নরমপন্থী ও আনুগত্যের রাজনীতিতে একটা নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল। ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদ আরো ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে অনিল শীল মন্তব্য করেছেন।

Q. 9. To what extent was British policy as directed by Lord Reading responsible for the failure of the Non-co operation Movement ?

Ans (১) ভূমিকা :

১৯২০তে গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতে জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু ১৯২২-এ এই আন্দোলন স্তিমিত ও শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আন্দোলনের পতনের কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, শাসকবর্গ দমননীতি প্রয়োগ করেছিলেন। বহু আন্দোলনকারী কারারুদ্ধ

হয়েছিলেন এবং পুলিশ ও সরকার নানাভাবে নির্যাতন চালিয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র দমননীতি দিয়ে এই আন্দোলনের ব্যর্থতা অনুধাবন সম্ভব নয়। ইংরেজদের কূটনীতি এই আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল। ভাইসরয় লর্ড রিডিং এ ব্যাপারে যথেষ্ট বুদ্ধি ও তৎপরতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি অযথা দমননীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ সেক্ষেত্রে আন্দোলনের ভাবমূর্তি ভারতীয়দের কাছে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। তিনি আন্দোলনের মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ও স্থপতি গান্ধীকে আর সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা এবং গান্ধীর সঙ্গে তাদের মতবিরোধ সৃষ্টি করা। তিনি প্রথমে নরমপন্থী কংগ্রেসী ও উদারপন্থীদের কাছ থেকে গান্ধীকে সরিয়ে রেখেছিলেন। তেজবাহাদুর সপ্রু ও জয়াকরের মতো উদারপন্থীরা কোন সময়েই অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না। তাঁরা মণ্টফোর্ড শাসনতান্ত্রিক সংস্কার গ্রহণ করেছিলেন এবং আরো পরিবর্তন আশা করেছিলেন। মদনমোহন মালব্যের মতো কংগ্রেসী প্রথম থেকে অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা এই ধরনের গণ-আন্দোলনের পরিবর্তে সরকারের সঙ্গে আলোচনা চেয়েছিলেন। রিডিং এঁদের সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত করে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ভবিষ্যতে আরো শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন করা হবে। তার ফলে নরমপন্থীরা গান্ধীর আন্দোলনকে সংবিধানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা বলে মনে করেছিলেন। সুতরাং তাঁরা গান্ধীর কাছ থেকে সরে এসেছিলেন। রিডিং তাঁদের কাছে গান্ধীকে একগুঁয়ে ক্ষমতালোভী ও অযৌক্তিক মানুষ বলে তুলে ধরেছিলেন। তিনি এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন যে, গান্ধীর একগুঁয়েমির জন্য কোন সমাধান হতে পারছে না। তিনি তাদের আরো বুঝিয়েছিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলন দেশকে নেতিবাচক অরাজকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গান্ধীর কার্যকলাপ রিডিং-এর প্রচারকে সমর্থন করেছিল। গান্ধী সোসাইটির সঙ্গে আলোচনা করতে চান নি এবং সর্বদলীয় সম্মেলনে অংশ নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি অনেকের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এবং রিডিং সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিলেন।

(২) বিভেদ নীতি :

এরপর রিডিং গান্ধীর সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ সৃষ্টি করেছিলেন। এক সময়ে গান্ধী মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির নেতৃত্বে পরিচালিত খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে সমঝোতা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু মহম্মদ আলির প্রভাবের বাইরে অনেক মুসলমান-গোষ্ঠী ছিল। তাঁরা অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন না। মহম্মদ আলির প্রভাব রক্ষণশীল মুসলমানদের মধ্যে সীমিত ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে গান্ধীর মতান্তর ও মনান্তর ঘটেছিল এবং এ ব্যাপারে রিডিং এর ভূমিকা ছিল। মহম্মদ আলির উগ্রবর্তিতা গান্ধীর মনঃপূত হয় নি এবং তার ফলে মহম্মদ আলি মনঃক্ষুন্ন হয়েছিলেন। খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছিল। দুটি আন্দোলনই ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল এবং প্রাথমিক উৎসাহে ভাটা পড়েছিল।

সরকার মহম্মদ আলিকে গ্রেপ্তার করলেও গান্ধীকে গ্রেপ্তার করে নি। তার ফলে খিলাফৎ পন্থী মুসলমানদের মধ্যে গান্ধী সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। এদিকে খিলাফৎ বিরোধী এবং পাশ্চাত্যপন্থী মুসলমান নেতা সফি এবং জিন্না অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁরা শাসকদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সংবিধান নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের কাছে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ছিল অরাজকতার নামান্তর। জিন্না বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে ইংরেজ সরকার গান্ধী অপেক্ষা অনেক বেশী শাসনতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা মুসলমানদের দিতে সক্ষম হবে।

সুতরাং রিডিং নরমপন্থী ও মুসলমানদের সঙ্গে গান্ধীর দূরত্ব বৃদ্ধি করেছিলেন। তার তাৎপর্য এই নয় যে, তিনি এই মতপার্থক্য কল্পনার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কখনও একটি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হিসাবে গড়ে উঠতে পারে নি। ভারতীয় সমাজ বহু ধর্ম ও ভাষাগত গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। সুতরাং গান্ধীর পক্ষে একটি সর্বভারতীয় কাঠামোর মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনা দুঃসাধ্য ছিল। আন্দোলন শুরু হবার পর এই সব অন্তর্বিরোধ প্রকট হয়েছিল। রিডিং এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট বুদ্ধি ও বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছিলেন।

অবশ্য অসহযোগ আন্দোলন ভিতর থেকে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছিল এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের মূল জাতীয়তাবাদী প্রবাহের কোন সম্পর্ক ছিল না। তুরস্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে হিন্দুদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। তা ছাড়া খিলাফৎ আন্দোলনের বাইরে অনেক মুসলমান গোষ্ঠী ছিল। গান্ধী তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন নি। অপরদিকে গান্ধীর রামরাজ্যের আদর্শের মধ্যে মুসলমানরা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার আভাস দেখতে পেয়েছিল। গণ-আন্দোলনের সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস তখন উপযুক্ত হয়ে ওঠে নি। সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের শাখা গড়ে ওঠে নি। এই বিশাল গণ-আন্দোলন পরিচালনার সাধ্য সংগঠনের দিক থেকে কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। জহরলাল নেহেরু তাঁর জীবনীতে একথা স্বীকার করেছেন। উত্তরপ্রদেশ, বাংলা প্রভৃতি প্রদেশে কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে এই সুযোগে আন্দোলন করলে গান্ধী বিব্রত হয়েছিলেন। কারণ কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ক ছিল। গান্ধী রাজ-নৈতিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আন্দোলন করতে চাইলেও তাঁর পক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যাকে আটকে রাখা সম্ভব ছিল না। সুতরাং কৃষি আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনকে ভারতীয় জমিদার ও পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছিল। তার ফলে বৃটিশ রাজের সুবিধা হয়েছিল।

(৩) উপসংহার :

অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেকের ধারণা স্বচ্ছ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনকে নেতিবাচক ও সংকীর্ণ বলে অভিহিত করেছিলেন। বিহার ও অন্যত্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। বিহারে গোয়ালা, রাজপুত ও ভূমিহারদের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। নরমপন্থীরা এই আন্দোলনকে অরাজকতার নামান্তর বলে মনে করেছিলেন। অপরদিকে চরমপন্থীরা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহকে গ্রহণ করতে পারে নি। বোম্বে, পাঞ্জাব ও মালাবারে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছিল। এর মধ্যে মালাবারে মোপলা চাষীদের বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন যে, আন্দোলন তাঁর হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং হিংসার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯২২-এ উত্তর প্রদেশে গোরক্ষপুর জেলার চৌরি-চৌরা থানার উপর হিংসাত্মক জনতা আক্রমণ করলে অনেক পুলিশ মারা গিয়েছিল। গান্ধী এই পরিস্থিতিতে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে আন্দোলনের নৈতিক অবক্ষয় লক্ষ্য করেছিলেন। অধ্যাপক ত্রিপাঠীর ভাষায় চৌরিচৌরা ছিল "উটের পিঠে শেষ খড়"। বলা বাহুল্য, এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা গান্ধীজির কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না।

সুতরাং অসহযোগ আন্দোলন ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং সম্ভবতঃ তার দিন ঘনিয়ে এসেছিল। রিডিং এতদিন গান্ধীকে গ্রেপ্তার করেন নি কারণ সেক্ষেত্রে তাঁর জনপ্রিয়তা আবার বৃদ্ধি পেত। কিন্তু এখন রিডিং বুঝতে পেরেছিলেন যে, গান্ধীর জনপ্রিয়তা আপাততঃ ভাটার দিকে এবং তাঁর আন্দোলন কার্যতঃ ভেঙ্গে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি গান্ধীকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছিলেন এবং গান্ধী সেই গ্রেপ্তার বরণ করেন। গান্ধীর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। এইভাবে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং বৃটিশ নীতির প্রয়োগ অসহযোগ আন্দোলনকে ব্যর্থতার গ্লানিতে আচ্ছন্ন করেছিল।

Q. 10. Discuss the contributions made by Dayananda Saraswati towards the growth of extremism.

Ans. (১) **ভূমিকা :**

আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দ)। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মার্চ দয়ানন্দ সরস্বতী বোম্বাই শহরে আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে লাহোরে আর্য সমাজের কেন্দ্রস্থল গড়ে ওঠে এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর্য সমাজের প্রভাব বিস্তার করে। দয়ানন্দ বেদকে অভ্রান্ত মনে করতেন এবং তাঁর উপর ভিত্তি করে হিন্দু সমাজের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানান। হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য স্বামী দয়ানন্দ শুদ্ধি বা অহিন্দু ও ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। দয়ানন্দ সরস্বতীর ধর্মীয় মতবাদ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ প্রসারে সহায়ক হয়। তিনি ভারতের জাতীয় জীবনে পুরাতন

আর্য উপাদান সংগ্রহ করার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করেন। দয়ানন্দ সরস্বতী সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেন,—"Among the great galaxy of remarkable figures that will appear to the eye of posterity at the head of Indian Renaissance, one stands out by himself with the peculiar and solitary distinctions, one unique in the type, as he is amid a range of hills rising to a greater or lesser altitude, but all with the sweeping contours, green clad, flattering their eyes even in their stands apart, piled up in their strength, a mass of bare and puissant granite, with verdure on its summit, a solitary pine jutting out into the blue, a great cascade of pure, vigorous and fertilising water pushing out from its strength as a very fountain of life and the health to the valley. Dayananda was a great soldier of Light, a warrior in God's world, a sculptor of men and institutions, a bold and rugged victory of the difficulties which matter presents to spirit."

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে যে চরমপন্থী চিন্তাধারা ও আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তাতে স্বামী দয়ানন্দের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন একজন তাত্ত্বিক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি মোটেই সক্রিয় ছিলেন না এবং রাজনীতিতে তিনি কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন নি। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠি চরমপন্থী চিন্তাধারার তিন প্রবক্তার নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন—বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং দয়ানন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে দয়ানন্দ পাশ্চাত্য অথবা ইংরাজী শিক্ষা পান নি। তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বৈদিক আদর্শের অনুগামী ছিলেন। তাঁর কাছে বেদ ছিল অভ্রান্ত ও সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র উৎস। তিনি ছিলেন মূলতঃ ধর্মের মানুষ। বিবেকানন্দ ধর্মের মানুষ হলেও তাঁর চিন্তায় একটা সামাজিক ও বাস্তব দিক ছিল। তিনি ধর্মকে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। দয়ানন্দ সেদিক থেকে ধর্মকে খুব বেশী পরিমাণে বাস্তব জগতে নিয়ে আসেন নি।

২) দয়ানন্দের চিন্তাধারা :

তথাপি দয়ানন্দের চিন্তাধারা ও বক্তব্য চরমপন্থী আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। এই আন্দোলন ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছিল এবং পাশ্চাত্য তথা খ্রীষ্টীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। এই আন্দোলন ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও উদারপন্থী চিন্তাধারার বিরোধিতা করে সনাতনপন্থী যৌথসমাজের আদর্শ ঘোষণা করেছিল। দয়ানন্দের বক্তব্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রচলিত হয়েছিল। তিনি প্রাচীন ইতিহাস এবং বেদের আদর্শে অনেক বেশী বিশ্বাসী ছিলেন। অধ্যাপক ত্রিপাঠি

দেখিয়েছেন যে, চরমপন্থীরা অন্ধভাবে অতীতের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস করতেন না। তাঁদের কাছে অতীতের "Form" অথবা বহিরঙ্গ অপেক্ষা "spirit" বা আত্মা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দয়ানন্দ আধুনিককালের সমস্যাগুলিকে বেদের মানদণ্ডে বিচার ও সমাধান করতে চেয়েছিলেন। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তিনি আধুনিক-কালের বিশেষ সমস্যাবলী সম্পর্কে কতটা অবহিত ছিলেন? অনেক সমালোচকের মতে দয়ানন্দ অতীত রোমন্থনের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন এবং বর্তমান অপেক্ষা অতীতের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অতীতকে ফিরিয়ে আনতে চান নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, অতীতের নৈতিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে বর্তমানের অনেক সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হবে। সুতরাং তিনি বর্তমানের স্বার্থে অতীত চর্চায় রত হয়েছিলেন। বেদ সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় আস্থা এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। আসলে তিনি বেদের মধ্যে যে উচ্চ আদর্শ দেখেছিলেন তা তাঁর কাছে কাল-জয়ী বলে মনে হয়েছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দয়ানন্দ তৎকালীন সমাজের শোচনীয় পরিস্থিতিতে যথেষ্ট বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এখানে তাঁর বিশ্লেষণ চরমপন্থী আধুনিক নেতাদের বক্তব্য থেকে পৃথক ছিল। চরমপন্থীরা ভারতের সমস্ত দুর্দশা ও সমস্যার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে দায়ী করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, বৃটিশ শাসন অপসারিত হলে এই সব সমস্যা দূর হবে এবং ভারত আবার হৃত মর্যাদা ফিরে পাবে। কিন্তু দয়ানন্দ এই মতে সায় দেন নি। তাঁর কাছে ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা ভারতের নৈতিক অবক্ষয়ের নিদর্শন। যে জাতির চরিত্র নষ্ট হয়েছে কেবলমাত্র সেই জাতি পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং ভারতের রাজনৈতিক দাসত্বের জন্য ভারতীয়রাই দায়ী। তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা, লোভ, ব্যভিচার ও দুর্নীতি দেশকে পঙ্কে নিমজ্জিত করেছে। সুতরাং বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটলেই ভারত পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে এই যুক্তি গ্রহণ-যোগ্য নয়। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন কল্পে ভারতের নৈতিক দিক থেকে যোগ্য হতে হবে। তার কঠোর অনুশাসনের প্রয়োজন। এই জন্যে দয়ানন্দ শৃঙ্খলা ও নিয়মানু-বর্তিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, এই চিন্তাধারার ক্ষেত্রে দয়ানন্দের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। দয়ানন্দের মতো বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপেক্ষা আত্মিক ও নৈতিক স্বাধীনতাকে বেশী জরুরী মনে করেছিলেন। আসলে এই তিনজন তাত্ত্বিক রাজনীতির ক্ষুদ্র গণ্ডিতে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখতে চান নি। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ব্যাপক এবং তাঁরা আংশিক স্বাধীনতার পরিবর্তে সার্বিক মুক্তির আশ্বাস পেতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বিশ্ব-মানবতার মুক্তি চিন্তা করলেও দয়ানন্দের মধ্যে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় নি।

(৩) চরমপন্থী আন্দোলনে আর্যসমাজের অবদান ঃ

দয়ানন্দের কার্যকলাপ আর্যসমাজে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান কাগজে

কলমে এবং নীতিগত ক্ষেত্রে রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। সুতরাং তাঁর হাতে আর্য সমাজ সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্র হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দয়ানন্দ হিন্দু সমাজকে প্রাচীন ঐতিহ্যের কাঠামোর মধ্যে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রথমে বিভিন্ন জায়গায় আর্যসমাজ তেমন চাপ রাখতে না পারলেও ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানের প্রভাব প্রসারিত হয়েছিল। শুদ্ধির মাধ্যমে অনেককে হিন্দু সমাজে নিয়ে আসা হয়েছিল। ক্রমশঃ আর্যসমাজের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হ'ল। দয়ানন্দের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আর্যসমাজের ছত্রছায়ায় থেকে অনেক চরমপন্থী রাজনীতির চর্চা করেছিলেন। এইভাবে আর্যসমাজ একটি রাজনৈতিক চরিত্রে ভূষিত হ'ল। Chirol-এর মতে এই সমাজ অনেক চরমপন্থীকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং তারা সরকারের পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষতঃ পাঞ্জাবে আর্যসমাজের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। শহরের মধ্যবিত্ত হিন্দু ও গ্রামীণ চাষী আর্যসমাজের ও হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। যদি আমরা এই সময়কার চরমপন্থীদের একটি সংখ্যাতত্ত্ব তৈরী করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, আর্যসমাজ চরমপন্থী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করেছিল।

(৪) **উপসংহার :**

সুতরাং দয়ানন্দ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিল। দয়ানন্দের আদর্শবাদ, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা, চরিত্রবল, দেশপ্রেম এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সশ্রদ্ধ মনোভাব তৎকালীন যুগে অনেককে অভিভূত করেছিল। স্বয়ং অরবিন্দ মন্তব্য করেছেন যে, দয়ানন্দ তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী দিয়ে তৎকালীন রাজনীতি ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর অ-রাজনৈতিক বক্তব্য সত্ত্বেও আর্যসমাজ রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেকে প্রসারিত করেছিল এবং সেক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল। সুতরাং রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক এই উভয় ক্ষেত্রেই দয়ানন্দ তৎকালীন যুগের উপর নিজস্ব প্রতিভার ছাপ রাখতে পেরেছিলেন।

Q. 11. Would you agree with the view that a system of patronage lay at the heart of Madras Politics in the late 19th century ?

Or,

Explore the connection of Madras Politics with All India politics to 1907 In What ways did Madras present an exceptional political pattern ?

Ans. (১) **ভূমিকা :**

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তিনটি প্রেসিডেন্সীর মধ্যে মাদ্রাজের স্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্য দুটি প্রেসিডেন্সীর তুলনায় মাদ্রাজ ছিল অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ।

এখানে প্রশাসন আপাততঃ বেশী পরিমাণে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছিল। মাদ্রাজ শহরকে কেন্দ্র করে এই প্রেসিডেন্সী গড়ে উঠলেও এখানে আরও অনেক শহর ছিল। সুতরাং প্রেসিডেন্সী রাজনীতিতে কলকাতা ও বোম্বাইয়ের তুলনায় মাদ্রাজের গুরুত্ব কম ছিল। ওয়াশব্রুক মাদ্রাজে শান্ত পরিবেশ থাকার দু'টি কারণ দেখিয়েছেন। প্রথমতঃ, দক্ষিণ ভারতে গ্রাম ও শহরে দুই শ্রেণীর প্রভাবশালী মানুষ আধিপত্য করত। দ্বিতীয়তঃ, এইসব স্থানীয় প্রভাবশালী মানুষ ও সরকার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ছিল। তার ফলে মাদ্রাজে সমাজ, রাজনীতি ও প্রশাসনে একটি ভারসাম্য ছিল। ওয়াশব্রুক গ্রামের মাতব্বরদের "Rural local bosses" বলে উল্লেখ করেছেন। তারা স্থানীয় প্রতিপত্তির জন্য প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করত। আবার শাসকরাও স্থানীয় প্রশাসনের জন্য তাদের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করত। সাধারণতঃ গ্রামীণ মাতব্বররা আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল ছিল। ওয়াশব্রুক দেখিয়েছেন যে, মাদ্রাজের জমি ছিল শুষ্ক ও উর্বর। মালাবার ও অন্ধ্রের ব-দ্বীপে (গোদাবরী ও কৃষ্ণা) জমি উর্বর থাকায় সেখানকার চাষীর অবস্থা ছিল স্বচ্ছল। এই স্বচ্ছল চাষী স্থানীয় ব্যাপারে নেতৃত্ব দিত। সাধারণতঃ তারা সরকারের অনুগত ছিল। তাদের অর্থ নৈতিক স্বচ্ছলতা মাদ্রাজ রাজনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই উর্বর কৃষি পরিস্থিতিতে আমরা আয়ের মানদণ্ড বিচার করতে পারি না। অপরদিকে মাদ্রাজের শহরাঞ্চলে আধুনিক শিক্ষা, ব্যাংকিং ও বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল। তার ফলে একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। যারা জমির উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আধুনিক।

(২) মাদ্রাজ রাজনীতির চরিত্র ঃ

ওয়াশব্রুক গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাজের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে গ্রাম ও শহর সমান্তরালভাবে রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে। দুই স্তরেই "Magnet" বা স্থানীয় নেতৃত্বের তথ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। জেফ্রি ও সান্থারালিংগম্ মনে করেন যে, মাদ্রাজে নতুন ধরনের সামাজিক গোষ্ঠী ও চিন্তাধারার বিকাশ হয়েছিল। ওয়াশব্রুক ছাপাখানা ও শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। সংবাদপত্র ও বিতর্কসভা শিক্ষিত মানুষের মধ্যে জনমত রচনায় সাহায্য করেছিল। তবে ওয়াশব্রুক এইসব নতুন প্রবণতা মাদ্রাজের সমাজ ও রাজনীতিতে কতটা ভূমিকা নিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাহলেও শিক্ষিত মানুষের ভূমিকা উপেক্ষা করা উচিত হবে না। সান্থারালিংগম্ দেখিয়েছেন যে, মাদ্রাজে বৃটিশ অর্থনীতি ও প্রশাসনের চাহিদা মেটাবার জন্য শহরাঞ্চলে নতুন "Elite" গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তিনি এই প্রসঙ্গে তিন প্রকার Elite দেখিয়েছেন—(১) ১৮৪০-র দশকে একটি ধনিক শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিল। তারা ১৮৫২-তে মাদ্রাজ ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই এ্যাসোসিয়েশন খাজনা-মকুব ইত্যাদি দাবি

করে কোম্পানির কাছে একটি দাবি পাঠিয়েছিল। আমরা এই এ্যাসোসিয়েশনকে দক্ষিণ-ভারতের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলতে পারি। ১৮৬২-র মধ্যে এই এ্যাসোসিয়েশন কার্যতঃ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ ১৮৫০ ও ১৮৬০ র দশকে ইংরেজদের পক্ষে এই এ্যাসোসিয়েশনের প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। (২) Elite গোষ্ঠী ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। তারা বিভিন্ন চাকুরী ও বৃত্তিতে নিযুক্ত হতে আগ্রহী ছিল। তারা কতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। (৩) ১৮৬০-র দশকে একটি নতুন Elite গোষ্ঠীর বিকাশ হয়েছিল। তারাও ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে গড়ে উঠেছিল। তবে তৃতীয় গোষ্ঠী দ্বিতীয় গোষ্ঠী অপেক্ষা আয়তনে বড় ছিল। উকিল, চিকিৎসক, শিক্ষক প্রভৃতি বিভিন্ন জীবিকার মানুষ নিয়ে এই তৃতীয় গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের এই তিন গোষ্ঠীর উত্থান বৃটিশ শাসকদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এর ফলে বৃটিশ প্রশাসনের পক্ষে প্রেসিডেন্সীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সুবিধাজনক হয়েছিল।

কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকদের তথ্য অনুযায়ী আর দু'টি প্রেসিডেন্সীর মতো মাদ্রাজেও ব্রিটিশ প্রশাসনকে কেন্দ্র করে "Patron-Client" সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে Patron ছিল বৃটিশরাজ কারণ তাদের হাতে সুযোগ, সুবিধা দেওয়ার অনেক স্থানীয় Magnet অথবা বিশিষ্ট মানুষ শাসকদের সঙ্গে স্থানীয় স্তরে সহযোগিতা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্ভব হয় নি এবং তা থেকে হতাশা ও অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা এমন একটি গোষ্ঠী তৈরী করেছিল যাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটানো বৃটিশ রাজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে হারে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়ছিল সে হারে কর্মসংস্থান বাড়ছিল না। তাছাড়া ১৮৫৭-র পর Racialism অথবা জাতিগত বিদ্বেষ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। প্রশাসন ও অর্থনীতির উপর-তলায় কার্যতঃ ইউরোপীয়দের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৬২-তে কলকাতায় ইলবার্ট বিল নিয়ে বিতর্ক দেখা গেলে তা সুদূর দক্ষিণেও প্রসারিত হয়েছিল। সুতরাং জাতীয়তাবাদের পশ্চাতে অসন্তোষ সক্রিয় ছিল। ১৮৭৮-এ প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু' পত্রিকা দক্ষিণভারতে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সংবাদপত্রে পরিণত হয়েছিল। বিজয়রাঘবাচারী অভিযুক্ত হলে জাতীয়তাবাদী অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতিতে ১৮৮৪-তে মাদ্রাজে মহাজন সভা স্থাপিত হয়েছিল। মাদ্রাজ ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশনের অস্তিত্ব আর ছিল না। মহাজন সভা বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। যেমন উকিল ও বেটিয়া ব্যবসায়ী। ১৮৮৪ সালে মাদ্রাজ মহাজন সভা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়।

(৩) মাদ্রাজ রাজনীতিতে কংগ্রেসের প্রবেশ ঃ

ওয়াশব্রুকের মতে ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৬খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রশাসন স্থানীয় প্রধানদের চাপ সৃষ্টি করেছিল। জমিদারী, অরণ্যসম্পদ, আয়কর ও জলসেচের উপর এই চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং স্থানীয় প্রভাবশালী মানুষ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ কংগ্রেস

মহাজন সভার মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হতে চেয়েছিল। সানূথারালিংগম্ দেখিয়েছেন যে, এর ফলে জাতিগত বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৮৭তে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের ব্যয় শহরের ধনীরা বহন করেছিল। অধিবেশনে গ্রাম ও শহরের প্রতিবেশীরা যোগ দেওয়ায় কংগ্রেসের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল। রেড্ডি, সর্দার লিঙ্গায়েৎ ব্যবসায়ী এবং ভেল্লাল জমিদাররা এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিল। সুতরাং কংগ্রেসের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ যুক্ত হয়েছিল। এর ফলে কংগ্রেসের সংগঠন দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছিল। ১৮৯৩-র সূচনা পর্যন্ত দক্ষিণে কংগ্রেস নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে পেরেছিল। কিন্তু ৯০-এর দশকে কংগ্রেসের প্রতিপত্তিতে ভাটা পড়েছিল। ওয়াশব্রুকের মতে এর কারণ হচ্ছে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কংগ্রেসের বাইরে স্বার্থসিদ্ধির রাস্তা পেয়েছিল। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, পৌরসভা, আইন পরিষদ প্রভৃতি সংস্থায় প্রভাবশালী মানুষেরা প্রবেশ করতে চেয়েছিল। তাছাড়া ১৮৯২-এ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্টে ভারতীয়দের সামনে সলিসিটর জেনারেল ও এ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ লাভ করার সুযোগ আসে। সুতরাং শিক্ষিত ভারতীয়দের সামনে নানাবিধ সুযোগ আসায় তাদের রাজনীতি পরিবর্ধিত রূপ নিয়েছিল এবং কংগ্রেস ও মহাজন সভার প্রতিপত্তি হ্রাস পেয়েছিল। শহরের শিক্ষিত মানুষ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি বা Magnet-দের উপর নির্ভরশীল ছিল না।

(8) উপসংহার :

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমরা দু'টি রাজনৈতিক গোষ্ঠী দেখতে পাই—মাইলাপুর ও এ্যাগনোর। এই দুই গোষ্ঠীই ছিল শহর-কেন্দ্রিক। তাদের নেতারা যথাক্রমে মাইলাপুর ও এ্যাগনোরে থাকত। মাইলাপুর গোষ্ঠী উকিল ও প্রশাসকদের নিয়ে গঠিত ছিল। ১৮৮০-র দশকে এই গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন সুব্রহ্মণম্ আয়ার। এর পর নেতা হয়েছিলেন কৃষ্ণস্বামী আয়ার ও শিবস্বামী আয়ার। অপরদিকে এ্যাগনোর গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন শঙ্করণ আয়ার, রঙ্গচারী এবং কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার। ১৮৯৪তে এই দুই গোষ্ঠীর সংঘাতে কংগ্রেস বিপর্যস্ত হয়েছিল। মফঃস্বল অঞ্চলে দুই গোষ্ঠীরই ঘাঁটি ছিল। ১৮৯০-র দশকে মাদ্রাজ কংগ্রেস মাইলাপুর গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে ফিরোজ শা মেহতা প্রমুখ বোম্বাইয়ের নরমপন্থীদের সম্পর্ক ছিল। অপরদিকে এ্যাগনোর গোষ্ঠীর চরমপন্থী আন্দোলনের প্রতি বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও শ্রমিকদের সহানুভূতি ছিল। কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে (১৯০৭) প্রথম উল্লেখযোগ্য নরমপন্থী-চরমপন্থী সংঘর্ষ হয়েছিল। মাইলাপুর গোষ্ঠীর হাতে "Patronage" এর সিংহভাগ ছিল বলে এই গোষ্ঠীই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছিল। অপরদিকে কিছু চরমপন্থী ধর্মীয় পুনরুভ্যুদয়ের গুজব ছড়িয়ে তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। ১৯০৯ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে মাইলাপুরের হাতে এসেছিল। সুতরাং মাদ্রাজ রাজনীতি উপদলীয় বিরোধে লিপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত নরমপন্থী ও চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

Q. 12. Analyse the weakness of the Extremist movement with special reference to its class character.

Ans. (১) **ভূমিকা** :

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে চরমপন্থী আন্দোলন অনেক প্রত্যাশা নিয়ে গড়ে উঠলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই আন্দোলন কতকটা আকস্মিকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। পুলিশী অত্যাচার ও দমননীতি অবশ্যই এই আন্দোলনকে বাধা দিয়েছিল কারণ এই আন্দোলন ছিল নতুন অনভিজ্ঞ এবং দুর্বলভাবে সংগঠিত। তথাপি দমননীতি দিয়ে আন্দোলনের ব্যর্থতার সমস্ত কারণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেও আন্দোলনকারীরা আদালতে আইনের সাহায্যে অব্যাহতি পেয়েছিলেন।

(২) **স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা** :

অনেক অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের মতে বয়কট যথেষ্ট পরিমাণে সফল হতে পারে নি। অধ্যাপক ত্রিপাঠিও এই মত পোষণ করেন। যদিও সুমিত সরকারের মতে বয়কট ফলপ্রসূ হয়েছিল। বিদেশী শিল্পদ্রব্য বয়কটের ফলে স্বদেশী উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে স্বদেশী শিল্প গড়ে ওঠে নি। তাছাড়া বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির হাতে দেওয়া হয়েছিল। বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব ছাড়া অন্যত্র কংগ্রেস কমিটি নরমপন্থীদের হাতে ছিল এবং তারা বয়কটের পক্ষপাতী ছিল না। স্বদেশী দ্রব্যের অভাব ঘটলে সাধারণ মানুষের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল এবং তারা পুনরায় বিদেশী দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাছাড়া মুসলমান সমাজও স্বদেশী ও বয়কটের পক্ষপাতী ছিল না। তাদের উপর জোর করে বয়কট চাপাতে গেলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলপূর্বক বয়কটের বিরোধী ছিলেন। জামালপুর ও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ হয়েছিল। বস্তুতঃ চরমপন্থী আন্দোলনের চিন্তাধারার তত্ত্ব সনাতনপন্থী হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। চরমপন্থীরা ভারতের প্রাচীন গৌরব বলতে হিন্দু গৌরব বোঝাতেন। তাঁরা মুসলমান শাসন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন ও বিরূপ ছিলেন। মৌলানা আজাদ লিখেছেন যে, তিনি মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলনে নিয়ে আসার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। স্বদেশী অর্থনীতির মতো স্বদেশী শিক্ষানীতিও সফল হয়নি। ইংরেজদের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বয়কটের ডাক যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকরী হয়নি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রীর গুরুত্ব হ্রাস পায় নি। অপরদিকে যথেষ্ট সংখ্যক স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপিত হতে পারেনি।

(৩) **মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী** :

সোভিয়েত ও মার্কসবাদী লেখক কোমারভ্ ও লেভ্কভ্স্কি চরমপন্থী আন্দোলনের মধ্যে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক সংকট লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের মতে চরমপন্থীরা ছিলেন সমাজে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। মুলতঃ অর্থনৈতিক অসন্তোষ তাদের

পরিচালিত করেছিল এবং তারা উপনিবেশ ও বিদেশী শাসন থেকে কোন প্রতিকার পান নি। অপরদিকে নরমপন্থীরা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন এবং সেজন্য তাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন না। এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী চরমপন্থীদের মধ্যে নিম্নলিখিত গোষ্ঠী পরিচালিত হয়। (১) গ্রামীণ ভদ্রলোক গোষ্ঠী—এঁরা শিক্ষিত ছিলেন কিন্তু এঁদের হাতে যথেষ্ট জমি ছিল না এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল না। (২) গ্রাম ও শহরের কারিগর গোষ্ঠী —বৃটিশ পুঁজিবাদ এঁদের ভবিষ্যত নষ্ট করে দিয়েছিল। (৩) শহরের মধ্যবিত্ত—এঁরা শিক্ষিত হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। (৪) সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক ও ছাত্র—এদের বেতন ও আয় ছিল অত্যন্ত কম এবং তা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

সোভিয়েত লেখকদের মতে এইসব বিক্ষুব্ধ মানুষ ধীরে ধীরে হতাশায় চরমপন্থী আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা পাবনা ও দাক্ষিণাত্যে কৃষক বিদ্রোহ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন। যদিও তাঁরা সমগ্র সংগ্রামের পথে যান নি তবে তাঁদের মধ্যে অনেকে হিংসা ও সন্ত্রাসের পথে গিয়েছিলেন। সোভিয়েত লেখকরা এই সন্ত্রাস-বাদের নিন্দা করেছেন। কারণ তা গণ-আন্দোলন থেকে বিচ্যুতির কারণ হয়েছিল এবং সাধারণ মানুষ থেকে চরমপন্থীদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। রাশিয়াতে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ ব্যর্থ হয়েছিল এবং ভারতেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল।

(৪) **সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুটি ঃ**

অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠি সোভিয়েত বিশ্লেষণের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে সোভিয়েত লেখকরা চরমপন্থী আন্দোলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা বড় করে দেখেছেন। অধ্যাপক ত্রিপাঠি একটি সামাজিক বিশ্লেষণে এটি নির্দেশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, পূর্ববাংলার অনেক বড় বড় জমিদারও চরমপন্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। যদিও তাঁরা উচ্চবিত্ত ছিলেন। কেবলমাত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে আশংকা হওয়ায় তাঁরা সরকার-বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন একথা মনে করলে ভুল হবে। পূর্ববাংলার বিক্রমপুর এবং পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ ভদ্রলোকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক সমস্যায় বিব্রত হয়ে চরমপন্থায় আকৃষ্ট হয়েছিল বলা যায়। কিন্তু অন্যত্র চরমপন্থী আলোচনার সঙ্গে অর্থনৈতিক অসন্তোষের কার্যকারণ সম্পর্ক সুনিশ্চিতভাবে স্থাপন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া গ্রামীণ সমাজে দুর্গতির সঙ্গে কিছুটা ভালোর হদিশ পাওয়া যায়। মরিস ডি. মরিস, ধর্মকুমার প্রমুখ ঐতিহাসিক দেখিয়েছেন যে, কৃষিসমাজে সকল ক্ষেত্রে অবক্ষয় ছিল না।

তবে একথা ঠিক যে, শহরে শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক অভাব ও অসন্তোষ ছিল। স্কুল-শিক্ষক ও কেরানীর বেতন অত্যন্ত কম ছিল। অপরদিকে বাড়িভাড়া ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ছাত্রদের সামনে কোনও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল না। শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং বেকারত্ব ছাত্রদের সামনে অপেক্ষা করছিল। সরকারী শিক্ষানীতি এই সব সমস্যা সমাধানের কোনও আশা দেয় নি। অনেকের মতে ছাত্ররাই ছিল চরমপন্থী আন্দোলনের স্তম্ভ।

(৫) চরমপন্থী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ :

অধ্যাপক ত্রিপাঠির মতে চরমপন্থী প্রকৃত গণ-আন্দোলনে পরিণত হতে পারে নি। এই আন্দোলনে এক ধরনের গোপনীয়তা ছিল যার ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি। গ্রামের কৃষক এবং শহরের শ্রমিকদের সঙ্গে চরমপন্থীদের আত্মিক সংযোগ স্থাপিত হয় নি এবং তারা এই আন্দোলনে আকৃষ্ট হয় নি। বস্তুতঃ গান্ধীর পূর্বে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন জাতীয়তাবাদের অঙ্গ হিসাবে গড়ে ওঠে নি। তার ফলে চরমপন্থীরা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা সংগঠনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দক্ষ ছিল না। ত্রিপাঠি দেখিয়েছেন যে, চরমপন্থী নেতারা নিজ নিজ প্রদেশে রাজনৈতিক ঘাঁটি তৈরী করেছিলেন, তাই সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন নি। সুতরাং এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী ও সংগঠন নিয়ে সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

(৬) সাম্প্রতিক মতামত :

সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব ও আদর্শকে অনেক লেখক কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। সমালোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হল যে, নতুন জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেন এবং তার ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চরিত্রে সঙ্কীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা দেখা যায়। এককথায় চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িকদোষে দুষ্ট ছিল এবং ভারতে ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ প্রসারে চরমপন্থী রাজনীতি বাধা সৃষ্টি করে। রজনী পাম দত্ত হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সংমিশ্রণের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মত হল, চরমপন্থী মতবাদ ভারতের জাতীয় সংগ্রাম ও রাজনৈতিক চেতনার গতিকে দুর্বল করে তুলেছিল এবং ভারতের সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সংহত করে তুলতে সমর্থ হয়। রজনী পাম দত্ত আরও বলেন যে, অন্ধ হিন্দুধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশকে জাতীয় সংগ্রামের মূলধারা থেকে দূরে নিক্ষেপ করে। শুধু তাই নয়, ধর্মকেন্দ্রিক এই উগ্র জাতীয়তাবাদ পরবর্তীকালে গান্ধীবাদে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু রজনীপাম দত্তের এই মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ শীর্ষস্থানীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ যেমন বালগঙ্গাধর টিলক, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধী ছিলেন না। উপরন্তু, তাঁরা হিন্দু-মুসলমান সংহতির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তাছাড়া মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতের মতো অনগ্রসর দেশে সাধারণ মানুষকে জাতীয় আন্দোলনের ধারার সঙ্গে যুক্ত করতে হলে ধর্ম ও অতীত ঐতিহ্যকে ব্যবহার করা অযৌক্তিক নয়। সোভিয়েত ঐতিহাসিক ডক্টর কোমারভ এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গণ্ডীকে জনগণের নিকট সম্প্রসারিত করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়ার বলশেভিক কর্মীগণ মধ্য এশিয়ার জনগণের নিকট

ইসলাম এবং বৌদ্ধধর্মের আদর্শ অনুসরণে সাম্যবাদী চেতনা সঞ্চারে সচেষ্ট হন। সম্প্রতিকালে ডক্টর এস. আর. মেহরোত্রা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের চরিত্র সম্পর্কে যে মত ব্যক্ত করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, উগ্র জাতীয়তাবাদ ছিল একাধারে রক্ষণশীল ও বৈপ্লবিক ঘটনা, কারণ একদিকে এই মতবাদ ভারতের ঐতিহ্য ও হিন্দুধর্মের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, অন্যদিকে ভারতীয় রাজনীতিতে এই মতবাদ পাশ্চাত্যপন্থী আন্দোলনের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল। গণ-আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারাকে পাশ্চাত্যপন্থী রাজনৈতিক পদ্ধতি বলা যায়। ডক্টর মেহরোত্রা মনে করেন যে, ভারতীয় রাজনীতিতে নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুটি গোষ্ঠীর উদ্ভবের মধ্যে তদানীন্তন ভারতীয় সামাজিক পরিস্থিতির প্রতিফলন দেখা যায়। একদিকে নরমপন্থী নেতারা ছিলেন সমাজের বিত্তবান ও উচ্চ শ্রেণীভুক্ত, অন্যদিকে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সমর্থকগণ ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে উগ্র জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। চরমপন্থী আন্দোলনের নানা ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও চরমপন্থী নেতাদের অনুপ্রেরণায় জাতীয় আন্দোলন গতিশীল গণমুখী ও সংগ্রামী চরিত্র গ্রহণ করে। তাছাড়া চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করে স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেন।

(৬) উপসংহার :

অধ্যাপক ত্রিপাঠি চরমপন্থী আন্দোলনে আদর্শবাদের ভূমিকা আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, সোভিয়েত লেখকরা আদর্শবাদের ভূমিকা উপেক্ষা করে ভুল করেছেন। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকরাও আদর্শবাদের ভূমিকা উপেক্ষা করেছেন। এই প্রসঙ্গে সুমিত সরকার এবং Gramsci তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। Gramsci লিখেছেন যে, অনেকক্ষেত্রে মানুষ আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি স্বপ্নের জগৎ রচনা করে, যদিও বাস্তবের সঙ্গে তার মিল থাকে না। এর ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে দোদুল্যমান থাকে এবং আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। চরমপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। চরমপন্থীরা আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। তার ফলে চরমপন্থী শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে হতাশাবোধ সঞ্চারিত হয়েছিল। ঋষি অরবিন্দের দিব্যদর্শন এবং রাজনীতি পরিত্যাগ আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল। অবশেষে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী দরবারে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত বাতিল হলে চরমপন্থীদের পায়ের তলার জমি সরে গিয়েছিল কারণ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সুতরাং চরমপন্থী আন্দোলন প্রাথমিক অধ্যায়ে যে উদ্দীপনার অবতারণা করেছিল শেষ পর্যন্ত তা স্থায়ী হয় নি। তবে আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও এই আন্দোলন পরবর্তী জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল এবং ভারতীয় মানসিকতায় নতুন শক্তি নিয়ে এসেছিল।

Q. 13. To what extent was the British in India non-interventionist ? Do you accept the nightwatchmanship of Britain ?

Or, How far was the policy of Non-intervention successful about the princely States of Britain in India.

Ans. (১) ভূমিকা :

স্যার উইলিয়াম লী-ওয়ার্নার তাঁর "The Native States of India" পুস্তক ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলোর ১৭৫৭ থেকে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সম্পর্ককে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন। (১) এই তিনটি পর্ব হল 'Ring-Fence' নীতি (১৭৫৭-১৮১৩); (২) Subordinate Isolation নীতি (১৮১৩-১৮৫৮) এবং (৩) Subordinate Union নীতি (১৮৫৮-১৯১৯)।

(২) Ring-Fence নীতি :

স্যার উইলিয়াম লী-ওয়ার্নার-এর মতে Ring-Fence পর্বে ব্রিটিশ সরকার একটি নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ অঞ্চলে নিজেদের অধিকার সীমিত রেখে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে যথাসম্ভব কম সম্পর্ক রেখে চলার ব্যবস্থা করত। এই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী খুব শক্তিশালী ছিল না এবং তাদের পক্ষে ভারতীয় শক্তিগুলোকে যুদ্ধে পরাজিত করাও খুব সহজ ছিল না। মারাঠা, ফরাসী, নিজাম, মহীশূরের শক্তির মতো ইংরেজগণও ভারতের অন্যতম শক্তিরূপে বিবেচিত হত। সুতরাং ভারতীয় অন্যান্য শক্তির সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধিতা দেখা দিলে সাধারণতঃ সমতার ভিত্তিতেই উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হত। প্রকৃতপক্ষে এই সময় ব্রিটিশ কোম্পানী ভারতীয় অন্যান্য শক্তি সম্পর্কে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করত। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের পীটের ভারত-আইনেও স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করতে সম্মত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকটি ব্যাপারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশীয় রাজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করে। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম মারাঠা ও দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে লিপ্ত হন। লর্ড কর্ণওয়ালিস তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মহীশূর রাজ্যের অর্ধাংশ জয় করে ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে স্থাপন করেন। লর্ড ওয়েলেসলি চতুর্থ মহীশূর এবং দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। তিনি হায়দ্রাবাদ এবং অযোধ্যা রাজ্যকে ব্রিটিশের সঙ্গে অধীনতামূলক বশ্যতার চুক্তিতে আবদ্ধ করতে বাধ্য করেন। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড মিণ্টো পাঞ্জাবের রঞ্জিতসিং-এর সঙ্গে অমৃতসরের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে শতদ্রু নদীর পূর্বতীরের রাজ্যগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

লী-ওয়ার্নার-এর মতে এই দীর্ঘ ছাপ্পান্ন বছর (১৭৫৭-১৮১৩) ব্রিটিশ সরকার খুব সতর্কভাবে দেশীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। দেশীয় রাজ্যগুলোকে সংযুক্তিকরণ অথবা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন এই বিষয় দুটি সম্পর্কেই তাঁর বিশেষভাবে

চিন্তা করতে হয়। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের পর অযোধ্যা রাজ্যের ভবিষ্যৎ ব্রিটিশের দয়ার উপর নির্ভর করলেও ব্রিটিশ-ভারতের সঙ্গে তা যুক্ত করা হয় নি। রোহিলা যুদ্ধের পরও ওয়ারেন হেস্টিংস রোহিলাখণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন নি। ব্রিটিশ-মারাঠা দ্বন্দ্বেও সলবই-এর চুক্তির দ্বারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা স্বীকার করে নেয়। মহীশূর জয়ের পরও ঐ রাজ্যের একাংশ প্রাক্তন হিন্দু রাজবংশের উপর ন্যস্ত করা হয়।

কে. এম. পানিক্কর ব্রিটিশ শক্তির তদানীন্তন নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে দুটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। (১) মহীশূর ছাড়া অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে ব্রিটিশ শক্তি সমতার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন করে এবং ব্রিটিশ শক্তি বিশেষ কোন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মর্যাদা দাবি করে নি। (২) এই সব চুক্তি অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলো তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব ভোগ করার সুযোগ রক্ষা করতে সমর্থ হয় এবং ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ না করার নীতি মেনে চলতে বাধ্য হয়।

(৩) অধীনতামূলক বিচ্ছিন্নতা নীতি (Subordinate Isolation) :

১৮১৩ থেকে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলোকে অধীনতামূলক বশ্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করে। এই সময় থেকেই দেশীয় রাজ্যগুলো ব্রিটিশ রাজকে ভারতের প্রধানতম শক্তিরূপে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। দেশীয় রাজ্যগুলোর নিরাপত্তার জন্য নগদ অর্থ অথবা রাজ্যের একাংশের পরিবর্তে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। অধীনতামূলক মৈত্রীতে আবদ্ধ রাজ্যগুলো ইংরেজ ব্যতীত অন্যান্য ইয়োরোপীয় রাজকর্মচারীদের বিতাড়িত করতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ সরকারের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন উপায়ে বিদেশী কোন রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার উপরও বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। ভারতের অন্য কোন দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে বিরোধের প্রশ্নেও তারা ব্রিটিশ সরকারের মধ্যস্থতা করে নিতে বাধ্য হয়। এই সব শর্তের বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলোর অখণ্ডতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে টমাস মুনরো বলেন যে, দুর্বল ও অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীকে সমর্থন করে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায়ের নৈতিক অবনতির পথ প্রশস্ত করে দেয় এবং সাধারণ লোকদের চির-দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার মধ্যে জীবন যাপন করতে বাধ্য করে। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে 'লণ্ডন টাইমস' পত্রিকাও অধীনতামূলক মিত্রতার নীতির তীব্র সমালোচনা করে। তাদের মতে ব্রিটিশ শক্তির সমর্থনপুষ্ট দায়িত্বহীন, অপদার্থ দেশীয় রাজগণ নিজ নিজ এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করার সুযোগ লাভ করেন।

লর্ড হেস্টিংস অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তির সাহায্যে মধ্যভারতের ১৪৫ টি, কাথিওয়ারের ১৪৫ টি এবং রাজপুতানার ২০ টি রাজ্যের উপর ইংরেজদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ শক্তির অধীনতা স্বীকার করে দেশীয়

রাজ্যগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার নীতিতে বিশ্বাস করলেও তিনি এগুলোকে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী লর্ড ডালহৌসী পূর্বসূরীর নীতি পরিত্যাগ করে সিন্ধু, পাঞ্জাব, অযোধ্যা এবং, আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। স্বত্ব বিলোপ নীতির সাহায্যে তিনি অপুত্রক রাজাদের সাতারা, নাগপুর তাঞ্জোর, জয়পুর, ঝাঁসি, প্রভৃতি রাজ্যও অধিকার করেন। অপশাসনের জন্যও তিনি কয়েকটি রাজ্য ব্রিটিশের অধীনে আনয়ন করেন। লর্ড ডালহৌসীর এই নীতি দুভাবে দেশীয় রাজ্যগুলোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। যথা (১) ভারতের চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করে দত্তক পুত্রের দাবি অস্বীকার করা এবং (২) অপশাসনের যুক্তিতে রাজাদের চিরাচরিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। যাহোক অধীনতামূলক মৈত্রী ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার পর্বে ব্রিটিশ সরকার নানা যুক্তিজাল বিস্তার করে দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পথ সুগম করে।

(৪) অধীনতামূলক মিত্রতা বনাম ঐক্য (Subordinate Union) ঃ

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকার ও দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্পর্কের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করে। লর্ড ডালহৌসীর রাজ্য অধিকার নীতি বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ রূপে চিহ্নিত হয়। ফলে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে মহারাণীর ঘোষণা পত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, দেশীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্কিত সকল চুক্তি অপরিবর্তনীয়ভাবে মেনে চলা হবে এবং ব্রিটিশ সরকারের ভারতে রাজ্য বিস্তৃতির আর কোন বাসনা নেই। কিন্তু ঐ বছরেই লর্ড ক্যানিং ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ শক্তিই ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি, সুতরাং প্রয়োজন অনুসারে দেশীয় রাজ্যগুলোর শাসনব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব তারা ভোগ করে। ফলে সিপাহি বিদ্রোহের পর দেশীয় রাজ্যসমূহের বিচ্ছিন্নতাবাদের অবসান ঘটে এবং নৈতিকভাবে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যসমূহে বসবাসকারী ভারতীয়দের দায়িত্বও গ্রহণ করে। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয়গণ ক্যানিং-এর নীতিই অনুসরণ করেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড মিন্টো ঘোষণা করেন দেশীয় রাজ্যগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আভ্যন্তরীণ শাসনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার অধিকার ব্রিটিশ সরকার ভোগ করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাধারণ লোকের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়েই ব্রিটিশরাজের কর্তৃত্ব দেশীয় রাজন্যবর্গের স্বীকার করে নেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে উদয়পুরের ভাষণে লর্ড মিন্টো এই বিষয়টি আরও বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজন অনুসারে দেশীয় রাজ্যগুলোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ করার নীতির সমর্থনে বহু যুক্তি প্রদর্শন করেন। ফলে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সরকারের একান্ত অনুগত শক্তিতে পরিণত হয়।

(৫) দেশীয় রাজন্যবর্গের সভা ও বাটলার কমিশন :

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কারে আইন প্রবর্তনের পর রাজন্যবর্গের দ্বারা একটি সভা গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। একশ কুড়ি জন সদস্যের দ্বারা গঠিত এই সভায় দেশীয় বহু রাজ্য অংশ গ্রহণ করতে আপত্তি করে। ভাইসরয় এবং ভাইসরয়ের অনুপস্থিতিতে রাজন্যবর্গের দ্বারা নির্বাচিত চ্যান্সেলারের নেতৃত্বে এই সভা দিল্লীতে প্রতি বছর কমপক্ষে তিনবার মিলিত হয়ে দেশীয় রাজ্যগুলোর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মিলিতভাবে উপায় উদ্ভাবন করার চেষ্টা করত। কয়েক বছর পরে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলোর সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য বাটলার কমিশন নিযুক্ত করে। বাটলার কমিশন দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গের সঙ্গে ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে ভারত সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্য সুপারিশ করেন। বিশেষতঃ ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ শাসিত অঞ্চল থেকে পৃথক করে রাখাই ছিল বাটলার কমিশনের সুপারিশের প্রধান উদ্দেশ্য।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের পর ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গ একটি সর্বভারতীয় সংস্থা গড়ে তুলতে সম্মত হন। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন আইন দেশীয় রাজন্যবর্গের এই সর্বভারতীয় সংস্থার প্রতি সমর্থন জানায়। কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এই সংস্থার কার্যকলাপ ও সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা সত্ত্বেও দেশীয় রাজন্যবর্গের এই সংস্থা কখনই শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত হয় নি। বিশেষতঃ ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়। তবে বারবার তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্মতি ব্যতীত ব্রিটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। তবে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ক্যাবিনেট মিশন ও দেশীয় রাজ্যগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়ে ভারতের পরবর্তীকালের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে অথবা অন্য কোন প্রকার রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তুলে দেশীয় রাজ্যগুলোকে ভবিষ্যৎ নির্ধারণের পরামর্শ দেয়।

(৬) উপসংহার :

নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার সুবন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার প্রধানতঃ দেশীয় রাজ্যগুলোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করত। তবে অনেক উত্তরাধিকারীর প্রশ্ন এবং অন্যান্য ব্যাপারেও দেশীয় রাজ্যগুলোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজন হয়ে পড়ত। হায়দ্রাবাদ ও বরোদার ঘটনা তার গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। দেশীয় রাজাদের নির্যাতনের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করার জন্যও কখনও কখনও ব্রিটিশ সরকার তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হত। সৈন্যচলাচলের সুব্যবস্থা সম্পাদন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন, রেলপথ ও রাজপথের

সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্যও অনেক সময় ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজন্য-বর্গের শাসিত অঞ্চলের উপর নিজের কর্তৃত্ব বিস্তারের চেষ্টা করত। তবে রাজনৈতিক কারণে এইরূপ ঘটনা খুবই কম দেখা দিত। প্রকৃতপক্ষে একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করার নীতির পক্ষপাতী ছিল না। ব্রিটিশ সরকার ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রয়োজন ব্যতিরেকে হস্তক্ষেপ না করলেও সতর্ক প্রহরীর মতো তাদের প্রতিটি কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করত। আর এই প্রহরার কাজে তাদের প্রধান সহায়ক ছিলেন দেশীয় রাজাদের দরবারে নিযুক্ত ব্রিটিশ রেসিডেন্টগণ। সন্দেহজনক কোন কার্যকলাপে দেশীয় নৃপতিদের ব্যাপৃত মনে করলেই ব্রিটিশ সরকারকে তাঁরা সেই সম্পর্কে অবহিত করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পরামর্শ দিতেন।

Q. 14. Discuss the nature of the early Congress with special reference to the nature of leadership.

Ans. (১) **ভূমিকা :**

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নরমপন্থী নেতাদের সৃজনশীল ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ভূমিকাকে লঘু করে দেখার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের অনুসৃত নীতিকে ভিক্ষাবৃত্তি ও কাপুরুষতা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সকল নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হল তাঁরা ছিলেন শহরবাসী মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি এবং তাঁরা দেশবাসীর স্বার্থের কথা চিন্তা না করে নিজ নিজ স্বার্থে পরিচালিত হতেন। কিন্তু যদিও কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতৃবৃন্দ তাঁদের উত্থাপিত বিভিন্ন সংস্কারমূলক দাবিগুলো পূরণে ব্যর্থ হন এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে মূলতঃ ভারতীয় উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব বহাল ছিল, তথাপি কংগ্রেসের প্রথম কুড়ি বছরের ইতিহাসকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক গৌরবজনক অধ্যায়রূপে গণ্য করা যায়। প্রথম যুগের কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সক্রিয় গণ-আন্দোলনের পথ গ্রহণ না করার জন্য তাঁদের ভীরু, উদাসীন এবং কাপুরুষ বলা যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ তাঁদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতির অভাব ছিল না। তাঁরা ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ ভারতবাসীর অনগ্রসরতার কথা বিবেচনা করে তাঁরা সক্রিয় ব্রিটিশ বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করেন নি। সেজন্য ডক্টর এস.আর. মেহরোত্রা কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতাদের বাস্তববাদী বলে অভিহিত করেন। রজনী পামদত্তও মনে করেন যে, কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতৃবৃন্দের নরমপন্থী কর্মপদ্ধতি দিয়ে বিচার করে তাঁদের বিদেশী শাসনের প্রতিক্রিয়াশীল দেশদ্রোহী ভৃত্যরূপে গণ্য করা অসমীচীন হবে। তিনি আরও মনে করেন যে, ঐ নেতৃবৃন্দকে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল শক্তির যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কংগ্রেসের প্রথমপর্বের নেতৃবৃন্দ উচ্চশ্রেণীভুক্ত হওয়া

সত্ত্বেও তাঁরা ভারতীয় জনসাধারণের মঙ্গল বিধানের জন্য বিভিন্ন দাবি দাওয়া তুলে ধরার চেষ্টা করেন। ফলে কংগ্রেস উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আওতায় থাকলেও সমাজের নিম্ন-শ্রেণীর সমর্থন লাভ করতে থাকে। তাছাড়া কংগ্রেসের নানাবিধ দাবির মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন করতে সাহায্য করে। কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে ভারতের ভূস্বামী ও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর মধ্যে তীব্র কংগ্রেস-বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। কারণ ভারতের সামন্তশ্রেণী ছিল মনেপ্রাণে প্রতিক্রিয়াশীল এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির অন্ধ ভক্ত। সুতরাং দেখা যায় যে, কংগ্রেস তাঁর প্রথম বিশ বছরের ইতিহাসে পরিপূর্ণভাবে গণ-সংগঠনে পরিণত না হলেও নানা ভাষাভাষী ও বহু জাতি অধ্যুষিত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের জনসাধারণের নিকট, ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটনে ও জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারে সমর্থ হয়। ফলে কংগ্রেস ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ডক্টর তারাচাঁদ সেজন্য মন্তব্য করেন—"Although the Congress was a middle class organisation, it interested itself in the needs of all classes. As time pas ed the Congress became the embodiment of India's political hopes and aspiratiors, the instrument of India's struggle for independence."

(২) কার্যাবলীর বিশ্লেষণ ঃ

তবে জাতীয়কংগ্রেসের প্রথম বিশ বছরের কর্মপ্রয়াস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ক্ষমতাসীন নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ভারত-ব্রিটিশ যৌথ সহযোগিতার যে নীতি গ্রহণ করেন তা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় নি। নরমপন্থী নেতাদের এই ব্যর্থতা তাদের রাজনৈতিক কৌশল বা পদ্ধতির ব্যর্থতা নয়। এই ব্যর্থতার মূলে ছিল ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির ঔদাসীন্য ও অসহযোগী মনোভাব। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ক্ষমতা অব্যাহত রাখার দিকে ইংলণ্ডের সকল রাজনৈতিকদলেরই সমান আগ্রহ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিশ্বজোড়া যে সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা দেখা দেয়, তাতে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় অংশ ছিল গ্রেটব্রিটেনের এবং বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি ছিল ভারতবর্ষ। সেজন্য ভারতে কঠোর সাম্রাজ্যবাদীনীতির বিন্দুমাত্র শিথিলতাও সহ্য করতে তাঁরা সম্মত ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক কোন পক্ষই ভারতের শাসন ব্যাপারে কোন প্রকার সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না।

ব্যর্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কংগ্রেসের প্রথম-যুগের নরমপন্থীনেতাদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁরা ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ উদার ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করেন এবং এই আদর্শ-গুলোই চিরদিনের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের মূল নীতিতে পরিণত হয়। প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দ সযত্নে কংগ্রেসকে প্রতিপালন করে দেশবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে জাতীয় কংগ্রেস প্রকৃত অর্থে একটি জাতীয় সংস্থায় পরিণত হয়ে এবং জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে একটি শক্তিশালী সংগঠনের

রূপ গ্রহণ করে। কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতৃবর্গের প্রচেষ্টার ফলেই মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জাতীয় চেতনার সূত্রপাত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীরাও যে একটি অভিন্ন জাতি এই ধারণার মূলেও জাতীয় কংগ্রেসের দান অনস্বীকার্য। সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যেও এ বোধ বিস্তারলাভ করে। তাঁদের সকলের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ যে একসূত্রে গাঁথা, সাম্রাজ্যবাদই যে তাদের একমাত্র শত্রু এই চেতনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদীরা জাতীয়তাবাদে তাদের অনুপ্রাণিত করেন। সাধারণের মধ্যে তাঁরা গণতন্ত্র ও নাগরিক স্বাধীনতার আদর্শও প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের প্রচেষ্টায়ই ভারতে আধুনিক রাজনীতি জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

(ঙ) মূল্যায়ন ঃ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম সমালোচক হিসাবেও নেতৃবর্গ সর্বপ্রথম যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁরাই প্রথম সাফল্যের সঙ্গে প্রচার করেন যে, ভারতের প্রতিটি গুরুতর অর্থ নৈতিক সমস্যাই রাজনৈতিক পরাধীনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিদেশী শাসকদের অর্থ নৈতিক শোষণের চিত্রটিও তাঁরা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। ভারতের এইসব নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতাদের আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। ব্রিটিশ শাসনের সুফল বা সৎ-অভিপ্রায়ের প্রতি সাধারণ মানুষের আর কোন আস্থা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে চিন্তার জগৎ থেকে এই আলোড়নকে রাজনৈতিক জগতে বিস্তৃত করে তুলতে সমর্থ হন। তাঁদের আন্দোলন ব্যাপকতর আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তোলে।

১৮৫৮ থেকে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনের যুগ। আদি জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ সেই ভিত্তি সযত্নেই স্থাপন করেন। তাঁদের জাতীয়তা-বোধ কোন সংকীর্ণ আবেগ বা তাৎক্ষণিক উত্তেজনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাঁদের জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের অতি তীক্ষ্ণ ও বাস্তব বিশ্লেষণকে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁরা সঠিকভাবেই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসক ও ভারতীয় স্বার্থের দ্বন্দ্বের মূল কারণ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। সুতরাং তাঁদের পক্ষে একটি ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীযুগে ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষ সংগ্রামের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম হন।

তাঁদের অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম পর্বের জাতীয়তা-বাদীদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের উদ্যোগকে ভিত্তি করেই পরবর্তীযুগে আন্দোলন সমৃদ্ধতর হয়। আধুনিক ভারতের নির্মাতা বলে যাঁদের মনে করা হয় তাঁদের মধ্যে এই জাতীয়তাবাদীদের নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। জাতীয়তাবাদী এই ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নরমপন্থীদের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি গোপালকৃষ্ণ বলেন, "আমাদের ভুললে চলবে না যে দেশের অগ্রগতি এখন যে স্তরে আছে তাতে আমাদের সাফল্য সীমিত হতে বাধ্য। নিরন্তর আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে দুঃসহ নিরাশার গ্লানি।

ভাগ্য-বিধাতা মুক্তি সংগ্রামে আমাদের এই স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, নির্দিষ্ট কাজ আমরা যখন শেষ করতে পারব, আমাদের দায়িত্বও তখন শেষ হবে ; আমাদের ব্যর্থতা দিয়ে দেশমাতৃকার আরতি করে আমরা তৃপ্ত হব ; কঠিন হলেও এই উপলব্ধিতে সান্ত্বনা পাব যে, আমাদের ব্যর্থতার মধ্যেই ভবিষ্যতের মহান সাফল্যের শক্তি লুকিয়ে আছে।"

(৪) নেতৃবর্গের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ঃ

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূলে যে সব নেতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর মধ্যে ছিলেন পশ্চিম ভারতের দাদাভাই নওরোজি, বিচারপতি রানাডে, ফিরোজ শাহ মেহতা, কে. টি. তেলাঙ, রহিমতুল্লা মোহম্মদ সায়ানি, জাভেরী লাল, উমাশঙ্কর দীক্ষিত, বদর-উদ্‌দিন তায়েবজির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের ছিলেন জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, এবং আনন্দ চারলু ও পূর্ব ভারতের ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। উপরি-উক্ত নেতৃবর্গের প্রকৃতি ও কার্যকলাপের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, এই নেতৃবৃন্দের অনেকেই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। অনেকের সঙ্গেই ইংলণ্ডের রাজনীতির সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল এবং ইংরেজ জাতির ন্যায়নিষ্ঠা, সততা ও উদারনৈতিক, রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর গভীর আস্থা ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ভূস্বামী শ্রেণীর সমর্থন না পাওয়ার জন্য অর্থাভাবের ফলেই তাঁদের পক্ষে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। অনেকে এজন্য তাঁদের স্বার্থান্বেষী এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন মনে করেন, কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে এরূপ মনোভাব পোষণ করার কোন কারণ নেই। আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রভৃতি শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ ব্যাপক জাতীয়তাবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন, সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। (৩) রজনীপাম দত্ত জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পাশ্চাতে ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে যে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেন তা সঠিক বলে মনে হয় না। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হিউমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও ভারতীয় নেতৃবর্গের সদিচ্ছার বিকৃত ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত বলে মনে হয়। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন যার মাধ্যমে ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রাম করা সম্ভব। তাঁরা বিদেশী শাসকের ক্রীড়নক ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন খাঁটি স্বদেশপ্রেমিক। রাজনৈতিক প্রচেষ্টার প্রথম পর্বেই রাজরোষে পড়তে চান নি বলে তাঁরা হিউমের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। যদি বলা যায় যে, হিউমের উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসকে 'সেফটি ভালভ' রূপে ব্যবহার করা, তাহলে একথাও বলা যেতে পারে যে, কংগ্রেস নেতারা হিউমকে লাইটনিং কণ্ডাকটর বা বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দণ্ড হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন বলে আশা করেন।

(৫) উপসংহার ঃ

আধুনিক কালে কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতৃবর্গের প্রকৃতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে

অনেক বিরূপ মন্তব্য করা হয়। স্বার্থান্বেষী, সুবিধাবাদী প্রভৃতি বিশেষণও তাঁদের সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে, যদিও সূচনায় তার প্রকৃতি ছিল সীমিত, দ্বিধাগ্রস্ত এবং মৃদু। তার ক্ষমতা প্রতিবছর বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন স্তরে পৌছায় যে, অবশেষে বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে শক্তিশালী চরমপন্থী সংগ্রামে লিপ্ত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়।

Q. 15 In what ways did the differences among the Muslim leaders in U. P. contribute to the Lucknow Pact ? Would the pact have led to the solution of the communal problem ?

Ans (১) **ভূমিকা :**

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের পর ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে পুনরায় জাতীয় কংগ্রেসের সম্মিলিত অধিবেশন শুরু হয়। একই সময় মুসলিম লীগেরও লক্ষ্ণৌ শহরে বার্ষিক অধিবেশন বসে। হোমরুল আন্দোলনের উত্তেজনায় জাতীয় কংগ্রেস তখন সংগ্রামের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। মুসলিম লীগেরও ইতিমধ্যে প্রকৃতিগত আমূল পরিবর্তন ঘটে। সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব ও আলিগড় স্কুলের সঙ্কীর্ণ রাজনীতির প্রভাব কাটিয়ে ওঠার ফলে লীগের দৃষ্টিভঙ্গিও চরমপন্থী হয়ে উঠতে শুরু করে। অপরদিকে তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহম্মদ আলি এবং সৌকৎ আলিকে ব্রিটিশ সরকার অন্তরীণ করলেও মুসলিম রাজনীতির উপর তাদের আদর্শ প্রতিফলিত হয় এবং সর্ব-ভারতীয় সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। মুসলিম লীগের সম্মেলনে লক্ষ্ণৌ ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে উপস্থিত চারশ জন তরুণ মুসলিম নেতা লীগ-কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য গঠন করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করার জন্য প্রস্তাব সমর্থন করেন। বিশেষতঃ ইতিপূর্বেই মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, মোহম্মদ আনসারি, আজমল খান প্রভৃতির উদার মনোভাবের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। মোহম্মদ আলি জিন্নাহ এবং ফজলুল হকও মুসলিম লীগ-কংগ্রেস ঐক্যের পক্ষপাতী ছিলেন। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারের নীতিও এই চুক্তি সম্পাদনের পথ প্রশস্ত করে তোলে। এই সময় মৌলানা আবুলকালাম আজাদের 'আল-হিলাল' এবং মোহম্মদ আলির 'কমরেড' পত্রিকা দুটির প্রকাশ সরকার জোর করে বন্ধ করে দিয়ে তাঁদের দুজনকেই অন্তরীণ করে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এই আগ্রহের ফলেই ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়।

(২) নেতৃবর্গের মনোভাব ঃ

জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের অন্যতম প্রধান নেতা বালগঙ্গাধর টিলক বহু পূর্বেই উপলব্ধি করেন যে, একমাত্র হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সাফল্য অর্জন করতে পারে। ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যা সম্ভব, মুষ্টিমেয় চরমপন্থী বা সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে তা করা কখনই সম্ভব নয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে তাঁর ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে তাঁর আগ্রহ এত আন্তরিক ছিল যে, লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী বা রায়তি সুবিধার দাবিকে মেনে নিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। অপরদিকে মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্ লক্ষ্ণৌচুক্তি সম্পাদনের সময় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করলেও প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তি ছিল জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের তরুণ মুসলিম নেতৃবৃন্দের। এই চুক্তি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর স্বার্থে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলোর বিশেষতঃ উত্তরপ্রদেশের মুসলিমদের স্বার্থ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফলে এই চুক্তি উত্তরপ্রদেশের রক্ষণশীল মুসলিম নেতাদের নিকট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে বাধ্য হয়, কারণ তাঁরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ বা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পরিবর্তে স্থায়িভাবে ব্রিটিশ শাসন এবং উত্তরপ্রদেশের আইনসভায় মুসলিমদের জন্য শতকরা পঞ্চাশটি আসন লাভ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু খলিফার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তির যুদ্ধ ঘোষণার ফলে তরুণ মুসলিম নেতাদের মনে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তাঁরা একদল উলেমার সমর্থন লাভ করে মুসলিম রাজনীতিকে নিজেদের কুক্ষিগত করে তোলার সুযোগ পান। তাছাড়া পাঞ্জাবের রাজনৈতিক ঘটনা এবং বাংলাদেশের ফজলুল হকের সমর্থনও তাদের শক্তিকে বৃদ্ধি করে তোলে এবং সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সাময়িকভাবে উত্তরপ্রদেশের তরুণ মুসলিম নেতৃবর্গ প্রাধান্য স্থাপন করার সুযোগ পান।

(৩) লক্ষ্ণৌ চুক্তি ঃ

লক্ষ্ণৌ চুক্তির ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত হয় যে, প্রত্যেক প্রদেশের আইনসভায় কজন করে মুসলমান সদস্য আসন লাভ করতে সমর্থ হবেন। তাছাড়া এই চুক্তিতে স্থির হয় যে, কেন্দ্রীয় বা ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ মুসলমান হবেন। আইনসভার যে কোন ধর্মের প্রতিনিধিদের মোট সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ যদি কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তা হলে সে প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আর অগ্রসর হওয়ার অধিকার আইন সভার থাকবে না। তাছাড়া লক্ষ্ণৌচুক্তির পর জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ যৌথভাবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট কতকগুলো দাবি পেশ করে। এই দাবিগুলো হল: (১) ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল তুলে দিতে হবে; (২) কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর মোট সদস্যের তিন-চতুর্থাংশ নির্বাচিত সদস্য হবেন; (৩) প্রাদেশিক বিষয়গুলোতে সরকার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং (৪) প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি ছাড়া অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে।

(৪) **সমালোচনা :**

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌচুক্তি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরিচায়ক হলেও, গান্ধীজির উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলা যায় যে, এই চুক্তি ধনী শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে ধনী শিক্ষিত মুসলমানের চুক্তি। হিন্দু বা মুসলমান সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই চুক্তির কোন সম্পর্ক ছিল না। তাছাড়া লক্ষ্ণৌচুক্তিতে জোর দেওয়া হয় হিন্দু ও মুসলমানের তথাকথিত স্বতন্ত্র স্বার্থের উপর। এই চুক্তিতে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, হিন্দু ও মুসলমানের রাজনৈতিক অস্তিত্ব পৃথক্—তাদের সামাজিক সত্তাও যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির তাও এই চুক্তিতে স্বীকৃতি লাভ করে। ধর্মনিরপেক্ষতা বোধের বিকাশে লক্ষ্ণৌচুক্তির কোন অবদান নেই এবং ভবিষ্যৎ সাম্প্রদায়িকতার পথ এই চুক্তি প্রশস্ত করে তোলে। ভারতের মৌলিক ঐক্যকে বিসর্জন দিয়ে এই চুক্তিতে যে আপসের নীতি গৃহীত হয় তার ফলে লক্ষ্ণৌচুক্তির পুরো কাঠামোই অত্যন্ত দুর্বল ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে এবং ফলে তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে প্রথম থেকেই প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে।

তবে তৎকালীন রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, লক্ষ্ণৌচুক্তির মধ্য দিয়ে ভারতের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল মিলিত হতে সক্ষম হয়। ফলে তাদের সম্মিলিত দাবি সুস্পষ্ট চেহারা নিয়ে ভারত সরকারের সামনে উপস্থিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের তরুণ সদস্যদের হোমরুল লীগগুলোর কর্মধারার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। তাঁদের সম্মিলিত আন্দোলনে সরকারও বিব্রত হয়ে পড়তে শুরু করে। দেশের মধ্যে এবং বিদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও সমসাময়িক ভারতের রাজনীতির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

(৫) **উপসংহার :**

এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ব্রিটিশ সরকার পুনরায় তাদের দুমুখো নীতির শরণাপন্ন হয়। একই সঙ্গে সংস্কার প্রবর্তনের আশ্বাস দিয়ে এবং নির্মম দমন নীতি অবলম্বন করে তারা এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। সংস্কারের নীতি যাতে অবিলম্বে ঘোষণা করা যায় ভাইসরয় চেমস ফোর্ড সেজন্য সেক্রেটারী অফ স্টেটকে ক্রমাগত চাপ দিতে শুরু করেন। কিন্তু তৎকালীন হোম মেম্বারের মত হল, "এই নতুন বন্যাকে ভালো করে রুখতে হবে।" ফলে হোমরুল লীগগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হল, সরকারের হাতে শ্রীমতী বেসান্ত গ্রেফতার হলেন। ভাইসরয়ের কাছে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে কংগ্রেস শ্রীমতী অ্যানিবেসান্তকে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের কলকাতা অধিবেশনের সভানেত্রী নির্বাচিত করে। তবে মাদ্রাজে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের যে প্রস্তাব গ্রহীতা হয় তা জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ না করলেও, হোমরুলের দাবির প্রতি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পূর্ণ সমর্থন জানান হয়। সরকারের কাছে কংগ্রেসের দাবি হল, ভারতকে অবিলম্বে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিতে হবে এবং শাসনসংস্কারের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মর্যাদা দিতে হবে কংগ্রেস ও লীগের যুক্ত পরিকল্পনাটিকে।

Q 15. Do you think that landless labour was a new class in the 19th century India ?

Ans (১) ভূমিকা ঃ

ব্রিটিশদের ভারতে আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে মোগল আমলে ভারতের কৃষকগণ সাধারণভাবে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—(১) খুদ-কসৎ; (২) পাহি কস্তৎ; (৩) মুজারিয়ান এবং (৪) ভূমিহীন চাষী। ব্রিটিশ আমলে ভূমিহীন চাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, মোগল আমলের দলিলে তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিসালা-ই-জিরায়তে এই জাতীয় কৃষকদের বলা হয়েছে কমজানা। অন্যান্য অঞ্চলে এদের বলা হত তেথারি বা বলাহার। এছাড়া বিভিন্ন গ্রামে ধানুকী, চামার প্রভৃতি নিম্নতর শ্রেণীর বর্ণ বা বিভিন্ন ধরনের উপজাতিদের উপজীবিকা ছিল কৃষি ছাড়া অন্যান্য ধরনের তথাকথিত সাধারণ কাজ করা। কিন্তু সারা বছরের খাদ্য তারা সেই কাজ থেকে সংগ্রহ করতে পারত না বলে, মরশুমের সময় তারা প্রায়ই প্রকৃত কৃষকদের কাজে সহায়তা করত এবং দৈনিক ভিত্তিতে মজুরী লাভ করত। এই সব বর্ণ বা উপজাতিদের সরাসরি কৃষি-কর্ম থেকে সরিয়ে রেখে ভারতীয় বর্ণ-পদ্ধতিই গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন চাষীদের সৃষ্টি করার পথ প্রশস্ত করে তোলে।

(২) জমিদারশ্রেণীর উদ্ভবের ফল ঃ

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে দক্ষিণ ভারতে মারাঠা, উত্তর ভারতে শিখ ও জাঠ এবং মধ্য ও পূর্বভারতের জামদারদের অতিরিক্ত ক্ষমতা লাভের ফলে কৃষিজগতে এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় পরিবর্তন দেখা দেয়। মোগলদের পতনের যুগে কৃষক বিদ্রোহের প্রধান কারণই ছিল জমির উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম। শিখ, মারাঠা প্রভৃতি প্রতিবাদী শক্তির আক্রমণে পুরাতন কৃষক সম্প্রদায়ের অনেকে জমির মালিকানার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তারা জীবিকা অর্জনের জন্য উপায়ান্তরহীন হয়ে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়ে অপরের জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ে কৃষিকার্য করতে শুরু করে। অপরদিকে প্রতিবাদী আন্দোলনের নেতৃবর্গ ভূস্বামীতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায়। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে জমিদারগণ রাজস্ব আদায়কারীর পরিবর্তে জমির মালিকে পরিণত হওয়ার সুযোগ পেয়ে বলপূর্বক বহু কৃষককে তারা জমি থেকে বিতাড়িত করে এবং সেই কৃষকদের জমি তারা নিজেদের অধিকারে আনয়ন করে। এই ভাবে জমিদারগণ জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(৩) কারিগর শ্রেণীর বিলোপ ঃ

ইংরেজ বণিকদের মানদণ্ড ভারতে রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ার পূর্বে ভারত শুধু মাত্র কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ ছিল না, শিল্প সম্পদের জন্যও ভারতের খুব সুখ্যাতি ছিল। এইসব শিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের মধ্যে অধিকাংশ কৃষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেও এবং অবসর

সময়ে শিল্পকার্যে আত্মনিয়োগ করলেও, একদল কারিগর শুধুমাত্র শিল্পকার্য করেই জীবিকা অর্জন করত। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়ে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে শুরু করে। ব্রিটিশ বণিকদের স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে নানা প্রকার আইন বিধিবদ্ধ করে ভারতের শিল্পগুলোকে ধ্বংসোন্মুখ করে তোলে। ফলে শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিরা কর্মহীন হয়ে পড়ে এবং উপায়ান্তরবিহীন হয়ে তারা কৃষিকার্যে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। শিল্পের উপর নির্ভর ব্যক্তিদের কৃষকে পরিণত হওয়ার সংখ্যা প্রচুর না হলেও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে তারা যথেষ্ট সাহায্য করে।

(8) দেশীয় রাজাদের পতনের ফল ঃ

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ার পর ভারতের রাজন্যবর্গের অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী কর্মহীন হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকারের সৈন্য বিভাগে সাধারণতঃ দেশীয় কোন রাজার সৈন্যবাহিনীকে গ্রহণ করা হয় নি। ফলে কর্মচ্যুত এই সৈনিকগণ বাধ্য হয়েই জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কোন পথ উদ্ভাবন করার চেষ্টা করে। ইয়োরোপের অনেক দেশেই সামন্তপ্রথার পতনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিপ্লব দেখা দেওয়ার ফলে সামন্তদের অধীনস্থ ব্যক্তিগণ শিল্প সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু ভারতে ইংরেজদের কর্তৃত্ব লাভের প্রাক্কালে শিল্পজগতে বিপ্লব না দেখা দিলেও যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা শুরু হয়েছিল ইংরেজ শাসকদের অনুসৃত দেশীয় শিল্পবিরোধী নীতির ফলে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের সময়ও দেখা যায় যে, দেশীয় নৃপতিদের কর্মচ্যুত সিপাহিগণ ঐ বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের বিফলতার পরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর কর্মচ্যুত ব্যক্তিরা প্রাণ রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়।

(৫) ইংরেজ সরকারের ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের ফল ঃ

অপরদিকে ইংরেজ সরকার ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্বলাভের পর নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য পূর্ব ভারতের বিরাট এক অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারতে নতুন প্রণালীর জমিদারী প্রথা এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে রায়তারি বন্দোবস্ত প্রচলন করে। এই সব ব্যবস্থার মধ্যে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রচলিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষকদের সবচাইতে কঠোরভাবে আঘাত করে এবং ভূমির মালিক কৃষকদের একটি মাত্র আইনের সাহায্যে শুধুমাত্র জমি চাষ-বাসকারী অধিকারসম্পন্ন কৃষকে পরিণত করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষকদের স্বার্থে যে পরিমাণ আঘাত করে সম্ভবতঃ অন্য কোন আইন কৃষকদের এত বেশি ক্ষতি করতে কখনও সমর্থ হয় নি। চিরস্থায়ী ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী জমিদার নামক তথাকথিত অভিজাত শ্রেণী জমির মালিকে পরিণত হয় এবং কৃষকগণ শুধু মাত্র জমি চাষবাস করার অধিকার লাভ করে। অধিকন্তু জমিদারগণ নিজেদের ইচ্ছামতো জমির উপর রাজস্ব বৃদ্ধি করে কৃষকদের অবস্থাকে আরও শোচনীয়

করে তোলে। বর্ধিত রাজস্ব দেওয়ার জন্য কৃষকগণ হয় মহাজনদের নিকট থেকে ঋণ করতে বাধ্য হয় অথবা রাজস্ব দিতে অসমর্থ হয়ে জমির চাষবাস করার স্বত্বও পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফলে ঋণের দায়ে এবং রাজস্ব দিতে অসমর্থ হয়ে বহু কৃষক জমি থেকে উৎখাত হয় এবং অন্যের জমিতে মজুর হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পূর্ব ভারতের একটি বিরাট সংখ্যক কৃষক ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়।

উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা চিরস্থায়ী ব্যবস্থার মতো কঠোর না হলেও জমিদার শ্রেণীর এবং সরকারের স্বার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখাই ছিল ঐ সব ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। ফলে ব্রিটিশ সরকারের প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা কৃষকদের স্বার্থের অনুকূল না হয়ে প্রতিকূল হয়ে পড়ে এবং এই বন্দোবস্তের কঠোরতার বলি হিসাবে বহু স্বাধীন কৃষক ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়।

(৬) ক্রীতদাস প্রথা লোপ ঃ

ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার আরও একটি প্রধান কারণ ছিল ব্রিটিশ আমলে ভারতে ক্রীতদাস প্রথার বিলুপ্তি। ভারতের ক্রীতদাসগণ সাধারণতঃ মুসলিম শাসনের সময় অভিজাত মুসলিম এবং হিন্দু ভূস্বামীদের সম্পত্তি-রূপে বিবেচিত হত। বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্রীতদাসগণই হিন্দু ও মুসলমান ভূস্বামীদের জমিতে চাষবাস করত এবং কখনো কখনো ছোট-খাট যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করত। বাদশাহের খাসমহলেও ক্রীতদাসগণ কৃষিকার্যে নিযুক্ত হত। কিন্তু মুসলিম শক্তির পতনের পরই ক্রীতদাসদের অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। হিন্দু ও মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিদের বাড়ীতে স্থান লাভ করে তাদের ব্যক্তিগণ ভৃত্যে পরিণত হয়। জমিদারগণ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর আংশিকভাবে কর্মহীন ক্রীতদাসগণ প্রধানতঃ নিজ নিজ প্রভুর জমিজমা তত্ত্বাবধান করত। কিন্তু ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার ভারতে ক্রীতদাস প্রথাকে বেআইনী বলে ঘোষণা করে। ইতিপূর্বে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দেই লিসেষ্টার স্ট্যানহোপ গ্লাউসেষ্টারের ডিউককে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা রহিত করতে অনুরোধ জানান। তদানীন্তন নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, উত্তর ভারতে পুরুষ ক্রীতদাসগণ প্রধানতঃ গৃহভৃত্যের এবং দক্ষিণ ভারতের পুরুষ ক্রীতদাসগণ সাধারণতঃ কৃষকের কাজ করত। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে চার্টার গভর্নর জেনারেলকে অবিলম্বে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা রহিত করতে নির্দেশ দেয়। ফলে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে আইন অনুযায়ী ভারতে ক্রীতদাস প্রথা বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই আইনে ক্রীতদাসদের মুক্তি দিতে মালিকদের বাধ্য করা হলেও তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নি। ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জীবিকাহীন ব্যক্তিরা বাধ্য হয়ে ভূমিহীন কৃষক

রূপে অপরের জমিতে চাষবাস শুরু করে। ক্রীতদাসগণ মুক্তি পাওয়ার পর ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

(৭) **অন্যান্য কারণ ঃ**

তাছাড়া ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার রূপান্তরের সঙ্গে জমির উপর চাপবৃদ্ধি পেতে শুরু করে। দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রতিক্রিয়া হিসাবে খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্য অঞ্চল থেকে বহুলোক অপেক্ষা খাদ্যদ্রব্যের সুলভ অঞ্চলে বসবাস করার জন্য দলে এসে ভীড় করে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ছিন্নমূল জনসাধারণ পুনরায় নিজেদের বাসভূমিতে সাধারণতঃ প্রত্যাবর্তন করতে উৎসাহ বোধ করে না। নতুন স্থানে বসবাস করার উপযোগী সামান্য ভূমি অধিকার করতে পারলেই তারা সেখানে বসবাস করতে শুরু করে এবং জীবিকা অর্জন করার সহজতম উপায় হিসাবে কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার চেষ্টা করে। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম যুগ থেকে বারবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এদের মধ্যে কয়েকবার দুর্ভিক্ষ মহামারীর রূপ গ্রহণ করে। ঐসব মহামারীর সময় বহু উদ্বাস্তু অন্যত্র নতুন বাসস্থানের সন্ধান করে এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। অপরদিকে জমিদারদের অত্যাচারে বহু অঞ্চলের কৃষকগণ নিজেদের ভিটেমাটি পরিত্যাগ করে নিজেদের জীবন রক্ষার চেষ্টা করে। ভারতে মুসলিম রাজত্বের কালে এইরূপ ঘটনা, খুবই স্বাভাবিক ছিল এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আমলের প্রথম পর্বে এইরূপ ঘটনার কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় নি। বিশেষতঃ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর এইরূপ ঘটনার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সর্বোপরি ব্রিটিশ রাজত্ব কঠোর কায়েম হওয়ার ফলে দস্যুত', লুণ্ঠন প্রভৃতি জীবিকায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হয়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ বংশানুক্রমিক দস্যুদের অস্তিত্বের কথা ভারতীয় ও বিদেশী লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায়। কিন্তু ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের প্রচেষ্টায় এইসব দস্যুগণ তাদের চিরাচরিত জীবিকা অর্জন করার পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং এইসব জীবিকাহীন ব্যক্তিরাও কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করতে শুরু করে। তাদের সংখ্যা বেশি না হলেও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা সামান্যভাবে তারা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

(৮) **উপসংহার ঃ**

ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভূমিহীন কৃষকদের অস্তিত্ব ব্রিটিশ শাসকদের সৃষ্ট না হলেও ব্রিটিশ শাসনের আমলেও তাদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ শাসকদের স্বার্থান্বেষী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, নিজেদের সমর্থক জমিদারশ্রেণী গঠনের প্রচেষ্টা এবং সাধারণ লোকের স্বার্থের প্রতি ঔদাসীন্য ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে তোলে। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, লোকসংখ্যার বৃদ্ধিও ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীর বৃদ্ধির অন্যতম সহায়করূপে কাজ করে।

Q. 17. Make a detailed analysis of the U. P. peasant movement between 1919 and 1922. Would you agree that it was betrayed by Congress leadership ?

Ans. (১) **ভূমিকা :**

ভারতের বৃটিশ শাসনের শেষ পঞ্চাশ বছরে উত্তর প্রদেশের কৃষি-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন জটিল সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বিশেষতঃ রাজস্ব বিভাগ পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক চাপের ফলে এই সমস্যা দ্রুত আরও জটিল আকার ধারণ করার সুযোগ পায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে উত্তর প্রদেশে চাষের অধীন জমির পরিমাণ ছিল মোটামুটিভাবে পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ মিলিয়ন একরের মধ্যে। তবে জমিসংক্রান্ত ব্যাপারে জটিলতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের স্থিতিস্থাপকতার অভাব। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই তীব্র মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে শুরু করে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোতে মুদ্রাস্ফীতি চরমে আরোহণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বছরগুলোতেও এই মুদ্রাস্ফীতি অব্যাহত থেকে দরিদ্র কৃষকদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। ইতিমধ্যে মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য বৃটিশ সরকার জমির উপর প্রায় শতকরা ছত্রিশ ভাগ রাজস্ব বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে এবং ভূস্বামীগণও তাঁদের চাহিদা শতকরা বার ভাগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষকদের প্রকৃত আয় ক্রমশই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের আদমশুমারির প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এই সময় (১৯১১-১৯২১ খ্রীস্টাব্দ) উত্তর প্রদেশের লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ভূস্বামীগণ ও সরকার একসঙ্গে এই সুযোগ গ্রহণ করে কৃষকদের উপর শোষণের চাপ আরও বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। ভূস্বামীগণ অতিরিক্ত কর আদায়ের সুযোগ স্থায়ী করে তোলার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যা টেনান্সি অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয় এবং জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু নতুন এই আইন চাষীদের স্বার্থে আঘাত করলে উত্তর প্রদেশের এক বিরাট অঞ্চলে বিশেষতঃ, অযোধ্যা অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে শুরু করে।

(২) **আন্দোলনের সূত্রপাত :**

উত্তর প্রদেশের কৃষক সমাজের মধ্যে যখন এইরূপ অসন্তোষ দেখা দেয় তখন সর্ব-ভারতীয় রাজনীতি খুবই সমস্যাসঙ্কুল ছিল। রাওলাট আইন বিধিবদ্ধ, জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ড এবং খিলাফৎ আন্দোলন প্রভৃতি সামগ্রিকভাবে যুক্ত হয়ে মহাত্মা গান্ধীজীর আহ্বানে সমস্ত ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। এই আন্দোলন তথাকথিত শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ্ডী অতিক্রম করে শ্রমিক কৃষক প্রভৃতি সম্প্রদায়কেও আন্দোলনের সামিল করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে অসহযোগ

আন্দোলনই সাধারণ ভারতীয়দের বৃটিশ শাসনের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সর্বপ্রথম উৎসাহিত করে তুলতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষক সমাজের মধ্যে এই সময় বিপুল সাড়া জাগতে দেখা যায়। অপরদিকে খাজনা বন্ধের যে আহ্বান কংগ্রেস ছড়িয়ে দিতে শুরু করে তা সরাসরি কৃষকদের মর্মে গিয়ে পৌঁছায়। কংগ্রেসের এই আহ্বানে ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের কৃষকগণ বৃটিশ শাসনের কায়েমী স্বার্থের অংশীদার ভূস্বামীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। মেদিনীপুর, গুন্টুর, কৃষ্ণা, গোদাবরী প্রভৃতি জেলায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এইসব স্থানের কৃষকগণ কর দিতে অস্বীকার করে। এই সময় জাতীয় কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে খাদি, অহিংসা ও হিন্দু মুসলমান ঐক্যের নীতিকে যদি মেনে চলা হয় তা হলে এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে জাতীয় কংগ্রেস সম্মত আছে। গান্ধীজী আরও একটি শর্ত আরোপ করেন যে, আন্দোলনে যুক্ত রায়তদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। কৃষক আন্দোলনের প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের এইরূপ সমর্থনের সংবাদ জানতে পেরে ভারতের বিভিন্ন স্থানের কৃষক নতুন উদ্দীপনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে। দ্বিধাহীনভাবে তারা স্বাক্ষর দিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে রাজি হয়।

(৩) উত্তর প্রদেশের কৃষক আন্দোলন :

জমির খাজনা বৃদ্ধির জন্য উত্তর প্রদেশে কৃষকগণ পূর্ব থেকে বৃটিশ সরকার ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানের কৃষক আন্দোলনের সংবাদে উৎসাহিত হয়ে এই সময় তারা মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়। বিশেষতঃ স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদল রাজস্ব বন্ধ করার জন্য কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানালে স্বাভাবিকভাবেই কৃষকগণ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে বিশেষভাবে উৎসাহ বোধ করে। উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলি ও ফৈজাবাদে এই কৃষক আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। স্থানীয় ভাড়াটিয়া কৃষকগণ অতিরিক্ত এবং বে-আইনী খাজনা দিতে অস্বীকার করে। স্থায়ী কৃষকগণও ভাড়াটিয়া কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করে এই আন্দোলনের অংশীদারে পরিণত হয়। এই আন্দোলন সুসংবদ্ধভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিটি গ্রামেই কৃষকদের সংস্থা গঠিত হয়। কৃষকদের আন্দোলন সংগঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। ফলে উত্তর প্রদেশের কৃষক আন্দোলন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে।

উত্তর প্রদেশের কৃষক আন্দোলনের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতায় বৃটিশ সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ে। তারা স্থানীয় জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কঠোর হস্তে কৃষকদের দমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আন্দোলনকারী কৃষকদের দমন করার জন্য জমিদারদের ভাড়াটে গুণ্ডা ও পুলিশ-বাহিনীকে প্রেরণ করা হয়। ফলে কৃষকদের সঙ্গে পুলিশ

বাহিনীর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে কৃষকগণ কোর্ট-কাছারি আক্রমণ শুরু করে। উত্তেজিত জনতাকে দমন করার উদ্দেশ্যে পুলিশ বহু সংখ্যক কৃষককে গ্রেপ্তার করে এবং বন্দী কৃষকদের উপর কঠোর নির্যাতন শুরু করে। ইতিমধ্যে আন্দোলনকারী কৃষকগণ মারমুখী হয়ে উঠে এবং বন্দী কৃষকদের পুনরুদ্ধার করার জন্য থানা আক্রমণ শুরু করে। ফলে সমগ্র অঞ্চলে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। জাতীয় কংগ্রেসে নবাগত জওহরলাল নেহরু এই সময় আন্দোলনকারী কৃষকদের সমর্থনে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে কৃষকদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তোলার চেষ্টা করেন। উত্তর প্রদেশের ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে বৃটিশ সরকার গভীর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং ভূস্বামীদের সঙ্গে পরামর্শ করে জমি-সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন এবং রাজস্ব হ্রাস করার কথা চিন্তা করতে শুরু করে। উত্তর প্রদেশের কৃষক আন্দোলনের এই সাফল্যে ভারতের অন্যান্য স্থানের কৃষকদের মনেও গভীর উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। অপর দিকে জাতীয় কংগ্রেসের মুখপাত্র হিসাবে গান্ধীজী ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী ব্যক্তিগত ও জনতা-নির্ভর অসহযোগ আন্দোলনে সম্মতি দান করলে এবং কংগ্রেস গুজরাটের বারদৌলি তালুকে অহিংস আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করলে উত্তর প্রদেশের কৃষকগণের মনোবল আরও বৃদ্ধি পায়।

(৪) আন্দোলন প্রত্যাহার :

কিন্তু ইতিমধ্যে একটি ঘটনা উত্তর প্রদেশের কৃষক আন্দোলনের তথা ভারতের অন্যান্য বিভিন্ন স্থানের আন্দোলনের অগ্রগতির পথ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করে দেয়। বারদৌলিতে গণ-অসহযোগ তখনও শুরু হয় নি। কিন্তু ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরাতে জনতা হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। পুলিশের যথেচ্ছ গুলীচালনার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কিছু চাষী একটি থানায় আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে ২২জন পুলিশ কর্মচারী অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এই ঘটনার আটদিন পরে গান্ধীজীর সনির্বন্ধ অনুরোধে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। গান্ধীজীর প্রধান বক্তব্য ছিল যে অহিংস আন্দোলন হিংসার রূপ পরিগ্রহ করেছে বলেই তিনি এই আন্দোলন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন।

বারদৌলির সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন জাতীয় নেতৃবৃন্দকে স্তম্ভিত করে তেমন অপর দিকে ভারতের বিভিন্ন স্থানের আন্দোলনকারী কৃষকদের বিশেষতঃ উত্তর প্রদেশের উগ্র-পন্থী কৃষকদের দারুণ সংকটের সম্মুখীন করে তোলে। সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তকে 'জাতীয় দুর্দৈব' বলে অভিহিত করেন। জওহর-লাল নেহরু এই সিদ্ধান্তের সংবাদ জেনে বিস্মিত ও হতবাক হন। এম. এন. রায় এই সিদ্ধান্তের মধ্যে গণশক্তির নয়, নেতৃত্বের দুর্বলতার সুস্পষ্ট পরিচয় দেখতে পান। অন্যান্য নেতৃবর্গ অভিযোগ করেন যে, জনগণের রাজনৈতিক তৎপরতাকে খর্ব করে তাদের উঁচু শ্রেণীকে মুঠোর মধ্যে রাখতেই গান্ধীজী আগ্রহী ছিলেন।

(৫) উপসংহার :

বারদৌলি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে উত্তর প্রদেশের

আন্দোলনকারী কৃষকদের মনোবল নষ্ট হয়ে যায়। অপর দিকে পুলিশবাহিনীর অত্যাচারে তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়। আন্দোলনের নেতৃবর্গকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। যদিও পরবর্তীকালে কৃষক আন্দোলনের আশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার নতুন নতুন আইন বিধিবদ্ধ করে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার এবং জমিদারদের অসঙ্গত দাবি ও অত্যাচার বন্ধ করার চেষ্টা করে, তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কংগ্রেস নেতৃবর্গের ভ্রান্ত নীতির ফলে উত্তর প্রদেশের কৃষকদের সুনিশ্চিত সাফল্যের সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয় এবং পুলিশবাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারে তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

Q. 18. Review critically the financial administration of James Wilson.

Ans. ভূমিকা :

সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারত সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক বিভাগকে পুনর্গঠিত করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এতদিন পর্যন্ত ভারত সরকারের অর্থবিভাগ যুগ্মভাবে গভর্নর জেনারেল এবং তাঁর পরিষদের দ্বারা পরিচালিত হত। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের ফলে রাজস্ব আদায়ের কয়েকটি উৎস বন্ধ হয়ে যায় এবং নতুন নতুন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বিয়াল্লিশ মিলিয়ন পাউণ্ড ঋণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং পূর্ববর্তী ঋণের সঙ্গে তা যুক্ত। সরকারের সেই ঋণের পরিমাণ আটানব্বুই মিলিয়ন পাউণ্ডে পরিণত হয়। ১৮৫৮-৫৯ আর্থিক বছরে ভারতের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় সাত মিলিয়ন পাউণ্ড। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই ভারতের মোগলযুগের স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির অবসান ঘটে এবং ভারতের অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। সুতরাং পূর্ববর্তীকালের সরকারের আয়-ব্যয়ের নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। সরকারের আয়-ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট নীতি স্থির করার উদ্দেশ্যে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে জেমস্ উইলসন নামে একজন অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদকে গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয়ের পরিষদের সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে অর্থদপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর জেমস্ উইলসন ভারতের অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন। তিনি মাত্র ন'মাস এই দপ্তরের দায়িত্ব বহন করার সুযোগ ভোগ করেন, তবে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অর্থদপ্তরের শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। বার্ষিক আয়-ব্যয় সুনির্দিষ্ট করার জন্য বাজেট তৈরির ব্যবস্থার প্রচলন করেন এবং নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে সরকারের অর্থনীতিকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার ব্যবস্থা করেন। অর্থদপ্তরের সুযোগ্য প্রশাসক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

(১) অর্থনীতির পরিবর্তন :

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহ দমন করতে সরকারের যে ব্যয় হয় তার ফলে

ভারত সরকারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। বিদ্রোহের পরবর্তী যুগে ভারতে আরও ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী রাখার যে নীতি গৃহীত হয় সেজন্যও প্রতিরক্ষাজনিত ব্যয় বর্ধিত হয়। সুতরাং এই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি করার জন্য উইলসন গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। সকল প্রকার পক্ষপাতমূলক আচরণ এই সময় বিলুপ্ত করা হয় এবং অধিকাংশ বিলাস-সামগ্রীর ক্ষেত্রে সমহারে পণ্য-মূল্যের ২০ শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয়। মদ, স্পিরিট এবং বিয়ারের ক্ষেত্রে পরিমাপ ভিত্তিক শুল্ক আরোপ করা হয়। তবে এই ধরনের শুল্কের হারও মূল্যের ২০ শতাংশের কাছাকাছিই ছিল। সাধারণের ব্যবহার্য অল্প কয়েকটি পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে শুল্কহার ১০ শতাংশ করা হয়। এই পণ্যদ্রব্যগুলোর মধ্যে থানবস্ত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তুলাজাত সূতা, পাকানো সূতা এবং কর্তিত সূতার ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হারে শুল্ক ধার্য করা হয়। গ্রন্থ ও সংবাদ পত্র-পত্রিকা, কাঁচাতুলা, স্বর্ণপিণ্ড ও অধিকাংশ যন্ত্রপাতি নিঃশুল্ক তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শস্যের উপর শুল্ক ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্কের ক্ষেত্রে শুল্কহারের সাধারণতঃ কোন পরিবর্তন করা হয় নি। শস্যের উপর রপ্তানি শুল্ক প্রতি মণ ৩ পয়সা থেকে বৃদ্ধি করে ১৩ পয়সা করা হয়। রপ্তানি শুল্ক বহির্ভুক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী ছিল রেশম এবং তামাক। সরকার এই নতুন শুল্ক ধার্য করার সময় ঘোষণা করে যে, নতুন আরোপিত শুল্কের কোন সংরক্ষণমূলক প্রভাব থাকবে না। একমাত্র রাজস্ববৃদ্ধির উপায় হিসাবেই এই শুল্ক আরোপ করা হল। জেমস্ উইলসন তাঁর এই নতুন শুল্ক ধার্যের নীতি ঘোষণা করার সময় ভারতের অর্থদপ্তরের পূর্বেকার অনুসৃত নীতির একটি বিরাট পরিবর্তন সাধন করেন। পূর্বে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সীর জন্য পৃথক হারে শুল্ক আরোপ করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তিনি এই ব্যবস্থা বাতিল করে সমগ্র ভারতের জন্য একই হারে শুল্ক আরোপের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

(৩) ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন:

তবে একমাত্র শুল্কের হার বৃদ্ধি করে বাজেটের ঘাটতি পূরণ করার উপায় উদ্ভাবন করেই জেমস্ উইলসন সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। ভূমি-রাজস্ব বিভাগেও তিনি পরিবর্তন আনয়ন করার চেষ্টা করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তরা প্রকৃতপক্ষে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয় এবং জমিদার ইচ্ছা করেই তাদের জমি থেকে বিতাড়িত করার সুযোগ ভোগ করতে শুরু করেন। উদ্ধারীকৃত পতিত জমি এবং নতুন নতুন আবাদী জমি থেকেও জমিদারদের অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে বেঙ্গল রেন্ট অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন পাঞ্জাব ও অযোধ্যা ব্যতীত বংলাদেশসহ সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে কার্যকরী করা হয়। এই আইন অনুসারে জমিদারদের কর বৃদ্ধির ক্ষমতা সীমিত করা হয় এবং নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বারো বছর পর্যন্ত চাষবাসে নিযুক্ত কৃষককে জমি থেকে বঞ্চিত করার উপায় নিষিদ্ধ করা হয়। তবে

এই আইনের ফলে জমি-সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এই আইনকে ভারতীয় কৃষকদের 'ম্যাগনাকার্টা' বলা যেতে পারে। এই আইন কার্যকরী হওয়ার ফলে জমিদার ও তালুকদারদের স্বেচ্ছাচারিতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

(৪) আয়কর প্রবর্তন :

সরকারের বাজেটের ঘাটতি দূর করার উদ্দেশ্যে জেমস্ উইলসন ভারতের সর্বপ্রথম আয়কর ধার্য করেন। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রথমবার এই কর মাত্র পাঁচ বছরের জন্য আরোপ করা হয় যদিও পরবর্তীকালে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে এই কর স্থায়ী করে পরিণত হয়। দুশ থেকে পাঁচশ টাকা আয়ের উপর দুশতাংশ এবং পাঁচশ ও তার ঊর্ধ্বে আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর চারশতাংশ হারে এই কর ধার্য করা হয়।

(৫) উপসংহার :

১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে সুতীবস্ত্রের থানের উপর আমদানি শুল্ক বর্ধিত করা হলে বোম্বাইয়ে ব্যবসায় নিযুক্ত ইয়োরোপীয় বণিকশ্রেণীর মুখপাত্রগণের পক্ষ থেকে সরকারী এই নীতির বিরোধিতা করা হয়। তাদের যুক্তি ছিল যে, দেশে বস্ত্রশিল্প ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দেশের আর্থিক জীবনের এই অংশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বজায় রাখতে হলে এই ধরনের দ্রব্যের কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা সঙ্গত হবে না। তবে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের গৃহীত শুল্ক ব্যবস্থা সম্ভবতঃ সফল হয়; কেননা শুল্কে উচ্চতর হার প্রবর্তিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই আমদানির পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে শুল্কহারগুলো হ্রাস করে আবার দশ শতাংশ করা হয়। একই সঙ্গে পাকানো এবং কর্তিত সুতার উপর শুল্কহারও প্রচলিত পাঁচ শতাংশ হার থেকে বৃদ্ধি করে দশ শতাংশ করা হয়। আবার নিঃশুল্ক দ্রব্যের তালিকায় আরও কয়েকটি নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। রপ্তানি শুল্ক সম্বন্ধে গভর্নর-জেনারেলের কার্য নির্বাহক পরিষদের অর্থ বিষয়ক সদস্য উইলসন সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এইরূপ শুল্ক হ্রাস করার সাধারণ নীতি ঘোষণা করেন। কেননা এই ধরনের শুল্ক বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত। কিন্তু বিদেশের বাজারে সোরা একচেটিয়া কারবারের সুযোগ ভোগ করত বলে তিনি সোরার উপর রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি করেন। আমদানি শুল্ক হ্রাস করার দরুন রাজস্বের যে ক্ষতি হয় তা অন্য উপায়ে পূরণ করার ব্যবস্থা করা হয়। জেমস্ উইলসনের প্রচেষ্টায় ভারত সরকারের ঘাটতির পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পায় এবং ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের বাজেটে কোন প্রকার ঘাটতিই দেখা যায় নি। জেমস্ উইলসন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী মিস্টার লেইঙ্গ প্রকৃতপক্ষে ভারতে আধুনিক যুগোপযোগী আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন।

Q. 19. Discuss the industrial development in India with special reference to foreign investment in Bombay and Calcutta.

Ans. (১) ভারতের শিল্প-উদ্যোগ :

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম ভারতের বিত্তশালী অভিজাত সম্প্রদায় দেশের নানা অঞ্চলে নিজেদের ধনসম্পদের অধিকারচ্যুত হন। কিন্তু দেশের বাণিজ্যিক শ্রেণীগুলোকে শাসকশক্তির বাণিজ্যিক আধিপত্য মেনে নেওয়ার শর্তে নিজেদের ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ কোন বাধার সৃষ্টি করে নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য গোড়ার দিকে কিছু পরিমাণে অর্থ নৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশদের সহিত মিলে-মিশে নানাভাবে কাজ করার এবং এই ভাবে লাভজনক জীবিকা অবলম্বনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। অন্ততঃপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতে ধাতুমুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা মাঝে মাঝে দেখা দিলেও সাধারণভাবে পুঁজির কোন দুষ্প্রাপ্যতা অনুভূত হয় নি। প্রায় যে কোন প্রকার ব্যবসায়িক উদ্যোগে দেশীয় বণিক ও জমিদার শ্রেণীর পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যেত। অবশ্য ক্রমশঃ অধিকতর মূলধন ব্যবহারকারী যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠতে শুরু করে।

ভারতে কয়েক ধরনের আধুনিক শিল্পের উদ্ভবের স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫০-১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের দশকে। ১৮৫৪ সালের পর প্রধানতঃ কয়েকজন পার্শি তুলাব্যবসায়ীর উদ্যোগের ফলে বোম্বাই-এ সূতাকল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী রিষড়াতে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। পাটশিল্পের বয়ন শাখার কার্যকলাপ আরম্ভ হয় ১৮৫৯ সালে। ১৮৬০ সালে কানপুরে সরকারী পশুসজ্জা এবং জিন প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিল্পপদ্ধতি ব্যবহার করে চামড়ার দ্রব্য উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে বালী অঞ্চলে কাগজকল প্রতিষ্ঠিত হলে যন্ত্রের মাধ্যমে কাগজ উৎপাদন শুরু হয়। ১৮৭৪ সালে বরাকর লৌহ কারখানা লৌহ পিণ্ডের উৎপাদন শুরু করে। কয়েকটি পশমকল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে দিয়াশলাই উৎপাদন শুরু হয়। সিমেণ্ট উৎপাদন শুরু হয় ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দেই রানীগঞ্জে প্রথম কয়লাখনির কাজ শুরু হয়। তবে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে রেলপথের বিস্তার কয়লাখনির প্রসারে সহায়তা লাভ করে। রেলপথের জন্য প্রচুর পরিমাণে কয়লা ও রেল সংগঠন নবোদ্ভূত শিল্প-কেন্দ্রগুলোতে কয়লা বণ্টনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই ভারতে চা শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করে।

(২) দেশী বিনিয়োগ :

সাধারণভাবে বলা হয় যে ভারতে মূলধন দুষ্প্রাপ্য নয় তবে ভারতীয়রা মূলধন বিনিয়োগে অনিচ্ছুক। তবে কতকগুলো কারণেই ভারতীয়গণের মূলধন বিনিয়োগে অনীহার সৃষ্টি হয়। ১৮৬০-১৮৭০-এর দশকে বোম্বাই-এ তুলা ব্যবসায়ে ফাটকাবাজি যে সমৃদ্ধির সৃষ্টি করে তাতে অনেক ভারতীয় অর্থবিনিয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই

সময়ের অভিজ্ঞতা ভারতীয়দের পুঁজি বিনিয়োগের অনীহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। কলকাতার বাণিজ্যিক আবহাওয়াও সমভাবেই দূষিত ছিল। বিশেষতঃ কয়লা শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করে অনেকেই ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তবে তৎকালীন সহানুভূতিহীন সরকার ও বিদেশী ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দেশে ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। এই ধরনের পরিবেশে ভারতে দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনের লেন-দেন কারবার বিকাশের পথ উন্মুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

তবে বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে এই অবস্থার ক্রমশঃ পরিবর্তন দেখা দেয়। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে রেজিষ্ট্রিভুক্ত যৌথ মূলধনী কোম্পানীগুলোতে দেশীয় পুঁজির পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি টাকা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে সমৃদ্ধির সৃষ্টি হয় তা হঠাৎ তীব্রভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে এবং ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে যৌথ মূলধনী কোম্পানীগুলোর মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২৩ কোটি টাকা। ১৯২৯-১৯৩০ সালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান সমিতির সংযুক্ত বিদেশী বিশেষজ্ঞ ডাঃ জেইডলসের হিসাব অনুসারে ভারতে বিনিয়োগকৃত মোট দেশীয় মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭০০ কোটি টাকা। এই অঙ্কের মধ্যে অবশ্য কেবলমাত্র শিল্প এবং কোম্পানী বিষয়ক বিনিয়োগের পরিমাণই অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এর মধ্যে ব্যাংক আমানত, সরকারী এবং অন্যান্য ঋণপত্রে বিনিয়োগের পরিমাণও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(৩) বিদেশী বিনিয়োগ :

ভারতে বিনিয়োগকৃত বিদেশী মূলধনের পরিমাণ নানাভাবে হিসাব করা হয়। এডগার ক্র্যামস্তের হিসাব অনুসারে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৯·৪০ কোটি পাউণ্ড এবং জর্জ পেশ-এর হিসাবে ১৯১০-১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৬·৫০ কোটি পাউণ্ডের উপর। বিদেশী পুঁজির বৃহত্তর অংশ হয় সরকারী বণ্ডে, নয়তো রেলওয়ে কোম্পানীগুলোর শেয়ারে এবং বণ্ডে বিনিয়োগ করা হয়। চা, কফি এবং রবারের আবাদ সমূহেও কিছু পরিমাণ বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ করে। বিদেশীদের সহায়তায় কয়লা এবং পেট্রোলিয়ামের মতো খনিজ পদার্থের আবিষ্কারের কাজ শুরু করা হয়। ভারতের কার্যরত বিদেশী ব্যাংকগুলো ভারতে বিনিয়োগ করার জন্য কিছু পরিমাণ বিদেশী পুঁজি আমদানি করে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, ট্রামওয়ে এবং জলসরবরাহ প্রভৃতি নাগরিক সুবিধার কাজেও বিনিয়োগ করার জন্য কিছু পরিমাণ বিদেশী পুঁজি আমদানি করা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় ভারতে কার্যরত কোম্পানিগুলোর সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায় যে ভারতের বাইরে সমিতিবদ্ধ এইরূপ ৬৩৪টি কোম্পানী তখন ভারতে ছিল এবং তাদের মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪২·৩৬ কোটি পাউণ্ড। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে বিদেশী কোম্পানিগুলো অধিকতর সংখ্যায় টাকার অঙ্কে শেয়ার ছেড়ে সমিতিবদ্ধ হতে শুরু করলে কোম্পানী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

হতে বিদেশী মূলধনের বাড়া-কমার হিসাব করার অসুবিধা দুরতিক্রম্য হয়ে ওঠে। আবার বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় ভারতবর্ষকে লেনদেন উদ্বৃত্তের সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। এই সময় বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের জন্য সুদ ইত্যাদি প্রদানের সমস্যা স্বভাবতঃই বড় হয়ে দেখা দেয়। জি. ফিগুলে সিরাজের হিসাব অনুসারে ১৯২৯ সালে ভারতের বিদেশী বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি টাকা। কিন্তু এই হিসাব ত্রুটিপূর্ণ। কারণ দেশীয় কোম্পানিগুলোতে বিদেশীদের স্বত্ব এবং সরকারী ঋণপত্রের উপর বিদেশীদের মালিকানার হিসাব করা হলে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ১০০ কোটি পাউণ্ডের চেয়েও বেশী হত। ভি. কে. আর. ভি. রাও-এর. হিসাবে এই অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৩'৭৫ কোটি পাউণ্ড। কিন্তু অধ্যাপক শেনয় মনে করেন যে, ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতে বিদেশী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮২'৯৮ কোটি পাউণ্ড। কিন্তু তাদের হিসাবেও কিছু সন্দেহজনক পরিসংখ্যান থাকায় নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি।

(৪) কলকাতা বনাম বোম্বাই :

ভারতে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা এবং বোম্বাই এই দুই অঞ্চলেই শিল্পের পতন শুরু হয় এবং বিদেশী পুঁজিপতিগণ উভয়স্থানেই অর্থ বিনিয়োগ করতে শুরু করে। বোম্বাই অঞ্চলে তুলা এবং তুলাজাত শিল্পের আধিক্য দেখা গেলেও এই শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের অধিকাংশই ছিল ভারতীয়। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে বস্ত্রশিল্পে আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬'৩৭ কোটি টাকা ভারতীয়দের দ্বারা নিয়োজিত এবং ৮০,০০০ পাউণ্ড ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ কোম্পানিগুলোর দ্বারা নিয়োজিত। পরবর্তী-কালে এই মূলধনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে প্রায় এই মূলধনের পরিমাণ হয় ১০০ কোটি টাকা।

ল্যাঙ্কাশায়ার ও ম্যাঞ্চেস্টারের সুতীবস্ত্র শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে যেমন, বোম্বাই-এর বয়ন শিল্প নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়, তেমনি ভাবেই বাংলা-দেশের পাটশিল্প ডাণ্ডির পাটশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়। পাটশিল্প গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ মূলধন এই শিল্পে বিনিয়োগ হতে শুরু করে এবং পাটশিল্প মূলতঃ ব্রিটিশদের পরিচালিত শিল্পে পরিণত হয়। বোম্বাই-এর ভারতীয় শিল্প-পতিদের বাংলাদেশে কোন সুগঠিত বণিক সংস্থা ছিল না। বিশেষতঃ বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত থাকার জন্য বিত্তশালী ব্যক্তিগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রাপ্ত অর্থ নতুন শিল্প-উদ্যোগে মূলধন রূপে বিনিয়োগ করার পরিবর্তে জমিদারী ক্রয় করার ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন। এই রীতির ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে দেখা গেলেও তার সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। ফলে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে বিদেশী মূলধনের প্রভাব বোম্বাই অপেক্ষা গভীরতর ভাবে দেখা দিতে শুরু করে। বিশেষতঃ নীল, আফিম, পাট, চা প্রভৃতি কৃষিপণ্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হতে শুরু করলে বিদেশী বণিকগণ এই সব কৃষিপণ্যে এবং কৃষিজাত শিল্পে প্রচুর অর্থ লগ্নী করতে শুরু করে। প্রাচ্য দেশগুলোর সংগে আফিমের ব্যবসায় মন্দা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলের ব্যবসা জমে ওঠে। আবার নীলের ব্যবসা বন্ধ হওয়ার পূর্বেই পাট ও চা-এর ব্যবসা ক্রমোন্নতি করার সুযোগ

পায়। ফলে বাংলাদেশে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। যদিও নীলের ব্যবসায় নিয়োজিত মূলধনের বেশি অংশই ছিল ভারতে কার্যরত ব্রিটিশ কর্মচারীদের। তথাপি এই অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট ছিল এবং পরে এই অর্থের একটি বিরাট অংশ চা ও পাট শিল্পে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

কৃষিপণ্যে বিনিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য বৃহৎ শিল্পেও বিদেশী মূলধন যথেষ্ট পরিমাণ লগ্নী করা হয়। বরাকর অঞ্চলে লৌহখনি এবং রানীগঞ্জ এলাকায় কয়লার খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর এইসব খনিজ সম্পদকে সদ্ব্যবহার করার জন্য বিদেশী পুঁজিপতিগণ অর্থ বিনিয়োগ শুরু করেন। যদিও প্রথমদিকে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাগুলো বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নি। কিন্তু কয়লা শিল্প প্রাথমিক অসুবিধাগুলো অতিক্রম করে অল্পদিনের মধ্যেই উন্নতিলাভ করার সুযোগ পায়।

(৫) **উপসংহার :**

অপরদিকে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। কলকাতা বন্দর দিয়ে শুধুমাত্র পূর্ব-ভারতেই নয় সমগ্র মধ্য ও উত্তর-ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালিত হত। সুতরাং কলকাতা বন্দরের উন্নতি সাধন ও আধুনিকীকরণের জন্যও বিদেশী কোম্পানিগুলো প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করে। ফলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্তই বিদেশী বিনিয়োগের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যৌথ-ভাবে মূলধন বিনিয়োগ করা ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে অনেকে কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে ছোট ছোট কলকারখানা গড়ে তুলতে শুরু করে। এইসব কলকারখানায় একক-ভাবে মূলধনের পরিমাণ সামান্য হলেও যৌথভাবে তাদের মূলধনের পরিমাণ প্রচুর ছিল। অনেক সময় ভারতীয় ও বিদেশীদের সমবেত চেষ্টায় ও যৌথ মূলধনেও অনেক কলকার-খানা স্থাপিত হয়। বিশেষতঃ বৃহৎ শিল্পের সহায়ক শিল্প হিসাবে এইসব কলকারখানা গড়ে উঠতে শুরু করে। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ হ্রাস পেতে শুরু করে তথাপি ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত কলকাতায় বিদেশী মূলধনের প্রাধান্য হ্রাস পায় নি।

Q. 20 Do you think that the aftermath of the revolt of 1857 was a conservative reaction in British policy ?

Ans (১) **ভূমিকা :**

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণরূপে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের সামাজিক ও অন্যান্য সংস্কার প্রবর্তনের প্রচেষ্টাকে চিহ্নিত করা হয়। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ ও হিন্দু সমাজের অন্যান্য সংস্কার রক্ষণশীল হিন্দুদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। সমুদ্রপাড়ি দিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্যদের বিদেশে প্রেরণের যে নীতি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে তাও হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র বিরোধী বলে বিবেচিত হত। খ্রীস্টধর্ম প্রচারের চেষ্টাকে প্রথম থেকেই হিন্দুগণ খুব অপছন্দ করত। লর্ড ডালহৌসির আমলের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বিশেষতঃ স্বত্ব বিলোপ আইন অনুসারে

দত্তক পুত্র গ্রহণের প্রতি বাধা-নিষেধ আরোপ করায় ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হিন্দুদের অনেকের মনেই সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার ও অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যাদিও ইংরেজ শাসকদের সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে বিবেচিত হয় নি। উপরি-উক্ত বিষয়গুলো সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণরূপে গণ্য না হলেও বিদ্রোহ সংগঠনে তাদের প্রভাব অনস্বীকার্য। ফলে বিদ্রোহ দমিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার ভারতে সামাজিক সংস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের কার্যকলাপ সরকারীভাবে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায়ও বলা হয় যে, **"We know and respect the feeling of attachment with which the Natives of India regard the land inherited by them from their ancestors and we desire to protect them in all rights connected therewith subject to the equitable demands of the state and we will do that generally in framing and administering the law, due regard be paid to the ancient rights, usages and customs of India."**

(২) ব্রিটিশ শাসকদের মনোভাব ঃ

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপদ্ধতি গভীর সন্দেহের চোখে দেখত। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার সিপাহি বিদ্রোহের পূর্বে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদর্শন করতেন তা পরিত্যাগ করতে তাঁরা বাধ্য হয়। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের স্যার উইলিয়াম ওয়েডবার্ন এবং মিস্টার হিউম স্পষ্টভাবে এই অভিমতের কথা প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে ওয়েডবার্ন বলেন, **"......many entirely disapprove of any efforts to cultivate the native mind, many condemn as unconditionally, a merely secular education."** এমন কি, শ্বেতকায় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে অথবা বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী পাঠাবার জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ করতেও নিষেধ করা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ব্রিটিশ রাজকর্মচারীগণ ভারতবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে এবং সহানুভূতিহীন হয়ে জাতিগত বৈষম্য বজায় রেখে এবং বিদ্রোহের সামান্যতম আভাস পেলে তাকে কঠোরভাবে দমন করে শাসনতন্ত্র পরিচালনা করার নীতি গ্রহণ করেন। ভারতবাসীদের সঙ্গে কোন প্রকার মেলামেশা করার বা যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনও তাঁরা উপলব্ধি করেন নি। সিপাহি-বিদ্রোহের পর থেকে শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। এমন কি, সিপাহি বিদ্রোহের অবসানের পর ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য ভাবধারা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন করতে শুরু করলে ইংরেজ সরকার এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করতে অসম্মত হয়। এমন কি, ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ শিক্ষিত ভারতীয়দের এই প্রচেষ্টাকে দারুণ সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন এবং

তাদের সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক Molleson তাঁর The India Mutiny of 1957 নামক গ্রন্থে লেখেন, "Concession to noisy agitation on the part of the ruling power would place the lives, the fortunes, the Interests of the loyal classes of India at the mercy of the noisist, most corrupt and most despised race in India."

(৩) মুসলিমদের প্রতি নীতি :

সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অনুসৃত নীতি তাদের অনুদার মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় মুসলিম সৈন্যগণ বিদ্রোহে ব্যাকপভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস করে ভারতে পুনরায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। শেষ মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে তারা পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজগণ মুসলমানদের অত্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং তাঁদের সম্পর্কে একটি অসহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেন। তাঁদের এই নীতির ফলে মুসলিম সমাজের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষী এক মনোভাবের সৃষ্টি হয় এবং বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পরও বহুদিন পর্যন্ত মুসলিমগণ ইংরেজশাসকদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ পায় নি।

(৪) স্বার্থপ্রণোদিত শাসন :

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ও লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সমাজ থেকে নানা-প্রকার কুসংস্কার ও যুক্তিহীন প্রথা দূর করার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়, সিপাহি বিদ্রোহের পর তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় থেকে শাসক গোষ্ঠী-শাসিতদের মঙ্গল ও উন্নতির কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থেই শাসনতন্ত্র পরিচালনা করতে শুরু করে। এই সম্পর্কে William Jennings Bryan বলেন, "The trouble is that England acquired India for England's advantage, not for India's, and that she holds India for England's benefit not for India's. She administers India with an eye to England's interests, not India's, and she passes judgement upon every question as a judge would be permitted to decide his own case". সিপাহি বিদ্রোহের পর ইংলণ্ড নিজের স্বার্থেই সংরক্ষণশীল নীতি অনুসরণ করে ভারতের উপর তার আধিপত্য সুনিশ্চিত করে তোলার চেষ্টা করে।

(৫) উপসংহার :

ঐতিহাসিক Percival Spear সিপাহি বিদ্রোহোত্তর যুগের ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, "The Mutiny crisis necessarily brought to a halt the programme of social and material

improvement which Dalhousie had pursued so energetically" কিন্তু তিনি মনে করেন যে, সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সম্পর্কে অনুদার, রক্ষণশীল ও সংকীর্ণ নীতি অনুসরণ করলেও অল্পদিন পরেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সম্পর্কে এই মনোভাব পরিবর্তন করে এবং John Bright ব্রিটিশ শাসনকে যে "......hundred years of crime against the docile natives of India" বলে বর্ণনা করেন তা ঠিক নয়। কারণ ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি ভারতীয়দের সম্পর্কে নীচ ধারণা পোষণ করলেও অনেকেই আবার ভারতবাসীর নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির কথা চিন্তা করতেন। সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তীকালেও ইংরাজ রাজকর্মচারীদের কার্যকলাপের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের 'উডের ডেসপ্যাচ' অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কোথাও কোন বাধার সৃষ্টি করা হয় নি। সিপাহি বিদ্রোহের সময়ই কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পরই বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন কলেজ স্থাপিত হতে শুরু করে এবং সরকার এই সব কলেজের প্রতি অনুদান মঞ্জুর করতে খুব আপত্তি করে নি। জনহিতকর কার্যকলাপও বন্ধ হয় নি এবং বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন রেলপথ নির্মিত হয় এবং ভারতের সর্বত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। রেলপথ নির্মাণের ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ভারতের অন্তর্বাণিজ্য উন্নতিলাভের সুযোগ পায় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের পথ উন্মুক্ত হয়। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্যও ব্রিটিশ সরকার নতুন আইন বিধিবদ্ধ করে তার উদার নীতির পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে উত্তর প্রদেশ, আজমীর এবং পাঞ্জাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য একটিনীতি নির্ধারণ করে এবং পরবর্তী কালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের উদ্ভবের প্রাথমিক কার্যগুলো লর্ড ক্যানিং-এর চেষ্টায়ই সম্পন্ন হয়। অপরদিকে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার অনুযায়ী ভারতীয়দের জন্য যে নতুন আইন সঙ্কলনের ব্যবস্থা হয় তার ফলেই ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত আইন-বিধি এবং পরবর্তী বছরে ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত আইন-বিধি সরকারীভাবে কার্যকরী হয়। এই আইন সংকলনের ফলে ভারতের বিচার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সুতরাং ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ভারতবাসীদের সম্পর্কে অনুসৃত ব্রিটিশ সরকারের নীতি সম্পর্কে বলা যায় যে, বিশেষ কোন সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে অথবা তা দূর করার জন্য সচেষ্ট না হয়ে ব্রিটিশ সরকার সাধারণ ভাবে ভারতীয় জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং পুরাতন ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা শুরু করে। তা ছাড়া, প্রাক্-বিদ্রোহের যুগে সামাজিক ও ধর্মীয়

সংস্কারকে কার্যকরী করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সমর্থন গ্রহণ করলেও বিদ্রোহোত্তর যুগে ভারতীয়দের সাহায্য ব্যতীত এককভাবেই ব্রিটিশ সরকার তাদের নীতি কার্যকরী করার ব্যবস্থা করে।

Q. 21 Discuss briefly the results of the Sepoy Mutiny.

Ans. (১) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান :

বিদ্রোহীদের কর্মপন্থা, যোগাযোগ ও সংহতির অভাব, সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব ও নেতৃত্বের সংঘর্ষ, বিদ্রোহীদের সাংগঠনিক ও সামরিক ভুল এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ কূট-কৌশল ও ব্রিটিশ সেনাপতিদের সামরিক দক্ষতার ফলে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ বিফল হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহ বিফলতায় পর্যবসিত হলেও এই বিদ্রোহের ফলেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসকদের প্রচেষ্টায় ভারতের শাসনক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়। এই বিদ্রোহের ফলে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্পষ্টই বুঝতে পারে যে, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হস্তে এত বড় একটি সাম্রাজ্যের শাসনভার ছেড়ে দেওয়া কোন মতেই নিরাপদ নয়। এই কারণে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে এই সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের অধীনে স্থাপন করা হয়। ভারতের শাসনের উন্নতির জন্য একটি আইন পাস করে ভারতের শাসনভার একজন সেক্রেটারী ও পনের জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কাউন্সিলের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। এই সংস্থাটি ইংলণ্ডে স্থাপিত হয় এবং ইংলণ্ডের মহারানীর পক্ষে ভারতের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব এই কাউন্সিল ও সেক্রেটারীর হস্তে ন্যস্ত করা হয়। ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক মহারানীর প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের গভর্নর জেনারেল বা ভাইসরয় প্রতিনিধি নিযুক্ত হন।

(২) স্বত্ব বিলোপ নীতি পরিত্যক্ত :

গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং নতুন ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হন। ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর প্রচুর জাঁক-জমক ও আড়ম্বরের মধ্যে তিনি মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এই ঘোষণাপত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রিটিশ সরকার ভারতের দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে তাদের নীতি পরিবর্তন করে। অধীনতামূলক বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে অধীনতামূলক ঐক্যের নীতি গৃহীত হয়। ব্রিটিশের স্বার্থের সহিত তাদের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করাই ছিল এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। অভিজাত ও রাজন্যবর্গের মধ্যে যাঁরা ইংরেজদের বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করেন তাঁদের সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা ও নানাভাবে পুরস্কৃত করা হয়। নিজাম, সিন্ধিয়া, জয়পুররাজ, উদয়পুর-রাজ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ এইরূপ সম্মান লাভ করেন। সিন্ধিয়াকে আরও ভূখণ্ড দান করা হয় এবং তাঁর রাজ্যের আয়তন আরও বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসির দ্বারা অধিকৃত কয়েকটি জেলা নিজামকে প্রত্যর্পণ করা হয়।

মহারানীর ঘোষণা দ্বারা লর্ড ডালহৌসি প্রবর্তিত স্বত্ব-বিলোপ নীতিও পরিত্যক্ত হয়। ঘোষণায় স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে আর রাজ্য বিস্তার

করবে না। দেশীয় নৃপতিদের মনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি যে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল তা দূরীকরণের জন্যই এই কথার উল্লেখ করা হয়। তা ছাড়া, দেশীয় রাজগণের উত্তরাধিকার তাঁদের নিজ নিজ আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে এবং দত্তক পুত্র গ্রহণেও তাঁদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে বলে এই ঘোষণায় বলা হয়। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ক্যানিং প্রত্যেক হিন্দু রাজাকে অপুত্রক হলে দত্তক পুত্র গ্রহণের ক্ষমতা দিয়ে সনদ প্রদান করেন। মুসলমান রাজাদের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রচলিত বিধি ও রীতি অনুযায়ী উত্তরাধিকার ঘটবে বলে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। এইভাবে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যগ্রাস নীতি আনুষ্ঠানিকভাবে পরিহার করা হলেও দেশীয় রাজাদের তাদের রাজ্যের সুশাসনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকতে বলা হয়।

(৩) শাসন-ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ-নীতি :

ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অধিকতর অংশদানের নীতিও গৃহীত হয়। ভারতের ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় এবং ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কোনপ্রকার যোগাযোগ ছিল না বলেই ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে এই বিদ্রোহ ঘটে—এই কথা স্মরণ করে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি প্রবর্তিত হয়।

(৪) ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল অ্যাক্ট :

১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজ ও বোম্বাই-কাউন্সিলের আইন প্রবর্তনের ক্ষমতা কলকাতা কাউন্সিলের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু বিদ্রোহের পর এই কেন্দ্রীয়করণ নীতি পরিত্যক্ত হয়। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল অ্যাক্ট পাস করে বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীনে কোন প্রদেশ গঠন করা হলে সেখানে কাউন্সিল স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে পার্লিয়ামেন্টের বিধির দ্বারা ভারতের নতুন আইনসভা সৃষ্ট হয়। শাসন পরিষদের সভ্যগণ ভারতের নতুন আইনসভার সদস্য পদ লাভ করেন এবং আরও বারো জন অতিরিক্ত সদস্য এই সভায় যোগদানের সুযোগ পান। এই বারো জনের মধ্যে অর্ধেক ছিলেন সরকারী কর্মচারী এবং অর্ধেক বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ।

(৫) সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ নীতির প্রয়োগ :

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ শাসকবর্গের মধ্যে ভীতি ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তা দূর করার জন্য এবং ভারতের ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনীতির প্রচলন করতে সচেষ্ট হন। সেই সময় হতেই সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণের চেষ্টা শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং ইংরেজ শাসকগণ হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতির সুযোগে নিজের স্বার্থ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। বিদ্রোহের সময় মুসলমানগণ বিদ্রোহীদের প্রতি খুব সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে, এমন কি, দক্ষিণভারতে বিদ্রোহ প্রবলাকারে না হলেও ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে সেখানে

বহুবার ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র দেখা দেয়। বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা অংশগ্রহণ করলেও বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার পর মুসলমানদেরই বেশি নির্যাতন সহ্য করতে হয় এবং মুসলমান সমাজের বহু নেতারই নির্বাসন অথবা প্রাণদণ্ড হয়। এইসব মুসলমান নেতাদের মধ্যে ঝাঝর, বল্লভগড়, ফারুকনগর, ফারুকাবাদ প্রভৃতি স্থানের নবাব সাহেবদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর একমাত্র দিল্লীতেই ২৪ জন মোগল রাজবংশের সন্তানদের ফাঁসি হয়। মুসলমানদের প্রতিই ব্রিটিশ শাসকগণ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং মুসলমানদের বিষয়-সম্পত্তিও যথেষ্টভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়। মুসলমান সমাজের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির ফলে ভারতের মুসলিম সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র দিল্লীর অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলিমদের এই বিপর্যয় ভারতের পক্ষেও খুব ক্ষতিকারক হয়। Mr. C. F. Andrews-এর মতে, "It is not difficult to trace the fatal havoc to budding cultural life which one year of Mutiny brought. Decay immediately overtook the revival of learning from Delhi from which it never recovered." ব্রিটিশ সরকারের বিভেদ নীতি অনুসরণ এবং মুসলমান সমাজের প্রতি নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের পূর্বেকার সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের অবসান ঘটে এবং তার পরিবর্তে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধানও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোন ঐক্য স্থাপনের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

(৬) বৃটিশ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি ঃ

ভারতীয় সিপাহীদের সংখ্যার অনুপাতে অতি নগণ্য সংখ্যার ব্রিটিশ সৈনিক রাখার বিপদ বুঝতে পেরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরও বহু ব্রিটিশ সৈন্য ভারতে আনয়ন করে ভবিষ্যতে সিপাহী বিদ্রোহের পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা করে। তা ছাড়া, সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে যাবতীয় দায়িত্বমূলক কার্যে কেবলমাত্র ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগের নীতি অনুসৃত হতে শুরু করে। দেশীয় গোলন্দাজ বাহিনীকে ইয়োরোপীয় বাহিনীর সহিত যুক্ত করা হয়। এই সময় থেকেই ব্রিটিশ শক্তি ভারতীয় সামরিক বাহিনী পুনর্গঠনের জন্য কয়েকটি নতুন নীতি গ্রহণ করে। "The lessons taught by the Mutiny have led to the maintenance of two great principles, of retaining in the country an irresistable force of British troops and keeping the artillery in hands of the Europeans." দেশীয় সিপাহিদের সংখ্যা হ্রাস এবং ইয়োরোপীয় সৈন্যদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে দেশরক্ষা খাতে ভারতের ব্যয় বৃদ্ধি শুরু হয় এবং সামরিক বিভাগের অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য ভারতবাসীদের উপর নতুন নতুন করের বোঝা চাপানো হয়। সামরিক বিভাগের উচ্চপদে এবং সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে একমাত্র ইংরেজদেরই নিযুক্ত করা হয়। এই সম্পর্কে Sir Richard Temple মন্তব্য করেন যে, "At every large military stations in the empire there are

enough European to hold their own even in the event of a mutiny." তা ছাড়া, ভারতের উচ্চবর্ণের লোকদের সামরিক বাহিনীতে গ্রহণ করা নীতিগতভাবেই বন্ধ করা হয়। বিদ্রোহের পর বাংলায় একটি নতুন বাহিনী গঠন করা হয়—এই বাহিনীতে দু-একজন ব্যতীত বাকি সকল পলটনই শিখ, পাঠান, গুর্খা প্রভৃতি জাতি দ্বারা গঠিত হয়। পূর্বিয়া নামে পরিচিত পূর্বভারতের অধিবাসীদের সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করা প্রায় নিষিদ্ধ হয়। বিদ্রোহের পরবর্তীকালে পুলিশবাহিনীরও সংস্কার ও পুনর্গঠন করা হয়। মাদ্রাজ পুলিশের প্রধান কর্মকর্তা মিস্টার ডব্লিউ রবিনসন-এর উপর এই কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ভারতীয় নৌবাহিনী বিলুপ্ত করে উপকূল রক্ষা করা এবং সন্নিহিত সাগরে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব রাজকীয় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর উপর অর্পণ করা হয়।

(৭) বিচার বিভাগের সংস্কার:

সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পূর্বেই লর্ড ব্যাবিংটন মেকলের দ্বারা পেনাল কোড প্রণয়ন শুরু হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর তা প্রধান বিচারপতি স্যার কর্নেস পীককের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়ে আইনে পরিণত হয়। যথেষ্ট বিচার এবং শাস্তির হাত থেকে নতুন বিচার ব্যবস্থা ও নতুন আইন জনসাধারণকে বহুল পরিমাণে রক্ষা করে। ফৌজদারী বিচারের পদ্ধতি পরিবর্তন করে এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট করে কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর প্রণীত হয়।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট এক আইনের সাহায্যে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই তিনটি প্রেসিডেন্সীতে তিনটি হাইকোর্ট স্থাপন করে। সুপ্রিমকোর্ট ও সদর আদালতের মধ্যেকার পার্থক্য রহিত হয় এবং এই দুই আদালতের বিচার ক্ষমতা হাইকোর্টে কেন্দ্রীভূত হয়। স্থির হয় যে, হাইকোর্টের বিচারপতিদের মোট সংখ্যার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ থাকবেন ইংরেজ ব্যারিস্টার এবং আর এক-তৃতীয়াংশ থাকবেন বিচারকার্যের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সিভিল সারভেন্ট। তাঁরা স্থান থেকে স্থানান্তরে যেয়ে নিম্ন আদালত থেকে আনীত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার আপীলের বিচার করবেন। যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতের 'ব্যবহারজীবিগণও বিচারপতির পদলাভ করার অধিকার পান। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দেই সিভিল সার্ভিস বিধি প্রণয়ন করে অনেকগুলো পদ ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

(৮) সংস্কার নীতি পরিত্যাগ ও ভারতীয়দের সম্পর্কে নীতির পরিবর্তন:

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহের কারণগুলোর মধ্যে ব্রিটিশ শাসনাধীনে সতীদাহ প্রথা দমন, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি সংস্কার কার্যকরী করা অন্যতম কারণরূপে দেখা দেয়। এই কথা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সংস্কারকার্যাদি গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে শুরু করে। অপরদিকে সিপাহীদের সশস্ত্র বিদ্রোহের পশ্চাতে আর একটি সংঘর্ষও বিদ্যমান—ভারতীয় সংরক্ষণশীলতার সহিত ইয়োরোপীয় উদারনীতির

সংঘর্ষ। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতীয় সংরক্ষণশীলতার কাছে আপৎকালের জন্য পশ্চিমী উদারনীতি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার তাদের পূর্বতন উদারনীতি পরিত্যাগ করে, তার পরিবর্তে সংরক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ভারতবাসীদের সহিত ব্যবহার সম্পর্কেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নূতন নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব হলেও, সিপাহী বিদ্রোহের ক্ষতচিহ্ন দূরীকরণ হয় নি। ভারতীয়দের জাতীয় জীবনেই এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয় এবং শাসক ও শাসিতদের মধ্যে আর কোনদিনই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। বরঞ্চ ধীরে ধীরে উভয়ের পার্থক্য আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শাসক ও শাসিতদের মধ্যে যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় উভয় পক্ষের আন্তরিক চেষ্টা থাকা সত্বেও তা দূর করা সম্ভব ছিল না। ভারতীয়দের মনে উর্ধ্বতন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের একান্ত অনুগত কর্মচারীদেরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা ইংরেজদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ইংরেজদের সহিত ভারতীয়দের স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

(৯) উপসংহার:

স্যার লেপেল গ্রিফিন-এর মতে, "perhaps a more fortunate occurrence than the mutiny of 1857 never occurred in India." তিনি মনে করেন যে, এই বিদ্রোহের ফলে ভারতের আকাশে দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত মেঘ চিরতরে অপসারিত হয় এবং শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সহজে ও বিনা আয়াসে জয় করে এবং নিরুপদ্রবে শাসন করে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অলসতা ও আত্মতৃপ্তির সৃষ্টি হয়। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ সৈন্যগণ আত্মতৃপ্তি ও অলসতা দূর করে আবার প্রমাণ করতে সমর্থ হয় যে, সহস্র বাধা-বিপদ অতিক্রম করে এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়ে সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব। সিপাহী বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজ বাহিনী পৃথিবীর কাছে আবার তাদের রণনিপুণতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। ফলে নতুন কর্মোদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে ইংরেজগণ ভারতের উপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। অপরদিকে ঐতিহাসিক মিস্টার কটন মনে করেন যে, সিপাহী বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শাসকদের নিকট একটি অর্থপূর্ণ সতর্কবাণী। শাসক-শাসিতদের প্রভেদ বিস্মৃত হয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সমাজে পরিবর্তনের যে চেষ্টা করে তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা ছিল না। ফলে অনেক সময়ই তারা শাসিতদের মনোভাবের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে নিজেদের মতামত ও আদর্শ তাদের উপর আরোপ করার চেষ্টা করত। এই ভ্রান্ত নীতি পরিত্যাগ করা ব্রিটিশ শাসকদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। সম্ভবতঃ এই সতর্কবাণীর

দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সিপাহী বিদ্রোহোত্তর যুগে ইংরেজ সরকার গভীরভাবে চিন্তা করেই প্রতিটি সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুত হয়। তবে সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বেই ব্রিটিশ শাসকদের উদারনীতির ফলে শিক্ষিত ভারতীয়-দের মনে যে নতুন চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়, সিপাহী বিদ্রোহ অথবা সিপাহী বিদ্রোহোত্তর যুগের ব্রিটিশ নীতি তাদের কার্যকলাপ স্তিমিত করে তুলতে সমর্থ হয় নি।

Q. 22. Give a Critical estimate of the Indian council Acts of 1861 and 1892.

Ans. (১) ভূমিকা :

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর স্থির করা হয় যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একদল দায়িত্বহীন কর্মচারীর হস্তে ভারতের শাসনভার অর্পণ করা শুধুমাত্র অযৌক্তিক নয়, বিপজ্জনকও বটে। সুতরাং মহাবিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটে এবং ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের বলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার সরাসরিভাবে গ্রহণ করে। এই আইন অনুসারে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যাবতীয় রাজ্য ও অন্যান্য অধিকার সমূহ ব্রিটেনের সিংহাসনের উপর ন্যস্ত হয় এবং একজন ভারত সচিব এবং পনের জন সদস্য বিশিষ্ট ভারত কাউন্সিল নামে একটি পরিষদের উপর ভারতের শাসনব্যবস্থার সকল ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আইনত ভারতের প্রশাসনের দায়িত্ব ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর দেওয়া হলেও এই বিষয়ে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের কোন বাস্তব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য প্রকৃতপক্ষে ভারত সচিবের উপরই এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। সেজন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত শাসনের ব্যাপারে 'ঘুমন্ত অভিভাবকের' ভূমিকা গ্রহণ করে।

(২) ভারত আইন, ১৮৫৮ :

ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ভারত আইন শাসনক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধন করে নি। একমাত্র গভর্নর জেনারেলকে সিংহাসনের প্রতিনিধি হিসাবে 'ভাইসরয়' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কিন্তু এই সময় থেকে তুলনামূলকভাবে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ভারতের শাসনব্যবস্থার উপর ভারত সচিবের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপন, আভ্যন্তরীণ শাসন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত সচিব সর্বেসর্বা ক্ষমতার অধিকার লাভ করেন। তবে এই সময় থেকে দুটি কারণে ভারত সরকারের উপর ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। (১) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়; এবং (২) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এশিয়ায় ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে ভারত এশিয়ায় ব্রিটিশ সম্প্রসারণ কর্ম-কাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতে নিজেদের ক্ষমতা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে

ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তান, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, ভুটান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হয়। ফলে ভারতের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেনের শাসক গোষ্ঠীর সর্বাত্মক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩) ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভারতে শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু হল ভারতে আইনসভার প্রতিষ্ঠা এবং শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়করণ ও বিকেন্দ্রীকরণের নীতির সূচনা। মহাবিদ্রোহের পূর্বে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ আইন অনুযায়ী ভারতে আইনসভার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আইনে কতকগুলো ত্রুটি ছিল এবং সেজন্য শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে নানারূপ অসুবিধা দেখা দেয়। (১) ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভায় বারবার হস্তক্ষেপ ও আইন প্রণয়নের স্বাধীনতার দাবি প্রচণ্ড জটিলতার সৃষ্টি করে। (২) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ফলে বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের পক্ষে কোন আইন বিধিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। ফলে ঐ দুটি প্রদেশের শাসন ব্যাপারে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। (৩) আইনসভায় কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় ভারতীয়দের সঠিক মনোভাব জানা সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে ভারতীয়দের মনোভাব জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সুতরাং নতুন আইন বিধিবদ্ধ করে তাঁরা এই বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা শুরু করেন। ফলে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল আইনে শাসন-তান্ত্রিক ব্যাপারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়। প্রথমতঃ, গভর্নর জেনারেলের কার্য-নির্বাহক পরিষদের সাধারণ সদস্যের সংখ্যা চার থেকে বাড়িয়ে পাঁচে পরিণত করা হয়। নতুন এই সদস্য অবশ্যই আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ হবেন। লর্ড ক্যানিং বিভাগীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং প্রত্যেক সদস্যকে এক একটি বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। গভর্নর জেনারেল ন্যূনতম ছয়জন এবং অনধিক বারোজন অতিরিক্ত সদস্যকে দুবছরের জন্য মনোনীত করার ক্ষমতা লাভ করেন। এই অতিরিক্ত সদস্যের অন্তত অর্দ্ধেক অবশ্যই বেসরকারী পর্যায়ের হবে। তৃতীয়তঃ, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রাদেশিক গভর্নরের পরিষদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পুনরায় অর্পণ করা হয়। চতুর্থতঃ, প্রাদেশিক গভর্নরের পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ন্যূনতম চারজন এবং অনধিক আটজন অতিরিক্ত সদস্য মনোনীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ঠিক হয় যে, এই সংখ্যার অর্দ্ধেক সদস্য অবশ্যই বেসরকারী পর্যায় থেকে গৃহীত হবে। পঞ্চমতঃ, বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আইন পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ষষ্ঠতঃ, গভর্নর জেনারেল জরুরী পরিস্থিতিতে আইন পরিষদের অনুমোদন ছাড়াই অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইন ঘোষণা করার অধিকার লাভ করেন।

(৪) সমালোচনাঃ

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন ব্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত শাসন-

ব্যবস্থার অনেক নীতি পরিবর্তন করে। আইন পরিষদে কিছু সংখ্যক ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করায় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলোর উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রত্যর্পণের ফলে শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়করণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের নীতি সামান্যভাবে গৃহীত হয়। তা ছাড়া, পরিষদগুলোতে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বেসরকারী সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় ভারতবাসী এই প্রথম প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। কিন্তু ভারতে স্বায়ত্ত শাসনের বিবর্তনের পথে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল আইনকে কোন ক্রমেই সন্তোষজনক বা অগ্রবর্তী পদক্ষেপ বলা চলে না। আইন পরিষদে সরকারী সদস্যদের সংখ্যাধিক্য থাকায় বেসরকারী সদস্যদের মতামতের কোন মূল্য ছিল না। তা ছাড়া, বেসরকারী সদস্যদের অধিকাংশই সরকারের মনোনীত হওয়ায় তাঁদের পক্ষে সরকারের বিরোধী মতামত প্রকাশ করার সুযোগ ছিল না। বেসরকারী সদস্যদের প্রায় সকলেই দেশীয় রাজন্যবর্গ ও ভূস্বামী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে মনোনীত হতেন এবং তাঁদের সঙ্গে সাধারণ ভারতবাসীর কোন সংযোগ ছিল না। অপরদিকে আইন পরিষদের সদস্যদের প্রশাসন, কর ধার্য, ব্যয় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের কোনও ক্ষমতা ছিল না। সর্বোপরি ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল আইনে গভর্নর জেনারেলকে অর্ডিনান্স জারি করার যে ক্ষমতা দেওয়া হয় তার ফলে স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। এমন কি, আইন পরিষদের গৃহীত কোন আইনও গভর্নর জেনারেলের সম্মতি ব্যতীত কার্যকরী হতে পারত না।

(৫) ভারত কাউন্সিল আইন, ১৮৯২ :

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের পরে প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ বছর কাল শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সংস্কার সাধিত হয় নি। তবে এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ও ভারত সচিবের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে গভর্নর জেনারেলের ব্যক্তিগত ক্ষমতাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। অপরদিকে আইন পরিষদগুলোর কার্যকলাপ ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। শিক্ষাবিস্তার ও রাজনৈতিক চেতনা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ভারতবাসী দেশের শাসনকার্যে অধিকতর দাবি উত্থাপন করতে শুরু করেন। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক সমিতি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই সকল দাবি-দাওয়া প্রকাশিত হতে থাকে। দেশীয় সংবাদপত্র আইন, অস্ত্র আইন, ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীর অসন্তোষ স্পষ্ট আকার ধারণ করে। বিশেষতঃ ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনগুলোতে বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে সরকারী নীতির সমালোচনা পরিলক্ষিত হয়। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্যও কংগ্রেস ব্যাপক প্রচার শুরু করে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস ইংলণ্ডে একটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করে এবং ঐ সংস্থার মাধ্যমে কংগ্রেসের দাবি-দাওয়াগুলো ব্রিটিশ জনগণের নিকট উপস্থাপিত করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাফরিন আইন পরিষদের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা

নিরূপণের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে ভারত সচিব লর্ড ক্রস ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে পার্লামেন্টে ভারতীয় কাউন্সিল বিল পেশ করেন। বিলটির মূল লক্ষ্য ছিল ভারত সরকারের প্রশাসনিক ভিত্তি ও কার্যাবলীর পরিধি সম্প্রসারণ করা। বিলটিতে ভারতীয় আইন পরিষদের তিন প্রকারের সংস্কার সুপারিশ করা হয়। এই তিনটি পরিবর্তন হল—অর্থনৈতিক বিষয়ে সমালোচনার অধিকার, প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার ও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হল। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যসংখ্যা ষোল করা হয় এবং বৃহৎ ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রাদেশিক পরিষদগুলোর সদস্যসংখ্যা যথাক্রমে কুড়ি ও পনেরো ধার্য করা হল। প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যাও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করা হয়। অতিরিক্ত ন্যূনতম বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে আটজন, বাংলায় কুড়িজন এবং যুক্তপ্রদেশে পনের জন করা হয়। সদস্য নিয়োগের ব্যাপারে যদিও সরাসরিভাবে নির্ধারণের নীতি গৃহীত হয় নি, কিন্তু জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, বিশ্ববিদ্যালয়, চেম্বার অফ কমার্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করার অধিকার দেওয়া হয়। প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলোর বেসরকারী সদস্যগণ চারজন সদস্যকে কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচন করার অধিকার লাভ করে। তা ছাড়া, বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভার আটজন অতিরিক্ত বেসরকারী সদস্য, পৌরসভা, জেলাবোর্ড, বণিকসভা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোকে বাজেট ও জনসাধারণের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করার অধিকার দেওয়া হয়।

(৬) উপসংহার:

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল আইন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে নির্বাচন প্রথার আংশিক প্রয়োগ করে এবং সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সুযোগ দিয়ে আধুনিক ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। প্রকৃত পক্ষে পরবর্তীকালে ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার গৃহীত হয়, ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল আইন তাঁর ভিত্তি রচনা করে। কিন্তু ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের আইন পূর্বেকার বিধি-ব্যবস্থা থেকে অনেক উন্নত মানের হলেও এই আইন ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে নি। তার প্রধান কারণ ছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইন সভায়ই মনোনীত সদস্যের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখা। তা ছাড়া, আইন পরিষদগুলোর সদস্যগণ অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে মতামত প্রকাশের বা প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার পেলেও তাঁরা বাজেট সম্পর্কে ভোট দানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। ফলে সদস্যদের পক্ষে সরকারী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয় নি। অপর দিকে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল আইনে যদিও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় নি, তথাপি পরবর্তী

কালে এই আইনের একটি সূত্র অবলম্বন করেই সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ভারতের সাংবিধানিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি মূল ভিত্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

Q. 23. Why was India central to the British Imperial system in the World as a whole in the late 19th century ?

Ans. (১) সাম্রাজ্য বিস্তারের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা :

উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। এই অধ্যায়ের সূচনার মূলে ছিল বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এই সময় পশ্চিম ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে এবং উত্তর আমেরিকায় যন্ত্রসভ্যতার প্রসার ঘটার ফলে যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন ও পুঁজির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের আধিপত্যের অবসান ঘটে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং পরবর্তীকালে জাপান বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজার অধিকার করার চেষ্টা করতে শুরু করে। ফলে বাজারের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়।

অপরদিকে, যন্ত্রশিল্পের কাজে ব্যবহার করার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। ইস্পাত শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, পেট্রোলিয়াম শিল্প প্রভৃতি এই যুগে দ্রুত উন্নতি লাভ করে। শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তিও এই সময় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলে একদিকে বস্ত্রশিল্প দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হতে থাকে, অন্যদিকে নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগের জন্য কাঁচামালের প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কাঁচামালের ঘাটতি দেখা দিলে যন্ত্রশিল্পে অপূরণীয় ক্ষতির আশঙ্কায় সকল দেশের পুঁজিপতিগণই চিন্তিত হয়ে পড়েন। অপরদিকে শিল্পোদ্যোগের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করার জন্য অনেক বেশি খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে কাঁচামাল ও খাদ্যশস্যের নতুন নতুন উৎসের জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু হয়। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে কৃষিজ ও খনিজ কাঁচামালের যেসব উৎস ছিল অথবা যে সকল স্থানকে সম্ভাব্য উৎস বলে মনে করা হত সেগুলোর উপর একচেটিয়া অধিকার লাভের জন্য বিভিন্ন পশ্চিম রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হল।

তা ছাড়া, বাণিজ্য ও যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি এবং বর্দ্ধিত মাত্রায় উপনিবেশ এবং ঔপনিবেশিক বাজারগুলোর শোষণ উন্নত দেশগুলোর হাতে অপরিমিত পুঁজির সম্ভার এনে দেয়। সুতরাং, এই উদ্বৃত্ত পুঁজি লগ্নী করার জন্য নতুন নতুন পথ খুঁজে ব্যয় করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু পুঁজি লগ্নী করার মাধ্যমে মূলধনের মালিকগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার সুযোগ খুঁজতে শুরু করেন। স্বদেশীয় শিল্পের পুঁজি লগ্নী করে সেখানকার শ্রমজীবীদের শক্তি ও আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি না করে ঐ পুঁজি অন্যত্র খনিজ এবং কৃষিজ কাঁচামাল উৎপাদনের কাজে [illegible] লগ্নী করে বিদেশের [illegible]

পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অপরদিকে স্থানীয় শ্রমিকদের দুর্বল করে রাখার নীতি গ্রহণ করেন। ফলে উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগের সুব্যবস্থা করা এবং অনুন্নত দেশগুলোতে নামমাত্র অর্থব্যয় করে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের সুযোগ পাওয়া সম্ভব হত। এমন কি, নিজেদের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যেসব কাঁচামালের প্রয়োজন তার সরবরাহও অটুট রাখা সম্ভব হয়।

কিন্তু এই সময় পশ্চিম দুনিয়ার উন্নত দেশগুলোর রাজনীতিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিলে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর শাসকশ্রেণী খুব বিব্রত হয়ে পড়ে। পুঁজিপতি ও শাসকশ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের মূলত কোন পার্থক্য না থাকায় তথাকথিত উন্নত দেশগুলোতে প্রায় অভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পশ্চিম ইয়োরোপের প্রায় সব দেশে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক চেতনা খুবই প্রবল হয়ে ওঠে। প্রায় সকল দেশেই মজুর এবং কৃষকগণ ভোটের অধিকার লাভ করায় শাসকশ্রেণী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের ধারণা হয় যে, মজুর ও কৃষকরা নিজেদের স্বার্থে এই অধিকার ব্যবহার করে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ ধ্বংস করার চেষ্টা করবে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের গৌরব প্রচার এবং ঐশ্বর্যের মোহ সৃষ্টি করে তাঁরা জনসাধারণের ভাবাবেগ পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করে। এই ব্যাপারে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি দেশের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ নীতিকে কোন না কোন কাল্পনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা শুরু করে। শ্বেতকায় জাতিগুলো নিতান্ত বাধ্য হয়েই যে কৃষ্ণকায় জাতির বোঝা বহন করতে স্বীকৃত হয়েছে এরূপ মনোভাব সর্বদাই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হত। সাম্রাজ্যবাদের মহত্ত্ব প্রচার করে পূর্বেকার শাসকবর্গই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও শাসন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার সুযোগ পেতে থাকে।

উপরি-উক্ত ঘটনাপ্রবাহ ও পরিবর্তন অবধারিতভাবে একটি মাত্র পরিণতি লাভ করে। প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ নিজ উপনিবেশ ও আধাউপনিবেশে অতিরিক্ত অর্থ লগ্নী করে কাঁচামাল ও বাজারের উপর একচেটিয়া অধিকার রক্ষা করার চেষ্টা করে। তা ছাড়া, নতুন উপনিবেশ ও আধাউপনিবেশ স্থাপনের সম্ভাবনা আর না থাকায় নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তিক্ত এবং তীব্র হয়ে ওঠে। এমন কি, পুরাতন উপনিবেশ ও আধাউপনিবেশগুলোকে নতুন ভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করার জন্যও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের সূত্রপাত হয়।

(২) ভারতে ব্রিটিশ নীতি :

এরূপ পরিস্থিতিতে গ্রেট ব্রিটেনকে প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপের সম্মুখীন হতে হয়। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে নবাগত ধনতান্ত্রিক দেশগুলো বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের আধিপত্যকে আক্রমণ করতে শুরু করে। সুতরাং নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যই ব্রিটিশ তার সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্যের বন্ধন আরও দৃঢ় করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ব্রিটেনের এই নীতি ভারতের শাসনক্ষেত্রেও স্পষ্টভাবে দেখা

দেয়। ভারতে ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতিনিধি লিটন, ডাফরিন, ল্যান্সডাউন, কার্জন প্রভৃতি শাসকের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে এই মনোভাব খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সারা পৃথিবীতে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়ে ভারতকেই তাঁরা ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগের প্রধান স্থান রূপে মনে করতে শুরু করেন। ফলে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের পরে ব্রিটিশ পুঁজির একটি বৃহৎ অংশ রেলপথ নির্মাণ ও সরকারকে ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া, চা-বাগান, কয়লা খনি, পাটকল, জাহাজের ব্যবসা, বাণিজ্যিক লেন-দেন এবং ব্যাঙ্কে প্রচুর পরিমাণে লগ্নী করা হয়। অপরদিকে, অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকট থেকে এই পুঁজিকে নিরাপদ রাখার জন্য ভারতের উপর ব্রিটিশ শাসনকে আরও দৃঢ় করে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই প্রয়োজনীয়তার কথা তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও রাজনীতিবিদগণ স্বীকার করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তা ছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের চক্রান্তের ফলে ভারতকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। আফ্রিকা ও এশিয়ায় ব্রিটিশ অধিকার বিস্তার ও সুদৃঢ় করার কাজে ভারতীয় সেনাবাহিনীই ছিল প্রধান সম্বল। ফলে ভারতীয় বিশাল সেনাবাহিনীর ব্যয় ভারতের রাজস্ব থেকেই বহন করা হত এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মোট রাজস্বের প্রায় ৫২ শতাংশ এই খাতে ব্যয় করা হত। এমন কি, এই সময় স্বায়ত্ব শাসনের কাজে ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তোলার জন্য যেসব আলোচনা শুরু হয়েছিল তাও তখন বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশ শাসক ও রাজনীতিবিদগণ প্রচার করতে শুরু করেন যে, ভৌগোলিক, জাতিগত, ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অনেক কারণে ভারতীয়গণ স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে অনুপযুক্ত, সুতরাং আরও বহু দিন যাবৎ ব্রিটিশ সরকারই তাদের জন্য 'সভ্য' ও 'সহৃদয়' শাসনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবে। নিজেদের শাসনক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই সময় ব্রিটিশ সরকার পুরোপুরিভাবে রোমের নীতি অনুসরণ করে 'বিভাজন ও শাসন নীতি' (Policy of divide and rule) ভারতে কার্যকরী করার চেষ্টা করে এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি জোরদার করে তোলার ব্যবস্থা করে।

(৩) অর্থনৈতিক শোষণের রূপান্তর :

নিজেদের অধিকার আরও দৃঢ় করে তোলা ও অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই সময় ভারত ও ভারতীয় সমাজের প্রতিটি স্তর ব্রিটিশ শাসনের আষ্টেপাশে আবদ্ধ করার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর লাভের জন্য ভারতের প্রত্যেকটি বন্দর, প্রত্যেকটি শহর, প্রত্যেকটি গ্রামকে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করা ভারতের রাজস্ব বিভাগের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ ভারতের মতো দরিদ্র দেশে কর বৃদ্ধি করে সরকারী আয় বাড়ানোর নীতিও ব্রিটিশ সরকার সমর্থন করতে পারে নি, কারণ তাতে গণবিদ্রোহ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা কোন ক্রমেই অমূলক নয়। ফলে নিজেদের স্বার্থের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হন। তবে,রেল

ও জল পথে ভারতের বিভিন্ন স্থান যুক্ত করে যতদূর সম্ভব ভারতের অর্থনীতিতে তাঁরা অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করেন। আবার একই সঙ্গে ব্যয়বহুল শাসনতান্ত্রিক ও সামরিক কাঠামোর অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ব্যয়ের বোঝা মাথায় নিয়ে শিক্ষা, সেচ-ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা ও আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উন্নতিসাধনের দায়িত্ব বহন করার মতো ক্ষমতা ভারতের ছিল না। সুতরাং ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের নীতির মধ্যে এখানে অসঙ্গতি দেখা দেয়। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ উন্নতির প্রয়োজন উপলব্ধি করলেও আর্থিক অনটনের জন্য তা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অপর দিকে, ভারতকে আধুনিকীকরণের ফলাফল কি হতে পারে সে সম্পর্কেও তাঁদের স্পষ্ট ধারণা ছিল, কারণ তাঁরা জানতেন যে, আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সামাজিক শক্তি দ্রুত বলীয়ান হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধিতা শুরু করবে। সুতরাং ব্রিটিশ শাসকগণ এরূপ সংকটের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যেই ভারতে আধুনিকীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করার পরিবর্তে কঠোর সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করার পক্ষপাতি ছিল।

(৪) উপসংহার :

ব্রিটিশ শাসনের ফলে উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বেই ভারত একটি উপনিবেশে পরিণত হয়। ভারত ছিল ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয় প্রধান কেন্দ্র, কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য আহরণের পক্ষে প্রশস্ত উৎস এবং ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হলেও কৃষি ও কৃষকের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে শাসকগোষ্ঠী কৃষির উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করে রাজস্ব বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করতেন। পরিবহন ব্যবস্থা, খনিজ সম্পদ, কলকারখানা, বৈদেশিক বাণিজ্য, নদী ও সামুদ্রিক বন্দর, উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থাপনা, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি সবকিছুই বিদেশী মালিকগোষ্ঠীর করায়ত্ত ছিল। হাজার হাজার ইংরেজ কর্মচারী ভারতে জীবিকা সংস্থান করার সুযোগ পেত এবং তাদের বেতনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ভারতের কোষাগার থেকে সংগ্রহ করা হত। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পরও এইসব কর্মচারীর পেনসনের দায়িত্ব ভারতের বহন করতে হত। ভারতীয় অর্থেই দেশীয় রাজন্যবর্গের দরবারে ব্রিটিশ প্রেসিডেন্ট এবং ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের ব্যবস্থা করা হত। এই খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার জন্য ভারতের রাজস্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় হয়ে যেত। বহুদূর বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে অক্ষুন্ন রাখার কাজের প্রধান সহায়ক ছিল ভারতীয় সৈন্যবাহিনী। পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়ায় এবং উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা ও বৃদ্ধি করায় তাদের ভূমিকাই ছিল সর্বপ্রধান। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসকদের শোষণে ভারত নিঃশেষিত হলেও ভারতের অর্থবল ও সামরিক শক্তির সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে কঠোর সাম্রাজ্যবাদ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

Q. 24. Account for the growth of Communalism in India by the first decade of the 20th century.

Ans. (১) ভূমিকা :

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই সর্বস্তরের মুসলমান জনগণ এক অভূতপূর্ব সংকটের সম্মুখীন হয়। একদিকে মুসলিম সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে দারুণ অর্থনৈতিক সমস্যায় বিব্রত হয়ে পড়ে এবং অপরদিকে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে এই সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে। সরকারী ও বেসরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন এই সমস্যা মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড আঘাত করে ; কারণ ইংরেজ শাসকদের প্রতি তীব্র বিরূপতার জন্যই মুসলিমগণ ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। ব্রিটিশ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে এবং দেশীয় কুটির শিল্পের বিনাশ ঘটায় মুসলমান বণিক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় অর্থনৈতিক দুর্দশায় নিমজ্জিত হয়। সুতরাং ব্রিটিশ শাসন সকল স্তরের মুসলমান জনগণের জীবনে এক সংকটময় অধ্যায়ের সূচনা করে। ফলে ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই মুসলমান সমাজের মনে ব্রিটিশ বিরোধী প্রবণতা দেখা দেয়। সে জন্য তারা ইংরেজি শিক্ষা ও প্রশাসন থেকে নিজেদের দূরে রাখতে চেষ্টা করে। অপরদিকে,ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ফলে হিন্দু সমাজ খুব উপকৃত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনা ও চেতনা সঞ্চার করে এবং তথাকথিত নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে অনগ্রসর হয়ে পড়তে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি প্রবর্তন ভারতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের উপর বিপরীত ধর্মী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

(২) মুসলিমদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব :

এই সময় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় তারা ব্রিটিশ শাসনের সমর্থকে পরিণত হয়। অপরদিকে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের উদ্ভব ঘটে। এই ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবই মুসলিম সমাজকে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। দিল্লীর শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইসলাম ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুল আজিজ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে বেরিলির সৈয়দ আহম্মদের পরিচালনায় মুসলিম সমাজে ওয়াহাবি আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। সৈয়দ আহম্মদের পাটনায় বসবাসকারী দুই অনুচর বেলায়েত আলি ও এনায়েত আলি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সামগ্রিক যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ১৮৭০-৭১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ওয়াহাবি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই সময় পূর্ববঙ্গে ফরিদপুরের দুদুমীর এবং পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণায় বারকেলবেড়িয়ায় তিতুমীর ফরাজি আন্দোলন শুরু করেন। ফলে দলে মুসলমান কৃষক শ্রেণীর লোকেরা এই

আন্দোলনে যোগ দেয়। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই আন্দোলনও দমন করে। প্রকৃতপক্ষে ওয়াহাবি ও ফারাজি আন্দোলনের মধ্যে মুসলমান সমাজের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়।

তবে কেবলমাত্র সাধারণ মুসলমানগণই ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পোষণ করত না, অভিজাত এবং শিক্ষিত মুসলমান সমাজেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মামুদ আল হাসানের নেতৃত্বে দেওবন্দ গোষ্ঠী সিপাহী বিদ্রোহের সময় প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতা শুরু করেন। এই বিদ্রোহের সময় ভারতের প্রায় সর্বত্রই এই মুসলিমগণ ইংরেজ বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দেয় এবং ব্রিটিশ সরকারও বিদ্রোহের পরবর্তীকালে মুসলমানদের সম্পর্কে খুব সতর্কতার সঙ্গে কঠোর নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে।

(৩) ব্রিটিশ সম্পর্কে মনোভাবের পরিবর্তন :

কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর ব্রিটিশ বিরোধী প্রবণতা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে। ব্রিটিশের দমন নীতির ফলে মুসলমান সমাজ বুঝতে পারে যে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে ভারত থেকে উৎখাত করা অসম্ভব। সুতরাং মুসলমান সমাজ, বিশেষ করে উচ্চবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য ও সহযোগিতার নীতি গ্রহণে উদ্যত হয়। অপরদিকে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সূত্রপাত হওয়ায় ব্রিটিশ শাসকবর্গ মুসলমান সমাজের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়োর নির্দেশে সরকারী কর্মচারী মিস্টার হাণ্টার মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। এবং ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর **The Indian Musalmans** গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি দেখান যে, ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলমানগণই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল এবং ব্রিটিশ শাসকদের আমলেই হিন্দুগণ নানা সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে এবং অন্যদিকে মুসলমানদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য তিনি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের নির্দেশ দেন। হাণ্টারের বক্তব্য শিক্ষিত মুসলমানদের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অপর দিকে, হাণ্টারের সুপারিশ অনুসারে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে মুসলমান সমাজ ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

(৪) সৈয়দ আহম্মদের কৃতিত্ব :

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের ভিত্তিতে মুসলমান সমাজের মধ্যে নতুন চেতনা সঞ্চারের জন্য যাঁরা ব্রতী হন স্যার সৈয়দ আহম্মদ তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। সৈয়দ আহম্মদ প্রথম দিকে কোনও প্রকার রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল মুসলমান সমাজ নিজের স্বার্থেই কোন প্রকার রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন করবে না। তবে মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রথমে ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে একটি 'ট্রানস্লেশন সোসাইটি' এবং পরে 'সায়েন্টিফিক

সোসাইটি অফ আলিগড়' স্থাপন করেন। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে আলিগড়ের অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করা। এই কলেজই পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং মুসলমান সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার ও রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সৈয়দ আহম্মদ নিজে স্বদেশপ্রেমিক হলেও তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। সুতরাং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'মহমেডান এডুকেশনাল কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে এই সংস্থা 'মহমেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' নামে পরিচিত হয়। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে 'ইউনাইটেড প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েসন' স্থাপন করেন। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করা। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহম্মদ 'মহমেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন করেন। চারটি উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংস্থাটি গঠিত হয় এবং উদ্দেশ্যগুলোতেই স্যার সৈয়দ আহম্মদের চিন্তাধারার আদর্শ সুন্দর ভাবে প্রকাশ করে। এগুলো হল, (১) মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা; (২) ব্রিটিশ শাসনকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য বিভিন্ন সরকারী ব্যবস্থা সমর্থন করা; (৩) জনগণের মধ্যে আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি করা এবং (৪) মুসলমান সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবণতা বিনষ্ট করা। প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ আহম্মদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের দুটি প্রধান দিক ছিল—প্রথমতঃ, মুসলমান সমাজের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা; দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু প্রভাবিত জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা ও কংগ্রেসের প্রভাব থেকে মুসলমান সমাজকে দূরে রাখা। এইভাবে তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং হিন্দু মুসলমান দুটি পৃথক জাতি ও তাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী—অর্থাৎ সংক্ষেপে দ্বিজাতি তত্ত্বের বীজ বপন করেন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বরে তাঁর প্রসিদ্ধ লক্ষ্ণৌ ভাষণে কংগ্রেস বিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভাষণে তিনি তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন: (১) ভারতে দুটি বিভিন্ন জাতি বসবাস করে: (২) স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তা মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে, কারণ এই শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাই ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য পাবে এবং (৩) নিজ স্বার্থের জন্য মুসলমানদের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া উচিত।

(৫) সরকারী ও বেসরকারী ব্রিটিশদের প্রচেষ্টা:

অনেকে মনে করেন যে, সৈয়দ আহম্মদ কংগ্রেস বিরোধিতা সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এবং আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিওডোর বেক উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্নর অকল্যাণ্ড কলভিনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই বিশ্-

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্বেই ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি হিন্দু-মুসলমান সৌভ্রাতৃত্বের বিরোধিতা করেন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানান। তবে এ কথা ঠিক যে, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ঐ সংস্থা সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

আলিগড় কলেজের কর্তৃপক্ষ ছাড়াও ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত নীতি এই বিভেদপন্থী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অনুকূল পরিবেশ রচনা করে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ব্রিটিশ শাসকবর্গ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠী ও জাতির ভিত্তিতে বিভক্ত করার চেষ্টা করেন। সামরিক ও বেসামরিক উভয় দিকেই নিয়োগ ক্ষেত্রে বিভাজন নীতি প্রযোজ্য হয়। হান্টারের রচনাও এই বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট প্রভাবিত করে। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী মুসলমানদের অনুগত শ্রেণীতে পরিণত করার জন্য তোষণ নীতি গ্রহণ করতে শুরু করেন। তাঁদের ধারণা হয় যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য ব্রিটিশ শাসন সুরক্ষিত করে তুলবে। সুতরাং দেখা যায় যে, আলিগড় কলেজ থেকে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতি ও ব্রিটিশ শাসকদের মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সাম্প্রদায়িক ভেদ নীতি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে।

(৬) রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের চেষ্টা :

সৈয়দ আহম্মদের প্রচারিত হিন্দু বিরোধী আদর্শ ও জাতীয়তাবাদ বিরোধী কর্মসূচী মুসলমান সমাজকে কংগ্রেস থেকে নিঃসন্দেহে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে সমর্থ হয়। ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কংগ্রেসে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলেও ১৮৯৩ থেকে তা আবার হ্রাস পেতে শুরু করে। অপরদিকে স্যার সৈয়দ আহম্মদ মুসলমান সম্প্রদায়কে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হয় নি। নবাব মহসিন-উল-মুলক, বিখার-উল-মুলক, আগা খান প্রভৃতি মুসলিম নেতৃবর্গ মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠনে উদ্যোগী হন। এই সংস্থা গঠনের তিনটি মূল উদ্দেশ্য ছিল : (১) সরকারের নিকট মুসলমান জনগণের মনোভাব উপস্থাপন, (২) ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত রাখার জন্য প্রচারকার্য পরিচালনা এবং (৩) কংগ্রেসের রাজনীতি থেকে মুসলমান জনগণকে বিচ্ছিন্ন রাখার ব্যবস্থা করা।

(৭) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া :

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মুসলমান সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের চেষ্টা সক্রিয় হয়ে ওঠে। লর্ড কার্জন প্রধানতঃ কলকাতা থেকে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করে তোলা এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে পরিপুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে লিয়াকৎ হোসেন, আবদুল রসুল প্রমুখ মুসলিম নেতৃবর্গ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেও স্বদেশী আন্দোলন প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে মুসলমান সমাজের ক্রমশঃ

এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে যায়। প্রকৃত পক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের সময় একদিকে হিন্দুধর্ম ও আদর্শের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় মুসলমান জনগণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে মুসলিম শীর্ষস্থানীয় অনেকেই বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে মুসলমানদের জনমত সংগঠনের চেষ্টা শুরু করেন। তাদের মধ্যে ঢাকার নবাব সলিম উল্লাহর কর্মতৎপরতা এবং কলকাতার মহমেডান লিটারেরি সোসাইটির কার্যকলাপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জমিদার ও মুসলিম কৃষকদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ যে অর্থ নৈতিক সংঘর্ষ দেখা দেয়, স্বার্থান্বেষী মুসলমান নেতৃবর্গের প্রচেষ্টায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের রূপ গ্রহণ করে এবং পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে। তা ছাড়া, মূলত হিন্দু নেতৃবর্গের দ্বারা পরিচালিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শক্তি খর্ব করার জন্য ।ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠেন।

(৮) সিমলা সাক্ষাৎকার ঃ

ইতিমধ্যে মুসলমান জনসমষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। এই ব্যাপারে আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ আর্কিবল্ড এবং সম্পাদক মহসিন-উল-মুলক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন স্তরের ব্রিটিশ রাজকর্মচারিগণ ও মুসলমান নেতৃবর্গের সঙ্গে লর্ড মিন্টোকে সাক্ষাৎ করার জন্য পরামর্শ দেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে পঁয়ত্রিশ জন সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল সিমলায় বড়লাট মিন্টোর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং একটি দাবিপত্র পেশ করেন। এই দাবিপত্রের মূল বক্তব্য ছিল—সরকারের সামরিক ও বেসামরিক চাকরীর ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক মুসলমানদের নিয়োগ, পৌরসভা এবং জেলা পরিষদগুলোতে মুসলমানদের নিয়োগ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভাগুলোতে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি। লর্ড মিন্টো প্রতিনিধি দলের প্রস্তাবগুলো সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেন। তিনি মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব কার্যকরী করার এবং একটি পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। সিমলার এই সাক্ষাৎকারের দুটি সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: (১) ব্রিটিশ সরকার এই নেতৃবর্গকে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি রূপে স্বীকৃতি দেন এবং (২) মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস এবং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচনের নীতি গ্রহণ করার ফলে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে একটি পৃথক জাতির মর্যাদা দেওয়া হয়।

সিমলা সাক্ষাৎকারের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে সমসাময়িক মুসলমান নেতৃবৃন্দ, বৃটিশ রাজকর্মচারীগণ এমন কি,জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী এবং নরমপন্থী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কেউই সচেতন ছিলেন না। কিন্তু এই সম্মেলনের গুরুত্ব খুবই

তাৎপর্যপূর্ণ—কারণ এই সম্মেলনের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ছয়কোটি মুসলমানকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে এনে ব্রিটিশ শাসনের সমর্থকে পরিণত করতে সমর্থ হয়। তা ছাড়া, এই সাক্ষাৎকারের পরেই মুসলিম নেতৃবর্গ একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত হন এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

(গ) মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা :

মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের ব্যাপারে ঢাকার নবাব সলিম উল্লা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় মহমেডান শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বিখার-উল-মুলক মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং হাকিম আজমল খান এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। ফলে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং ঐ সভায় মুসলীম লীগের চারটি মূল লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করা হয়। এগুলো হল : (১) মুসলিম লীগের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য সুনিশ্চিত করা এবং সরকারী বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে মুসলমানদের মনে কোনরূপ সন্দেহ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে না দেওয়া ;

(২) মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা এবং মুসলমানদের মনে কোনরূপ সৃষ্টি হতে না দেওয়া ;

(৩) জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিপত্তি হ্রাস করা ; এবং

(৪) উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলো কোনমতে ক্ষুণ্ণ না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের, সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখা। এই সময়ে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক মিত্রতা সম্ভব হলেও কোনপ্রকার রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপন সম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির উপর গঠিত মুসলিম লীগ অনতিবিলম্বে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রধানকেন্দ্রে পরিণত হয়।

Q. 25. What role did Hume play in the foundation of the National Congress.

Ans. ভূমিকা :

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব সম্পর্কে নানাবিধ মতামত প্রচলিত আছে। ডক্টর পট্টভি সীতারামাইয়ার মতে অবসর প্রাপ্ত ব্রিটিশ সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাফরিনের আনুকূল্যে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। অপরদিকে, জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় লর্ড ডাফরিনের মুখ্যভূমিকা ছিল, কারণ মিস্টার হিউম শুধুমাত্র সামাজিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি সর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে মনস্থ করেন কিন্তু ডাফরিন একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং হিউম তাঁর প্রস্তাব অনুসারে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তৎকালীন চিঠি-পত্র, অন্যান্য তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে, লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে মিস্টার

হিউমের সম্পর্ক আদৌ সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না এবং ডাফরিন হিউমের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার কঠোর সমালোচক ছিলেন। তা ছাড়া, ডাফরিন জাতীয় কংগ্রেসকে প্রথম থেকেই সন্দেহের চোখে দেখতেন। তবে এ কথা ঠিক যে, হিউম কংগ্রেসের পরিকল্পনা নিয়ে ডাফরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কিন্তু ডাফরিন এইরূপ সংস্থা গঠনে তাঁকে কোন উৎসাহ দেন নি বা সাহায্য করেন নি। সুতরাং মিস্টার হিউম যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভিত্তি স্থাপন করেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

(২) হিউমের উদ্দেশ্য :

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূলে মিস্টার হিউমের কি উদ্দেশ্য ছিল এই সম্পর্কেও নানা-রূপ বিভিন্ন মত দেখা যায়। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী মিস্টার হিউম উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে ভারত সরকারের সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময় সরকারীগোপন নথিপত্র অনুসন্ধান করে হিউম ভারতবাসীর অসহনীয় অবস্থার কথা জানতে পারেন। তদানীন্তনভারতের পরিস্থিতি তাঁর নিকট উত্তেজনাপূর্ণ ও নৈরাশ্যজনক বলে বিবেচিত হয় এবং তিনি মনে করেন যে, অবস্থার উন্নতি না ঘটলে জনগণের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ হিংসাত্মক কার্যকলাপে রূপান্তরিত হবে। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য দ্রুত কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এইরূপ চিন্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েই হিউম নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতবাসীর সমস্যা সমাধানের জন্য জনমত গঠনের যন্ত্র হিসাবে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে তিনি সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা মার্চ কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি দেশের অগ্রগতি সাধনে শিক্ষিত সমাজের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন এবং ভারতের জনগণের মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য একটি স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য পরামর্শ দেন। পরে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে ভারতে একটি জাতীয় সংগঠন স্থাপন করার পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তাঁর মতে, এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান ভারতবাসীর নানা অভাব-অভিযোগ ব্রিটিশ সরকারের নিকট তুলে ধরতে এবং জনমত গঠন করতে সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে তিনি গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ঐ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। ডাফরিনেরও ধারণা হয় যে, ঐরূপ একটি সংস্থার মাধ্যমে সরকার পক্ষ ভারতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার সুযোগ পাবে এবং ফলে ব্রিটিশ শাসকগণ উপকৃত হবেন। ইংলণ্ডে গিয়ে হিউম সেখানকার কয়েকজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁরাও এই পরিকল্পনার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। অবশেষে স্থির হয় যে, ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পুণে শহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হবে। ইতিমধ্যে হিউম ভারতীয় জাতীয় ইউনিয়ন নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জাতীয় ইউনিয়নের সদস্যদের ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্থাগুলোর সদস্য-

বৃন্দকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে আহ্বান করেন। কিন্তু এই সময় পুণেতে কলেরা দেখা দিলে অধিবেশন বোম্বাই শহরে স্থানান্তরিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মাত্র বাহত্তর জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও আড়ম্বরহীনভাবে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়।

কিন্তু মিস্টার হিউম কোন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন সে বিষয়ে সমকালীন ও পরবর্তী কালের লেখকদের মধ্যে মতানৈক দেখা যায়। এই সম্পর্কে প্রচলিত মত হল যে, ভারতের তৎকালীন শোচনীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারকে নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে ভারতের রাজনৈতিক অসন্তোষ যাতে হিংসাত্মক না হয়ে নিয়মতান্ত্রিক পথে প্রবাহিত হয় হিউম তার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ হিউম সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন যাতে কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে এক নিরাপদ ভালভের (safety valve) কাজ করে। মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক রজনীপাম দত্ত এই মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্বের ফলে সৃষ্ট এবং একটি গোপন ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি। এই সংস্থা গঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর ক্রমবর্দ্ধমান ব্রিটিশ-বিরোধী বিক্ষোভের হাত থেকে ব্রিটিশ শাসনকে সুরক্ষিত করতে সচেষ্ট হন। বিক্ষুব্ধ জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা যাতে বিক্ষুব্ধ কৃষকসমাজের সঙ্গে হাত মেলাবার সুযোগ না পান তাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। "......the National Congress was in fact brought into being through the initiative and under the guidence of direct British Governmental patronage a plan secretly pre-arranged with the Viceroy as an intended weapon for safeguarding. British rule against the rising forces of popular unrest and anti-British feeling." রজনীপাম দত্ত মনে করেন, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশ সরকার একটি অবশ্যম্ভাবী বিদ্রোহ নিবৃত্ত করতে সমর্থ হয়। তিনি আরও বলেন যে, 'এই আন্দোলনের পিছনে যাঁরা প্রাথমিক প্রেরণা জুগিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে আর অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। তৎকালীন উত্তেজনা উত্তরোত্তর তীব্র চরমপন্থী রূপ ধারণ করে। এই তীব্র বিক্ষোভ ও উত্তেজনা যাতে প্রকাশ্যে চরমতর রূপ গ্রহণ করার সুযোগ না পায়, সেজন্য প্রয়োজন ছিল তাকে নিয়মতান্ত্রিক শৃঙ্খলার পথে পরিচালিত করা।' অন্যদিকে ডক্টর এস. আর. মেহরোত্র এবং অন্যান্য আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, হিউম কোন ষড়যন্ত্রের মনোভাব নিয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন নি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে তিনি ভারতীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করার জন্য শান্তিপূর্ণ সাংবিধানিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেন। মিস্টার মেহরোত্র মনে করেন যে, কংগ্রেসের উপর হিউমের অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং এই সংস্থার কার্যকলাপকে তিনি জাতীয় আন্দোলন বলে আখ্যা দেন।

(ঙ) সমালোচনা :

হিউম যে উদ্দেশ্য নিয়েই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করুন না কেন, ভারতীয় জনগণও এই সময় একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার দশ বছর পূর্বেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সচেতনতা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আহূত জাতীয় সম্মেলনকে কংগ্রেসের পূর্বাভাস বলা যেতে পারে। এই সময় ভারতের অন্যান্য প্রান্তে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়ে ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সর্বভারতীয় সংস্থা গঠনের মনোভাব প্রকাশ পেতে শুরু করে। তাঁরা ছিলেন এক নতুন সামাজিক শক্তির প্রতিনিধি, ব্রিটিশের স্বার্থে ভারতকে যে ভাবে শোষণ করা হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাঁদের কার্যকলাপের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। তাঁরা তখন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করেন যার মাধ্যমে ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতির জন্য সংগ্রাম করা সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা আদি পর্বেই সরকারী রোষে পড়ে যাতে ধ্বংস হয়ে না যায় সেজন্য তাঁরা হিউমের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সানন্দে প্রস্তুত হন। তাঁরা ভেবেছিলেন হিউমের মতো একজন অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীর সাহায্য যদি পাওয়া যায় তা হলে সরকারী মহলে তাঁদের সম্পর্কে সন্দেহের বিশেষ কোন কারণ থাকবে না। সুতরাং যদি হিউম কংগ্রেসকে সেফটি ভালভ হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন তা হলে তদানীন্তন ভারতীয় নেতৃবর্গও হিউমকে লাইটনিং কণ্ডাক্টর বা বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দণ্ড রূপে ব্যবহার করতে পারবেন বলে আশা করেন। তদানীন্তন নেতৃবর্গও যে এই সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তা গোপালকৃষ্ণ গোখলের বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়। তিনি ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে লিখলেন, "কোন ভারতবাসীর পক্ষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না।……এই ধরনের সর্বভারতীয় আন্দোলনে কোন ভারতীয় যদি অগ্রসর হতেন, তা হলে সরকার নিশ্চয়ই তার বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিত। রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে সরকারের সন্দেহ তখন এত তীব্র ছিল যে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা যদি একজন বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত প্রাক্তন ইংরেজ রাজকর্মচারী না হতেন, তা হলে কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে যে কোন উপায়ে এ উদ্যোগ দমন করতেন। সুতরাং যে উদ্দেশ্যেই মিস্টার হিউম জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করুন না কেন, তাঁর অবদান ও কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

Q. 26. Give a critical estimate of the achievements of the early Congress.

Ans. ভূমিকা :

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আদিপর্বে যাঁরা নেতৃত্ব করেন তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অনুকূল ঐতিহাসিক পরিস্থিতি তখনও সৃষ্টি হয় নি। সুতরাং তাঁদের প্রধান প্রচেষ্টাই ছিল জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করা এবং সেই চেতনাকে দৃঢ় করে তোলা। তাঁদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জনসাধারণকে যুক্ত করা এবং রাজনৈতিক সাফল্যে জনগণকে সুনিশ্চিত করে তোলা। রাজনৈতিক বিষয়ে জনসাধারণের কৌতূহল সৃষ্টি করে দেশব্যাপী জনমত গঠন করাও এই কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। তদানীন্তন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিল নবজাগ্রত জনমতের সর্বভারতীয় চরিত্র প্রতিফলিত করার জন্য সামগ্রিকভাবে দেশের ভিত্তিতে জনসাধারণের দাবিগুলোকে সুসংবদ্ধ করা। কিন্তু সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল রাজনৈতিক-সচেতন নেতৃবৃন্দ, কর্মীগণ ও জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়ঐক্যবোধ সৃষ্টি করা। সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনা তখন সবেমাত্র রূপ নিতে শুরু করেছে সুতরাং জাতীয়তাবোধকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন ছিল। জাতি-ধর্ম-অঞ্চল নির্বিশেষে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনা গড়ে তোলার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জাতীয়তাবাদী কর্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে জাতীয় কংগ্রেস এই ঐক্যবোধকে বিকশিত করে তোলার পথ সুগম করে। জাতীয় ঐক্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়েই সে যুগের কংগ্রেস অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি উত্থাপন করতে শুরু করে।

(২) অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন দাবি :

প্রথম দিকের জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁদের সমালোচনা। ব্রিটিশ অর্থ নৈতিক সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ তাঁরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন এবং বাণিজ্য, শিল্প ও মূলধনের ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর একাধিপত্য স্থাপনের গুরুত্ব তাঁরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন। ভারতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কার্যকরী করার জন্য ব্রিটিশ সরকার তিনটি পথ অবলম্বন করে : (১) ভারতকে কাঁচামালের সরবরাহক রূপে পরিণত করা ; (২) ভারতকে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার রূপে ব্যবহার করা এবং (৩) ভারতকে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিণত করা। ব্রিটিশের এই সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াসের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন। ঔপনিবেশিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে যেসব অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত তার বিরুদ্ধেও তাঁরা সংগঠিত আন্দোলন শুরু করেন। ব্রিটেনের নিকট ভারতের অর্থনৈতিক অধীনতা হ্রাস করা, এমন কি, অর্থনৈতিক অধীনতার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য তাঁরা আন্দোলন সংগঠন করেন। এই যুগের জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ তাঁদের রচনায় ও বক্তৃতায় ভারতের জনগণের ভয়াবহ দারিদ্র্যের চিত্র তুলে ধরে প্রমাণ করেন যে, ব্রিটেনের শোষণের ফলেই ভারত এইরূপ শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। তা ছাড়া, দেশের পুরাতন শিল্পের ধ্বংস সাধন এবং আধুনিক শিল্প বিকাশের পথ শাসকবর্গ যেভাবে রুদ্ধ করার চেষ্টা করেন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ তারও তীব্র সমালোচনা করেন। ভারতের রেলপথ, চা-বাগিচা, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ করার নীতিরও তাঁরা নিন্দা করেন। তাঁরা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারেন যে, বিদেশী মূলধন আমদানির ফলে দেশীয় শিল্প বিকাশের পথ একদিকে যেমন

রুদ্ধ হবে অপরদিকে ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর বিদেশীদের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁরা বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা বন্ধ করার চেষ্টা করেন। দ্রুত ভারতীয় শিল্প প্রসারের জন্য তাঁরা রাষ্ট্রীয় সাহায্য এবং রক্ষাত্মক শুল্কনীতি গ্রহণের জন্যও সরকারের নিকট আবেদন জানান। এমন কি, শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার যথাযথ সম্প্রসারণও তাঁরা সরকারের দায়িত্ব বলে বিবেচনা করতেন। ভারতে আমদানি করা পণ্যের উপর শুল্ক রহিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছিলেন জাতীয়তাবাদীরা ১৮৭৫ থেকে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা করেন। ভারতে প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। বিদেশী কাপড় বর্জন ও আগুনে পোড়াবার কর্মসূচীও কোন কোন স্থানে গৃহীত হয়।

অর্থনৈতিক সমস্যার আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীগণ আন্দোলন শুরু করেন। ভূমি রাজস্বের হার হ্রাস করার জন্য তাঁরা দাবি করেন। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত কৃষি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের সুলভ হারে ঋণ দেওয়া এবং ব্যাপক ভাবে সেচব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য সরকারের কাছে দাবি পেশ করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আধাসামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা বজায় রাখার প্রচেষ্টাকেও তাঁরা তীব্র সমালোচনা করেন। চা ও কফি বাগিচার শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্যও তাঁরা আন্দোলন শুরু করেন। তৎকালীন রাজস্ব ব্যবস্থা এবং সরকারের ব্যয়-নীতির আমূল পরিবর্তনের জন্য তাঁরা দাবি জানান। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের দুর্দশার মাত্রা হ্রাস করার জন্য তাঁরা কয়েকটি শুল্কের হার পরিবর্তন দাবি করেন। এই দাবির মধ্যে লবণ শুল্কের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূল সৈন্য বিভাগের বিপুল ব্যয় হ্রাসের জন্যও তাঁরা দাবি উত্থাপন করেন। শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য রাজকোষের উপর অপ্রয়োজনীয় কিন্তু অতিরিক্ত আর্থিক চাপও তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জাতীয়তাবাদীরা যে তত্ত্বের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে মূর্ত করে তোলেন তা নির্গমন তত্ত্ব বা ড্রেন থিয়োরি (Drain Theory) নামে পরিচিত। এই তত্ত্বের মধ্যে তাঁরা প্রমাণ করেন যে, ভারতের অর্থ-সম্পদের একটি বৃহৎ অংশ বিভিন্ন পথে ভারত থেকে ব্রিটেনে চলে যায়। বিদেশী মূলধনের লভ্যাংশ, লগ্নীকৃত অর্থের সুদ, সামরিক-বেসামরিক অসংখ্য কর্মচারীর বেতন এবং পেন্সন রূপে এই নির্গমন অবিরত চলে। ভারতে শোষণের রূপ এই নির্গমনের মধ্যে খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। নির্গমন তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মূলে আঘাত করে এবং শোষণের স্বরূপ জাতীয় জনসাধারণের নিকট স্পষ্টভাবে দেখা দেয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে কেন্দ্র করে প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীরা যে আন্দোলন গড়ে

তোলেন তাতে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে একটি সর্বভারতীয় ধারণা গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। তা ছাড়া, ব্রিটিশ শাসনের পরোক্ষ সুফলের চেয়ে প্রত্যক্ষ কুফল যে অনেক বেশি এবং ব্রিটিশ শোষণই যে ভারতের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণ সে কথাও সর্বসাধারণের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(৩) শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি :

ব্রিটিশ সরকারের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের নীতি সম্পর্কেও জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ নির্ভীকভাবে সমালোচনা করতে শুরু করেন। দুর্নীতিপরায়ণ, ব্যয়বহুল এবং অযোগ্য শাসনব্যবস্থার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য তাঁদের দাবি খুব জোরদার হয়ে ওঠে। এই দাবিটি হল, সরকারের উচ্চপদগুলো ভারতীয়করণের প্রচেষ্টা এবং এর সঙ্গে নৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত ছিল। তবে অর্থ নৈতিক কারণই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশী কর্মচারীগণ উচ্চহারে বেতন পেতেন এবং বেতনের একটি বিরাট অংশ ইংলণ্ডে প্রেরিত হত বলে ভারতীয় অর্থ নির্গমনের পথ প্রশস্ত হত। তা ছাড়া, এইসব কর্মচারীরা ভারতীয়দের স্বার্থ অপেক্ষা বিদেশী শিল্পপতিদের স্বার্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। ফলে জাতীয়তাবাদী কর্মীদের মনে রাজনৈতিক ভাবে অসাম্যের কথা বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপর দিকে ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের অধীনে থাকার ফলে ভারতীয় কর্মচারীদের মনে হীনম্মন্যতা দেখা দেয় এবং নীতিগতভাবে তাদের মানসিক ক্ষতি হয়। অধঃস্তন কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জন্যও জাতীয়তাবাদী নেতাগণ দাবি করতে শুরু করেন। পুলিশ বিভাগের দুর্নীতি, সরকারী কর্মচারীর দুর্ব্যবহার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তাঁরা তীব্র আক্রমণ শুরু করেন। বিচার বিভাগের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিও তাঁরা শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। ভারতের রাজকোষের অর্থ যথেষ্টভাবে ব্যবহার করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধেও তাঁরা প্রতিবাদ জানান।

সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কারসাধন এবং জনকল্যাণমূলক কাজে ব্রিটিশ সরকারের ঔদাসীন্য স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা করার জন্য তাঁরা সরকারের নিকট দাবি উত্থাপন করেন। যোগাযোগের ব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধনের জন্যও তাঁরা ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাতীতাবাদীরা ভারতীয় শিল্পপতিদের কথা যত ভেবেছেন ভারতীয় শ্রমিকদের কথা তত ভাবেন নি। সম্ভবতঃ তাঁদের ধারণা ছিল যে, শিল্পপতিদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিজেরাই ভারতীয় শ্রমিকদের উন্নতি সাধনে সচেষ্টা হবেন।

প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্যও জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ চেষ্টা শুরু করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়, মরিশাস, ফিজি, পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রিটিশ গায়না প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্যও ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাগণ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের পরে

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যখন ভারতীয়দের মানবিক অধিকারের দাবিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় গণআন্দোলন গড়ে তোলেন জাতীয়তাবাদী নেতারা তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান।

(৪) নাগরিক অধিকারের জন্য আন্দোলন ঃ

বাক্‌-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা, রচনা ও প্রকাশনার স্বাধীনতা প্রভৃতি আধুনিক যুগে সকল সভ্যদেশে স্বীকৃত নাগরিক অধিকারের জন্য ভারতবাসীরা আন্দোলন শুরু করেন। বিশেষতঃ ঐসব অধিকার খর্ব করার জন্য সরকার চেষ্টা করলেই দেশের মানুষ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করে। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর কণ্ঠরোধের জন্য ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হলে ভারতবাসী তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। ফলে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে সরকার এই আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ১৮৯০-এর দশকে সরকারী গোপনীয়তা রক্ষার দোহাই দিয়ে সরকার সংবাদপত্রের সমালোচনার অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করলে ভারতবাসীরা সরকারের এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ করে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নে বাল গঙ্গাধর এবং নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারমূলক নীতি শিক্ষিত ভারতবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলে নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম আর কোন বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম না থেকে দেশের মুক্তি আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে দেখা দেয়।

(৫) স্বায়ত্ত-শাসনের সংস্কার ঃ

স্বাধীনতা অন্দোলনের সূচনা থেকেই জাতীয়তাবাদীরা গণতন্ত্র ভিত্তিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁদের মত ছিল যে, বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্তি বা স্বাধীনতা পেতে হবে অনেক স্তর পেরিয়ে এবং তার প্রথম স্তর হিসাবে তাঁরা স্বায়ত্ত শাসনের দাবি পেশ করেন। আইনসভাগুলোর বিস্তার ও সংস্কার সাধন করে তাঁরা ভারতীয়দের জন্য অধিকতর পরিমাণে সরকারী ক্ষমতা লাভের চেষ্টা শুরু করেন। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল আইনের বলে কিছু বেসরকারী সভ্য আইনসভাগুলাতে মনোনয়ন পেলেও স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা সরকারের সমর্থকে পরিণত হন। ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই জাতীয়তাবাদীরা মনো-নয়নের পরিবর্তে নির্বাচনের মাধ্যমে আইন সভায় জনসাধারণের প্রতিনিধি গ্রহণ করার নীতির পক্ষে দাবি করেন। এই সঙ্গে তাঁরা আরও দাবি করেন যে, আইনসভাগুলোর ক্ষমতার সীমা বাড়াতে হবে এবং সভ্যদের ক্ষমতা বাড়িয়ে বাজেট ও দৈনন্দিন শাসনের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রশ্ন করার ও সমালোচনার অধিকার দিতে হবে।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে নতুন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়। নতুন এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আইন সভাগুলোতে বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁদের মধ্যে মুষ্টিমেয় সদস্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পান। বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করার অধিকার তাঁরা পেলেও, ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন।

কিন্তু এই আইন দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, সুতরাং আইন-সভায় বেসরকারী নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং বাজেটের উপর যাতে বেসরকারী সদস্যদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় সেজন্য তাঁরা আবার আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু এই আন্দোলনের সময়ও তাঁরা তাঁদের গণতান্ত্রিক দাবির ভিত্তি-ভূমি সম্প্রসারিত করতে ব্যর্থ হন। তাঁদের দাবির তালিকায় সাধারণ মানুষের বা মহিলাদের ভোট দেওয়ার অধিকার কোন স্থান লাভ করে নি। প্রকৃতপক্ষে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁদের দাবি রচিত হয়, সর্বসাধারণের কল্যাণের ভিত্তিতে নয়।

(৫) উপসংহার :

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতাদের সৃজনশীল ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ভূমিকাকে লঘু করে দেখার প্রবণতা দেখা যায়। তাঁদের অনুসৃত নীতিকে ভিক্ষাবৃত্তি ও কাপুরুষতা বলে চিহ্নিত করা হয়। এই সব নেতাদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা ছিলেন শহরবাসী মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি এবং তাঁরা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিবর্তে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের কথা চিন্তা করতেন। কিন্তু এই অভিযোগ সঠিক নয়। কারণ কংগ্রেসের আদি পর্বের নেতৃবৃন্দ নিঃসন্দেহে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাঁদের সংস্কারমূলক দাবিগুলো সার্থকতা অর্জন করতে পারে নি,তথাপি জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম কুড়ি বছরের ইতিহাসকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় অধ্যায় বলা যেতে পারে। তদানীন্তন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেই নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের গতি স্থির করেন এবং ডক্টর এস. আর. মেহরোত্র তাঁদের বাস্তববাদিতার প্রশংসা করেন। রজনীপাম দত্তও তাঁদের তৎকালীন ভারতীয় সমাজের সর্বাপেক্ষ প্রগতিশীল শক্তির যোগ্য প্রতিনিধিরূপে চিহ্নিত করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতৃবর্গ উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ভারতীয় জনসাধারণের উন্নতি বিধানের জন্য নানারূপ দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন। ফলে তাঁরা জনসাধারণের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হন নি। অপর দিকে জাতীয় কংগ্রেস এই সময় পরিপূর্ণভাবে গণসংগঠনে পরিণত না হলেও নানা-ভাষাভাষী ও বহুজাতি অধ্যুষিত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের জনসাধারণের নিকট ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনে ও জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারে সমর্থ হয়। ফলে কংগ্রেস ভারতের জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

তবে এ কথা ঠিক যে, কংগ্রেসের আদিপর্বের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ভারত-ব্রিটিশ যৌথ সহযোগিতার যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। কিন্তু নরমপন্থী নেতাদের এই ব্যর্থতার জন্য তাঁদের রাজনৈতিক কৌশল বা পদ্ধতি দায়ী নয়, এই ব্যর্থতার মূলে ছিল ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের স্বার্থপর অনমনীয় মনোভাব। ভারতে নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভারতবাসীর হাতে সামান্য সুযোগ-সুবিধাও তুলে দিতে তাঁরা রাজি ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের উদারনৈতিক বা রক্ষণশীল কোন

দলই ভারতে সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের এইরূপ অসহযোগিতা-মূলক নীতির ফলে আদি পর্বের জাতীয় কংগ্রেস সার্থকতার পরিবর্তে ব্যর্থতাই অর্জন করতে বাধ্য হয়।

Q. 27. What was the causes of the Indianisation of civil services? How far was it successful?

Ans. (১) আন্দোলনের প্রথম পর্যায় :

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পর থেকেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে ন্যায়সঙ্গত কারণে বিভিন্ন সরকারী উচ্চপদে নিয়োগের আকাজ্ক্ষা দেখা দেয়। এই আকাজ্ক্ষা থেকেই সরকারী কর্মচারীদের পদ ভারতীয়করণের দাবি উত্থাপিত হয়। গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে ভারতীয়দের প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দিলেও উচ্চ ও দায়িত্বশীল পদে তাদের নিয়োগের কোন সুযোগ ছিলনা। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ অনুযায়ী প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়দের ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের ব্যবস্থা করলেও সুদূর ইংলণ্ডে গিয়ে সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে সরকারী চাকরীর ক্ষেত্র ভারতীয়দের নিকট প্রশস্ত করা হলেও বাস্তবে তা কার্যকরী করা হয় নি। এমন কি, সরকারী উচ্চ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করতেও দ্বিধা বোধ করে নি। বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে এবং সরকারী উচ্চপদ থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা বাইশ থেকে কমিয়ে একুশ এবং পরে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে আই. সি. এস. (ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা একুশ থেকে উনিশ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয়দের মনে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে 'ভারত সভার' (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) উদ্যোগে কলকাতার টাউন হলে আহূত এক সমাবেশে এই বৈষম্যমূলক নীতির তীব্র নিন্দা করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট একটি স্মারকলিপি পাঠান হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নীতির প্রতিবাদ করেই ভারতসভা ক্ষান্ত হয় নি, ঐ সভার অন্যতম প্রধান সদস্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আইনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা দিয়ে ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। সুরেন্দ্রনাথ পরিচালিত সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত আন্দোলন ভারতবাসী ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করার দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করে। অপর দিকে অনুরূপ জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ভারত সভা লালমোহন ঘোষকে ইংলণ্ডে পাঠায়। লালমোহন ঘোষের বক্তব্য ও যুক্তি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ফলে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ভারত সচিব সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগের নির্দেশ দেন। এই নতুন আইনে স্থির হয় যে, প্রতি বছর যে সংখ্যক আই. সি. এস. কর্মচারী নিযুক্ত হবেন তার এক ষষ্ঠাংশ

ভারতীয়দের মধ্য থেকে ভারত সরকার মনোনীত করবেন। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই নীতি কার্যকরী করা হলেও স্ট্যাটুটরি সিভিল সার্ভিস বা বিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস ভারতীয়দের নিকট জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। কারণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ পদে এই সার্ভিসের লোকদের নিযুক্ত করা হত না এবং এই সার্ভিসের কর্মচারীদের বেতন কভেন্যানটেড সার্ভিস থেকে কম ছিল। ফলে সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে ভারতীয়দের অসন্তোষ দূর হল না। সুতরাং পরীক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা বৃদ্ধি এবং ভারতে আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণ এই দুটি দাবি কেন্দ্র করে সিভিল সার্ভিস আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে উত্থাপিত চতুর্থ প্রস্তাবে দাদাভাই নৌরোজি সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেন। ঐ প্রস্তাবে ইংলণ্ডে ও ভারতে একই সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা এবং পরীক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা উনিশ থেকে তেইশ বছর করার দাবি জানান হয়।

(২) আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ

ইতিমধ্যে সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠায় ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে সিভিল সার্ভিসে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারণের জন্য গভর্নর জেনারেল স্যার চার্লস এচিনসনের নেতৃত্বে পাবলিক সার্ভিস নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। কমিশন একযোগে ভারত ও ইংলণ্ডে সিভিল সার্ভিস গ্রহণের দাবি অগ্রাহ্য করলেও ভারতীয় পরীক্ষার্থীদের উর্ধ্বতম বয়ঃসীমা তেইশ বছর ধার্য করেন। এই কমিশন সরকারী চাকরীকে ইম্পিরিয়াল, প্রভিন্সিয়াল এবং সাব-অরডিনেট এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে। প্রশাসনের সর্বোচ্চপদগুলোকে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের আওতায় আনা হয় এবং এই সকল পদে কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব ভারত সচিবের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। প্রভিন্সিয়াল ও সাব-অরডিনেট পদে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারগুলো লাভ করে। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের আইনের দ্বারা এচিনসন কমিশনের রিপোর্ট সরকারীভাবে গৃহীত হয়। এই সময় থেকে প্রভিন্সিয়াল ও সাব-অরডিনেট কর্মচারীর পদে নিয়োগের ব্যাপারে ভারতবাসীর সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের ক্ষেত্রে কোন উন্নতি ঘটে নি। তা ছাড়া, প্রভিন্সিয়াল ও সাব-অরডিনেট কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নীতি সর্বত্র গৃহীত না হওয়ার ফলে অনেক সময়ই যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হত না। প্রকৃত-পক্ষে প্রাদেশিক পদগুলোতে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর নিয়োগের ব্যবস্থার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হত। ফলে এচিনসন কমিশনের রিপোর্ট ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগের আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়।

(৩) আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ঃ

এচিনসন কমিশনের ব্যর্থতার কথা চিন্তা করেই সম্ভবত ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একযোগে ইংলণ্ড ও ভারতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করে।

কিন্তু ভারত সরকারের আপত্তির জন্য এই সুপারিশ কার্যকরী করা হয় নি। তবে শুধুমাত্র ব্রিটিশ সরকার নয়, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহম্মদও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, ভারতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গৃহীত হলে সরকারী চাকরীতে হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং মুসলমানদের অনগ্রসরতা বহাল থাকবে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস ইংলণ্ড ও ভারতে একই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের দাবি অব্যাহত রাখে। দাবির অনুকূলে ইংলণ্ডে জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজশাহ মেহতা প্রমুখ নেতৃবর্গ সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেন। ১৮৯৫ এবং ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রচলিত নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের কংগ্রেস সভাপতি মদনমোহন মালব্য এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে গোপালকৃষ্ণ গোখলে কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রশাসনক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচন এবং ন্যায্য বিচারের যুক্তি প্রদর্শন করে উচ্চপদে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগের দাবি করেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত ব্যক্তিগণও তাঁদের এই দাবি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। ফলে এই দাবিকে কতক পরিমাণে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য লর্ড ইসলিংটনের নেতৃত্বে কমিশন গঠন করা হয়। দুজন ভারতীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং স্যার আব্দুর রহিম এই কমিশনের সদস্য মনোনীত হন। ইসলিংটন কমিশন সুপারিশ করে যে, ইংলণ্ডে গৃহীত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ ছাড়াও উচ্চতর সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে শতকরা পঁচিশভাগ ভারতীয়দের মধ্য থেকে নেওয়া হবে। সেজন্য ভারতেও একটি পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। ইসলিংটন কমিশনের রিপোর্ট ভারতবাসীর দাবি আংশিকভাবে পূরণ করলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে এই রিপোর্ট কার্যকরী হয় নি। কিন্তু যুদ্ধের শেষে সরকারী চাকরী ভারতীয়করণ করার বিষয়ে অনেক উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে বলা হয় যে, উচ্চতর পদগুলোর শতকরা তেত্রিশ ভাগ ভারতেই পূর্ণ করা হবে। তা ছাড়া, চাকরী নিয়োগের ব্যাপারে সর্বপ্রকার জাতিগত বৈষম্য দূর করা হবে। ইংলণ্ড ও ভারতে চাকরী নিয়োগের ক্ষেত্রে এই রিপোর্ট একই নীতি অনুসরণের পক্ষে সুপারিশ করে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের পর সরকারী চাকরী ভারতীয় করণের দাবি অনেকাংশে ফলপ্রসূ হয় এবং উচ্চপদে ভারতীয়গণ বেশি সংখ্যক নিযুক্ত হতে শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যেই ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস এবং অন্যান্য উচ্চপদে ভারতীয় কর্মচারীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ভারত সরকারও চাকরীর নিয়োগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে পর্যালোচনার জন্য কয়েকটি কমিশন নিযুক্ত করে। এদের মধ্যে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের লী কমিশন এবং ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ম্যাকাজেনেল কমিশনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে সরকারী চাকরীতে নিয়োগের জন্য একটি

পাবলিক সার্ভিস কমিশন স্থাপিত হয়। এইভাবে দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়দের সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের বাধা ও আপত্তি সত্ত্বেও ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকারের দাবি স্বীকৃতিলাভ করে। তা ছাড়া, জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতির অবসান অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সরকারী চাকরীতে ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বেশি সংখ্যক নিযুক্ত হলেও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি মোটেও শিথিল হয় নি। তবে কিছু কিছু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভারতীয় ব্রিটিশ প্রশাসনের উচ্চপদে নিযুক্ত হলেও সাধারণ ভারতবাসীর বিশেষ কোন উপকার হয় নি। প্রশাসনিক বিভাগে ব্রাহ্মণ এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের প্রাধান্য বজায় থাকায় ভারতীয় সামাজিক জীবনে বর্ণ বৈষম্যের প্রভাব অব্যাহত থাকে। অপরদিকে এই সকল উচ্চবর্ণের ভারতীয় আমলারা ব্রিটিশ শাসনের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

(৫) উপসংহার

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগ সম্পর্কে আন্দোলন কয়েকটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে ভারত ও ইংলণ্ডে বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলন করে শেষ পর্যন্ত ভারতের দাবি কার্যকরী করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও অত্যাচারের বীজ প্রবেশ করেছিল সুতরাং সম্পূর্ণ শাসনব্যবস্থা সংস্কারের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে জাতীয়তাবাদী নেতাগণ আমলাতন্ত্রের আমূল পরিবর্তনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা শুরু করেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার পিছনে নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ নিহিত ছিল। এই সময় জাতীয়তাবাদীদের মূল দাবি হয়ে দাঁড়ায় শাসন বিভাগের উচ্চ পদগুলোতে ভারতীয়দের আধিপত্য স্থাপনের সুযোগ লাভ করা। এই দাবির পিছনে অর্থনৈতিক কারণ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের এত বেশি বেতন দিতে হত যে, তাতে দেশের আর্থিক অবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ত এবং বেতনের এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেন্সনের একটি বড় অংশ ব্রিটেনে পাঠানো হত বলে নির্গমনের (drain) পথও প্রসস্ত হত। এ দাবির রাজনৈতিক কারণও ছিল সংগত ও যুক্তিযুক্ত। প্রথমতঃ, ইয়োরোপীয় কর্মচারীরা ভারতীয়দের প্রয়োজন ও প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করতেন এবং ভারতীয়দের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় শিল্পপতিদের বঞ্চিত করে ইয়োরোপীয় শিল্পপতিদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন। তৃতীয়তঃ, ইয়োরোপীয় বিচারকদের নিকটও ভারতবাসী বৈষম্যমূলক ব্যবহার লাভ করত। ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের সংঘর্ষের ফলে যখনই মামলা-মোকদ্দমা হত, প্রত্যেকবারই আইনের পক্ষপাতিত্বে

সুবিচার পেত ইয়োরোপীয়গণ, ভারতীয়গণ নয়। এই পক্ষপাতিত্ব দূর করার উদ্দেশ্যেই জাতীয়তাবাদী নেতারা বিচার বিভাগের উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগের দাবি উত্থাপন করেন। তা ছাড়া, নীতিগত দিক থেকে বিচার করলে, ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের অধীনে থাকার ফলে নিজেদের দেশেই ভারতীয়দের হীনম্মন্যতা থেকে ভুগতে হত এবং তাদের চরিত্রের মহত্ত্ব বিকশিত হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। তা ছাড়া, জাতীতাবাদী নেতৃবর্গ মনে করতেন যে, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেলে শাসনকার্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে ধীরে ধীরে ভারতীয় রাজকর্মচারিগণ দেশের শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। তবে জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ শুধুমাত্র ভারতীয়দের চাকরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তাঁরা অধস্তন কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিরও দাবি উত্থাপন করেন। তাঁরা মনে করতেন যে, বেতন বৃদ্ধি করা হলে এইসব কর্মচারীদের অযোগ্যতা এবং দুর্নীতিপরায়ণতা অনেকাংশে দূরীভূত হবে। সমমর্যাদা ও সমদায়িত্বপূর্ণ কাজে ভারতীয়গণ নিযুক্ত হলেও তাঁরা ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের তুলনায় অনেক কম বেতন ও অনেক কম অন্যান্য সুযোগ পেতেন। জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ এই বৈষম্যমূলক নীতি দূর করে ভারতীয় রাজকর্মচারীদের হীনম্মন্যতার মনোভাব থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যও আন্দোলন শুরু করেন। ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের স্বার্থের জন্যই এই আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের শক্তি আরও বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

Q. 28. The Bengal famine of 1943 may be called "more man made than act of God." Do you agree ?

Ans. (১) ভূমিকা :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোতে মৌসুমী বায়ুর স্বল্পতার জন্য দেশের নানা অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে খাদ্যাভাব দেখা দিলে পরিস্থিতি অনুসারে ত্রাণকার্য চালান হত। যুদ্ধের শেষ বছরে (১৯১৮-১৯ খ্রীস্টাব্দে) উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং মধ্যপ্রদেশে মৌসুমী বায়ুর স্বল্পতার জন্য অনাবৃষ্টি দেখা দেয় এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন শস্যোৎপাদনের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। ফলে খাদ্যাভাব ও মহামারী দেখা দেয়। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সরকার অস্ট্রেলিয়া থেকে দুলক্ষ টন গম আমদানি করতে বাধ্য হয়।

উভয় যুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে (১৯১৯-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ) স্থানীয়ভাবে খাদ্যাভাব দেশের অধিবাসীদের কাছে মাঝে মাঝে দেখা দিলেও শুধুমাত্র পরিবহণ ব্যবস্থা ও ত্রাণ ব্যবস্থার সংগঠনে উন্নতি সাধনের ফলে অন্যান্য অঞ্চলের উদ্বৃত্ত শস্য আমদানি করে এই ধরনের স্থানীয় খাদ্যাভাব দূর করার ব্যবস্থা করা হয়। সরকারের এই নীতির ফলে আশঙ্কাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা নিশ্চিতভাবে হ্রাস পায় এবং সরকার দাবি করতে পারে যে, তারা ভারত

থেকে দুর্ভিক্ষকে নির্বাসিত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার ফলে তাঁদের এই দাবি সর্বপ্রকারে নস্যাৎ হয়ে যায়। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে এই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় বলে একে পঞ্চাশের মন্বন্তর বলা হয়। আধুনিক যুগে একমাত্র ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সঙ্গে এই মন্বন্তরের তুলনা করা যেতে পারে।

(২) পঞ্চাশের মন্বন্তর :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রশাসনের স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এবং বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে খাদ্যাভাব এক বিরাট বিপর্যয়ে পরিণত হয়। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের ভয়ঙ্কর খাদ্যাভাবে প্রায় পনের লক্ষ লোক মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে নিযুক্ত উডহেড কমিটি তাঁদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, যদি প্রশাসনিক সংস্থাসমূহ সক্রিয় থাকত তবে খাদ্য সরবরাহের স্থানীয় অভাব বাংলাদেশের বাইরের থেকে খাদ্য আমদানি করে মিটানো অসম্ভব ছিল না। যুদ্ধের সময় দ্রুত অতিরিক্ত লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা খাদ্যশস্য ব্যাপক ভাবে মজুত করতে শুরু করে, ফলে পরিস্থিতি আরও সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে চালের দাম এক বছর পূর্বে ঐ সময়ে প্রচলিত দাম অপেক্ষা প্রায় পাঁচ-ছ গুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ীরা প্রচুর মুনাফা অর্জনের সুযোগ লাভ করে।

(৩) উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস :

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাস পর্যন্ত সরকার পর্যাপ্ত ত্রাণ-ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয় নি, কেননা যুদ্ধকালীন প্রচার অভিযানের স্বার্থে সরকার প্রথমে স্বীকার করতেই অস্বীকার করে যে, দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। অবশেষে যখন ত্রাণ সংগঠন চালু করা হল তখন অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষে বহু নরনারী ও শিশুর মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল প্রধানতঃ দুটি : (১) ত্রাণ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান করা যায় নি এবং (২) রেল-পরিবহণ খাদ্য চলাচলের উপর প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার না দিয়ে সৈন্যবাহিনী এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত দ্রব্যাদির চলাচলের ব্যবস্থাকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে শুরু করে। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থাও ছিল অপ্রতুল। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত রোগসমূহের প্রাদুর্ভাব হয় তাদের আক্রমণেও বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী দু'বছরে পরবর্তী দুর্ভিক্ষের আভাস প্রকাশ পেতে শুরু করে। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে যে আমন ফসল পাওয়া যায় তার পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে খাদ্য-সরবরাহের মাত্রা বজায় রাখার জন্য মজুত ভাণ্ডার থেকে চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বাজারে ছাড়ার ফলে মজুতভাণ্ডারের পরিমাণও যথেষ্ট হ্রাস পায়। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের মরশুমে আমন ফসল স্বাভাবিক গড় হিসাবেই উৎপন্ন হয়। ফলে হ্রাসপ্রাপ্ত মজুতভাণ্ডারকে পুনরায় পূরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের

গোড়ায় দিকে ব্রহ্মদেশ থেকে ইংরেজদের পশ্চাদপসরণের ফলে কোচিন এবং বোম্বাই-এর মতো যেসব অঞ্চল চালের জন্য ব্রহ্মদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল তারা তখন বাংলাদেশের চালের বাজারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। ব্রহ্মদেশ হতে চাল আমদানি বন্ধ হওয়ার ফলে এবং সরবরাহের অন্য কোন উৎস না থাকার দরুন বাংলাদেশের চালের বাজারে প্রচণ্ড বিপর্যয় দেখা দেয়। তা ছাড়া, এই সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বাংলা দেশের অনেক অঞ্চলের ধান উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের কয়েকটি জেলায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার ফলে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে আমন ধানের উৎপাদন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের উদ্বৃত্ত অঞ্চলের খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরণের ব্যবস্থাও সরকারের 'বাজেয়াপ্তকরণ' নীতির ফলে দারুণভাবে ব্যাহত হয়। এই নীতি অনুসারে প্রতিরক্ষা দপ্তরের যানবাহনের সরঞ্জাম পাছে শত্রুর কবলিত হয় সেই ভয়ে দেশীয় সমস্ত নৌকা এবং পরিবহণের অন্যান্য উপকরণ সরকারের নিকট গচ্ছিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। সুতরাং উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়ে।

(৪) সরকারের ভ্রান্ত নীতি :

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে বাংলাদেশের সরকার মজুত ভাণ্ডার থেকে খাদ্যশস্য সরবরাহ করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এই কাজের জন্য সরকারী কোনও সংস্থা না থাকায় খাদ্যশস্য সংগ্রহের দায়িত্ব ব্যবসায়ী গোষ্ঠী থেকে মনোনীত প্রতিনিধিদের উপর অর্পন করা হয়। ফলে খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা কোনরূপ আন্তরিকতার সঙ্গে করা হয় নি। সংগৃহীত খাদ্য বণ্টনের নীতিও ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এইরূপ পরিস্থিতিতে বিমূঢ় হয়ে এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বাংলাদেশের তদানীন্তন সরকার ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে খাদ্যশস্যের বিপণনের উপর সমস্ত প্রকার নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়। সরকারের এই ভ্রান্ত নীতির ফলে বিপর্যয় আরও ত্বরান্বিত হয়। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাস থেকে অক্টোবর এই কয় মাস এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলতে থাকে এবং সাধারণ মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। উত্তরবঙ্গের রাজসাহী বিভাগের প্রায় সব ক'টি জেলায়ই এই দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়। চট্টগ্রাম বিভাগের দক্ষিণাংশের কিছু অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য অংশে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দারুণভাবে অনুভূত হয়। প্রেসিডেন্সী বিভাগের সব কটি জেলায় এই দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও কলকাতা, হাওড়া এবং মেদিনীপুর জেলায় এই দুর্ভিক্ষ ভীষণ আকার ধারণ করে। বিশেষতঃ ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে অগাস্ট আন্দোলনের পর মেদিনীপুর জেলায় সরকারের কঠোর দমন নীতি, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিধ্বংসী ঘূর্ণিবাত্যা এবং তার কয়েক মাস পরেই প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ঐ জেলার অধিবাসীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে তোলে। ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর ও ঢাকা জেলায় দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করে। বিশেষতঃ ঢাকা জেলা চিরদিনই খাদ্যশস্যের দিক থেকে ঘাটতি অঞ্চল রূপে পরিচিত। বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানির পথে

নানারূপ বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার ফলে সেখানকার বাজারে চালের দাম ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের দামের তুলনায় প্রায় বারো গুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে সাধারণ লোকের পক্ষে চাল ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায় এবং বিকল্প খাদ্যের অভাবের জন্য বহু লোক অনাহারে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। তবে বাংলাদেশের সরকারের প্রধান কর্মকেন্দ্র কলকাতার অবস্থাই চরমে ওঠে। গ্রামাঞ্চলে খাদ্যের অভাব দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে লোক কলকাতায় ভীড় জমাতে শুরু করে এবং খাদ্যাভাবে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে তারা মৃত্যুবরণ করে। মহানগরীর সর্বত্রই ইতস্ততঃ মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যেত। জেলাভিত্তিক ভাবে হুগলি, হাওড়া ও নদীয়া সব চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশের তদানীন্তন সরকার দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দূর করা বা জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা লাঘব করার জন্য এত সামান্য চেষ্টা করে যে, সে কথা উল্লেখ করা সম্পূর্ণ ভাবে প্রয়োজনহীন।

(৩) দুর্ভিক্ষের প্রকৃতি ঃ

পূর্ববর্তী অন্যান্য দুর্ভিক্ষের সহিত ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পার্থক্য ছিল এই যে, বাস্তবিকপক্ষেই এই সময় দেশে চূড়ান্ত খাদ্যাভাব দেখা দেয়। পূর্বে স্থানীয় ভাবে শস্য উৎপাদন বিঘ্নিত হলে দেশের কোন না কোন অংশে খাদ্যাভাব দেখা দিত বটে, এবং স্থানীয়ভাবে কর্মহীনতা ও উপার্জনের সমস্যা দেখা দিত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত চড়া দামে খাদ্যশস্য আমদানি করা অসম্ভব হয়ে পড়ত না। খাদ্যশস্যের চড়া দামের জন্য ব্যবসায়ীরাই নিজেদের লাভের জন্য খাদ্য আমদানি করতে উৎসুক থাকবে এরূপ ভরসা রাখাও সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে সকল দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তা খাদ্যের দুর্ভিক্ষের পরিবর্তে উপার্জনমূলক কাজের দুর্ভিক্ষ ছিল। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে কর্নেল বেয়ার্ড স্মিথ তাঁর প্রতিবেদনে ভারতীয় দুর্ভিক্ষকে "খাদ্যের দুর্ভিক্ষ নয়, কাজের দুর্ভিক্ষ" বলে বর্ণনা করেন। ভারতের বিভিন্ন সময়ের অনেক দুর্ভিক্ষ সম্পর্কেই এই বিশ্লেষণ অর্থ নৈতিকভাবে যথার্থ। কিন্তু ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের বাংলাদেশের মন্বন্তরের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। পরিবহণের অসুবিধা, যুদ্ধকালীন মুনাফাবাজী এবং বিশৃঙ্খলাময় সরকারী নিয়ন্ত্রণাদি ব্যবসায়ের স্বাভাবিক পথগুলোকে রুদ্ধ করে দেয়। তবু খাদ্যাভাবের পরিমাণ খুব বেশি ছিল না। উডহেড কমিশনের প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, স্বাভাবিক প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র তিন সপ্তাহের খাদ্যের ঘাটতি ছিল। এই স্বল্প পরিমাণ খাদ্যাভাবের পরিবর্তে পনের লক্ষ জীবন ধ্বংস হওয়ার জন্য সর্বস্তরের সাংগঠনিক ব্যর্থতাকেই দায়ী করা যেতে পারে। সেজন্য এই দুর্ভিক্ষকে যথার্থভাবেই মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ বলে বর্ণনা করা হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের মন্বন্তরের জন্য দায়ী ছিল, "......the scorched earth policy of the British Indian Government, the cupidity and greed of the merchants and the dishonesty and corruptions in the administration."[৪] সুতরাং এই মন্বন্তরের জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করা যুক্তিহীন এবং অসঙ্গত।

Q. 29. How did the British administration react on the different section of Indian society ? What were its results ?

Ans. (১) কৃষক শ্রেণী :

ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের বিস্তার ও স্থায়িত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে শাসকশ্রেণী ও ভারতবাসীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ইংরেজগণ যে এ দেশে রাজত্ব করছে এবং সে রাজত্ব বজায় রাখার জন্য যে সাধারণভাবে ব্রিটিশ জাতির ও বিশেষ করে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে ভারতের মঙ্গল বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ভারতবাসীর কাছে সে কথা আর গোপন ছিল না। তাঁরা আরও উপলব্ধি করেন যে, সাম্রাজ্যবাদই ভারতের অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের প্রধান কারণ এবং ব্রিটিশ শাসনই এ দেশের সকল প্রকার উন্নতির অন্তরায়। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান বলি ছিল ভারতের কৃষক সম্প্রদায়। ভূমিরাজস্ব এবং অন্যান্য করের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ সরকার আত্মসাৎ করত। জমির মালিক এবং মহাজনও এদের যতদূর সম্ভব শোষণ করত। জমির উপর কৃষকের কোন মালিকানা স্বত্ব ছিল না, এমন কি, ফসলের উপরও তার অধিকার ছিল খুবই সীমিত। অর্থাৎ তার শ্রমের ফসল অন্যের শ্রীবৃদ্ধি করত। আর কৃষকরা যখন জমিদার, ভূস্বামী এবং মহাজনের বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তুলত, তখন আইন ও শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে সরকার সমস্ত পুলিশ বাহিনী ও বিচার বিভাগকে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাদের দমন করা হত। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই কৃষক সম্প্রদায় সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকা বুঝতে সমর্থ হয় কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য সাম্রাজ্যবাদই প্রধানতঃ দায়ী তা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও শক্তিশালী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের আশ্রিত ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

(২) কারিগর শ্রেণী :

ভারতের কারিগর সম্প্রদায়কেও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের কাছে অনেক দুর্দশা ভোগ করতে হয়। বহু শতাব্দী পর্যন্ত যে পেশার সাহায্যে তারা জীবিকা অর্জন করে আসছিল তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয় কিন্তু কোন নতুন জীবিকার সন্ধানও তাদের দেওয়া হয় নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের লোভ এবং স্বার্থান্বেষী কার্যকলাপের ফলে ভারতের ঐতিহ্যময় বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয় এবং ঐ শিল্পের কারিগরগণ প্রাণ রক্ষার তাগিদে কৃষির উপর নির্ভর করতে শুরু করে। ফলে গ্রামীণ ভারতের অর্থ নৈতিক দুরবস্থা চরমে উপনীত হয়। একদিকে জমির উপর অতিরিক্ত চাপে পুরাতন অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ

ভেঙে পড়ে অপর দিকে পেশাচ্যুত কারিগর শ্রেণীর সম্পূর্ণ ক্রোধ ব্রিটিশ সরকারের উপর পতিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে গ্রামের সাধারণ অধিবাসীদের অবস্থা চরমে পৌঁছায় এবং সমকালীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে তারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

(৩) শ্রমিক শ্রেণী :

আধুনিক শিল্পের প্রসারের সঙ্গে ভারতে একটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। সংখ্যায় অল্প এবং ভারতের সামগ্রিক জনসমষ্টির ক্ষুদ্র অংশমাত্র হলেও তারা ছিল এক নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধি। জীবনে কোন ঐতিহ্য-বোধ বা বিশেষ কোন জীবনপদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাবের জন্য শুরু থেকেই তারা সর্বভারতীয় স্বার্থবোধের চরিত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে ওঠে। তা ছাড়া, একমাত্র শহরাঞ্চলে ঘনসন্নিবদ্ধ অঞ্চলে কলকারখানার শ্রমিকগণ বসবাস করত। ফলে তাদের সংখ্যার তুলনায় ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের কার্যকলাপের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল।

যে পরিবেশে ভারতীয় শ্রমিকদের জীবিকা অর্জন ও জীবন ধারণ করতে হত তাও ছিল অত্যন্ত অসন্তোষজনক এবং অস্বাস্থ্যকর। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাদের কাজের সময়ের মাত্রা সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। রোগ, বার্ধক্য, কর্মহীনতা, দুর্ঘটনা, আকস্মিক মৃত্যু প্রভৃতি গুরুতর বিষয়েও তারা কোন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করত না। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের কোন প্রকল্প তখনও চালু হয় নি। ছুটি-ছাঁটারও কোন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। একমাত্র সন্তানলাভের সময় মহিলা শ্রমিকগণ কিছু কিছু সুবিধা ভোগ করত। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে নি ততদিন পর্যন্ত শ্রমিকদের জীবনে কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেয় নি। বরং একদিকে কৃষির উপর অতিরিক্ত চাপের ফলে ভূমিহীন কৃষকগণ শ্রমিকে পরিণত হতে শুরু করলে, শ্রমজীবীর সরবরাহ প্রশস্ত হয়ে ওঠে এবং অপরদিকে আন্তর্জাতিক বাজারের সাময়িক মন্দার সুযোগ নিয়ে মালিক পক্ষ সবদাই শ্রমিকদের বেতন হ্রাস করার চেষ্টা করতে শুরু করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তখনকার ভারতীয় শ্রমিকদের যথেষ্ট আহার জুটত না ; তাদের বাস করতে হত পশুর মতো এমন জায়গায় যেখানে আলো নেই, বাতাস নেই, জল নেই। ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর সবচাইতে শোষিত মানুষের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী ছিল অন্যতম। চা এবং কফি বাগিচার শ্রমিকদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর জল-হাওয়ার মধ্যে এই সব শ্রমিকদের বাস করতে হত এবং প্রায় ক্রীতদাসের অবস্থায় তারা জীবনযাপন করতে বাধ্য হত। ব্রিটিশ সরকার মালিক পক্ষকে পুরোপুরি সাহায্য করত এবং তাদের সুবিধার জন্য নানারকম দণ্ডমূলক আইনও প্রণয়ন করত। ফলে সরকারের সাহায্যপুষ্ট মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ ক্রমেই তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিতে পরিণত করে তোলে।

(৪) মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী :

প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভেই ভারতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই শ্রেণীর কাছে অনেক নতুন সুযোগ-সুবিধা উপস্থিত হয়। স্কুল, কোর্ট-কাছারি এবং সরকারী খাস দপ্তরে নিম্নপদস্থ কর্মচারী হিসাবে তারা দলে দলে যোগ দিতে শুরু করে। তা ছাড়া, অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে সর্বস্তরেই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিস্তার লাভ করে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সাধারণ রীতি অনুযায়ীই অল্পদিনের মধ্যে এই অবস্থার পরিবর্তন দেখা দেয় এবং চাকরীর বাজারে মন্দা দেখা দিলে তদানীন্তন ভারতের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকও বেকার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। সরকারী ও বেসরকারী উচ্চপদে ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের নিয়োগের ফলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। এইরূপ পরিবেশে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী শীঘ্রই বুঝতে পারে যে, একমাত্র অর্থ নৈতিক দিক থেকে উন্নতিশীল এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে আধুনিক দেশই অনুকূল অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ দিয়ে তাদের জীবনের সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হবে এবং দারিদ্র্য, কর্মহীনতা, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক মর্যাদা হানির হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে। সুতরাং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার-বিরোধী মনোভাবের জন্য তারা সর্বান্তঃকরণে এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করে।

(৫) শিল্পপতিগণ :

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তীকালেই ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্ম হয়। কিন্তু অনতিবিলম্বে বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে তাঁদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ভারতীয় শিল্পপতিগণ শীঘ্রই বুঝতে পারে যে, সরকার পরিচালিত বাণিজ্য ও শুল্ক, পরিবহণ ও আর্থিক বিষয়ে সরকারী নীতি তাদের বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায়। তারা আরও বুঝতে পারে যে, অর্থনীতির প্রতিটি মৌলিক ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্যভাবে দেখা দিবে। বিশেষতঃ পশ্চিম ইয়োরোপের সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে অসম-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার ফলে তারা প্রচণ্ড সংকটের সম্মুখীন হয়। এইরূপ অবস্থায় ভারতীয় শিল্পপতিদের সব চাইতে বেশি প্রয়োজন ছিল সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সাহায্য। কিন্তু ভারতীয় আমলাদের কাছ থেকে তারা কোন সাহায্য পায় নি। ভারতীয় শিল্পের তখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল রক্ষাত্মক শুল্ক নীতির, কিন্তু এই সুবিধাও তাদের দেওয়া হয় নি। ফলে ভারতীয় শিল্পপতিগণ ক্রমশঃ উপলব্ধি করেন যে, অর্থ নৈতিক ঔপনিবেশিক কাঠামো, ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক নীতি প্রকাশ্যভাবেই তাদের বিরোধী। তারা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে যে, দেশীয় পুঁজি-পতিদের জন্য প্রয়োজন সহানুভূতিশীল রাষ্ট্র ও জাতীয় সরকার। যতদিন বিদেশী

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশ শাসন করবে ততদিন ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু সরাসরিভাবে শাসকদের বিরোধিতা না করলেও তারা ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে প্রধানতঃ আর্থিক সাহায্য দিয়ে দ্রুত প্রসারমান জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করে। জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকে তাদের পৃষ্ঠ-পোষকতাও লাভ করেন।

(৬) বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় :

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণ করেন আধুনিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন। তাঁরাই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতি খুব আগ্রহের সঙ্গে সাড়া দেন। তাঁরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারেন যে, ভারতের মতো বিশাল দেশ মুষ্টিমেয় বিদেশীদের বিজিত হওয়ার মূল কারণ এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গঠনের দৈন্যের মধ্যে নিহিত। সুতরাং, তাঁরা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার অকপট ও নির্মম বিশ্লেষণ করে সমাজ ও দেশকে আধুনিক করে গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। অর্থ নৈতিক উন্নতি, সামাজিক পরিবর্তন, রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়েই তাঁরা ইংলণ্ডের আদর্শ অনুসরণ করে ভারতে সংস্কার অভিযান পরিচালনার চেষ্টা করেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত রূপ তাঁদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং বিদেশী শাসকদের শোষণনীতিও তাঁদের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে সাহায্য করে। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অধিকার যতদিন সাম্রাজ্যবাদের করায়ত্ত থাকবে ততদিন তার উন্নতির সম্ভাবনা নেই, বরং ক্রমাবনতির প্রবল আশঙ্কা দেখা দিবে। তাঁরা এ কথাও বুঝতে পারেন যে, ভারতকে সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ ও ভারতের মানুষকে একটি জাতিতে পরিণত করার পথে ব্রিটিশ সহায়তা করে নি, বরং সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ প্রথা, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি বিভেদমূলক শক্তিকে সমর্থন করে এবং ক্ষয়িষ্ণু সামন্তদের উজ্জীবিত করে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। ফলে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী-গণ নতুন করে ব্রিটিশ শাসনের মৌলিক স্বরূপকে বিশ্লেষণ ও হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করেন এবং তখন থেকে তাঁদের প্রধান প্রচেষ্টা হয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

(৭) অন্যান্য শ্রেণী :

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যে সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর কোনরূপ সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না সেগুলো হল জমিদার, ভূস্বামী, দেশীয় রাজন্যবর্গ, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং প্রাচীনপন্থী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। এদের মধ্যে জমিদার, ভূস্বামী, দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম-

চারীদের স্বার্থ বিদেশী শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল বলেই তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি দ্বিধাহীনভাবে আনুগত্য প্রকাশ করতেন। আর প্রাচীন বুদ্ধিজীবীগণ আধুনিক রাজনীতির স্পর্শ থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে প্রাচীন ভারতের রক্ষণশীল চিন্তাধারা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপরি-উক্ত কোন শ্রেণীই ব্রিটিশ শক্তির প্রতি অবিমিশ্র আনুগত্য বজায় রাখতে সমর্থ হয় নি। তার প্রধান কারণ ছিল অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী জাতির মতো ব্রিটিশদের বর্ণবিদ্বেষমূলক ভাবধারা এবং জাতি হিসাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য আপামর ভারতবাসীকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা। বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের মনোভাবের নির্লজ্জ ও স্পর্দ্ধিত প্রকাশে চিন্তাশীল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন প্রত্যেক ভারতীয়ই নিজেকে অপমানিত বোধ করতে শুরু করেন। এই অপমানবোধ থেকেই রাজা ও ভিখারী, জমিদার ও তাঁর প্রজা, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও কেরানী, ধনী ও দরিদ্র সকল শ্রেণীর ভারতীয়ই জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রগাঢ়ভাবে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে।

(৮) উপসংহার :

ব্রিটিশ শাসনের মূলত সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও ভারতীয় জনগণের জীবনে তার বিষময় ফল ভারতে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের জাগরণ ও বিকাশ ঘটায়। এই আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে জাতীয় আন্দোলন বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কারণ ভারতীয় সমাজের প্রায় সকল শ্রেণী এবং সম্প্রদায় এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ভারতের প্রতিটি শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের কোন না কোন বিশেষ কারণে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দেয় বলেই তারা এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাদের নিজেদের মধ্যে অনেক স্বার্থবিরোধ থাকা সত্ত্বেও বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তারা পারস্পরিক বিভেদ ভুলে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে।

Q. 30. Examine the importance of the career of Sir Syed Ahmed in the history of Muslim politics in India.

Ans. (১) প্রসিদ্ধি লাভ :

স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের ২০ বছর "তাঁকে কেন্দ্র করেই মুসলিম রাজনীতি আবর্তিত হয়েছিল"। তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয়েছিল উত্তর প্রদেশে সরকারী কর্মকর্তা-রূপে। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের সময় তিনি বৃটিশের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের প্রতি একান্ত অনুগত ছিলেন এবং ইউরোপীয়দের প্রাণরক্ষা করেছিলেন। এই কর্মপন্থাই ১৮৫৭ সালের

পরে তাঁকে প্রসিদ্ধি দিয়েছিল—এবং তাঁর বাকী জীবন তিনি নিজের সম্প্রদায়ের সেবাতেই নিয়োজিত করেছিলেন।

মুসলমানদের তখন দরকার ছিল একটি শক্তিশালী সংগঠনকারী নেতার। তারা তখন সব সুবিধা হারিয়ে বসেছে—কারণ তারা ছিল ইংরেজী শিক্ষা এবং পশ্চিমী সংস্কৃতির বিরোধী। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ তাদের ব্রিটিশের চোখে সন্দেহভাজন করে তুলেছিল। কারণ, ব্রিটিশেরা ভেবেছিল এটা মোগল শাসন পুনরুদ্ধারের জন্য মুসলিমদের উত্থান। ফলে মুসলমানেরা হয়েছিল অবিশ্বাসের পাত্র ও দমনের শিকার। মুসলমান সমাজের উপর ওয়াহাবিদের প্রভাব অতিরঞ্জিত করে তোলা হয়েছিল।

(২) ব্রিটিশ শাসনকে গ্রহণ:

স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকটা অতিবাহিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকদের মনে এই প্রত্যয় সৃষ্টি করার জন্য যে, মুসলমানেরা হলেন একটি অনুগত সম্প্রদায় এবং তাঁরা ব্রিটিশ শাসনকে আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। ১৮৫৮ সালে তিনি 'দি কজেজ অফ দি ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট' নামে একখানি বই লেখেন। এই বইতে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, 'বিদ্রোহ' ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি হিন্দু উদ্যোগ—যাতে মুসলমানেরা বৃটিশ সরকারের অভিপ্রায় না জেনে যোগ দিয়েছিল। ১৮৬০ সালে লিখিত 'দি লয়্যাল মহামেডানস অফ ইণ্ডিয়া' নামে আর একখানি বইয়ে তিনি যুক্তি দেখালেন যে, ওয়াহাবিরা ছিলেন শিখ-বিরোধী—বৃটিশ-বিরোধী নয়। তাঁরা নিষ্ঠাবান মুসলমানদের ঘৃণার পাত্র ছিলেন এবং সীমান্তে উপজাতিদের বর্বর দুষ্কার্যের জন্য তাঁদের দায়ী করা যায় না। স্যার সৈয়দ ইংরেজী-শিক্ষা প্রসারের অনুরাগী ছিলেন এবং প্রচারপত্রের দ্বারা ব্রিটিশের মুসলমান-বিরোধী ধারণাগুলোর' পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। 'মহামেডান সোশ্যাল রিফর্মার' নামে একটি পত্রিকা তিনি বের করেছিলেন—এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসকের সম্মুখে ইসলামের একটি নবতর ও অপেক্ষাকৃত শান্ত প্রতিচ্ছবি স্থাপিত করা।

এই প্রচেষ্টার ফলে প্রচুর লাভ দেখা দিল; ব্রিটিশ শাসকেরা মুসলমানদের প্রতি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করল। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান' নামে হাণ্টারের সুপরিচিত বইখানিতে এক নূতন নীতির আবির্ভাব দেখা যায়। এই প্রভাবশালী বৃটিশ রাজপুরুষের দ্বারা এই নীতি উদ্ভাবিত হয় যে, মুসলমানদের ক্ষোভগুলি দূরীভূত করে তাদের সরকারের চারপাশে সমবেত করা হোক। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তাদের বিপদের দীর্ঘস্থায়ী উৎসরূপে আর ফেলে রাখা যায় না। যেহেতু হিন্দুরা রাজনীতির ক্ষেত্রে আগে থেকেই অসুবিধাজনক কথাবার্তা বলছিল সেজন্য ব্রিটিশ সরকার বিভেদের দ্বারা শাসনের (দিভিদে এত্ ইম্পিরা) নীতি গ্রহণ করল এবং মুসলমানদের স্বদলে আনা স্থির করল।

(৩) ইংরেজী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা :

স্যার সৈয়দ আহমদ বুঝেছিলেন যে, শুধুমাত্র সরকারী সমর্থনেই তাঁর সম্প্রদায় নিজেকে শক্তিশালী করতে পারবে না ; নিজেকেও চেষ্টা করতে হবে নিজের বল বাড়াতে এবং তা পারা যাবে ইংরেজী শিক্ষা ও পশ্চিমী সংস্কৃতি গ্রহণের দ্বারা। তিনি মুসলমানদের বোঝালেন যে, পবিত্র কোরানে এমন কিছু নেই যেটা এই শিক্ষা গ্রহণের পথে বাধা হতে পারে এবং এই শিক্ষাই হল অগ্রগতির ভিত্তি। ১৮৬৪ সালে গাজীপুরে তিনি একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। তিনি প্রয়োজনীয় ইংরেজী বইগুলি উর্দু অনুবাদে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং এর জন্য বৈজ্ঞানিক সমাজের (সায়েন্টিফিক সোসাইটি) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৮৬৯ সালে তিনি ইংলণ্ড পরিভ্রমণে যান এবং সেখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ হন। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের অনুসরণে ভারতে মুসমানদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা সেখানেই তিনি চিন্তা করেন। ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৮৭৭ সালে আলিগড় মহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড লিটন কর্তৃক এর ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং প্রিন্সিপাল বেকের সাংগঠনিক ক্ষমতার দ্বারা কলেজের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। ব্রিটিশ শাসক ও মুসলমান 'সম্প্রদায়ের মিলনের প্রতীক' রূপে এই কলেজটি বর্ণিত হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে মুসলান ছাত্রেরা আলিগড় এসে যোগদান করেছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের মাঝে পশ্চিমী শিক্ষা বিস্তারে কলেজটির অবদান অনেকখানি। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে কলেজটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। কলেজটির প্রভাব শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না—রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপের কেন্দ্রও হয়ে উঠেছিল এটা। চিন্তা ও কার্যক্রম সমবেতভাবে 'আলিগড় আন্দোলনে'র রূপ নিয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও স্যার সৈয়দ আহমদ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, পথও স্থির করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলন উল্লেখযোগ্য সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিল কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষ বেকের কাছ থেকে।

(৪) রাজনৈতিক মতামত :

হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে স্যার সৈয়দ পরস্পরবিরোধী কথা বলেছেন। যেমন, ১৮৮৪ সালে তিনি বলেছিলেন ধর্মের দিক থেকে হিন্দু ও মুসলমান পৃথক হলেও একই দেশবাসীরূপে তারা এক ও অভিন্ন জাতি। কিন্তু ১৮৫৮ সালে এই দুটি সম্প্রদায়কে তিনি পরম শত্রুভাবাপন্ন জাতি বলে বর্ণনা করেছিলেন। ১৮৮৩ সালে তিনি বলেছিলেন বহুপ্রকার জাতীয়তার কথা এবং ভারতের একটি মাত্র জেলাতেও তা থাকতে পারে এও উল্লেখ করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতিরূপে

আখ্যা দিয়েছিলেন। এই পৃথকীকরণই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মসূচীর ভিত্তি ছিল।

স্যার সৈয়দ প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বা বিধানের বিরোধী ছিলেন—বিশেষ করে নির্বাচন প্রণালীর। তাঁর প্রধান যুক্তি ছিল যে, এক্ষেত্রে হিন্দুরা মুসলমানদের স্বার্থকে সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত করে দেবে। তিনি বলেছিলেন 'উভয়েই সমান থাকতে পারে এরকম আশা অসম্ভব ও অচিন্ত্যনীয়কেই চাওয়া।'

সুতরাং স্যার সৈয়দ ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তার ধারণা ও কর্মসূচীকে সমর্থন করলেন না। কংগ্রেস-বিরোধী কর্মসূচীর সৃষ্টি ও প্রচারে প্রধান অংশ গৃহীত হল অধ্যক্ষ বেকের দ্বারা। ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হল 'মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন অফ আপার ইণ্ডিয়া'। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় করা এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা।

অ্যালান অক্টাভিয়াস হিউমও কার্যতঃ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও তৃতীয় সভাপতি বদরুদ্দিন তায়েবজির আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্যার সৈয়দ কংগ্রেসের প্রতি তাঁর বিরোধিতা পরিত্যাগ করলেন না। তিনি বলেন, দুটি জাতিকে নিয়ে একটি জাতীয় কংগ্রেস হতে পারে না। হিন্দুদের সার্বভৌম কর্তৃত্বের কথা চিন্তা করে ভীত হলেন। তিনি বললেন—কংগ্রেসের চরম লক্ষ্য হল দেশ শাসন করা, এবং যদিও ভারতে সমস্ত জনগণের পক্ষ থেকেই এই লক্ষ্যে পৌছাতে চাওয়া হচ্ছে, তবু মুসলমানদের অবস্থা হবে অসহায় যেহেতু তারা সংখ্যালঘু। তিনি অধিকাংশ মুসলমানকে কংগ্রেস থেকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর কংগ্রেস-বিরোধী ধারণাগুলি প্রচারিত হত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। তাদের মধ্যে ছিল ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিওটিক এসোসিয়েশন এবং বার্ষিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন।

(৫) সিদ্ধান্ত :

স্যার সৈয়দ আহমদ যে, তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের মস্ত উপকারী ছিলেন এটা সন্দেহাতীত। তিনি পশ্চিমী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সমাজের প্রবেশ ঘটিয়েছিলেন, দৃষ্টভঙ্গীর আধুনিকীকরণও হয়েছিল কিছুটা তাঁর দ্বারা। সর্বোপরি সম্প্রদায়ের নেতাদের তিনি করেছিলেন রাজনীতি-সচেতন। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে—ভারতীয় ইতিহাসের বৃহত্তর পরিধিতে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মাবলী এই উপমহাদেশের পক্ষে ধ্বংসাত্মক হয়েছে। দুই জাতি তত্ত্বের উপস্থাপকও তিনি। এই তত্ত্বই ১৯৪৭ সালে দেশাবভাগ ঘটিয়েছিল। তাঁর জীবনের একটি মাত্রই উদ্দেশ্য ছিল যে-কোন বাধাকে উপেক্ষা করে মুসলমানদের সুবিধা বৃদ্ধি।

Q. 31 What was the attitude of Sir Syed Ahemed to the Indian National Congress ? Explain, in this connection, his reasons for opposing the Congress.

Ans. (১) স্যার সৈয়দের কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবের ক্রমবিকাশ :

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী ধারণা ও কর্মসূচীকে স্যার সৈয়দ সমর্থন করেন নি, কারণ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি তাঁর চোখে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ১৮৫৮ সালেই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে তিনি 'পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন দুইটি জাতি বলে বর্ণনা করেছিলেন। বাংলার মুসলমানেরাও কংগ্রেসে যোগ দিতে চান নি। কিন্তু বাংলার মুসলমানেরা ও স্যার সৈয়দ একই কারণে কংগ্রেস বিরোধিতা করেন নি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই স্যার সৈয়দ-এর প্রতিরোধকল্পে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কংগ্রেস চেয়েছিল প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদ। কিন্তু স্যার সৈয়দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই ধরনের পার্লামেণ্টে মুসলমানেরা চিরদিনই সংখ্যালঘু হয়ে থাকবে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথমদিকে তিনি পরবর্তীকালের কংগ্রেস সদৃশ একটি পরিমিত মধ্যপন্থী রাজনৈতিক সংঘ গঠনের কথা বিশেষভাবে বলেছিলেন। এমন কি, তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের একটি সার্বজনীন রাজনৈতিক কর্মপন্থার কথাও চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু ১৮৮৬ সালে তিনি কংগ্রেসকে বলে বসলেন 'গণবিক্ষোভমূলক প্রতিষ্ঠান'।

১৮৮৭ ও ১৮৮৮ সালে স্যার সৈয়দ আরও মুখর হলেন তাঁর কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করতে। এই ব্যাপারে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন প্রিন্সিপাল বেকের দ্বারা। 'পাইওনিয়ার' ও 'আলিগড় ইনস্টিটিউট' পত্রিকায় বেকের দ্বারা প্রবন্ধমালা রচিত হল। সেখানে বলা হল—বহু-জাতি অধ্যুষিত দেশে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির সরকার অর্থহীন ও অযৌক্তিক। যদি 'ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল' নির্বাচিত ব্যক্তি-মণ্ডলীর দ্বারা রচিত হত—হিন্দুদের থাকত কমপক্ষে মুসলমানদের চেয়ে চারগুণ সভ্য। পরীক্ষাকে যদি মান বলে ধরা হত কলিকাতার হিন্দু স্নাতকেরা মুসলমানদের সরকারী কাজে প্রবেশ করতে দিত না। স্যার সৈয়দ কংগ্রেসের পরিচয় দিয়েছিলেন বাঙালীদের জন্য বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলন বলে। এই যুক্তি দেখিয়ে তিনি মুসলমানদের কংগ্রেস থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। ১৮৮৭ সালে লক্ষ্ণৌয়ে তিনি বলেছিলেন—"তোমরা যদি চাও যে দেশ বাঙালী-শাসনের জোয়াল কাঁধে নিয়ে আর্তনাদ করবে আর দেশবাসী বাঙালীর জুতো চাটবে, তা হলে ঈশ্বরের নাম নিয়ে ট্রেনে চেপে তোমরা মাদ্রাজ চলে যাও।"

(২) স্যার সৈয়দ ও হিন্দুদের কংগ্রেস-বিরোধী অনুভূতি :

স্যার সৈয়দ উত্তর ভারতের হিন্দুদের কাছ থেকে কংগ্রেস-বিরোধিতার সমর্থন পেতে

পারতেন যদি তিনি উপকূলবর্তী প্রদেশগুলির স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থের পার্থক্য কি সেটা দেখিয়ে দিতেন। কিন্তু স্যার সৈয়দ উপকূলবর্তী অঞ্চলের কংগ্রেস ও উত্তর ভারতের অন্তর্বর্তী অঞ্চলের কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক পরস্পর-বিরোধিতা নির্ণয় করতে পারেন নি। তিনি বুঝতে পারেন নি—উত্তর ভারতের নিষ্ঠাবান মানুষদের মধ্যে কংগ্রেস-বিরোধী বলতে শুধু মুসলমানেরাই ছিলেন না—ছিলেন অনেক ক্ষমতাশালী প্রভাবশালী হিন্দুও।

(৩) স্যার সৈয়দ, কংগ্রেস ও মুসলিমগণ :

১৮৮৮ সালে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন এলাহাবাদে হবার সিদ্ধান্ত দুই পক্ষকে মুখোমুখী হবার সুযোগ করে দিল। কংগ্রেস যে সকলের প্রতিনিধিত্ব করছে না এ কথা বোঝাবার জন্য ১৮৮৮ সালের আগস্ট মাসে স্যার সৈয়দ 'ইউনাইটেড প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' স্থাপিত করলেন। হিন্দু ও মুসলমান যে দুটি পৃথক জাতি—এ কথা তিনি ঐ বৎসরেই বলেছিলেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বার্থ অভিন্ন—এ কথা তিনি মানেন নি। মুসলমান ভূস্বামী ও পরিপালকেরা 'ইউনাইটেড প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশনে' যোগ দিলেন। অন্যদিকে দেখা যায়—নিষ্ঠাবান মুসলমানেরা স্যার সৈয়দকে সুনজরে দেখেন নি, যেহেতু তিনি পশ্চিমী পন্থায় আধুনিক-করণের কথা বলছিলেন। প্রথমবারের অধিবেশনে কংগ্রেসে মুসলমানদের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল দুইজন, দ্বিতীয়বারে ছিল ৩৩ জন, তৃতীয় বারে ছিল ৭৯ জন এবং এলাহাবাদ অধিবেশনে ছিল ২২২ জন। যেসব মুসলিম নেতা কংগ্রেসের বিরোধিতা করছিলেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন বদরুদ্দিন তায়েবজি। ১৮৮৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি স্যার সৈয়দের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন তার উত্তরে স্যার সৈয়দ বলেছিলেন—"মুসলমানেরা কংগ্রেস-বিরোধিতার দ্বারা ভারতের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করতে চাইছেন না বা প্রাপ্য অধিকার ভোগ থেকেও ভারতবাসীদের বঞ্চিত করতে চাইছেন না—তবে এটাও ঠিক যে, যাদের সঙ্গে দৌড়িয়ে আমাদের জিতবার কোন সম্ভাবনা নেই তাদের সঙ্গে দৌড়-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেও আমরা বাধ্য নই।" এই সঙ্গে তিনি মুসলমানদের উন্নত করণের জন্য তায়েবজির প্রচেষ্টাকে প্রশংসাও করেছিলেন। তবে তায়েবজিকে এও মনে রাখতে বলেছিলেন যে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি মিলে কোনদিনই এক জাতি গঠন করতে পারবে না। এ কথা তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন—"ভুল নামধারী জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ শুধুমাত্র আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষেই নয়—সমগ্র ভারতের পক্ষেই ক্ষতিকর।" তিনি এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন—"ভারতবর্ষকে একটি জাতি বলে ধরে নেবে এমন প্রত্যেকটি কংগ্রেস সম্বন্ধে আমি আপত্তি জানাব—হোক না কেন তারা যেকোন আকারের,যে কোন ছাঁচের। এ. ও. হিউমের ঐ একই ধরনের আবেদন স্যার সৈয়দ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

দুটি জাতিকে নিয়ে একটি জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হতে পারে না—এই কথাই তিনি বলেছিলেন। এও বলেছিলেন—"কংগ্রেসের চরম লক্ষ্য হল দেশ শাসন এবং যদিও ভারতের সমস্ত জনগণের পক্ষ থেকেই তারা তা করতে চাইছে, তবু মুসলমানেরা হবে অসহায় কারণ তারা থাকবে সংখ্যালঘু।"

(৪) সাধারণ মুসলমানদের কংগ্রেসের কার্যাদিতে অংশগ্রহণে বিমুখতা :

এটাও নিঃসন্দেহ—স্যার সৈয়দ অধিকাংশ মুসলমানকেই কংগ্রেসে যোগদান থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। ১৮৮৮ সালের ১৪ই মার্চে তিনি দাবী করেছিলেন—তায়েবজিকে বাদ দিলে, আর কোনো বিশিষ্ট মুসলমান মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগ দেন নি। তায়েবজির সমালোচনা করে স্যার সৈয়দ বলেছিলেন যে,তিনি বুঝতে পারেন নি কংগ্রেসের সমস্ত বিষয়ই মুসলমানদের পক্ষে অনুপযোগী। স্যার সৈয়দের লোকজন সারা ভারতেই খুব সক্রিয় ছিল—মুসলমানদের তারা নিরুৎসুক করে তুলছিল যাতে তারা কংগ্রেসে যোগ না দেয়। হায়দ্রাবাদে স্যার সৈয়দ দলে ভারী ছিলেন। সেখানে তাঁর বন্ধু ও সমর্থকেরা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের যে সকল মুসলমান রাজকর্মচারীদের নিজের দলভুক্ত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সালার জঙ্গ, মাস্তাক হোসেন, নবাব ভিকরে-উল-মুলক্ এবং নিজাম স্বয়ং। বোম্বাইতে অঞ্জুমান-ই আহবের লোকেরা স্যার সৈয়দের পক্ষে ছিল এটা সুনিশ্চিত। এরা তায়েবজির নিজস্ব সংগঠিত দল অঞ্জুমান-ই ইসলামকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কংগ্রেসের বিপক্ষে দাঁড় করিয়েছিল। এটিকে একটা বড় রকমের বিজয় বলা চলে।

(৫) প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান প্রতিষ্ঠান :

একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা স্যার সৈয়দ আগেই চিন্তা করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি 'ইউনাইটেড প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত করেন—এর দ্বারা তিনি কংগ্রেসের সকলের প্রতিনিধি করার দাবী আগ্রাহ্য করেন। এই সংঘ ইংলণ্ডে কংগ্রেসের প্রচারিত বিষয়গুলিকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও অযোধ্যায় এই সংঘ বেশ শক্তিশালী ছিল। কিন্তু স্যার সৈয়দের দ্বারা প্রবর্তিত 'মহামেডান এডুকেসনাল কংগ্রেস' অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী হয়েছিল। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের প্রতিটি জেলায় তিনি একটি করে স্থায়ী কার্যনির্বাহক সমিতি তৈরী করতে চেয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অনুরূপ করে একে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। পরিশেষে, ১৮৯৩ সালে 'মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স এসোসিয়েশন অফ আপার ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হল। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে শক্তিশালী করা এবং মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলিকে রক্ষা করা।

(৬) সিদ্ধান্ত :

স্যার সৈয়দের কংগ্রেসকে অস্বীকার—ধর্মনিরপেক্ষ যৌগিক জাতীয়তাবাদকে আগ্রাহ্য

করা থেকেই উদ্ভূত। জাতীয়তাবাদ ও ধর্মকে তিনি সমার্থকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এইদিক দিয়ে দেখলে তাঁর রাজনীতিকে শ্রেণীগত রাজনীতি বলা চলে। তিনি তাঁর নিজের সম্প্রদায়কে কংগ্রেসে ঢুকতে রাজী করিয়ে কংগ্রেসের বনিয়াদকে সুপ্রসারিত করার চেষ্টা করতে পারতেন। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানদের যে ধরনের প্রতিবাদ তিনি কংগ্রেসের সম্মুখে স্থাপন করেছিলেন তার বেশীর ভাগটুকুই এসেছিল অভিজাত বা উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের কাছ থেকে। মুসলিম জনসাধারণের অনগ্রসরতা তাঁর পরিকল্পনাতে বিশেষ কোন স্থান পায় নি। যাই হোক, তিনি ছিলেন কংগ্রেসের সম্মুখে প্রতিবন্ধকের এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড। সবকিছু দেখে তায়েবজি বলেছিলেন যে, বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত মুসলমানেরা কংগ্রেসের পক্ষেই আছেন। তবে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে, 'দুরধিগম্য মুসলিম সংখ্যাধিক্য আমাদের বিপক্ষেই রয়েছে।'

Q. 32. Give an account of some of the Principal agricultural Productions of India.

Or,

What were the factors that inhibited the development of agriculture in the later half of the 19th century.

Ans. (১) **ভূমিকা :**

সুদীর্ঘকাল ধরেই চাল এবং গম ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য ছিল এবং এর সম্পূরক হিসাবে আরও দুটি খাদ্যশস্য যব ও জোয়ার। তা ছাড়া, নানাধরনের ডাল, তৈলবীজ, তুলা, পাট, নীল, মসলা এবং তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হত। এই সকল শস্য চাষ করতে অতি সাধারণ এবং প্রায় আদিম কালের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হত। যন্ত্রপাতির মধ্যে থাকত হাল্কা কাঠের লাঙ্গল, কাঠ এবং বাঁশ নির্মিত শস্য মাড়াই করার দণ্ড আর লৌহনির্মিত যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল হাল্কা ধরনের কোদাল এবং কাস্তে। কৃষির কার্যে বলদ এবং মোষের শক্তি ব্যবহার করা হত। এদের সাহায্যে হলকর্ষণ এবং কৃষি ও পানীয়ের উদ্দেশ্যে কূপ হতে জল উত্তোলন করা হত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ধরনের অতি সাধারণভাবে কৃষিকার্য পরিচালিত হত। উনবিংশ শতাব্দীতে আলু, চা এবং কফির মতো নতুন কৃষিপণ্যাদির চাষ শুরু হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় কৃষিপদ্ধতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।

(২) **কৃষিপণ্য রপ্তানি—তুলা :**

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্বপ্রথম নীল, তুলা, পাট এবং তৈলবীজ জাতীয় ভারতীয় কৃষিজ পণ্যাদির রপ্তানির যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে তা উপলব্ধি করতে পারে। এই সময় ইংলণ্ডে শিল্পোন্নতির ফলে সে দেশে ভারতীয় শিল্পজাত

সামগ্রীর আমদানির উপর আরোপিত সংরক্ষণমূলক নিয়ন্ত্রণ বিধির চাপে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য নতুন কৃষিপণ্যের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হয়। রপ্তানির জন্য চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের পর বাংলায় পাট চাষের বিস্তার ঘটে। দাক্ষিণাত্যে তুলা চাষের প্রসার হতে থাকে। ১৮৪০ থেকে ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতে বিদেশী জাতের কিছু তুলার চাষ প্রবর্তিত হয় এবং এই ধরনের চাষকে স্থানীয় জলবায়ুর সঙ্গে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা শুরু হয়।

১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে দেশের আভ্যন্তরীণ অঞ্চলসমূহ রেলপথের সঙ্গে যুক্ত হলে এবং সামুদ্রিক পরিবহনের উন্নতির ফলে ভারী সামগ্রীসমূহ বিদেশে প্রেরণ সহজতর হলে, ভারতের কৃষিজ পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ আরও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের পর বাণিজ্যিক সংস্থা হিসাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্রিটিশ বণিকগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে নতুন উদ্যম প্রদর্শন করতে শুরু করেন। অপরদিকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের (১৮৬১—১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দ) সময় ভারতীয় কৃষির বাণিজ্যিক-করণ আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়। এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদনকারীরা তুলার সরবরাহের বেশির ভাগই আমেরিকা থেকে আমদানি করতেন। অতঃপর তাঁরা তুলার জন্য ভারতের উপর নির্ভর করতে শুরু করেন। ১৮৬০ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে ভারতীয় তুলার আমদানি ২½ গুণ বৃদ্ধি পায়। ভারতের তুলার মূল্যও এই সময়ে প্রায় পূর্বের তুলনায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে তুলার চাষের এলাকা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যেতে শুরু করে। অপ্রত্যাশিত দরে অধিকতর তুলা রপ্তানির মুনাফা ব্রিটিশ-ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের কৃষকশ্রেণীর আয় বৃদ্ধি করে।

কিন্তু আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর তুলা রপ্তানি ক্রমশঃ হ্রাস পেতে শুরু করে পুনরায় পূর্বের স্তরে নেমে আসে। ১৮৭০—১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তুলার মূল্যও হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৮০ থেকে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তুলার মূল্য কিছু বৃদ্ধি পেলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তুলার মূল্য দ্রুত কমতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তুলার মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই মূল্য কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুলার দাম আবার কমতে থাকে এবং বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হলে তুলার দাম শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ হ্রাস পায়। ফলে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোতে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য অধিকতর জমি ব্যবহার শুরু হলে তুলা উৎপাদনের পরিমাণও হ্রাস পায়। ভারত বিভাগের সময় কাঁচা তুলা রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১·৬ লক্ষ টন এবং তার মূল্য ছিল ২২·৬ কোটি টাকা।

(৪) **পাট রপ্তানি :**

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কাঁচা পাট ভারতীয় রপ্তানির তালিকাভুক্ত হলে পাট চাষের এলাকা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। দেশের অভ্যন্তরে পাটকলের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী মন্দার পূর্বের বছরগুলোতে কাঁচা পাটের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। বিশ্বব্যাপী মন্দার অব্যবহিত পূর্বে কাঁচা পাটের রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৯ লক্ষ টন। বিশ্বব্যাপী মন্দা কাঁচা পাটের রপ্তানি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং ১৯৩৩-৩৪ খ্রীস্টাব্দে কাঁচা পাটের রপ্তানি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে ৫'৬ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। কাঁচা পাটের মূল্য হ্রাসের ফলে পাটচাষীগণ আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাঁচ পাটের মূল্য ১৯২৮-২৯ খ্রীস্টাব্দে প্রতি টন ৩৫৫ টাকা থেকে ১৯৩৩-৩৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতি টন ১৭৫ টাকায় নেমে আসে। তবে পরবর্তী বছরগুলোতে কাঁচা পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তার রপ্তানি ও মূল্য উভয়ই সামান্য বাড়তে থাকে। অপরদিকে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করে কাঁচা পাটের মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে স্বেচ্ছা-মূলক ভিত্তিতে পাট চাষের এলাকা সঙ্কোচনের একটি পরিকল্পনা বাংলার সরকার গ্রহণ করে। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে এই নীতিকে বাধ্যতামূলক করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় পাটকলগুলো উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বাধ্য হলে কাঁচা পাটের রপ্তানি হ্রাস পায়। এই কাঁচা পাটের টন প্রতি মূল্যও অনেক বৃদ্ধি পায়। ভারত বিভাগের প্রাক্কালে কাঁচা পাট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩'১ লক্ষ টন এবং তার মোট মূল্য ছিল ১৯ কোটি টাকা।

(৪) **খাদ্যশস্য রপ্তানি :**

১৮৬০ খ্রীস্টব্দের পর থেকে চাল এবং গমের রপ্তানিও বৃদ্ধি পায়। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি বছরগুলোতে প্রতিবছর প্রায় ১২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য রপ্তানি করা হত। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, ভারত থেকে খাদ্য রপ্তানি দেশের খাদ্যের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটাবার পর করা হত এবং খাদ্যশস্য রপ্তানি বাস্তবিকই উদ্বৃত্তের প্রতিরূপ ছিল এরূপ মনে করলে ভুল করা হবে। ব্যাপক দারিদ্র্যের ফলে জনগণের অনেকেই তাদের খাদ্যের প্রয়োজন সম্পূর্ণ মেটাতে পারত না। খাদ্যশস্য এই ধরনের বহু লোকের নাগালের বাইরে ছিল বলেই রপ্তানির জন্য চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশের খাদ্যের সরবরাহ সুরক্ষিত করতে রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি প্রবর্তিত হত। তথাপি ১৯১৯-১৯২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারত খাদ্যশস্য রপ্তানিকারী দেশরূপেই পরিচিত ছিল। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ভারত খাদ্যশস্য আমদানিকারী দেশে পরিণত হয়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল ততদিন ভারতের খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ খুব কম ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতে খাদ্যশস্যের বার্ষিক আমদানির পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ টন। যুদ্ধের সময় আমদানির পরিমাণ হ্রাস পেতে শুরু হয়। এমন কি, ১৯৪২-১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতকে সিংহলে চাল রপ্তানি করতে হয়। ফলে

বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যুদ্ধের পর ভারতে খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি পরিমাণে খাদ্য আমদানি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ভারত বিভাগের সময় প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হত।

(৫) কৃষি উৎপাদনে সমস্যা :

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে দেখা যায় যে, খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অপেক্ষা হ্রাস পেতে শুরু করে। এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য তদানীন্তন ভারত সরকার যে একটি কমিটি নিয়োগ করে তার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এই সময় খাদ্যশস্যের চাষে নিয়োজিত ভূমির পরিমাণ এবং খাদ্যোৎপাদন উভয়ই জনসংখ্যার বৃদ্ধির তুলনায় অতীব মন্থর গতিতে বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ, ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের পর জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন তার সঙ্গে তাল রাখতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, খাদ্যশস্য উৎপাদনের এবং সাধারণ-ভাবে মোট কৃষিউৎপাদনের হিসাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত খুব নির্ভরযোগ্য ছিল না। তবে এ কথা ঠিক যে, দীর্ঘকাল যাবৎই মাথাপিছু খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে।

১৮৮০ থেকে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে যা তথ্য পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে প্রমাণ করা যায় যে, এই সময় খাদ্যশস্যের চাষে নিয়োজিত জমি অপেক্ষা অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে এই সময় খাদ্যশস্যের মূল্যের তুলনায় অন্যান্য কৃষিজ সম্পদের বাজার মূল্য বেশি ছিল। সুতরাং কৃষকগণ স্বভাবতই এই সকল কৃষিপণ্য উৎপাদনে বেশি আগ্রহী ছিল। ফলে নানা ধরনের তৈলবীজ, পাট, তামাক, চা, কফি প্রভৃতির চাষের জন্য নিয়োজিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় আর তার তুলনায় খাদ্যশস্য ও তুলার চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাণিজ্যিক কৃষিপণ্যের মুনাফার অধিকাংশই বিদেশী বণিকদের হস্তগত হত। ফলে সামগ্রিকভাবে আর্থিক আমদানি বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ চাষীদের খুব উপকার হয় নি।

অপরদিকে ব্রিটিশ শাসকগণ ও তাদের সহযোগী বিদেশী বণিকদের মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল প্রধানতঃ কৃষিজ সংক্রান্ত উৎপাদনের বাণিজ্যিক কার্যকলাপের দিকে। দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য সাধন এবং অধিকতর মুনাফা প্রদানে সমর্থ কৃষিপণ্যগুলোর উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ছিল তাঁদের মূল নীতি। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চা, কফি, আফিম প্রভৃতির চাষে উৎসাহ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কৃষির উন্নতির কোন সাধারণ নীতির ফল হিসাবে এই উৎসাহ দেওয়া হয় নি। সুতরাং এই ধরনের একপেশে নীতি কৃষির উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হয়। নিজেদের বিনিয়োগ থেকে দ্রুত মুনাফা লাভ করার আগ্রহে উৎপাদন এবং উন্নতির স্বাভাবিক নিয়মবিধি কোথাও গৃহীত হয় নি।

ব্রিটিশ সরকার কৃষির উন্নতির জন্য কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল না। ভারতের কৃষিসম্পদ মূলত মৌসুমী বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই বৃষ্টির পরিমাণ প্রতিবছর একরকম নয়। ফলে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি উভয়ই কৃষিপণ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থার দ্বারা জমিতে প্রয়োজনীয় জল বণ্টন অথবা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থাই করে নি। প্রকৃতপক্ষে জলসেচ ব্যবস্থা না থাকার জন্য ভারতের কোন না কোন অঞ্চলে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। তা ছাড়া, চাষবাসের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক রীতিনীতি প্রয়োগ করারও কোন চেষ্টা করা হয় নি। ভারতীয় কৃষির সনাতন পদ্ধতি অনুসরণ করেই কৃষকগণ জমি চাষ করত। ফলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কৃষি সার ব্যবহারের সুযোগসুবিধাও চাষীদের ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকেও সেই ব্যাপারে কোনরূপ সাহায্য করা হয়নি। উন্নতমানের কৃষিবীজ সরবরাহের কোন ব্যবস্থাও সরকারীভাবে হয় নি। যদিও ব্রিটিশ সরকার খুব ভাব ভাবেই জানত যে, ভারতের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি, তথাপি তারা এই বিষয়ে কোন দৃষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করে নি।

উপরি-উক্ত কারণগুলো ছাড়াও ভারতের কৃষির ক্রমাবনতির আরও কয়েকটি কারণ ছিল। তার মধ্যে একটি হল জমির মালিকানার সমস্যা। ভারতের অনেক অঞ্চলেই কৃষকগণ জমির মালিক ছিল না, জমিদার বা জোতদার শ্রেণী ছিল জমির মালিক। সুতরাং তারা যে কোন সময় কৃষককে জমি থেকে বিতাড়িত করতে পারত। ফলে কৃষকগণ কখনই নিজেদের অর্থ এবং শক্তি ব্যয় করে জমির উন্নতি করার পক্ষপাতী ছিল না। তা ছাড়া, ভারতের কৃষকদের দারিদ্র্য কৃষির উন্নতির পথে সবচাইতে বড় বাধার সৃষ্টি করে। প্রায় সকল কৃষকই গ্রামের মহাজনদের নিকট ঋণী ছিল এবং অনেক সময় বংশানুক্রমিক ভাবেও তাদের এই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর হত না। কৃষকদের এই বংশানুক্রমিক আর্থিক দুর্গতি কৃষি ও কৃষকের উন্নতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা স্বরূপ দেখা দেয়।

Q. 33. What were the factors which distinguished modern politics from traditional politics in mid-Victorian India ?

What were regional and social basis of this modern politics ?

Ans. (১) পটভূমিকা :

আধুনিক ভারতে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য যেসব ভারতীয় নেতা সর্বপ্রথম আন্দোলন শুরু করেন রাজা রামমোহন রায় তাঁদের অন্যতম ছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচারের ক্ষেত্রে জুরী প্রথার প্রবর্তন, শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, ভারতীয়দের উচ্চ সরকারী পদে নিয়োগ, জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করার ব্যবস্থা, ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতির পথ সুগম করা প্রভৃতিই ছিল তার আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রতিও তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল এবং যেখানেই স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ দেখতে পেতেন তার প্রতি তিনি সমর্থন জানাতেন।

রাজা রামমোহনের এই ঐতিহ্যের উত্তরসূরী ছিলেন নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ একদল বাঙালী যুবক। তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন স্বনামখ্যাত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষক হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিওর ছাত্র এবং তাঁর নাম অনুসারে তাঁরা নিজেদের ডিরোজিয়ান বলে অভিহিত করতেন। ডিরোজিওর ছাত্রগণ টমপেন এবং জেরেমি বেন্থামের রচনা এবং ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা থেকে স্বাধীনতা ও স্বদেশ প্রেমের প্রেরণা লাভ করে। ডিরোজিয়ানগণ অসংখ্য সভাসমিতি স্থাপন করে তাদের মাধ্যমে আধুনিক চিন্তাধারা ভারতীয়দের নিকট জনপ্রিয় করে তোলার এবং ভারতের ক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে স্বদেশ সম্পর্কে নতুন ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্নস্থানে রাজনৈতিক সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করে।

(২) রাজনৈতিক সভা-সমিতি :

রাজনৈতিক সমিতির মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাতীয় চেতনা বিকাশ লাভ করে। সুগঠিত জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভবও এই সময় থেকেই শুরু হয়। এই যুগে ভারতের আধুনিক বুদ্ধিজীবী সমাজ রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসারের জন্য ও রাজনৈতিক কাজের গোড়াপত্তনের জন্য বিভিন্নস্থানে রাজনৈতিক সমিতি স্থাপন করেন। নতুন রাজনৈতিক ভাবধারা, বাস্তব সম্পর্কে নতুন বুদ্ধিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে নতুন লক্ষ্য, সংগ্রাম ও প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন শক্তি, রাজনৈতিক সংগঠনের নতুন পদ্ধতি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণের জন্য তাঁরা প্রচেষ্টা শুরু করেন। মতাদর্শ, নীতি সংগঠন এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও তাঁরা এক নতুন রাজনৈতিক কর্মধারা সুনির্দিষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই কাজ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, কারণ আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে অধিকাংশ ভারতবাসীই তখন অপরিচিত ছিল। তখন রাজনৈতিক উপায়ে যে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে এই ধারণাও ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। সুতরাং আধুনিক রাজনৈতিক চেতনায় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে এইসব সভা-সমিতির সংগঠকদের দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়।

এ কথা ঠিক যে, অনেক সময় ধর্মীয় উদ্দীপনা, জাতি ও সাম্প্রদায়িক সংহতি প্রভৃতি ভারতীয়দের সভা-সমিতি গঠন করতে উৎসাহিত করে তুলেছে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গড়ে ওঠা সভা-সমিতির সঙ্গে পূর্ববর্তীকালের এই সব সভা-সমিতির প্রচুর পার্থক্য ছিল। আধুনিক সভা-সমিতিগুলো জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ সংগঠন হিসাবে জন্মলাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর এই সভা-সমিতি স্থাপিত হওয়ার পটভূমিকায় ছিল একই প্রকার চিন্তা, কর্মদক্ষতা, শিক্ষা, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। যৌথ পরিবারের, সম্প্রদায়ের বা আঞ্চলিক স্বার্থে এইসব সংগঠন স্থাপিত হয় নি। এক সময় পরিবার, সম্প্রদায়, অঞ্চল প্রভৃতিই ছিল সভা-সমিতি গড়ে ওঠার একমাত্র কারণ, কিন্তু চিরাচরিত নীতি পরিত্যাগ করে ভারতীয়গণ আধুনিক রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করতে শুরু করলে উপরি-উক্ত বিষয়-গুলোর গুরুত্ব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়।

কিন্তু চিরাচরিত প্রথা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে আধুনিক যুগের পক্ষে একান্ত উপযোগী জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ সভা-সমিতি গঠনের কৃতিত্ব বাস্তবিকই প্রশংসাপূর্ণ। সভা-সমিতি ভারতীয়দের নিকট অভিনবত্বহীন। সাধারণভাবে বিবেচনা করলে তথাকথিত প্রত্যেকটি জাতি কিংবা সম্প্রদায়কে এক-একটি স্বতন্ত্র সঙ্ঘ বা সমিতিরূপে মনে করা যেতে পারে। কার্যতও তাই ছিল, কিন্তু তদানীন্তন রাজনৈতিক চাপ ভারতীয়দের এমন একটি অবস্থার সম্মুখীন করে যার ফলে জাতি, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন সাময়িকভাবে উপেক্ষা করে তারা নতুন সভা-সমিতিতে অংশ গ্রহণ করতে সম্মত হয়। দ্বিতীয়ত, শিখ এবং মারাঠাদের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ব্যাপক দেশপ্রেমের কথা ভারতীয়দের নিকট অপরিচিত ছিল না। তৃতীয়ত, পুরাতন ও নতুন ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য আধুনিক রাজনীতির সংগঠক বুদ্ধিজীবীগণ পরিবার, জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতির গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করেন। অনেক সময় জাতি ও ধর্ম ভিত্তিক সংগঠনগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও বৃহত্তর ও আধুনিক রাজনৈতিক সভা-সমিতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হতে থাকে। টমাস হবসের ভাষায় জাতি ও ধর্মের উপর গঠিত সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত রাজনৈতিক সভা-সমিতিসমূহকে 'করপোরেশন' বলা যেতে পারে—নতুন রাজনৈতিক সভা-সমিতির ছত্রছায়ায় থেকেও যারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ ছিল। সর্বোপরি এই রাজনৈতিক সভা-সমিতিগুলোর আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তারা ব্রিটিশ শাসন নীতির বিরুদ্ধে অবিরত এবং সুসঙ্গতভাবে সমালোচনা চালিয়ে যেতে থাকে। এইসব রাজনৈতিক সংস্থার সদস্যগণের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের অভাব ছিল না। কিন্তু তাদের সমালোচনা অনেক সময়ই তীব্র ও কঠোর ছিল এবং অধিকারের সীমানাও তাঁরা লঙ্ঘন করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। ক্রমশ সভা-সমিতির সদস্য-সংখ্যা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সমালোচনাও তীব্রতর হতে থাকে এবং রাজনৈতিক দাবি-দাওয়াও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ সরকার এইসব সভা-সমিতি বন্ধ করার পক্ষপাতী ছিল না, ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে আর একটি সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে শুরু করে।

(৩) আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য :

রাজা রামমোহন রায় এবং ডিরোজিয়ানদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় স্থাপিত হল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি। এই সংস্থাই ভারতে স্থাপিত প্রথম রাজনৈতিক সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের সংকীর্ণ লক্ষ্য ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করা। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় স্থাপিত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল আরও ব্যাপক। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে এই দুটি সমিতি মিলিত হয়ে ব্রিটিশ ইন্‌ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামে পরিচিত হয়। তবে নাম পরিবর্তিত হলেও এই সংস্থার শ্রেণীগত ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন হয় নি।

১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন এবং মাদ্রাজ নেটিভ প্রেসিডেন্সিতে মাদ্রাজ অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। কলকাতার সংস্থার মতো এই দুটি সংস্থার অঞ্চল ও শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য ছিল খুবই সংকীর্ণ। বিশেষতঃ বোম্বে অ্যাসোসিয়েশনে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। গুজরাটি, পার্সী এবং মহারাষ্ট্রীয়দের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং ঐ সংস্থার সদস্যদের মধ্যে তার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের আত্মিক বৈশিষ্ট্য বোম্বে অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপের ওপরে কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করতেও অসমর্থ হয়। পার্সী, ইহুদি, পোর্তুগীজ, হিন্দু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বোম্বে অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে প্রথম দিন থেকে যুক্ত থাকলেও পার্সী বণিক সম্প্রদায়ই এই সংস্থায় সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী শ্রেণী হিসাবে দেখা দেয়। পরবর্তীকালে বোম্বে প্রেসিডেন্সির পুনে শহরে আর একটি অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠার পর দুটি সমিতির কার্যকলাপের ফলে আঞ্চলিক ও শ্রেণী চরিত্র বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এমন কি, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও বোম্বে ও পুনের সদস্য তাঁদের আঞ্চলিক ও শ্রেণী চরিত্র বিসর্জন দিতে অক্ষম হন এবং তাঁদের কার্যকলাপের মধ্যে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়।

মাদ্রাজের রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের উদ্যোক্তাগণ অসাড়ম্বরভাবে তাঁদের কাজ শুরু করেন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে তাঁরা মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা স্থাপন করেন। কিন্তু এই সংস্থার প্রধান দুই উদ্যোক্তা জি. এল. চেট্টি এবং পি. সুন্দরম চেউয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপেক্ষা করেও দক্ষিণ ভারতের খ্রীস্টান মিশনারীদের সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদ করতে শুরু করেন। যা হোক, কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজে রাজনৈতিক এই সব সংস্থা গড়ে ওঠার পরই সারা দেশ জুড়ে ছোট ছোট শহরগুলোতেও অনুরূপ সভা-সমিতি স্থাপিত হয়।

(৪) সমিতিগুলোর চরিত্র :

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ভারতের বিভিন্ন স্থানের সভা-সমিতির চরিত্র ছিল প্রধানত আঞ্চলিক। সর্বভারতীয় চিন্তাধারা এবং আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদের তখনও উদ্ভব হয় নি। আঞ্চলিক সমস্যা সেজন্য এইসব সমিতিতে প্রাধান্য পেত। অপরদিকে প্রায় সবগুলো সমিতিতেই আধিপত্য করতেন ধনী ব্যবসায়ী এবং জমিদার

এ কথা ঠিক যে, অনেক সময় ধর্মীয় উদ্দীপনা, জাতি ও সাম্প্রদায়িক সংহতি প্রভৃতি ভারতীয়দের সভা-সমিতি গঠন করতে উৎসাহিত করে তুলেছে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গড়ে ওঠা সভা-সমিতির সঙ্গে পূর্ববর্তীকালের এই সব সভা-সমিতির প্রচুর পার্থক্য ছিল। আধুনিক সভা-সমিতিগুলো জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ সংগঠন হিসাবে জন্মলাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর এই সভা-সমিতি স্থাপিত হওয়ার পটভূমিকায় ছিল একই প্রকার চিন্তা, কর্মদক্ষতা, শিক্ষা, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। যৌথ পরিবারের, সম্প্রদায়ের বা আঞ্চলিক স্বার্থে এইসব সংগঠন স্থাপিত হয় নি। এক সময় পরিবার, সম্প্রদায়, অঞ্চল প্রভৃতিই ছিল সভা-সমিতি গড়ে ওঠার একমাত্র কারণ, কিন্তু চিরাচরিত নীতি পরিত্যাগ করে ভারতীয়গণ আধুনিক রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করতে শুরু করলে উপরি-উক্ত বিষয়-গুলোর গুরুত্ব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়।

কিন্তু চিরাচরিত প্রথা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে আধুনিক যুগের পক্ষে একান্ত উপযোগী জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ সভা-সমিতি গঠনের কৃতিত্ব বাস্তবিকই প্রশংসাপূর্ণ। সভা-সমিতি ভারতীয়দের নিকট অভিনবত্বহীন। সাধারণভাবে বিবেচনা করলে তথাকথিত প্রত্যেকটি জাতি কিংবা সম্প্রদায়কে এক-একটি স্বতন্ত্র সঙ্ঘ বা সমিতিরূপে মনে করা যেতে পারে। কার্যতও তাই ছিল, কিন্তু তদানীন্তন রাজনৈতিক চাপ ভারতীয়দের এমন একটি অবস্থার সম্মুখীন করে যার ফলে জাতি, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন সাময়িকভাবে উপেক্ষা করে তারা নতুন সভা-সমিতিতে অংশ গ্রহণ করতে সম্মত হয়। দ্বিতীয়ত, শিখ এবং মারাঠাদের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ব্যাপক দেশপ্রেমের কথা ভারতীয়দের নিকট অপরিচিত ছিল না। তৃতীয়ত, পুরাতন ও নতুন ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য আধুনিক রাজনীতির সংগঠক বুদ্ধিজীবীগণ পরিবার, জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতির গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করেন। অনেক সময় জাতি ও ধর্ম ভিত্তিক সংগঠনগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও বৃহত্তর ও আধুনিক রাজনৈতিক সভা-সমিতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হতে থাকে। টমাস হবসের ভাষায় জাতি ও ধর্মের উপর গঠিত সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত রাজনৈতিক সভা-সমিতিসমূহকে 'করপোরেশন' বলা যেতে পারে—নতুন রাজনৈতিক সভা-সমিতির ছত্রছায়ায় থেকেও যারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ ছিল। সর্বোপরি এই রাজনৈতিক সভা-সমিতিগুলোর আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তারা ব্রিটিশ শাসন নীতির বিরুদ্ধে অবিরত এবং সুসঙ্গতভাবে সমালোচনা চালিয়ে যেতে থাকে। এইসব রাজনৈতিক সংস্থার সদস্যগণের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের অভাব ছিল না। কিন্তু তাদের সমালোচনা অনেক সময়ই তীব্র ও কঠোর ছিল এবং অধিকারের সীমানাও তাঁরা লঙ্ঘন করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। ক্রমশ সভা-সমিতির সদস্য-সংখ্যা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সমালোচনাও তীব্রতর হতে থাকে এবং রাজনৈতিক দাবি-দাওয়াও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ সরকার এইসব সভা-সমিতি বন্ধ করার পক্ষপাতী ছিল না, ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে আর একটি সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে শুরু করে।

(৩) আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য :

রাজা রামমোহন রায় এবং ডিরোজিয়ানদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় স্থাপিত হল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি। এই সংস্থাই ভারতে স্থাপিত প্রথম রাজনৈতিক সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের সংকীর্ণ লক্ষ্য ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করা। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় স্থাপিত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল আরও ব্যাপক। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে এই দুটি সমিতি মিলিত হয়ে ব্রিটিশ ইন্‌ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামে পরিচিত হয়। তবে নাম পরিবর্তিত হলেও এই সংস্থার শ্রেণীগত ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন হয় নি।

১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন এবং মাদ্রাজ নেটিভ প্রেসিডেন্সিতে মাদ্রাজ অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। কলকাতার সংস্থার মতো এই দুটি সংস্থার অঞ্চল ও শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য ছিল খুবই সংকীর্ণ। বিশেষতঃ বোম্বে অ্যাসোসিয়েশনে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। গুজরাটি, পার্সী এবং মহারাষ্ট্রীয়দের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং ঐ সংস্থার সদস্যদের মধ্যে তার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের আত্মিক বৈশিষ্ট্য বোম্বে অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপের ওপরে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতেও অসমর্থ হয়। পার্সী, ইহুদি, পোর্তুগীজ, হিন্দু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বোম্বে অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে প্রথম দিন থেকে যুক্ত থাকলেও পার্সী বণিক সম্প্রদায়ই এই সংস্থায় সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী শ্রেণী হিসাবে দেখা দেয়। পরবর্তীকালে বোম্বে প্রেসিডেন্সির পুনে শহরে আর একটি অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠার পর দুটি সমিতির কার্যকলাপের ফলে আঞ্চলিক ও শ্রেণী চরিত্র বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এমন কি, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও বোম্বে ও পুনের সদস্য তাঁদের আঞ্চলিক ও শ্রেণী চরিত্র বিসর্জন দিতে অক্ষম হন এবং তাঁদের কার্যকলাপের মধ্যে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়।

মাদ্রাজের রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের উদ্যোক্তাগণ অসাড়ম্বরভাবে তাঁদের কাজ শুরু করেন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে তারা মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা স্থাপন করেন। কিন্তু এই সংস্থার প্রধান দুই উদ্যোক্তা জি. এল. চেট্টি এবং পি. সুন্দরম চেউয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপেক্ষা করেও দক্ষিণ ভারতের খ্রীস্টান মিশনারীদের সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদ করতে শুরু করেন। যা হোক, কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজে রাজনৈতিক এই সব সংস্থা গড়ে ওঠার পরই সারা দেশ জুড়ে ছোট ছোট শহরগুলোতেও অনুরূপ সভা-সমিতি স্থাপিত হয়।

(৪) সমিতিগুলোর চরিত্র :

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ভারতের বিভিন্ন স্থানের সভা-সমিতির চরিত্র ছিল প্রধানত আঞ্চলিক। সর্বভারতীয় চিন্তাধারা এবং আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদের তখনও উদ্ভব হয় নি। আঞ্চলিক সমস্যা সেজন্য এইসব সমিতিতে প্রাধান্য পেত। অপরদিকে প্রায় সবগুলো সমিতিতেই আধিপত্য করতেন ধনী ব্যবসায়ী এবং জমিদার

গোষ্ঠী। তাদের কাজ-কর্মের মধ্য দিয়া উত্তরোত্তর এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এদের স্বার্থ জমিদারদের শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে এবং ফলে শাসক শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। সেজন্য তারা সযত্নে কৃষক সমাজকে সভাসমিতি থেকে দূরে রেখে নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে। আবার নিজেদের প্রয়োজনেই তারা শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, শাসনবিভাগে আরও বেশি সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ, শিক্ষা বিস্তার, সরকারী কার্য পরিচালনায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণ এবং ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতির পথে সহায়তা ইত্যাদির জন্য মাঝে মাঝে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দাবিও পেশ করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উল্লেখ করা যেতে পারে।

কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আঞ্চলিক ভিত্তির যেমন অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়, শ্রেণীভিত্তিক এইসব সংগঠনের মধ্যে তেমনই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। কলকাতার সংস্থায় ভূস্বামীদের প্রাধান্য ছিল, বোম্বের সংস্থায় প্রাধান্য লাভ করে ব্যবসাজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এবং মাদ্রাজের সংস্থায় প্রাধান্য দেখা যায় তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের। ফলে এই তিনটি সংস্থার কার্যকলাপের মধ্যে তাদের সদস্যদের সামাজিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। শ্রেণী ভিত্তিক এইসব সংস্থা শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার দিকে যতটা আগ্রহী ছিল, সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ততটা উৎসাহী ছিল না। সুতরাং এই সব সভাসমিতির কর্ম-পন্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে একদল তরুণ বুদ্ধিজীবী নতুন রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তোলার জন্য যত্নবান হন এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির করতলগত সভাসমিতির পরিবর্তে তাঁরা সামাজিক ও শ্রেণীর সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে ব্যাপক ভিত্তির উপর নতুন সংস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা শুরু করেন। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পথ সুগম করার ব্যাপারে ঐ সব সভাসমিতির দান অপরিসীম। এই সম্পর্কে অধ্যাপক অনিল শীল বলেন, "Transcending the ties of family, caste, religion and locality, and surviving their random baginnigs, there associations ware the first overt sign of a social and political revolution in the continent."

Q. 34. Briefly review development of education in modern India up to the recommendations made by the Saddler Commission.

Ans. ভূমিকা :

বাংলা দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ভারতে শিল্প বিস্তারের জন্য কোন নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেন নি। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড ভারতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এক সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করেন এবং জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি নির্দেশপত্র পাঠান। এই নির্দেশপত্রে

একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশও করা হয়। বেসরকারী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার অনুদান মঞ্জুর করার নীতি এবং বিদ্যালয়গুলোর পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধান সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারতে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে উডের নির্দেশনামার (Wood's Education Despatch) গুরুত্ব অপরিসীম বলে তা ভারতে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে ম্যাগনা-কার্টা নামে পরিচিত।

(২) শিক্ষাবিস্তারের প্রথম পর্ব ঃ

১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে উডের নির্দেশনামা প্রচারিত হওয়ার পর থেকেই ভারতে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৮৫৪ থেকে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ভারতের শিক্ষা বিবর্তনের ইতিহাসে ভিক্টোরিয়া পর্ব নামে পরিচিত। এই সময় ভারতের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকার জন্য শাসকবর্গ শিক্ষাবিস্তারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ লাভ করেন। ফলে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রত্যেকটি প্রদেশে স্বতন্ত্র শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া, বিভিন্ন সময়ে কমিটি ও কমিশন গঠন করে শিক্ষা সম্পর্কে নানা প্রকার সমীক্ষা করা হয়। অপরদিকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে খ্রীস্টান মিশনারী, সরকারী ও বেসরকারী—এই তিনটি মাধ্যমের উপর শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে সরকারী ও খ্রীস্টান মিশনারী সম্প্রদায় শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে শিক্ষাবিস্তারের মূল দায়িত্ব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রহণ করতে হয়। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ভারতে বিভিন্ন ধরনের ৫৮,৬৫৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ২৬৩৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিদেশীদের দ্বারা পরি-চালিত হত। তবে বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হলেও সরকার এই সব প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুদান মঞ্জুর করতে শুরু করে। অনুদানের পরিমাণও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সরকারী অনুদানের পরিমাণ ছিল ২১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা, ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে এই অর্থের পরিমাণ হয় ৬৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা এবং ১৮৮১-৮২ খ্রীস্টাব্দে এই অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকায় পরিণত হয়। ইতিমধ্যে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে এই সময় লর্ড মেয়ো শিক্ষাক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি গ্রহণ করে শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারগুলোর উপর ন্যস্ত করেন।

(৩) হান্টার কমিশন ঃ

শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার জন্য ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে ভারত সরকার একটি শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের প্রধান দুটি দায়িত্ব ছিল উডের নির্দেশ-নামার বাস্তব প্রয়োগ ও উপযোগিতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি না হওয়ায় সুনির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে এই কমিশন জেলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের হাতে পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে এবং স্বশাসিত সংস্থাগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি বিশেষ তহবিল রাখার সুপারিশ করে। মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা প্রসঙ্গেও

কমিশন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ এবং নানারূপ সুপারিশ করে। সকল স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অবসানের জন্য কমিশন সুপারিশ করে। তবে এই কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা করলেও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক ঘোষণা করার সুপারিশ করে নি। অপরদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা খাতে সরকারী সাহায্য হ্রাস পায় এবং সরকারী অনুদান অপ্রতুল হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে নি। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, এই কমিশনই প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে বর্ণনা করে প্রাথমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে।

(৪) উচ্চ শিক্ষার অবস্থা :

১৮৮২ থেকে ১৯০২ **খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত** সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার না ঘটলেও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতির হার বেশ উল্লেখযোগ্য ছিল। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩৯১৬ এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ২,১৪,০৭৭। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা হয় ৫১২৪ এবং ছাত্রের সংখ্যা হয় ৫,৯০,১২৯। ইতিমধ্যে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ছাড়াও পাঞ্জাব ও এলাহাবাদে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে কলেজের মোট সংখ্যা ছিল ৭২, ১৯০২, খ্রীস্টাব্দে এই সংখ্যা হয় ১৪৫। সাধারণ কলেজের মতো বৃত্তি ও পেশামূলক কলেজের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে ১৮৮২ থেকে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শিক্ষা জগতের সার্বিক চিত্রটিও পরিবর্তিত হয়। অনুন্নত সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়, অনগ্রসর উপজাতি প্রভৃতি এই সময় থেকে শিক্ষা প্রসারের অংশীদার হয়ে ওঠে। স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা দেয়। যদিও এই সময়ের শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা মূলত বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হত, কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে সবকারের উপর সামগ্রিক দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিল। শিক্ষা সম্প্রসারণ সরকারী অর্থ অনুদানের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং সরকার শিক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন মনোভাব গ্রহণ করতে পারে নি।

(৫) এই ব্যবস্থার ত্রুটি :

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষাক্ষেত্রের প্রশাসনিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য ভারতীয় শিক্ষায় সিভিল সার্ভিস গঠিত হয়। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ছিলেন ব্রিটিশ। ফলে শিক্ষাক্ষেত্র দ্রুত প্রসারিত হলেও শিক্ষাব্যবস্থায় কয়েকটি বিশেষ ত্রুটি দেখা দেয়। প্রথমত, শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী থাকার ফলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-বিস্তারের বিষয়টি অবহেলিত হয়। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের নিকট শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয় নি এবং ভারতীয় ভাষাসমূহের বিকাশের পথও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটলেও কারীগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অবহেলিত হয়। ফলে শিক্ষার সঙ্গে জীবন ও জীবিকার কোন যোগসূত্র স্থাপিত হয় নি। তৃতীয়ত, স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। চতুর্থত, শহরাঞ্চলে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও গ্রামাঞ্চলের জনগণের নিকট তা সহজলভ্য ছিল না। ফলে শহর ও গ্রামীণ সমাজের মধ্যে বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ইংরেজি শিক্ষায়

শিক্ষিত ধনী ভারতীয় সম্প্রদায় সামাজিক ক্ষেত্রে পদমর্যাদা ও অধিকতর সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়ে ওঠেন। অপরদিকে গ্রামীণ অনগ্রসর ভারতীয় সমাজ ক্রমেই আরও বেশি অবহেলিত হতে থাকে। সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার নীতি গ্রহণ করলেও গ্রামের মানুষ শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হয়। তা ছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষার দায়-দায়িত্ব স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর ন্যস্ত হওয়ায় আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তাদের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত প্রসার সাধন সম্ভব হয় নি।

(৬) লর্ড কার্জনের নীতি :

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে অর্থাৎ লর্ড কার্জনের শাসনকাল থেকে শুরু করে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি দেখা দেয়। এই সময় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেয় এবং সরকারী অর্থবরাদ্দের পরিমাণও বৃদ্ধি করে। শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থব্যয়ের পরিমাণ ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ছিল ৪০১ লক্ষ টাকা, ১৯২১-২২ খ্রীস্টাব্দে তার পরিমাণ হয় ১৮৩৭ লক্ষ টাকা। তবে এই সময়ই ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার কঠিন হস্তে শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দমন করার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড কার্জন উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধি ও শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির জন্য স্যার টমাস র‍্যালের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, কলেজগুলোর উপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কঠোর নিয়ন্ত্রণ, ছাত্রদের কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পাঠক্রম ও পরীক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে সুপারিশ করে। কিন্তু র‍্যালে কমিশনের সুপারিশক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় ভারতে তীব্র আন্দোলন দেখা দেয়। লর্ড কার্জন ভারতবাসীর মতবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করেন। এই আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্যাবলীর পরিধি বৃদ্ধি করা হয়। সিনেটের সদস্য সংখ্যার সীমা নির্দ্ধারিত করা হয় এবং সিণ্ডিকেট সংস্থাটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কলেজগুলোর কার্যাবলীর উপর সতর্ক দৃষ্টি দেওয়ার দায়িত্ব সিণ্ডিকেটের হস্তে ন্যস্ত করা হয় এবং সিনেটের কার্যাবলীর তদারকির দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমলা-তান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণ কঠোর সমালোচনা করলেও ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গতিশীল উন্নতি দেখা দেয়। তা ছাড়া, ভারতসরকার উচ্চশিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রতিবছর সরকারী অনুদান দিতে রাজি হয়। তবে শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, স্কুলশিক্ষার ক্ষেত্রেও কার্জন সরকার কর্তৃত্ব স্থাপনে সচেষ্ট হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও কার্জন একটি নতুন নীতি গ্রহণ করেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কার্জনের অনুসৃত নীতির মূল বক্তব্য ছিল গুণগত মান বৃদ্ধি, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি সংখ্যাগত বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেন। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য তিনি প্রাদেশিক সরকাগুলোকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন।

কার্জনের শাসনকালে শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতি দেখা দেয়। চিত্রকলা শিক্ষা, কৃষিবিদ্যা ও নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও নানারকম সংস্কার ঘটে। প্রাচীন

ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি অনুশীলনের জন্য একটি প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ স্থাপিত হয়। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও কার্জনের আমলে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময় সিমলা সম্মেলন অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষার অনুশীলনের জন্য ভারতীয় ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে ইংলণ্ডে প্রেরণের প্রস্তাবও গৃহীত হয় এবং ভারত সরকার প্রতি বছর দশটি সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করে। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে বেসরকারী উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যাদবপুরে একটি কারিগরি শিক্ষার কলেজ স্থাপিত হয়।

(৭) শিক্ষাক্ষেত্রে অভুতপুর্ব পরিবর্তন :

লর্ড কার্জনের পরবর্তীকালে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার ঘটে। প্রকৃতপক্ষে সরকারী নিয়ন্ত্রণের আধিক্য থাকলেও ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইন ভারতে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। এই আইনের সুযোগ নিয়ে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্নাতকোত্তর শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পরবর্তী অর্দ্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত ভারতের উচ্চশিক্ষার গতি নির্ণয় করে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয় এবং ১৯২১-২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় বারো। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদী নেতা মদনমোহন মালব্যের প্রতিষ্ঠিত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও সমাজ সংস্কারক আচার্য ডি কে. কার্ভে প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই এর মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী শিক্ষায়তনের নাম বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়।

কারিগরী প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রেও এই সময় বিশেষ অগ্রগতি ঘটে। গুণ্ডি, পুনে ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রযুক্তি বিদ্যার বিভিন্ন দিকে পঠন-পাঠন শুরু হয়। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাতু-বিদ্যার পাঠক্রম চালু হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে উচ্চতর গবেষণার জন্য ভারতীয় শিল্পপতি জে. এন. টাটার উদ্যোগে বাঙ্গালোরে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন ও গবেষণার প্রসার শুরু হয়। আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' নামেও একটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি দেখা দিলেও প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা খুবই অবহেলিত হয়ে পড়ে। ফলে জাতিয়তাবাদী নেতৃবর্গ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি বেসরকারী বিল উত্থাপন করেন। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এই বিলের প্রতি সমর্থন জানালেও প্রাদেশিক সরকারের এবং কিছুসংখ্যক জাতীয়তাবাদী নেতার বিরোধিতার জন্য বিলটি নাকচ হয়ে যায়।

(৮) স্যাডলার কমিশন :

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের পর ভারত সরকার পুনরায় শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করার চেষ্টা করে। নতুন নীতি অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

স্কুলে শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখা হল, যদিও অনুদানের ব্যাপারে সরকারী নীতি কিছু পরিমাণে শিথিল করা হয়। এই সময়ের শিক্ষা-নীতির একটি গুরুত্ব-পূর্ণ পদক্ষেপ হল স্যার মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের স্যাডলার কমিশনের সুপারিশগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, (১) ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাক্রম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুলে স্থানান্তর ; (২ মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার দায়িত্ব একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা পর্ষদের উপর অর্পণ ; (৩) বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর সরকারী কর্তৃত্ব খর্ব করা ; এবং (৪) তিন বছরের স্নাতক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন। পরবর্তীকালে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করার জন্য ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

(৯) উপসংহার :

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের শিক্ষানীতি ও বিস্তারের বিবর্তন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এই সময় শিক্ষা সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর ও আমলাতন্ত্রের আধিপত্য বজায় ছিল। সুতরাং ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষানীতি ও তার কাঠামো রচিত হয় নি। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, নানারূপ বাধা-বিপত্তির মধ্যেও এই যুগে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটে। তবে শিক্ষার প্রসার সংখ্যাগত দিক থেকে বৃদ্ধি পেলেও গুণগত দিক থেকে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে নি এবং ফলে তা দেশ ও জাতির স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। এই অসম্পূর্ণতা ও ব্যর্থতার জন্য শুধুমাত্র ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র ও সরকারের নীতি নির্দ্ধারকদের দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক নয়, কারণ উচ্চবিত্ত ক্ষমতাশালী ভারতবাসীগণও নিজ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য শিক্ষার আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে উচ্চশিক্ষার ঘোরতর সমর্থক হয়ে ওঠে।

Q. 35. Briefly discuss *the* history of *the* development of National Education.

(১) ভূমিকা :

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হলে ভারতীয় সমাজে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতীয় সমাজের গোড়ামি ও কুসংস্কার দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সকল সমাজ সংস্কারকই ইংরেজি শিক্ষাকে ভারতীয়দের পক্ষে কল্যাণকর এবং আধুনিকতার বাহনরূপে স্বীকৃতি দেন। এইসব সংস্কারকগণ ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে শিক্ষার প্রসার প্রসঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও ভারতীয়দের মধ্যে সংঘাত শুরু হয় এবং শিক্ষা প্রসারের বিষয়টি জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। শিক্ষাকে জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে গড়ে তুলে শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় চেতনার সঞ্চার করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

(২) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্ভব :

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই জাতীয় নেতৃবৃন্দ জাতীয়

শিক্ষা প্রসারের বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। ইতিপূর্বে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে লালা লাজপৎ'রায় প্রকৃত অর্থে জাতীয় ও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের একটি পরিকল্পনা তৈরির জন্য আহ্বান জানান। পরবর্তীকালে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে অ্যানি বেসান্ত জাতীয় শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইতিমধ্যে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ ও আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। জাতীয় নেতৃবৃন্দ শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের দাবি উত্থাপন করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জাতীয় শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পুনর্জাগরণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। আর্য সমাজের উদ্যোগে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এগুলোর মধ্যে লাহোরের ডি. এ. ভি. কলেজ এবং হরিদ্বারের গুরুকুল বিদ্যালয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে শিক্ষার কাঠামো রচনা করাই এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল। হিন্দুদের মতো মুসলিম সম্প্রদায়ও এই সময় শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। মামুদ-আল-হাসান এবং অন্যান্য মুসলমান চিন্তাবিদগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম ধর্ম ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হন। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি কার্যকরী করার পথে স্বাভাবিকভাবেই অনেক প্রকার বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়। ফলে তাঁদের প্রচেষ্টা ঐকান্তিক হলেও সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব ছিল।

(৩) জাতীয় শিক্ষা পরিষদ :

কিন্তু ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের নীতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষা সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ও জাতীয় নীতি গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে তোলে। বিশেষতঃ লর্ড কার্জনের শাসনকালে বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সুস্পষ্ট ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অপরদিকে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের প্রকৃত উদ্দেশ্যও তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়। বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাংলায় স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলনের সূচনা হয় এবং এই আন্দোলন ধীরে ধীরে জাতীয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। জাতীয় আন্দোলনের এই স্রোত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতীয় নেতৃবৃন্দ জনগণের মানসিক উৎকর্ষ সাধন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করেন। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্রিটিশ পণ্য-দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের উদ্ভাবিত শিক্ষাব্যবস্থাকেও তাঁরা বর্জন করে ভারতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনার রূপরেখা প্রস্তুত করেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ নেতৃবর্গের উদ্যোগে একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয় এবং প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়

স্তর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষার কর্মসূচী রূপায়ণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে কলকাতায় একটি জাতীয় কলেজ ও অন্যান্য অঞ্চলে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অরবিন্দ ঘোষ জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে কলকাতায় একটি কারিগরি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে এই প্রতিষ্ঠানটি কলেজ এবং শেষপর্যন্ত যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের অন্যত্রও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। লোকমান্য তিলক, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সর্বভারতীয় চরিত্র গ্রহণ করে। জাতীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় স্বার্থে এবং জাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাহিত্য,বিজ্ঞান, কারিগরি প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। মাতৃভাভাষার মাধ্যমেও তাঁরা শিক্ষার প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের অবসানের পর জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। প্রধানত দুটি কারণে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনের গতিধারা স্তিমিত হয়ে পড়েঃ ১) জাতীয় শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে জাতীয় নেতৃগণ কোন সুস্পষ্ট নীতি ও কর্ম-পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন নি, ফলে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন সংহতি অর্জন করে নি এবং (২) শিক্ষার সঙ্গে জীবিকা অর্জনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষা জনগণকে আকৃষ্ট করে। চাকুরীর ক্ষেত্রে জাতীয় বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার কোন উপযোগিতা না থাকার জন্য জনসাধারণ জাতীয় শিক্ষা গ্রহণে উদাসীন হয়ে ওঠে। তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে এবং শিক্ষার বিষয়টি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

(৪) **উপসংহার :**

কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নানারূপ বাধা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন চিরদিনের জন্য স্তিমিত হয়ে পড়ে নি। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভায় একটি বিল উত্থাপন করেন। এই বিল সরকারের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হলেও ভারতে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য শক্তিশালী জনমত গঠিত হয়। তবে দেশীয় রাজ্য বরোদা এবং বোম্বাই শহরের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও অন্যান্য স্বশাসিত সংস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ইতিমধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় শিক্ষার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে শিক্ষার প্রশ্নটি পুনরায় জাতীয় আন্দোলনের কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে চিহ্নিত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্কুল-কলেজ বর্জন ও জাতীয় শিক্ষার কর্মসূচী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময় গুজরাট বিদ্যাপীঠ, বিহার বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবর্গ ও জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া

নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ভারতের বহু শিক্ষাবিদ্ এবং ছাত্র এইসব জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। গান্ধীজী জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতিকে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও নিয়োগ করার চেষ্টা করেন। সেজন্য তিনি বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রকল্পও গ্রহণ করেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারের উপরও তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই জাতীয় শিক্ষা একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়ার সুযোগ পায়।

Q. 36. Give a short description of the famines in your period, what steps did the Government take to tackle the situation ?

Ans. (১) উল্লেখযোগ্য দুর্ভিক্ষ :

১৮৫৭ থেকে ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বার বার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনেক সময় এই সব দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী বছরগুলোতে দেশের এক বিরাট অংশে কৃষিকার্য অবহেলিত হয়। তা ছাড়া, ১৮৫৮-৬০ এই কয়েক বছর মৌসুমি বায়ুও প্রতিকূল ছিল। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থানের ও পাঞ্জাবের একাংশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং পরবর্তী বছরেও এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ চলতে থাকে। ১৮৬৬-৬৭ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে (বর্তমান তামিলনাড়ু), বাংলাদেশ ও বিহারের একাংশ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের অনাবৃষ্টিই ছিল এই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ। পরবর্তী বড় দুর্ভিক্ষ ১৮৬৮-৭০ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম ভারতের এক ব্যাপক অঞ্চলে শুরু হয়। রাজস্থানে এই দুর্ভিক্ষ চরম আকার ধারণ করে। অনাবৃষ্টির ফলে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে বাংলা, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে মৌসুমি বায়ুর আগমনের বিলম্বের ফলে উত্তর বিহারে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। ১৮৭৭ থেকে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান দুর্ভিক্ষের কবলিত হয়। তবে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের পর ব্যাপক ধরনের দুর্ভিক্ষের সংখ্যা হ্রাস পেলেও বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝে মাঝে স্থায়ীভাবে খাদ্যাভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১৮৮৮-৮৯ খ্রীস্টাব্দের গঞ্জাম দুর্ভিক্ষ এবং ১৮৯১-৯২ খ্রীস্টাব্দের মারওয়ার এবং মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ সাধারণ মানুষের জীবনে অভিশাপরূপে দেখা দেয়। তবে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে মৌসুমী বায়ুর স্বল্পতার জন্য দেশের বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে নিদারুণ দুর্ভিক্ষের উদ্ভব ঘটে। এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রায় দুবছর ধরে চলে। এরপর কয়েক বছর নিয়মিতভাবে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হওয়ার জন্য ভারতের সর্বত্রই খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য দেখা যায়। কিন্তু ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে মৌসুমীবায়ুর পরিস্থিতি আবার প্রতিকূল হয়ে ওঠে। ফলে ১৯০৫-১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে উত্তর প্রদেশ ও বোম্বাই অঞ্চল দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাব ও পূর্ববাংলায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পরবর্তী বছরে উত্তরবিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। কিছু দিন পরে ১৯০৮-১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যা, বাংলা ও উত্তরপ্রদেশের কতক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন ছিল। সাধারণভাবে বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত ভারতের কোন না কোন অংশে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোতেও মৌসুমি বায়ুর স্বল্পতার জন্য দেশের নানাস্থানে খাদ্যাভাব দেখা দিলেও পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে নি। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী

কালেও খাদ্য পরিস্থিতির অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ থেকেই দুর্ভিক্ষের আভাস দেখা দেয়। পূর্ববর্তী বছরে মৌসুমী বায়ু অনিয়মিত থাকায় খাদ্য পরিস্থিতি শোচনীয় আকার ধারণ করে। পরবর্তী বছরে এই দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরে পরিণত হয়। তবে পূর্ববর্তী দুর্ভিক্ষসমূহের সহিত ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পার্থক্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই এই সময় দেশে চরম খাদ্যাভাব ছিল। পূর্বে স্থানীয়ভাবে খাদ্যাভাব দেখা দিলে কর্মহীনতা এবং উপার্জনের সমস্যার সৃষ্টি হত। কিন্তু অপেক্ষাকৃত চড়া দামে খাদ্য-শস্য আমদানি করা সম্ভবপর ছিল। সেজন্য উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের দুর্ভিক্ষসমূহ খাদ্যের দুর্ভিক্ষ ছিল না, ছিল উপার্জনমূলক কাজের দুর্ভিক্ষ। কিন্তু ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে পরিবহনের অসুবিধা, যুদ্ধকালীন মুনাফাবাজী এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে সাংগঠনিক ব্যর্থতার ফলেই তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখা দেয়। সেজন্য এই দুর্ভিক্ষকে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ বলা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশ তথা ভারতে ইংরেজদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ার কয়েক বছর পরেই বাংলাদেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উদ্ভব হয় (ইংরেজি সন ১৭৭০-১৭৭১; বঙ্গাব্দ ১১৭৬) এবং ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসানের কয়েক বছর পূর্বে ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩৫০) পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়।

(২) দুর্ভিক্ষ ত্রাণের সরকারী নীতি ঃ

লর্ড লিটন (১৮৭৬-১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ) ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের দুর্ভিক্ষ প্রশাসন সংক্রান্ত কোন নির্দিষ্ট নীতি প্রকৃতপক্ষে ছিল না। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে জনসাধারাণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য সাময়িকভাবে বিনামূল্যে লঙ্গরখানা, আমদানিকৃত খাদ্যের অবাধ বিতরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। কিন্তু স্থায়ীভাবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষিকার্যের উন্নতি, জলসেচের ব্যবস্থা এবং জনশক্তিকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার জন্য কোন কার্যকরী নীতি গ্রহণ করা হয় নি। সরকারীভাবে সুনির্দিষ্ট কোন নীতি না থাকার জন্য ত্রাণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা স্থানীয় শাসকদের দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ভর করত। ১৮৬০-১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের উত্তর প্রদেশের দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষ ত্রাণের ব্যবস্থা হিসাবে সরকারী খাতে বিবিধ নির্মাণ কার্যের কর্মসূচী গৃহীত হয়। উত্তর প্রদেশের তদানিন্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জর্জ এডমনস্টোন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করার জন্য একটি নির্দেশনামা জারি করেন। তাঁর রচিত এই নির্দেশনামা ভারত সরকারও অনুমোদন করে। এই নীতির মূল বিষয়বস্তু ছিল যে, সমর্থ শ্রমিকদের কর্মে নিযুক্ত করতে হবে এবং শিশু ও বৃদ্ধ, অশক্তদের বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে। ত্রাণ-কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্ভাব্য ন্যূনতম মজুরি দিতে হবে যাতে নিয়মিত কৃষিকার্য পুনরায় সম্ভবপর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা পুনরায় পুরাতন জীবিকায় ফিরে যেতে পারে। ত্রাণ কার্যের জন্য জনসাধারণের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করে অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রস্তাবও এই নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। জনগণের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থের সমপরিমাণ

অর্থ সরকার দান করবে বলেও স্থির করা হয়। ভূমিরাজস্ব মকুবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে কৃষকদের তাকাভি ঋণ দেওয়ার শর্তসমূহ উদার করার ব্যবস্থাও করা হয়। ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় উপরি-উক্ত নীতিসমূহ অনুসরণ করা হয়। তা ছাড়া, এই সময় গ্রাম্য ত্রাণ ব্যবস্থা নামে এক নতুন উদ্ভাবিত নীতিরও প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থায় অতি দরিদ্র ব্যক্তিগণ সাহায্যদানের কর্মকেন্দ্রে উপস্থিত না হয়েই যাতে সাহায্য পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। এই দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য আমদানি সংক্রান্ত নীতিরও পরিবর্তন সাধিত হয়। খাদ্য আমদানি ব্যাবসায়ীদের ব্যক্তিগত কার্যকলাপের উপর ছেড়ে না দিয়ে সরকার নিজেও এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। খাদ্য আমদানি ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারী অর্থভাণ্ডার থেকে অগ্রিম অর্থও মঞ্জুর করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

১৮৬০ থেকে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে রাজস্থানের দুর্ভিক্ষের সময় ভারত সরকার একটি জরুরী নির্দেশনামা জারি করে সরকারী কর্মচারীদের 'তৎপর ও সক্রিয়' ত্রাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়। এই সময় থেকে সরকার সমর্থ দেহী সকল ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত করার দায়িত্বও গ্রহণ করে। তা ছাড়া, জনসাধারণের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ দেওয়ার পরিবর্তে প্রকৃত অসহায়দের সাহায্য করার পূর্ণ দায়িত্ব সরকার নীতিগতভাবে স্বীকার করে। খাদ্যদ্রব্যের অবাধ চলাচলের ব্যাপারে নানা প্রকারের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য আশ্বাস এবং দুর্গত অঞ্চলের কৃষকদের উদার হস্তে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৮৭৩ এবং ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের বিস্তৃত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ভারত সরকারের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অনশনজনিত মৃত্যুর জন্য এই সময় থেকে সংশ্লিষ্ট সব কর্মচারীদের দায়ী সাব্যস্ত করা হতে শুরু করে। সরকার অনেক করে কেন্দ্রীয়, জেলা ও মহকুমাস্তরে ত্রাণ কমিটিগুলোর বিধিনিয়ম প্রস্তুত করে। বিনা পারিশ্রমিকে দেওয়া ত্রাণ কার্যের সংহতি সাধনের ভার এই সকল কমিটির উপর অর্পণ করা হয়। পূর্ববর্তী যে কোন দুর্ভিক্ষের তুলনায় ১৮৭৩-১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় সরকারী খাতে খাদ্য আমদানি অনেক বেশি পরিমাণে করা হয়। দাক্ষিণাত্যের দুর্ভিক্ষের সময় ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ই আগস্ট লর্ড লিটন তার সবিস্তার নির্দেশনামার মধ্যে ভারত সরকারের দুর্ভিক্ষ ত্রাণ নীতির রূপরেখা আরও স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেন। এই নির্দেশনামায় তিনি রাজ্যের সম্পদ ব্যবহার করে সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ের নিয়োগ করে এবং সরকারী কর্মচারীদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে অনশন জনিত মৃত্যু রোধের নীতি ঘোষণা করেন।

(৩) স্ট্র্যাচি কমিশনের সুপারিশ : দুর্ভিক্ষ ত্রাণ নীতির ক্রমবিবর্তনের পরবর্তী স্তর :

১৮৭৮-১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে স্যার রিচার্ড স্ট্র্যাচির সভাপতিত্বে গঠিত দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশগুলো কার্যকরী করা শুরু হয়। দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কার্যকলাপ চালাবার সময় নানা ধরনের যেসব জনহিতকর কার্য গ্রহণ করা হবে—সে সম্পর্কে কমিশনের সুচিন্তিত মতামত ভারত সরকার গ্রহণ করে। কমিশন খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে সরকারী হস্তক্ষেপ

অনুমোদন না করলেও পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন বোধে এই নীতিকে সঙ্গত বলে বর্ণনা করে। উদার ভাবে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা মকুব করার জন্যও এই কমিশন সুপারিশ করে।

দুর্ভিক্ষত্রাণ সংস্থাসমূহের উন্নতি সাধনের জন্য কমিশন কয়েকটি প্রস্তাব করে। এগুলো হল : (১) ত্রাণ কার্যের সময় দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলের জন্য একজন দুর্ভিক্ষ কমিশনার নিযুক্ত হবে ; (২) দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে ; (৩) কৃষিসংক্রান্ত পরিসংখ্যান আরও নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করতে হবে ; (৪) প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারের একটি পৃথক কৃষিবিভাগ স্থাপন করতে হবে এবং (৫) দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য একটি তহবিল গঠন করতে হবে। তা ছাড়া, দুর্ভিক্ষের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গৃহীত দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যে রেলপথ এবং সেবাকার্যের বিস্তার, গ্রামীণ উপজীবিকার বৈচিত্র্য সাধনের মাধ্যমে কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং স্থায়ীভাবে জমির উন্নতির পরিকল্পনার জন্য উদার শর্তে ঋণ দানের সুযোগ-সুবিধার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্ট্র্যাচি কমিশনের প্রতিবেদন শুধু ত্রাণনীতির বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ না করে, সরকারের কৃষি ও পরিবহণ সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণেরও যথাযথ সুপারিশ করে।

১৮৭৮-১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশনের সচিব মিস্টার সি. এ এলিয়ট একটি খসড়া দুর্ভিক্ষ আচরণ বিধি রচনা করে প্রাদেশিক সরকারের মতামতের জন্য তাদের নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন স্তরে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে সে সম্পর্কে এই খসড়ায় নির্দেশ দেওয়া হয়। মূল খসড়াটির ভিত্তিতে স্থানীয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রেখে যথোপযুক্ত নিজস্ব আচরণ বিধি রচনা করার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের উপর অর্পণ করা হয়। খড়সা আচরণ বিধির উপর বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের মন্তব্যও ভারত সরকারকে একটি সংশোধিত আচরণ বিধি রচনা করতে সাহায্য করে। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে একটি আচরণ বিধি রচনা করে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারের নিকট প্রেরণ করে। তবে এই আচরণ বিধি অনুসরণ করে নিজস্ব দুর্ভিক্ষ আচরণ বিধি রচনা করার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া হলেও সংশোধিত আচরণ বিধির মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার অধিকার তাদের ছিল না।

(৪) সংশোধিত আচরণ বিধি ঃ

সংশোধিত আচরণ বিধিতে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ সম্পর্কে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব-সমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। ত্রাণ কার্যের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি জেলাকে কয়েকটি সার্কেলে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক সার্কেলে একজন করে তদন্তকারী কর্মচারী নিযুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। তদন্তকারী কর্মচারীর প্রধান দায়িত্ব ছিল তার সার্কেলের সর্বত্র নিয়মিত পরিদর্শন করে ত্রাণ ব্যবস্থা পরিকল্পনার কার্যাবলী তদারকি করা। জনহিতকর গঠনমূল কার্যকে স্ট্র্যাচি কমিশন দুভাগে বিভক্ত করে : (১) দুর্বলতর এবং অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য জেলাকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন পৌর জনহিতকর সরকারী কর্মসংস্থা এবং : (২) সমর্থ দেহী ও দক্ষ শ্রমিকদের জন্য পূর্ত বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেশাগত জনহিতকর সরকারী কার্যসংস্থা। এই কমিশন মজুরি, অর্থপ্রদানের পদ্ধতি এবং খাদ্যশস্য

বণ্টন সম্পর্কেও বিস্তৃত নির্দেশ এবং কমপক্ষে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদের ছয়মাসের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য পরামর্শ দেয়। আচরণবিধিতে অবশ্য সরকারী খাতে মজুতের জন্য খাদ্য আমদানির নীতি স্বীকৃত হয় নি। তবে প্রয়োজন অনুসারে মনোনীত ঠিকাদারতের মাধ্যমে খাদ্যশস্য সরবরাহের নীতির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত আচরণবিধিতে আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্পর্কেও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্যের কথা উল্লেখ করে। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিলেই যাতে ত্রাণ ব্যবস্থা চালু করা যায় সেজন্য প্রত্যেক অঞ্চলের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলা হয়। দুর্ভিক্ষ প্রবণ এলাকাগুলোর জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় জনহিতকর কার্যাবলীর একটি তালিকা তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের কার্য ও তার মজুরি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা হয়। পঙ্গু ও অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্যও বিস্তৃত সুপারিশ করা হয়। দুর্ভিক্ষের সময় ঋণ এবং অগ্রিম অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা এবং ভূমিরাজস্ব সাময়িক ভাবে মকুব করার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়।

(৪) পরবর্ত্তী কমিশনসমূহ :

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড এলগিন স্যার জেমস লায়ালের নেতৃত্বে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন স্ট্র্যাচি কমিশনের প্রতিবেদনের মূল কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে সাহায্য দানের রীতির কিছু পরিবর্তন এবং ঋণ দান সম্পর্কে আরও উদার ব্যবস্থার সুপারিশ করে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড কার্জন স্যার এন্টনি ম্যাকডোনেলের সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন স্ট্র্যাচি কমিশনের মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ নীতিতে কয়েকটি পরিবর্তনের সুপারিশ করে। বিশেষত দুর্ভিক্ষের প্রথম লক্ষণগুলো দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষামূলক ত্রাণমূলক কাজ শুরু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই নীতির ফলে দুর্ভিক্ষ পীড়িত এবং সন্নিহিত অঞ্চলের দুর্গতি ও কর্মহীনতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া সম্ভব হত। কমিশন স্থায়ীভাবে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, জলসেচ ব্যবস্থা প্রভৃতি গঠনমূলক অনেক কাজেরও সুপারিশ করে।

(৫) উপসংহার :

ভারত সরকারের ও প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনযন্ত্র দুর্ভিক্ষ ত্রাণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও এই নীতির সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করত ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনার উপর। তবে সাময়িক ভাবে দুর্ভিক্ষ ত্রাণের ব্যবস্থা গৃহীত হলেও এই সমস্যা স্থায়ী সমাধানের জন্য বিশেষ কোন নীতি অনুসরণ করা হয় নি। এমন কি, মৌসুমি বায়ুর উপর একান্ত নির্ভর ভারতের কৃষিসম্পদকে রক্ষার জন্য জলসেচ ব্যবস্থার কোন উন্নতি করা হয় নি। নামে মাত্র দুর্ভিক্ষ বীমা বিল প্রবর্তিত হলেও তার কোন সুফল ভারতবাসী ভোগ করতে সমর্থ হয় নি। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়ে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী অনশনে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।

Q. 37. Give a brief account of the peasants' movement in India.

Ans. (১) ভূমিকা :

ব্রিটিশ শাসনে ভারতের অর্থনীতিকে ব্রিটিশ পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করা হয় এবং ভারত ব্রিটিশ শোষণের এক প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এরূপ অবস্থায় ভারতের কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প সবকিছুই ব্রিটিশ স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং বাণিজ্য ও শিল্পের অনগ্রসরতার ফলে ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির উপর চাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সীমিত ও খণ্ডীকৃত জমির চাষবাসকারী কৃষকদের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। অপরদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা, কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস প্রভৃতির ফলে ত্রিশের দশকে ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে গভীর সংকট দেখা দেয় এবং ঋণভারে জর্জরিত কৃষকগণ জমি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়।

(২) কৃষক আন্দোলন :

বিদেশী শাসক এবং দেশী জমিদার ও মহাজনদের শোষণে জর্জরিত কৃষকগণ স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে কৃষক আন্দোলন জাতীয়সংগ্রামের বৃহত্তর স্রোতধারার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯২১-১৯২২ খ্রীস্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের সময় এবং ১৯৩০-৩২ খ্রীস্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় অন্ধ্র, মালাবার, উত্তর প্রদেশ ও বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলন সংগ্রামী চরিত্র ধারণ করে। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত অন্ধ্র অঞ্চলের গুণ্টুর জেলার কৃষক আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। কৃষক সমাজ রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দেয় এবং সরকারী প্রশাসনকে অচল করে দিতে সমর্থ হয়। নিয়মিত রাজস্বের পরিমাণের এক-চতুর্থাংশও সরকারের পক্ষে আদায় করা সম্ভব হয় নি। স্থানীয় কৃষক নেতৃবৃন্দ এবং জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীগণ এই আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষক আন্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক কুডাপ্পা জেলার রায়ছোটি এবং গুণ্টুর জেলার পালনাদ তালুকে সরকারী করনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অসহযোগ আন্দোলনের অবসান ঘটলে গুণ্টুরের কৃষক আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় আর একটি কৃষক আন্দোলন মালাবার অঞ্চলে দেখা দেয়। এই আন্দোলন মোপলা বিদ্রোহ নামে পরিচিত। যদিও এই আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয় কিন্তু এই আন্দোলনের মূল চরিত্র ছিল সমাজতন্ত্র বিরোধী এবং দরিদ্র মুসলমান কৃষকগণ ভূস্বামীদের শোষণে জর্জরিত হয়ে আন্দোলনের পথ গ্রহণ করে। প্রায় দু'হাজার কৃষককে হত্যা করে নৃশংসভাবে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

(৩) জাতীয় কংগ্রেস ও কৃষক আন্দোলন :

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সাধারণত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ ছিলেন।

সুতরাং তাঁরা কৃষক আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে উৎসাহী ছিলেন কিন্তু তাঁরা স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর কৃষক আন্দোলন মোটেই সমর্থন করতে পারেন নি। এমন কি, ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র কৃষকদের জাতীয় সংগ্রামের বৃহত্তর পরিধির মধ্যে রাখতে সচেষ্ট হলেও ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার হওয়ার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক প্রস্তাবে জমিদারদের বৈধ অধিকার স্বীকার করে নেয়। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের বারদৌলিতে বর্দ্ধিত রাজস্বের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের প্রতি গান্ধীজী সমর্থন জানালেও এই আন্দোলনের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে উচ্চ ও মধ্য কৃষক সম্প্রদায়। এই আন্দোলনের ফলে সরকার খাজনার বর্দ্ধিত হার প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং বারদৌলি আন্দোলন জয়যুক্ত হয়।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস কৃষিভিত্তিক কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করে নি। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজীর এগারো দফা দাবির মধ্যে মাত্র দুটি দাবির সঙ্গে কৃষকদের প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থ জড়িত ছিল। এই দুটি দাবি হল—লবণ-কর প্রত্যাহার এবং ভূমি-রাজস্বের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হ্রাস। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলি অঞ্চলের কৃষকগণ খাজনা বন্ধের আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে জাতীয় কংগ্রেস কৃষকদের এই সংগ্রামী আন্দোলন সমর্থন করে নি।

(৪) কৃষক সংগঠনের প্রচেষ্টা :

জাতীয় কংগ্রেস ব্যতীত বামপন্থী দলগুলোরও কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে শ্রমিক-কৃষক দল গঠিত হয় এবং পরে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে সর্বভারতীয় শ্রমিক-কৃষক দল কৃষক আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী হলেও ভারতের অন্যান্য স্থানে তারা কৃষক আন্দোলনের প্রতি উদাসীন ছিল। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলার পর থেকে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের প্রভাব হ্রাস পায়। কিন্তু ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে কমিউনিস্টদের সপ্তম কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ব্যাপক মোর্চা গঠনের নীতি গ্রহণ করে এবং কংগ্রেস দলের সকল বামপন্থী শক্তিগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করে। ফলে জাতীয় কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঐরূপ পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রবাদী ও বামপন্থী গোষ্ঠী একযোগে একটি সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে নিখিল ভারত কৃষক-সভা গঠিত হয় এবং এই সভার উপর কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠীর প্রাধান্য স্থাপিত হয়। কৃষকসভার চাপে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের ফৈজপুর অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস একটি কৃষি-ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই কর্মসূচীতে জমিদারী প্রথার

বিরোধ সাধনের জন্য কোন প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত না থাকায় কৃষক সভার মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।

(৫) কৃষক সভার কার্যকলাপ :

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন কার্যকরী হলে আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কৃষক সভার সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নিখিল ভারত কৃষক সভার সদস্য সংখ্যা ৮ লক্ষে পরিণত হয়। তবে শুধুমাত্র সংখ্যার দিক থেকে কৃষকসভা একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয় নি, জমিদারী প্রথা বিলোপ এবং কৃষকদের স্বার্থরক্ষা প্রভৃতি দাবির ভিত্তিতে কৃষক সভা আন্দোলনমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে। জমিদারী প্রথার বিলোপ ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষা প্রভৃতি দাবির ভিত্তিতে কৃষকসভা আন্দোলনমুখী কর্মসূচী গ্রহণে উদ্যোগী হয়। কিন্তু ১৯৩৭-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের প্রাদেশিক কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলো প্রজাস্বত্ব সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ণে ব্যর্থ হয়। ফলে কৃষক সভার সঙ্গে মন্ত্রীসভার বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস নেতৃবর্গের কার্যকলাপে কৃষক সভার নেতৃবৃন্দের মনে গভীর বিরূপতার সৃষ্টি হয়, ফলে কৃষকসভা ভারতের কমিউনিস্ট দলের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট দল ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রসারের সুযোগ পায় এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিখিল ভারত কৃষকসভার সাংগঠনিক কর্তৃত্ব অধিকার করে। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে নিখিল ভারত কৃষক সভা সরকারের যুদ্ধ প্রয়াসের প্রতিও পূর্ণ সমর্থন জানায়। কিন্তু কৃষক সভার কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন সদস্যগণ এজন্য ক্ষুব্ধ হয়ে সংগঠনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। তা সত্ত্বেও ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নিখিল ভারত কৃষক সভার সাংগঠনিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিশেষত অন্ধ্র ও বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক সভা সংগ্রামী চরিত্র গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর কৃষক সভা ঐতিহাসিক তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলন শুরু করে। বাংলাদেশের তেভাগা আন্দোলনের বর্গাদার কৃষকরা উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ এবং জমির স্থায়ী প্রজাস্বত্ব দাবি করে। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, যশোহর, খুলনা, ময়মনসিংহ এবং মেদিনীপুরে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয় ও উত্তরবঙ্গে এই আন্দোলন এক সর্বাত্মক কৃষক বিদ্রোহে পরিণত হয়।

(৬) আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যর্থতার কারণ :

তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রাজবংশী, সাঁওতাল, ওরাও প্রভৃতি উপজাতি তপশীল অনুন্নত সম্প্রদায়ের আন্দোলনে ব্যাপক অংশ গ্রহণ। ময়মনসিংহের সুসং অঞ্চলের হাজং সম্প্রদায়ের উপজাতিরা কৃষক বিদ্রোহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয়। জমিদার, জোতদার এবং সরকারের দমননীতি উপেক্ষা করে কৃষক আন্দোলন তীব্র

হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। তেভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল যে,পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ কৃষকই মুসলমান এবং ব্যাপকভাবে কৃষক সভার নেতৃত্বে তারা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। দ্বিতীয় কারণ হল, এই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে বর্গাদার ও ভাগচাষীগণ, অপরাপর কৃষকশ্রেণী তাদের বিরুদ্ধে জোতদার ও জমিদারদের পক্ষ অবলম্বন করে।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে দেশীয় রাজ্যে হায়দ্রাবাদের অধীন তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির অধীনে অন্ধ্র সম্মেলন উদ্যোক্তা ছিল এবং ঐ অঞ্চলের প্রায় চারশটি গ্রামে এই আন্দোলন শুরু হয়। হায়দ্রাবাদের নিজামের ভারত বিরোধী কার্যকলাপের ফলে এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে প্রায় চারহাজার গ্রামে কমিউনিস্ট স্বেচ্ছাসেবকগণ বিকল্প শাসনব্যবস্থা গঠন করতে সমর্থ হয়। বিশেষত ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনী হায়দ্রাবাদে অনুপ্রবেশ করলে তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলন গণবিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। তবে হায়দ্রাবাদ ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর নতুন প্রশাসন এই আন্দোলন দমনে সচেষ্ট হলে, কৃষক আন্দোলন ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে এই আন্দোলন প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত গরীব কৃষক এবং ভূমিহীন চাষীরা এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও বড় ও মাঝারি চাষীরা এই আন্দোলনে যোগ দেয় নি। তা ছাড়া, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকদের সঙ্গেও এই আন্দোলনের কোন যোগসূত্র গড়ে ওঠে নি। ফলে তেলেঙ্গানা আন্দোলন শুধুমাত্র কৃষক প্রতিরোধ বাহিনী ও কমিউনিস্ট কর্মীদের বিচ্ছিন্ন আন্দোলনে পরিণত হয় এবং শুরু থেকেই আন্দোলনের ব্যর্থতা সূচিত হয়।

(৭) উপসংহার :

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ভারতে কৃষক আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও তা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয় নি। ভারতের কৃষক আন্দোলনের এই সাংগঠনিক দুর্বলতাই তার ব্যর্থতার প্রধান কারণ। কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বও রাজনৈতিক সংস্থা, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ধনী ও মধ্যশ্রেণীর কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক আন্দোলনে যথাযোগ্য স্থান পায় নি। আদর্শগত দিক থেকেও কৃষক আন্দোলনের কোন সুস্পষ্ট কর্মসূচী ছিল না। গান্ধীবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ এবং মার্ক্সবাদ প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী আদর্শের দ্বারা কৃষক আন্দোলনের কর্মসূচী নির্দ্ধারিত হত। ফলে সুস্পষ্ট আদর্শের অভাবেও এই আন্দোলন কখনওই ব্যাপক হয়ে উঠতে পারে নি। এমন কি কৃষক আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে না পারায় ফলে কৃষক শ্রেণী কখনই ভারতের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্দ্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়।

Q. 38. Give an account of the working class movement in India.

Ans. (১) ভূমিকা :

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আধুনিক শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। সংখ্যায় অল্প হলেও শ্রমিক শ্রেণী ভারতীয় সমাজে এক নতুন শক্তিরূপে দেখা দেয়। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে সাধারণভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—আধুনিক বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক এবং গ্রামাঞ্চলে কুটিরশিল্পে অথবা অন্যান্য শিল্পকার্যে নিযুক্ত শ্রমিক। তবে ভারতে বৃহৎ শিল্পের কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও গ্রামাঞ্চলে পুরোপুরি বা আংশিক সময়ের জন্য কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাই অধিক। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্র বিকাশের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রুতহারে কল-কারখানা বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

(২) শ্রমিকদের অবস্থা :

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করে বিদেশী ও দেশী ধনিক শ্রেণী দ্রুত স্ফীত হলেও ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা ছিল খুবই দুর্দশাপূর্ণ। মর্মান্তিক ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের জীবিকার্জন ও জীবনধারণ করতে হত এবং তাদের জন্য কোন সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাও ছিল না। তাদের মজুরি ছিল খুবই সামান্য, ফলে অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে কোন প্রকারে কালাতিপাত করতে হত। বিশেষত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সত্ত্বেও তাদের মজুরি বৃদ্ধি হয় নি এবং ক্রমশ তারা ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। যদিও সরকার ভারতীয় বন্দর আইন, কারখানা আইন, খনি আইন, মজুরি আইন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণবিধি প্রবর্তন করে ভারতীয় শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘব করার জন্য চেষ্টা করে। তথাপি প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নি।

(৩) নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তাদের এই প্রচেষ্টার ফলে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ভারতীয় শ্রমিকগণও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃবর্গও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করেন। তবে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের গতি ছিল মন্থর এবং বিচ্ছিন্নভাবেই এই আন্দোলন

পরিচালিত হত। কিন্তু পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই এই আন্দোলন সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয় এবং পঁয়তাল্লিশটি ইউনিয়নের মোট দেড় লক্ষের উপর শ্রমিক এই সংস্থার সদস্য পদ গ্রহণ করে। এই সময় থেকেই ভারতের শ্রমিক আন্দোলন সংগ্রামী চরিত্র গ্রহণ করে। সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে শ্রমিক আন্দোলনে ইতিমধ্যে বামপন্থী ও সাম্যবাদী আদর্শ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে ১লা মে বোম্বাইয়ে শ্রমিকদিবস পালিত হয় এবং এই ঘটনা থেকে মনে হয় যে, তখন থেকেই ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হতে থাকে।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতে শ্রমিক ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করে। ভারতের বিভিন্নস্থানে অন্তত ২০৩টি ধর্মঘট হয় এবং পাঁচলক্ষের উপর শ্রমিক এই সব ধর্মঘটে যোগ দেয়। এই সময়ের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় শ্রমিক আন্দোলন হল বোম্বাই-এর সুতাকল ধর্মঘট। এই ধর্মঘটে প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক ছ'মাস ধরে দীর্ঘ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত গিরনি কামাগার ইউনিয়ন এই ধর্মঘট পরিচালনা করে। তা ছাড়া, দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথ এবং মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথের কর্মীরাও ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে।

(৪) সরকারের দমন নীতি :

শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি এবং শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সুতরাং তারা দুভাবে শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্য উদ্যোগী হয়। প্রথমত, আইন অনুযায়ী বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকার শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার হরণ করতে চেষ্টা করে। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইন সভায় শিল্প বিরোধ বিল এবং জননিরাপত্তা আইনের সংশোধনী বিল দুটি উপস্থাপিত করা হয়। এই দুটি আইনের দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন আচার-আচরণের উপর হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করা হয়, কারণ এই আইনের সাহায্যে সরকারের প্রশাসন বিভাগ ইচ্ছা করলেই শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার খর্ব করতে পারে এবং কোন প্রদেশে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে আইনসভার সম্মতি ছাড়াই আপৎকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার ভোগ করার সুযোগ পায়। কিন্তু ভারতীয় সদস্যদের বিরোধিতার ফলে কেন্দ্রীয় আইন সভায় এই আইন অগ্রাহ্য হয়।

দ্বিতীয়ত, শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকার দমনমূলক নীতি অনুসরণ করে। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতের কয়েকজন শ্রমিক নেতাকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার করার পর এইসব নেতাদের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়ও জড়িত করা হয়। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলে এবং অধিকাংশ বন্দীকেই দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

(৫) শ্রমিক আন্দোলনে ভাঙন :

কিন্তু ইতিমধ্যে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন এক ভাঙনের সম্মুখীন হয়। নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে বামপন্থী নেতারা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হুইটলি কমিশন বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু মিস্টার এম. এন. যোশীর নেতৃত্বে সংস্কারপন্থী গোষ্ঠী ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করে এবং তারা নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস পরিত্যাগ করে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করেন। এই নতুন সংগঠনটি শ্রমিক শ্রেণীর সব রকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ বর্জন করে শুধুমাত্র অর্থ নৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অপরদিকে এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল বামপন্থী গোষ্ঠীটি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন থেকে বিরত থাকে। ফলে ত্রিশের দশকের সূচনায় সরকারী দমন নীতি এবং রাজনৈতিক দলীয় বিরোধের আঘাতে শ্রমিক আন্দোলন অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়ে।

(৬) শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি :

তবে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় শ্রমিক শ্রেণী আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে শোলাপুর, নাগপুর ও বোম্বাইয়ে শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। শ্রমিক ধর্মঘটে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারী কর্তৃপক্ষ কমিউ-নিস্টদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার দমন নীতি গ্রহণ করে। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুলাই কমিউনিস্টদল সরকারীভাবে বে-আইনী ঘোষিত হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট দলের প্রভাব হ্রাস পায় নি। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের পর ভারতের শ্রমিক আন্দোলন আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। এই সময় থেকে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি পায় এবং কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রভৃতির সঙ্গে যৌথভাবে শ্রমিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারতের দুটি প্রধান শ্রমিক সংস্থা ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের মধ্যেও সংহতি সাধিত হয়। অপর দিকে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তিত হলে আটটি প্রদেশে কংগ্রেসদল মন্ত্রীসভা গঠন করলে শ্রমিক সংগঠন দ্রুত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, ভারতের বিভিন্ন শিল্পে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনও সংগঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পাট শিল্পে শ্রমিক ধর্মঘট, এবং কানপুরে সূতীবস্ত্র শিল্পে ধর্মঘট, আসামের ডিগবয়ে শ্রমিক ধর্মঘট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধিতে কংগ্রেস পরিচালিত মন্ত্রীসভাগুলোও অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। বোম্বাইয়ে সরকার শিল্পবিরোধ আইন প্রবর্তন করে শ্রমিক আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করে। কিন্তু সরকারী এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে বোম্বাইয়ে হরতাল পালিত হয়।

(৭) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও শ্রমিক আন্দোলন :

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার ভারত রক্ষা আইন প্রভৃতি জরুরী দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে শ্রমিক আন্দোলনের উপরও বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। অপরদিকে ভারত সরকার ভারতীয় জনমত উপেক্ষা করেই ভারতকে যুদ্ধে সংযুক্ত করায় শ্রমিকশ্রেণী যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ২রা অক্টোবর প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক যুদ্ধনীতির প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে। অপরদিকে যুদ্ধের ফলে ভারতের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক অসন্তোষ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মহার্ঘভাতার দাবিতে শ্রমিকগণ আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ৪ই মার্চ মহার্ঘ ভাতার দাবিতে বোম্বাইর প্রায় দুলক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট পালন করে। পরে ভারতের অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ আন্দোলন দেখা দেয়। কিন্তু ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হলে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। কমিউনিস্ট শ্রমিকনেতাগণ ফ্যাসিবাদের বিনাশের জন্য যুদ্ধপ্রয়াসে শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাত্মক সহযোগিতার নীতি উপস্থাপিত করেন। অন্যদিকে অ-কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ যুদ্ধবিরোধী নীতিতে অবিচল থাকেন। ইতিমধ্যে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে কমিউনিস্টদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে শ্রমিক সংগঠনে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ থাকায় শ্রমিক আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাস পায়।

(৮) উপসংহার :

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে শ্রমিক আন্দোলন প্রকৃত সংগ্রামী চরিত্র লাভ করে। যুদ্ধকালীন উৎপাদন বন্ধ হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপকহারে কর্মচ্যুতি, মজুরি হ্রাস, দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাওয়া প্রভৃতির ফলে শ্রমিক অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ১৬২৯টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় এবং বিশ লক্ষ শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এই সব ধর্মঘটের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জুলাই মাসে ডাক ও তার বিভাগের শ্রমিক ধর্মঘট ও আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে রেল ধর্মঘট সরকারের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। ডাক ও তার বিভাগের সমর্থনে ২৯শে জুলাই কলকাতায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। বোম্বাইর নৌ-বিদ্রোহের সময় ধর্মঘটী নাবিকদের সমর্থনে বোম্বাই, কলকাতা প্রভৃতি স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক ধর্মঘট পালিত হয়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দী নেতৃবর্গের মুক্তির দাবিতে ভারতব্যাপী গণবিক্ষোভ দেখা দিলে শ্রমিকশ্রেণীও তাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের নেতাগণ শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন সংগ্রামী চরিত্র ধারণ করায় অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেন। বিশেষত শ্রমিকদের

উপর কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধিতে তাঁরা বিচলিত হয়ে পড়েন। সুতরাং নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকায় জাতীয় কংগ্রেস নিখিল ভারত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার নীতি গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকারও কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং এই সম্পর্কে কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে সতর্ক করে দেন। সুতরাং বলা যায় যে, যখন ১৯৪৬-৪৭ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ক্ষমতা হস্তান্তরে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত, ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন তখন সংগ্রামী চরিত্র ধারণ করে এক নূতন স্তরে উন্নীত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামের এক অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়।

Q. 39. Give a critical account of the Indian National Army (Azad Hind Fouz).

Ans. (১) ভূমিকা :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের মুক্তি আন্দোলনের প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ভারতেই সীমিত ছিল না, ভারতের বাইরেও তা সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতের অভ্যন্তরে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন যেমন ব্রিটিশ শাসকদের বিচলিত করে তোলে, অপরদিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের বাইরে থেকে সমস্ত সংগ্রাম পরিচালনা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করে তুলতে সমর্থ হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব থেকেই সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর আপস-নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং ব্রিটিশ সরকারকে ছ'মাসের মধ্যে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য চরমপত্র পাঠাবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অসম্মত হয়। সুতরাং জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষদিকে সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করে জাতীয় সংগ্রামে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ফরওয়ার্ড ব্লক নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হওয়ার পরই সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের অনুকূল পরিবেশ উপস্থিত। সুতরাং তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করার সুযোগ সন্ধান করতে শুরু করেন। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্পদিন পরেই ব্রিটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রকে স্বগৃহে অন্তরীণ করেন।

(২) আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন :

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থা থেকে ছদ্মবেশে দেশত্যাগ করেন এবং কাবুলে উপস্থিত হন। কাবুল থেকে তিনি বার্লিনে যান। জার্মানীতে উপস্থিত হয়েই তিনি জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইয়োরোপে ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা পেশ করেন। ইতিমধ্যে

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জাপান ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং পার্ল হারবারের মার্কিন ঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ করে। ফলে প্রাচ্য রণাঙ্গণে জটিলতার সৃষ্টি হয়। দ্রুতগতিতে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করে। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মার্চ জাপান সিঙ্গাপুর এবং মার্চ মাসের প্রথমদিকে ব্রহ্মদেশ অধিকার করে। জাপানের দ্রুত সাফল্যে ব্রিটিশ সরকারের মনে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। ভারতের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তারা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠান কিন্তু তাঁর প্রস্তাব ভারতের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে জাপানের অভাবনীয় সাফল্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মনে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করে মুক্তি আন্দোলনে সংগঠিত করার জন্য জাপানে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু উদ্যোগী হন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে ১৫ই জুন ব্যাংককে ভারতীয়দের এক সমাবেশে তিনি ভারতীয় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন এবং তাঁর উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র বসুকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আগমনের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। ইতিমধ্যে ১৪নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর প্রচেষ্টায় সিঙ্গাপুরের পতনের পর যুদ্ধবন্দী ভারতের সৈন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অপরদিকে ব্যাংকক সম্মেলনে ভারতীয় সঙ্ঘ সুভাষচন্দ্রকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কার্য পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জার্মানী থেকে জাপানে উপস্থিত হওয়া কোন ক্রমেই নিরাপদ ছিল না। তথাপি ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী জার্মানী ত্যাগ করে সাবমেরিনের সাহায্যে সুভাষ চন্দ্র টোকিও অভিমুখে যাত্রা করেন। এই দুঃসাহসিক অভিযান সমাপ্ত করে ১৬ই মে তিনি টোকিও পৌছান। টোকিও পৌছেই তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাপানের সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র সংগ্রাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তারপরে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে এসে উপস্থিত হন এবং ২রা জুলাই রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উপস্থিত ভারতীয়গণ সানন্দে তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁকে 'নেতাজী' নামে অভিহিত করেন।

(৩) আজাদ হিন্দ বাহিনী পুনর্গঠন ও অস্থায়ী সরকার গঠন :

সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হওয়ার পরই সুভাষচন্দ্র ভারতে অভিযান পরিচালনার জন্য সামরিক বাহিনী পুনর্গঠন ও অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা শুরু করেন। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে অগাস্ট নেতাজী আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন এবং সৈন্যবাহিনীর উন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানের দিকে মনোযোগ দেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর পূর্বে মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল তেরো হাজার। তিনি তা পঞ্চাশ হাজারে পরিণত করেন। নেতাজী আজাদ হিন্দ বাহিনীকে তিনটি

বিভাগে বিভক্ত করেন এবং নারী, পুরুষ উভয় ধরনের বাহিনী গঠন করেন। নারী সৈন্যদের জন্য তিনি ঝাঁসির বাহিনী নামে একটি ব্রিগেড গঠন করেন। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের নিকট আবেদন করেন।

সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত করার পর নেতাজী অস্থায়ী সরকার গঠনের কাজে ব্রতী হন। সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের অধিবেশনে তিনি আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন। নেতাজীর মতে তাঁর সরকারের প্রধান লক্ষ্য হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ চূড়ান্ত সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং ভারতের মাটিতে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটান। তিনি আশা করেন যে, এই সরকার ভারতের মাটিতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর স্থায়ী জাতীয় সরকারের স্থান গ্রহণ করবে। অস্থায়ী সরকারের মূল ধ্বনি হল জয়হিন্দ ও দিল্লী চলো। জাতীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হল হিন্দুস্থানী। কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা জাতীয় পতাকার মর্যাদা পায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জনগণমন' গানটি জাতীয় সঙ্গীতরূপে নির্বাচিত হয়। শীঘ্রই জাপান, জার্মানী, ইতালি ও অন্য ছ'টি রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

(৪) ভারতের মাটিতে যুদ্ধ :

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে নেতাজী টোকিও শহরে অনুষ্ঠিত বৃহৎ পূর্ব-এশিয়া শক্তি সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী বা ম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ভারতের মুক্তিযুদ্ধে জাপানের সাহায্য দানের কথা ঘোষণা করেন। জাপানের সহযোগিতার নিদর্শন স্বরূপ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে সমর্পণ করা হয়। এই সম্মেলনের পরেই নেতাজী ভারতের মুক্তি সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন। জাতীয় বাহিনী গঠন এবং বৈদেশিক সাহায্য লাভ এই দুটির ভিত্তিতে আজাদ হিন্দ বাহিনী সশস্ত্র অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান কর্মকেন্দ্র রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করেন; কারণ ব্রহ্মদেশকে ভিত্তি করে ভারতের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করা সহজতর। এই সময় সুভাষচন্দ্র সম্মিলিত জাপানী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম আক্রমণ করার প্রস্তাব করেন। জাপান এই প্রস্তাবে আপত্তি জানায়, কারণ জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সমমর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু সুভাষ-চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বাহিনীকে জাপানী সৈন্যের সহায়ক বাহিনীরূপে ব্যবহার করার বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, ভারতের মাটিতে মুক্তিযুদ্ধে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরাই প্রথম রক্তবিন্দু দান করবে। শেষ পর্যন্ত সুভাষ বসু ও জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষ কাওয়াবের মধ্যে এক আলোচনার ভিত্তিতে স্থির হয় যে, আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং

জাপানী বাহিনী যৌথভাবে আরাকান ফ্রন্ট আক্রমণ করবে এবং ইম্ফল অভিমুখে অগ্রসর হবে। মার্চের প্রথম দিকে অভিযান শুরু হয় এবং ঐ মাসের শেষ দিকে ইম্ফলের পতন ঘটে। এপ্রিলের প্রথম দিকে কোহিমা অবরুদ্ধ হয়। এই সময় ঠিক হয় যে, বর্ষার পর আজাদ হিন্দ ফৌজ আসাম হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে। কিন্তু মে মাসের শেষ দিকে আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন কোহিমায় এসে উপস্থিত হয় তখন জাপানের সামরিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই সুযোগে ইম্ফল ও কোহিমায় ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যাপক সমাবেশ শুরু হয়। তবু আজাদ হিন্দ বাহিনী তাদের দখলীকৃত স্থানগুলো রক্ষার জন্য বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে। কিন্তু বর্ষার সমাগমে জাপানী সৈন্যদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরা রণাঙ্গণ পরিত্যাগ করতে শুরু করে।

(৫) অভিযানের ব্যর্থতা :

কিন্তু পরাজয় ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও নেতাজী নিরুৎসাহ হলেন না। তিনি পুনরায় সামরিক অভিযানে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করেন। এদিকে জাপানের সামরিক পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে ওঠায় তারা ব্রহ্ম রণাঙ্গণ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ব্রহ্মদেশের জাতীয় বাহিনীও জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী রেঙ্গুন অধিকার করলে নেতাজী ব্রহ্ম রণাঙ্গণ ত্যাগ করে ব্যাংককে চলে যান। ইয়োরোপেও এই সময় যুদ্ধের গতি দ্রুত পরিবর্তিত হয় এবং ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে জার্মানী আত্মসমর্পণ করে। রাশিয়াও এই সময় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে এককভাবে জাপান মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। বিশেষত ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাসে ৬ এবং ৯ তারিখে যথাক্রমে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের ফলে ঐ মাসের ১৫ তারিখে জাপান আত্মসমর্পণ করে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় থাকা নিরাপদ মনে না করে সুভাষ বসু টোকিও অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু ১৮ই অগাস্ট টাইহোকু বিমান বন্দরে এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর জীবনাবসান ঘটে।

(৬) ব্যর্থতার কারণ :

সামরিক কারণেই আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই জাপানের অবস্থা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে এবং ব্রহ্ম রণাঙ্গণ থেকে প্রচুর সৈন্য, রসদ, অস্ত্র প্রভৃতি দিয়ে সুভাষচন্দ্র বসুকে সাহায্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিশেষত প্রভূত মার্কিন সাহায্যপুষ্ট গ্রেট ব্রিটেন এই সময় থেকে জাপানের উপর চরম আঘাত করার জন্য ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হয়। প্রথমে ইতালি এবং পরে জার্মানীর পতন আসন্ন হয়ে পড়ায় মিত্রপক্ষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে জাপানের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। যদি ১৯৪২-৪৩ খ্রীস্টাব্দে জাপান সুভাষচন্দ্র বসুকে সামরিক সাহায্য দিয়ে ভারতের সীমান্তে পাঠাতে সম্মত হত তা হলে

সম্ভবত এই অভিযানের ফল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করত। বিশেষত ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন দমনে ব্যস্ত ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে যুগপৎ অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত আঘাত প্রতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। তা ছাড়া, জাপান সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য যে সৈন্যদল প্রেরণ করে তাদের দক্ষতা খুব উচ্চমানের ছিল না। আজাদ হিন্দ বাহিনীর অন্যতম সেনানায়ক ক্যাপটেন শাহ্‌নওয়াজ খান ইম্ফলের রণাঙ্গণে ব্যর্থতার জন্য সরাসরিভাবে জাপানকে দায়ী করেন।

(৭) আজাদ-হিন্দ বাহিনীর কৃতিত্ব ঃ

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে তার অভিযানের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে আজাদ হিন্দ বাহিনীর যে পরোক্ষভাবে সাহায্য সক্রিয় ছিল তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। ব্রিটিশ সরকার এই সময় থেকেই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে যে ভারতের উপর তাদের আধিপত্য বেশি দিন বজায় রাখা সম্ভব নয়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়েই নৌবাহিনী বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করে। ভারতের জনসাধারণও এই বাহিনীর কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তাই সরকার যখন ঘোষণা করে যে ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য ভঙ্গ এবং রাজদ্রোহের অপরাধে আজাদ হিন্দ বাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিচার করা হবে তখন সারাদেশ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সারা দেশে গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। সকলেই জাতীয় বাহিনীর অফিসারদের মুক্তি দাবি করে। ভুলাভাই দেশাই, তেজবাহাদুর সাপ্রু, কৈলাসনাথ কাটজু, আসফ আলি প্রমুখ আইনজীবীদের নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করে এবং বিচারাধীন অফিসারদের পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব এই কমিটি গ্রহণ করে। দিল্লীর লালকেল্লায় এই নাটকীয় বিচারকার্য সম্পাদিত হয় এবং কোর্ট মার্শালে বিচারাধীন সকল অফিসারই দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাঁদের দণ্ডাদেশও দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনমতের কাছে সরকারের নতি স্বীকার করতে হয় এবং সকল নেতাই সসম্মানে মুক্তিলাভ করেন।

(৮) উপসংহার ঃ

বিশ্বযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্র বসু জাপান ও জার্মানীর সহযোগিতায় ভারতের মুক্তি আন্দোলন পরিচালনার যে চেষ্টা করেন তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে তিনি ফ্যাসিবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েই বিদেশী শক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন এবং তিনি সাফল্য অর্জন করলে ভারত ফ্যাসিবাদের করায়ত্ত হত। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তিনি তাঁর চিন্তাধারায় ও আচরণে কখনও ফ্যাসিবাদ সমর্থন করেন নি। বরং তিনি সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বামপন্থী দলগুলোর ঐক্য সাধনের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে ভারতের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধানসম্ভবপর নয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রথম দায়িত্বই হবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচী রূপায়ণ। প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্র একজন সর্বাত্মক বিপ্লবী

এবং বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ ছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য তিনি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে তিনি অক্ষশক্তির সাহায্য প্রার্থনা করেন কিন্তু তাঁর কার্যকলাপে এ কথা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে অক্ষশক্তি বা ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না।

Q. 40. Give a brief account of the national movement in the native states.

Ans. (১) **ভূমিকা:**

ভারত উপ-মহাদেশে 'ব্রিটিশ-ভারত' ছাড়াও অসংখ্য রাজন্যশাসিত রাজ্য ছিল। ব্রিটিশ শাসকদের ভাষায় তাদের বলা হত নেটিভ স্টেটস্ বা দেশীয় রাজ্য। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আয়তনের দেশীয় রাজ্যগুলো বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকার জন্য এগুলো ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলের পাশাপাশিই অবস্থিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে দেশীয় রাজা বা দলপতির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারই এই রাজ্যগুলো পরোক্ষভাবে শাসন করত। দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থাও ছিল স্বৈরাচারী। সাধারণত দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করতেন। আর যাঁরা ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতেন বা তাঁদের স্বার্থবিরোধী কাজ করতেন তাঁরা রাজ্যচ্যুত হতেন। তবে ব্রিটিশ শাসকদের বশংবদ দেশীয় রাজন্যবর্গ সাধারণত ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল, সামন্ততান্ত্রিক এবং স্বৈরাচারী। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কোন রাজ্যেই প্রচলিত ছিল না। রাজা ও তাঁর সহযোগী অভিজাত সম্প্রদায় চরম ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার মধ্যে জীবনযাপন করতেন এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ছিল চরম দুর্দশাগ্রস্ত। ব্রিটিশ সরকারের ছত্র-ছায়ায় এইসব শাসকগণ নিরাপদে তাঁদের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার সুযোগ পেতেন।

(২) **রাজনৈতিক চিন্তাধারার উন্মেষ:**

কিন্তু স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ ধীরে ধীরে বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের প্রতিফলনই আঞ্চলিক সংগঠনের প্রেরণা যোগায়। সংগঠনগুলো সাধারণত প্রজামণ্ডল, রাজ্যপ্রজাসম্মেলন প্রভৃতি নামে পরিচিত হত। মহীশূরে যে সংগঠনটি গড়ে ওঠে তা রাজ্য কংগ্রেসের রূপ গ্রহণ করে। তবে এই সংগঠন ছিল প্রকৃত-অর্থেই আঞ্চলিক, স্থানীয় সমস্যার প্রতিই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত এবং পরস্পরের মধ্যে কোন যোগসূত্রও ছিল না। আঞ্চলিক এইসব সংগঠন ছাড়াও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেশীয় রাজ্যগুলোতে নতুন এক ধরনের সংস্থা বা সমিতি গঠিত হতে শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দেশীয় রাজ্যগুলো গ্রেট ব্রিটেনকে সাহায্য করার জন্য প্রচুর সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করে। যুদ্ধ প্রত্যাগত এই সৈনিকদল নিজ নিজ রাজ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে এবং এই উদ্দেশ্যে নিজেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে

বিভিন্ন সমিতি গঠন করে। তা ছাড়া, অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশীয় রাজ্যগুলোর অধিবাসীরাও অনেক স্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ফলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের রাজনৈতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

(৩) জাতীয় কংগ্রেসের নীতি :

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যগুলোর দিকে প্রথম দৃষ্টি দেয়। দেশীয় রাজন্যবর্গকে উদ্দেশ্য করে কংগ্রেস তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে অবিলম্বে জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানায়। তবে জাতীয় কংগ্রেস এই সময় ঘোষণা করে যে দেশীয় রাজ্যের প্রজারা এককভাবে কংগ্রেসের সভ্য হতে পারলেও তারা কংগ্রেসের নাম নিয়ে তাদের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অর্থাৎ নিজ নিজ রাজ্যে তারা যা করবে তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বেই করতে হবে। ব্রিটিশ-ভারতের নাগরিক কংগ্রেসের সদস্যদের সম্পর্কেও একই নীতি প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের ধারণা ছিল যে স্থানীয় প্রজামণ্ডল ও রাজ্য প্রজাসম্মেলনের উপরই প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মসূচী সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত।

(৩) রাজনৈতিক সংস্থা গঠন :

দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি যাতে রূপ নেয় ব্রিটিশ সরকার সেজন্য চেম্বার অফ প্রিন্সেস বা নরেন্দ্র মণ্ডল নামে একটি উপদেষ্টা সংস্থা গঠন করে। এই সংস্থার প্রধান কাজ ছিল পরামর্শ দান করা। কিন্তু বিভিন্ন স্তরের রাজাদের মধ্যে পদমর্যাদা নিয়ে বিরোধের ফলে সংস্থাটি কখনও শক্তিশালী সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে সাইমন কমিশন নিয়োগের সময় ব্রিটিশ সরকার হারকোর্ট বাটলার ইণ্ডিয়ান স্টেটস কমিটি নামে আর একটি কমিটি নিয়োগ করে। কেন্দ্রীয় সরকার ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টাই ছিল এই কমিটির প্রধান কাজ। এই সময় দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিশেষ ভাবে প্রসারলাভ করে। কাথিওয়াড়ের বসন্তরায় মেহতা ও মণিলাল কোঠারি এবং দক্ষিণ ভারতের জি. আর. অভয়ঙ্কর ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজাসম্মেলন আহ্বান করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় সাতশ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন এবং সম্মিলিত জনমতের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্তনের জন্য তাঁরা দাবি জানান। তা ছাড়া, দেশীয় রাজ্যগুলোতে নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণ যাতে সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করে এবং স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ করে তার জন্যও চেষ্টা করা হয়। রাজ্যগুলোর আয়-ব্যয়ের উপর জনপ্রতিনিধিমূলক সংগঠনের কর্তৃত্ব স্থাপন এবং স্বৈরাচারী ক্ষমতার অবসানের জন্য বিচার বিভাগ ও প্রশাসনকে পৃথক করার উপরও জোর দেওয়া হয়। সর্বোপরি ব্রিটিশ-ভারত এবং দেশীয় রাজবংশের মধ্যে সাংবিধানিক যোগসূত্র স্থাপন করে সারা দেশের পক্ষে স্বরাজ লাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার উপরও তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথম সম্মেলনের পর থেকেই নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলন স্থায়ী রাজনৈতিক সংগঠনের রূপ গ্রহণ করে। তবে এই সংগঠনের আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য ছিল সামন্ততন্ত্র, জাতীয় কংগ্রেসের মতো সুস্পষ্ট সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যে দেখা দেয় নি। কারণ, সাম্রাজ্যবাদের শোষণ অপেক্ষা সামন্ত-তন্ত্রের শোষণই তাদের নিকট বেশি পরিচিত ছিল। দোষ-ত্রুটি যা-ই থাক না কেন, এই সংগঠনটি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে দেশীয় রাজ্যসমূহের সাধারণ মানুষের সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা আঞ্চলিক সমস্যারূপে পরিচিত না হয়ে সংকীর্ণ অর্থে সমগ্র ভারতীয় সমস্যায় পরিণত হয়। এমন কি, জাতীয় কংগ্রেসও দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ নিতে শুরু করে। ফলে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজাসম্মেলনের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। দেশীয় রাজ্যগুলোকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে তাদের প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করে। ফলে নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজাসম্মেলনের আশা ভঙ্গ হলেও তারা করাচি কংগ্রেসে ব্রিটিশ-ভারতের নাগরিকদের জন্য যে মৌলিক অধিকার দাবি করে, নিজেদের জন্যও সেইসব দাবি উত্থাপন করে। এইভাবে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু হয় তা ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে এবং বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে।

(৪) ১৯৩৫-এর ভারত আইন এবং তার প্রতিক্রিয়া :

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত আইনে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকে স্বীকৃতি দিলেও দেশীয় রাজন্যবর্গ যাতে জাতীয়তাবাদী দাবিগুলোকে বাধা দিতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রস্তাবিত আইনে স্থির হয় যে কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চতর কক্ষে দুই-পঞ্চমাংশ আসন এবং নিম্নতর কক্ষের এক-তৃতীয়াংশ আসন দেশীয় রাজন্যবর্গের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি স্বীকার করা হয় নি, অথবা দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করারও কোন সুযোগ দেওয়া হয় নি। শুধু দেশীয় রাজাদের মনোনীত ব্যক্তিরা আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাওয়ার জন্য প্রতিনিধিমূলক সংস্থাসমূহ ক্ষুব্ধ হয়। ফলে রাজকোট, জয়পুর, কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি রাজ্যে ব্যাপক ভাবে অভ্যুত্থান দেখা দেয়। গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি স্বীকৃতিদানের দাবিই ছিল এই অভ্যুত্থানের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু দেশীয় রাজন্যবর্গ নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে এই আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে জাতীয় কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যসমূহের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জানাতে শুরু করে। জনসাধারণের গণতান্ত্রিক দাবি ও অধিকার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কংগ্রেস দেশীয় রাজন্যবর্গের উপর চাপ দিতে শুরু করে। কংগ্রেস আরও ঘোষণা করে যে, সমস্ত ভারতবাসীর জন্য স্বাধীনতাই তার প্রধান লক্ষ্য। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের

ত্রিপুরী অধিবেশনের সময় দেশীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে কংগ্রেস আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে। নিখিল ভারত রাজ্য প্রজাসম্মেলনও এই সময় জওহরলাল নেহরুকে সভাপতি পদে বরণ করে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে তোলে। এইভাবে দেশীয় রাজ্যসমূহের জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলন আঞ্চলিক পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সর্বভারতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতের ঐক্যবোধের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে।

Q. 41. Discuss the careers and effects of the commercialisation of agriculture in India.

Ans. (১) ভূমিকা :

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পরই ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামো ও পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং কৃষি ও শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। কৃষি ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তে বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং শিল্পক্ষেত্রে কুটির শিল্প ধ্বংস করে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক বাধার সৃষ্টি করা হয়। ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে এক যুগপরিবর্তনকাল উপস্থিত হয়।

(২) কৃষিপণ্য বাণিজ্যিক-করণ :

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত ভারতের গ্রামগুলো মোটামুটিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। বাইরের অর্থনীতির সঙ্গে তাদের যোগাযোগও খুব কম ছিল ; সাধারণতঃ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চল থেকে মাঝে মাঝে উদ্বৃত্ত শস্য এবং বস্ত্রাদি বিক্রি করার জন্য ব্যবসায়ীগণ উপস্থিত হত। এরূপ অবস্থায় প্রতিটি গ্রামেরই উৎপাদনের মূল লক্ষ্য ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের প্রচেষ্টা। প্রত্যেকটি গ্রামই প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র উৎপন্ন করত। তবে তুলা এবং ইক্ষু সকল অঞ্চলে জন্মায় না বলে এই দুটি পণ্যদ্রব্যের জন্য অনেক গ্রামই বাইরের আমদানির উপর নির্ভর করত। বাইরের অঞ্চলের সঙ্গে সীমিত বাণিজ্য থাকার জন্য মুদ্রার অভাবও তারা খুব সামান্য ভাবে অনুভব করত, কারণ সাধারণতঃ বিনিময় প্রথার মধ্যেই তাদের কেনা-বেচার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে কতকগুলো পরিবর্তনের ফলে গ্রাম-জীবনের চিরাচরিত বিচ্ছিন্নতা বিনষ্ট হয় এবং কৃষিক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন শুরু হয়। তখন থেকেই কৃষকগণ শুধুমাত্র সাংসারিক প্রয়োজনের শস্য উৎপাদন না করে এমন সব শস্য উৎপাদন করতে শুরু করে যার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি করা হত। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তারের নতুন নতুন শস্যের চাষ শুরু হয়। এই সব পণ্যদ্রব্যের মধ্যে তামাক, চীনাবাদাম এবং আলুর চাষ অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রয়োজনের জন্য নীল, পাট, চা ও কফির চাষও ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়। বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার ফলে কৃষক তার উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য থেকে বেশি লাভ

পাওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করে। ভারতের কৃষিপণ্যের উৎপাদনের এই পরিবর্তন কৃষিপণ্য বাণিজ্যিক করণ নামে পরিচিত। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে বাণিজ্যিক কৃষিপণ্যের অনেক কৃষিসম্পদই পূর্বে গ্রামের সামান্য পরিমাণ জমিতে উৎপাদিত হত। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই সব পণ্যদ্রব্যের চাহিদাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের জন্য আরও বেশি পরিমাণ জমি নির্দিষ্ট হতে শুরু করে। কিন্তু খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য প্রচুর জমির প্রয়োজন বলে বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিকভাবে ঐ সব পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। জলসেচের সুবিধা থাকার জন্য দক্ষিণ-ভারতে ইক্ষুচাষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বেরার তুলা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাংলাদেশে পাট চাষ এবং পাঞ্জাবে গম চাষ বিশেষ লাভজনক হয়ে ওঠে।

(৩) কারণ :

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কৃষিপণ্য বাণিজ্যিক করণের কতগুলো বিশেষ কারণ দেখা যায়। এদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৪৩৫ মাইল, ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ এবং ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ২৫,৩৬৩ মাইলে পরিণত হয়। রেলপথ ছাড়াও প্রশস্ত রাজপথ তৈরির কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই থেকে আগ্রা পর্যন্ত রাস্তা তৈরির কাজ সমাপ্ত হয় এবং গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বেনারস থেকে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হয় এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে ঘাটতি অঞ্চলে এবং বিদেশে রপ্তানির জন্য বন্দরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকটি রেলস্টেশনে একটি করে বাজার বা রপ্তানি কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং সেখানে ক্রেতা ও রপ্তানিকারীদের ভীড় বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে সুয়েজ খাল খননের ফলে ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। সুয়েজ খাল ইংলণ্ড ও ভারতের দূরত্বকে প্রায় ৩০০০ মাইল হ্রাস করে এবং মাত্র ৩৬ দিনের মধ্যে কলকাতা থেকে লণ্ডনে পৌঁছাবার সুযোগ এনে দেয়। জাহাজ শিল্পের উন্নতিও অর্থনৈতিক এই পরিবর্তনে যথেষ্ট সাহায্য করে। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই জাহাজ শিল্পের দ্রুত উন্নতি হয় এবং পুরাতন, মন্থর গতি পাল তোলা জাহাজের পরিবর্তে দ্রুতগামী অধিক ভারবাহী আধুনিক জাহাজ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। অপরদিকে সুয়েজ খাল খননের ফলে সমুদ্রযাত্রার পথ হ্রাস পাওয়ায় ইংলণ্ডের বহু জাহাজ উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ে। ফলে জাহাজ কোম্পানীগুলোর মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য দারুণ প্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং তারা মাশুলের হার হ্রাস করতে বাধ্য হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সুয়েজ খাল খননের বিশ বছরের মধ্যে কলকাতা থেকে লণ্ডনে প্রেরিত পণ্যদ্রব্যের প্রতি টনের মাশুল ৫৫ থেকে ২৭ শিলিং-এ পরিণত হয় অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ হ্রাস পায়।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে ভারতের অর্থ নৈতিক বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। এবং ভারতের কৃষিপণ্য বাণিজ্যিক করণের কাজ সম্পূর্ণ করে তোলে। যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড আমেরিকার পরিবর্তে ভারত থেকে তুলা আমদানি করতে শুরু করে। ফলে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড যেখানে ভারত থেকে মাত্র ৫ লক্ষ বেল তুলা আমদানি করে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে তার পরিমাণ হয় ১২·৬ লক্ষ। চাল, গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের চাহিদা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। যদিও আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অবসানের পর ইংলণ্ড ভারতের তুলা কম পরিমাণে আমদানি করতে শুরু করে তথাপি আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তুলা চাষীদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। এইভাবে দেশের অভ্যন্তরে ও ও বিদেশে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিক করণ পদ্ধতিতেও কোন বাধার সৃষ্টি হয় নি। বিভিন্ন নতুন নতুন অঞ্চলে লাভজনক কৃষিপণ্যের চাষবাসও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

বিনিময় প্রথার পরিবর্তে মুদ্রার ব্যবহারও পরোক্ষভাবে ভারতের কৃষিপণ্যের উৎপাদনের সহায়ক হয়ে ওঠে। পূর্বে ভূমি-রাজস্ব নগদ অর্থের পরিবর্তে উৎপন্ন শস্যে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে মুদ্রার মাধ্যমেই ভূমি-রাজস্ব আদায়ের রীতি প্রচলিত হয় এবং বাজারে কৃষিপণ্য বিক্রি করে নগদ মুদ্রা লাভ করে কৃষক অতি সহজেই রাজস্ব দেওয়ার সুযোগ পায়। নগদ মুদ্রালাভের আশায় সে আরও বেশি পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করার চেষ্টা শুরু করে। ইংলণ্ডে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্য ভারতের পক্ষে অনুকূল হয়ে ওঠে এবং ইংলণ্ডে দেয় অর্থ রপ্তানি বাণিজ্যের উদ্বৃত্তাংশ থেকেই সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়।

জলসেচ ব্যবস্থাও পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যিক করণে সহায়তা করে। পাঞ্জাব ও দক্ষিণ ভারতে এই ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা উন্নত থাকায় পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন এ দুটি অঞ্চলে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। শুকুর বাঁধ তৈরি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই পাঞ্জাবে গম উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ ভারত বিদেশে রপ্তানির পক্ষে উপযুক্ত উন্নত মানের ইক্ষু উৎপাদনে সমর্থ হয়।

ভারতের শাসক গোষ্ঠীও পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়। কারণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থ নীল, চা, কফি, চামড়া প্রভৃতি রপ্তানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। এই ব্যবসায়ে প্রধানতঃ সংযুক্ত ছিল ইংরেজগণ। এমন কি, কোম্পানীর কর্মচারীরাও এই সব বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেতেন। তা ছাড়া, ঐ সময় ইংলণ্ডের অধিকাংশ শিল্পই ছিল উন্নতিশীল ক্রমবর্দ্ধমান। সুতরাং কাঁচামাল আমদানির জন্য তাদের বিদেশের উপর নির্ভর করতে হত। এইসব কাঁচামালের ব্যাপক উৎপাদন ভারতে শুরু হলে ব্রিটিশ গোষ্ঠী ও শিল্পপতিগণ নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকাংশে সুনিশ্চিত হন।

(৪) ফলাফল :

কৃষিপণ্য বাণিজ্যিক করণ গ্রামীণ ভারতের উপর গভীর সামাজিক ও অর্থ নৈতিক

পরিবর্তন আনয়ন করে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যজীবন ও অর্থনীতির অবসান হয় এবং বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের অর্থ নৈতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। নতুন নতুন পণ্য-দ্রব্য চাষবাসের সঙ্গে কৃষকের জীবনেও নতুন পরিস্থিতির সূচনা হয় এবং প্রায় প্রত্যেক কৃষকই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাজারের অংশীদারে পরিণত হয়। স্থানীয় চাহিদার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক চাহিদার কথা মনে রেখে তখন থেকে কৃষকগণ বিভিন্ন জাতীয় শস্য উৎপাদন করতে শুরু করে। আন্তর্জাতিক বাজারের গতিপ্রকৃতিও ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

পণ্যদ্রব্য বাণিজ্যিক করণের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের চাহিদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়, কৃষিপণ্যের মূল্যও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ১৮৫৯-৬০ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২১ কোটি টাকা ; ১৮৭১-৮০-তে তার পরিমাণ হয় ৬১ কোটি টাকা এবং ১৯০৬-০৭ খ্রীস্টাব্দে তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৬ কোটিতে পরিণত হয়। গম প্রধানতঃ ইংলণ্ডে রপ্তানি হত ; চাল রপ্তানি হত পৃথিবীর অনেক দেশে, তার মধ্যে পূর্ব-আফ্রিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রপ্তানি শস্যের মধ্যে তৈলবীজও খুব প্রাধান্য লাভ করে। নতুন নতুন দেশের সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্যের সম্পর্কও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রেলপথ একদিকে যেমন ভারতের কৃষিপণ্য বাণিজ্যিক করণে সহায়তা করে অপর দিকে তেমনই বাইরের দেশে যন্ত্রশিল্পে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য গ্রামে গ্রামে পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। গ্রাম-জীবনের সমাজনীতির অবসান হওয়ায় স্থানীয় কারিগরদের পৃষ্ঠপোষকতা করার পরিবর্তে গ্রামের অধিবাসীরা এইসব শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করতে শুরু করে। ফলে ভারতের কুটিরশিল্প ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। কৃষি ও কুটিরশিল্প যৌথভাবে গ্রামের অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি করত—কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন শুরু হয় এবং কুটিরশিল্প অনাদৃত হতে শুরু করে। পৃষ্ঠপোষকতা ও স্থানীয় চাহিদা হ্রাস পেলে বহু কারিগরই জীবিকাচ্যুত হয়ে পড়ে এবং জীবন রক্ষার জন্য অন্য জীবিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই অনন্যোপায় হয়ে কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করে। ফলে জমির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং নতুন আর প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে। আবার অপরদিকে লাভজনক বাণিজ্যিক কৃষিপণ্যের উৎপাদনের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় ভারতের খাদ্যশস্যের উৎপাদন অবহেলিত হতে শুরু করে। তা ছাড়া, পূর্বে কৃষকগণ দুর্দিনের জন্য খাদ্যশস্য সঞ্চয় করে রাখত। কিন্তু দূর-দূরান্ত অঞ্চলের সঙ্গে পরিচয় ও যোগসূত্র গড়ে ওঠার পর এই নীতির পরিবর্তন হয়। খাদ্যশস্য সঞ্চয় করে রাখার প্রবৃত্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে কৃষককুলই হত আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। বার বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও এবং দুর্ভিক্ষে বার বার পীড়িত হলেও নগদ অর্থের লোভ সংবরণ করে কৃষকগণ কখনও খাদ্যশস্য সঞ্চয় করার প্রতি কোন দৃষ্টি দেয় নি। সেজন্য দেখা যায় যে, ১৮৯৫-৯৬

থেকে ১৮৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাণিজ্যিক পণ্যের পরিমাণ ৮৫% বৃদ্ধি পেলেও খাদ্য শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় মাত্র ৭%। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নতুন আবাদী জমির পরিমাণ খুবই সামান্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উন্নত এবং উর্বর জমিগুলোকে তারা বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখে। তা ছাড়া, বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মহাজনদের ব্যবসা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমির মূল্যও বৃদ্ধি পায় এবং মহাজনগণ চড়া সুদে কৃষকদের অতিরিক্ত ঋণ দিতেও সম্মত হয়।

Q. 42. What were the causes of de-industrialisation in India ? What were its effects ?

Ans. (১) ভারতীয় রাজন্যবর্গের পতনের ফল :

ভারতীয় রাজন্যবর্গের পতন এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের কুটির-শিল্প চরম আঘাত লাভ করে। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবার কর্তৃক চারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনের অবসান ঘটে এবং কারিগরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। রাজন্যবর্গের পতনের পরও কিছুকাল এই সব শিল্পের সীমিত চাহিদা থাকলেও জনসাধারণের পক্ষে ঐ সব শিল্পীদের পরিশ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা ও মজুরী দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। ফলে চারুকলা ও অন্যান্য কুটিরশিল্প ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে থাকে।

(২) ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়া :

ভারতের ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনের ফলে কুটিরশিল্প প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ভারতের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হলে ব্রিটিশ রাজকর্মচারিগণ শিল্পীদের এইসব অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা নিষিদ্ধ করে। চারুকলার দুটি প্রধান কেন্দ্র পাঞ্জাব ও সিন্ধুর শিল্পীগণ এইভাবে তাদের জীবিকাচ্যুত হয়ে পড়ে। সুতরাং এইসব শিল্পীগণ বিদেশী ভ্রমণকারীদের জন্য নানাপ্রকার অলঙ্কার তৈরি করতে শুরু করে। অপর দিকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর সরকার অলিখিত ভাবে চর্ম নির্মিত পাদুকা ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। ফলে মুচিশিল্পে পরিশোভিত পাদুকার ব্যবহার লোপ পায় এবং ঐ কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা কর্মহীন হয়ে পড়ে। পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় বিভিন্ন শিল্পের বণিকসঙ্ঘগুলো ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এই বণিকসঙ্ঘগুলোই ভারতের শিল্প নিয়ন্ত্রিত করত এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মান বজায় রাখার ব্যবস্থা করত। ফলে অযোগ্য কারিগর শিল্পে অনুপ্রবেশের সুযোগ পায় এবং শিল্পের মানের অবক্ষয় ঘটে এবং তাদের চাহিদাও হ্রাস পায়।

(৩) পাশ্চাত্য শিক্ষা :

ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতিও শিল্পের অবক্ষয়ের পথ সুগম করে তোলে। প্রথম দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়গণ ইয়োরোপীয়দের অপেক্ষা বেশি ইয়োরোপীয় ছিল। তারা ইয়োরোপীয় রীতি-নীতিকেই তাদের আদর্শ বলে মনে করতে শুরু করে

ভারতীয় সব কিছুকেই ঘৃণার চোখে দেখত। প্রকৃতপক্ষে সেই যুগে ইয়োরোপীয় আদব-কায়দাকেই উন্নতির চরম নিদর্শন রূপে গণ্য করত। ফলে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের চাহিদা দ্রুত হ্রাস পায় এবং ইয়োরোপীয় পণ্যদ্রব্যের চাহিদা নিয়ত বৃদ্ধি পায়।

(৪) **নতুন আদর্শ :**

দেশীয় রাজ্যের অবলুপ্তি এবং ভারতীয় শাসক গোষ্ঠী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও ইয়োরোপের পর্যটনকারিগণ তাদের স্থান গ্রহণ করে। যদিও ভারতীয় কারিগরগণ ইয়োরোপীয়দের চাহিদা অনুযায়ী সকলসময় পণ্যদ্রব্য তৈরি করতে পারত না, তথাপি তারা তাদের মনোরঞ্জনের জন্য নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য তৈরি করতে শুরু করে। ইয়োরোপীয় শিল্পের নমুনা অনুকরণ করে তারা অনেক পণ্য দ্রব্য তৈরি করে। ফলে এই সব শিল্পকর্ম প্রায়শই মৌলিক শিল্পকর্মের ব্যর্থ অনুকরণে পরিণত হত এবং ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে তা কথনই প্রাণবন্ত হয়ে উঠত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে পাঞ্জাবের কাফত গিরি শিল্প যথেচ্ছভাবে ইয়োরোপীয়দের রুচি মাফিক পণ্য দ্রব্য তৈরি করতে গিয়ে নিজের ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করে।

(৫) **যন্ত্রনির্মিত পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা :**

ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও তাদের রাজসভার অবলুপ্তি এবং বিদেশী প্রভাব ছাড়াও ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকারীদের উন্নত ধরনের যন্ত্রে নির্মিত পণ্যদ্রব্য ভারতীয় শিল্পীদের অভ্যন্তরীণ বাজার থেকেও দূর করতে সমর্থ হয়। মিস্টার রাণাডের মতে প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের পরিশ্রমের দ্বন্দ্বে ভারতের কুটিরশিল্প সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। ইয়োরোপের বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা পরিচালিত তাঁতযন্ত্র ভারতের বয়ন শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য করে তোলে। ১৮৩৪-১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় তন্তুবায়গণ ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হতে থাকে। ভারতের অন্যান্য শিল্পসম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। জাহাজ-নির্মাণ, লৌহ গলান পদ্ধতি, কাঁচ তৈরি, রঙশিল্প, কাগজ নির্মাণ পদ্ধতি প্রভৃতি দ্রুত ধ্বংস হয়। ভারতের শিল্পসমূহ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটিশ শিল্পের আঘাত সহ্য করে উঠতে সমর্থ হয় নি। তার মূল কারণ ছিল ভারতীয় শিল্পের পক্ষে ব্রিটিশ শিল্পের পশ্চাতের শক্তিশালী শিল্প সংগঠন, বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রপাতি, বৃহৎ আয়তনে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং জটিল কর্ম বিভাজন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব ছিল না। ভারতীয় শিল্প ও শিল্পীদের দুর্দশাকে আরও বৃদ্ধি করে তোলে সুয়েজখাল খনন কার্য সম্পাদন, পণ্য দ্রব্যের উপর ধার্য মাশুলের হার হ্রাস এবং রপ্তানি-আমদানি বাবদ ব্যয়ের ক্রমহ্রাসমান ব্যবস্থা। এই সব সুযোগ পাওয়ার ফলে বিদেশী পণ্যদ্রব্যের মূল্য ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের চেয়েও কম হয়ে পড়ে।

(৬) **ইংরেজ-সরকারের নীতি :**

প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করে, কারণ এইসব শিল্পজাত দ্রব্যের প্রধান রপ্তানিকারকই ছিল তারা। কিন্তু তাদের এই নীতি ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থ-বিরোধী হওয়ায় তারা ব্রিটিশ

সরকারের উপর ভারত থেকে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানির পরিবর্তে কাঁচামাল আমদানির জন্য বিশেষ চাপের সৃষ্টি করে। কারণ ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শিল্পের জন্য একদিকে কাঁচামাল অপর দিকে একটি নির্দিষ্ট কিন্তু বৃহৎ বাজারের প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার পরে দৃঢ়সংকল্প হয়ে সমগ্র ভারতকে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের প্রভাবাধীন করার চেষ্টা করে। ভারতের রেশম শিল্পের কারিগরদের নিজেদের বাড়ীতে বসে কাজ করার পরিবর্তে ব্রিটিশদের পরিচালিত কারখানায় যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে ভারতে রঞ্জিত রেশমী বস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। বর্দ্ধিত হারে নানা রকম শুল্ক ধার্য করে ভারতীয় শিল্পের ক্ষতি সাধনের ব্যবস্থা করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে নির্মিত বস্ত্র ইংলণ্ডের বস্ত্রের তুলনায় প্রায় ৫০% থেকে ৬০% কম দরে বিক্রি করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের বাজার থেকে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে বিতাড়িত করার জন্য ৭০% থেকে ৮০% হারে কর ধার্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে নিষেধ-আজ্ঞামূলক আইন প্রণয়ন ও কার্যকরী করা না হলে এবং শুল্কের হার বৃদ্ধি না করলে বাষ্পীয় শক্তি থাকা সত্ত্বেও ম্যাঞ্চেস্টারের বয়ন শিল্প গড়ে উড়তে পারত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ পোষণ করা অসঙ্গত নয়। ভারত স্বাধীন দেশ হলে তখন ব্রিটিশ বয়ন শিল্পের উপর প্রচুর পরিমাণে কর ধার্য করে তাদের ব্যবহারের উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু পরাধীন ভারতের সে ক্ষমতা ছিল না। সেজন্য বলা হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করতে অসম্ভব মনে করে ব্রিটিশ বস্ত্রোৎপাদনকারিগণ অন্যায়ভাবে রাজনৈতিক অস্ত্র ব্যবহার করে ভারতের শিল্প ধ্বংস করার সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্রিটিশ সরকার এই অন্যায় ভাবে আরোপিত শুল্ক বাতিল করে কিন্তু তখন ভারতের শিল্প প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাদের এই উদারতা ভারতের শিল্প ও শিল্পীদের কোন ভাবেই সাহায্য করে নি।

এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে, ইংলণ্ডের এই অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে ভারতের ব্রিটিশ সরকার কোনপ্রকার প্রতিবাদ জানায় নি, অথবা ভারতীয় শিল্পীদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে নি। বরং ভারত সরকার ভারতের বাজার শোষণ করে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত করে দেয়। মিস্টার রাণাডে এই সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ইংলণ্ডের শিল্পপতিগণ ভারতে উৎপন্ন কাঁচামাল ইংলণ্ডের জাহাজে স্বদেশে প্রেরণ করে সেখানকার কারখানায় পণ্যদ্রব্য তৈরি করে নিজেদের বাণিজ্যকুঠির মাধ্যমে তা ভারতের বাজারে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করে। ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ একই পণ্য-দ্রব্যে দুবার মুনাফা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করে। আর এই ব্যাপারে তাদের প্রধান সহায়ক ছিল ভারতের ব্রিটিশ সরকার। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় ভারতে কোন শিল্পের উন্নতিলাভ করা সম্ভব ছিল না। ফলে ভারতের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত ধ্বংস হতে শুরু করে এবং সমগ্র দেশ গ্রাম আবহাওয়ায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

(৭) মহাজনের ভূমিকা :

ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থপর নীতি ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যকে যখন ধ্বংসোন্মুখ করে তোলে, তখন দেশীয় মহাজনগণও দরিদ্র কারিগরদের শোষণ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে নি। প্রকৃতপক্ষে কারিগরদের তারা ক্রীতদাসে পরিণত করে। এইরূপ মহাজনদের শীর্ষস্থানে ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। কোম্পানী নিজেই বাণিজ্য পরিচালনা করত বলে চাষী ও কারিগরদের দাদন দিত এবং তার পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করত। একবার কোন কারিগর দাদন গ্রহণ করলেই সে প্রায় সারাজীবনের জন্য কোম্পানী বা অন্য মহাজনদের করতলগত হয়ে পড়ত। তাদের লৌহমুষ্টি থেকে তার আর অব্যাহতি থাকত না। কারণ একটি নির্দেশে বলা হয়েছিল যে দাদন গ্রহণকারী কোন তন্তুবায় তার উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য ভারতীয় বা ইয়োরোপীয় অন্য কোন বণিকের নিকট বিক্রি করতে পারবে না। যদি কেউ এরূপ কাজ করে তাহলে তাকে দেওয়ানি আদালতে সোপর্দ করা হবে এবং তার দ্বারা বিক্রীত প্রতিটি বস্ত্রখণ্ডের জন্য তাকে ৩৫% জরিমানা দিতে হবে। তা ছাড়া, যদি কোন তন্তুবায় চুক্তি অনুসারে বস্ত্র সরবরাহ করতে না পারত তা হলে তার পণ্যদ্রব্য বলপূর্বক বাজেয়াপ্ত করা হত এবং কোম্পানীর ক্ষয়-ক্ষতির আংশিক পূরণের জন্য সমগ্র পণ্যদ্রব্য সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় করে দেওয়া হত। অনেকে ব্রিটিশ কর্মচারীদের এইরূপ অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য এবং বয়ন শিল্পে আর যাতে কাজ না করতে হয় সেজন্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্তন করে ফেলতে বাধ্য হত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ তন্তুবায়দের সঙ্গে নিঃসন্দেহে দুর্বৃত্তের মতো আচরণ করত, কিন্তু ভারতীয় মহাজনেরাও তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করত না। দাদন দানের সুযোগ নিয়ে তারাও কারিগরদের নানাভাবে শোষণ করার চেষ্টা করত।

(৮) ফলাফল :

ভারতের কুটির শিল্পের ধ্বংস ভারতীয় অর্থনীতির উপর ব্যাপক বিপর্যয় আনয়ন করে। ভারতের গ্রাম্যজীবন ও গ্রামীণ অর্থনীতি কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ফলে গড়ে উঠেছিল। তাঁত ও চরকাই ছিল ভারতের সনাতন সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ব্রিটিশরাজ ও শিল্পপতি তাঁত ও চরকার ধ্বংস সাধন করে এশিয়ার সামাজিক জীবনে বৃহত্তম ও ব্যাপকতম বিপ্লবের সৃষ্টি করে। এই বিপ্লব শুধুমাত্র ভারতের প্রাচীন শিল্পকেন্দ্রগুলোকে ধ্বংস করে নি, গ্রামীণ জীবনের অর্থনৈতিক ভারসাম্যও ধ্বংস করে। শিল্পের ধ্বংসসাধনের ফলে কৃষির উপর অধিক সংখ্যক ব্যক্তি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং ভারতের অর্থনীতিতে শোচনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়।

Q. 43. How were the Princess fitted into the new imperial framework after 1857 ?

Ans. (১) ভূমিকা :

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহ ভারতের ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যসমূহের এক নতুন সম্পর্কের সূচনা করে। কোন না কোন অজুহাতে একের পর এক দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ-ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে যে নীতি লর্ড ডালহৌসী গ্রহণ করেন, সেই নীতিই সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম কারণ রূপে চিহ্নিত হয়। দেশীয় রাজ্যসমূহও ব্রিটিশ সরকারকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। সুতরাং এরূপ অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলো সম্পর্কে নতুন একটি নীতি গ্রহণ করার চেষ্টা করে। ফলে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের মহারানীর ঘোষণায় বলা হয় যে, ব্রিটিশ সরকার ভবিষ্যতে আর কোন দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ-ভারতের সঙ্গে যুক্ত করবে না। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আরও আশ্বাস দেওয়া হয় যে, তারা দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে সম্পাদিত সকল নীতির চুক্তিই অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। সরকার তাদের অধিকার এবং মর্যাদা যথোপযুক্ত ভাবে স্বীকার করবে এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার করবে। সরকার অপুত্রক দেশীয় রাজাদের দত্তক পুত্র গ্রহণ করার অধিকারও স্বীকার করবে। তাদের আরও আশ্বাস দেওয়া হয় যে, যতদিন পর্যন্ত তারা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকবে ততদিন তাদের কোন ক্ষতিসাধন করা হবে না। এই সময় দেশীয় রাজাদের একশ বাট খানা সনদও মঞ্জুর করা হয়। তবে এই সনদ মঞ্জুর করার সময় ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং বলেন যে, সনদ দেওয়ার পরও যদি কোন দেশীয় রাজ্যে সন্ত্রাস বা ক্ষমতার অপব্যবহার দেখা দেয় ব্রিটিশ সরকার তা দূর করে পুনরায় শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করার অধিকার ভোগ করবে। রাজন্যবর্গের মধ্যে আনুগত্যের অভাব অথবা চুক্তিভঙ্গের প্রবণতা দেখা দিলে ব্রিটিশ সরকার তাদের শাস্তি বিধান করবে। অধ্যাপক ডডওয়েল মনে করেন যে, এইসব সনদের মর্মার্থ হ'ল দেশীয় রাজ্যগুলোকে ব্রিটিশ-ভারতের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত করে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে এইসব রাজ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। রাজন্যবর্গের উপর বলপূর্বক ব্রিটিশ সরকার চুক্তি আরোপ করেছে এরূপ অভিযোগ করার সুযোগও চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তাঁরা সাম্রাজের অংশীদাররূপে স্বীকৃতি লাভ করে এবং স্বেচ্ছায় তাঁরা এই অবস্থাও মেনে নিতে আপত্তি করেন নি।

(২) ব্রিটিশের উদ্দেশ্য ও মনোভাব :

সিপাহি বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতীয়দের সম্পর্ক তিক্ত করে তোলে। ভারতীয়দের হাতে ইয়োরোপীয়ের মৃত্যু এবং ইয়োরোপীয়দের হাতে ভারতীয়দের মৃত্যুর নৃশংস কাহিনী কোন পক্ষেরই বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। এরূপ অবস্থায় ব্রিটিশ

সরকার ভারতের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে একদল ভারতীয়দের মিত্র রূপে লাভ করার চেষ্টা করে এবং এই ব্যাপারে দেশীয় রাজন্যবর্গই তাদের সব চাইতে বেশি আকাঙ্ক্ষিত ছিল। ফলে তারা দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতি পূর্বে অনুসৃত ঈর্ষা ও সন্দেহের নীতি পরিত্যাগ করে, তাদের পরস্পরকে স্বতন্ত্র করে রাখার পরিবর্তে তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করে। তবে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্রিটিশ সরকার তাদের সম্পর্কে নীতি পরিবর্তন করলেও তাদের অধিকার স্বাধীনতা দিতে সম্মত হয় নি। যে কোন সুযোগেই ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর তাদের সার্বভৌম অধিকারের ক্ষমতা ঘোষণা করতে দ্বিধা করত না। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ক্যানিং ঘোষণা করেন যে, ইংলণ্ডের রাজমুকুট প্রশ্নাতীত ভাবে সমগ্র ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। পরবর্তীকালে লর্ড লিটন, লর্ড ল্যান্সডাউন, লর্ড মিণ্টো এবং লর্ড রিডিং অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড মিণ্টো ঘোষণা করেন যে, ইংলণ্ডের রাজার সঙ্গে দেশীয় রাজাদের সম্পর্ক প্রকৃতভাবে অধিরাজের সঙ্গে সামন্ত রাজাদর সম্পর্কের মতো। অনিবার্য কারণ দেখা দিলে ইংলণ্ডের অধীশ্বর দেশীয় রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে পারে। তবে এইসব রাজ্যে যাতে নিম্নতম শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা বজায় থাকে সেদিকে ব্রিটিশ সরকার সকল সময়ই দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করবে। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে লর্ড রিডিং সুস্পষ্টভাবে হায়দ্রাবাদের নিজামকে জানিয়ে দেন যে, দেশীয় রাজাদের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বও ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের অধীন। বাটলার কমিটি ঘোষণা করে যে, ব্রিটিশ সিংহাসন এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যেকার সম্পর্ক স্থায়ী এবং ক্রমবর্ধমান। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের এক ঘোষণায় বলা হয় যে, আংশিক ভাবে জয়ের মাধ্যমে, আংশিক ভাবে চুক্তির দ্বারা এবং আংশিক ভাবে প্রথা অনুযায়ী ব্রিটিশের সার্বভৌমত্ব গড়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে সুযোগ পেলেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের সার্বভৌমত্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করত। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাইজার-ই-হিন্দ উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দরবারে দেশীয় রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ করা হয়। দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর প্রধান প্রধান দেশীয় রাজন্যবর্গ অভিযোগ করেন যে তাঁদের পদ মর্যাদা ও সম্মান যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয় নি, কিন্তু ঐ অপমানকর পরিস্থিতি তাদের নিঃশব্দে সহ্য করতে হয়।

(৩) হস্তক্ষেপের অধিকার :

দেশীয় রাজ্যগুলোর স্থায়িত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া হলেও রাজন্যবর্গ নিজেদের হীনতর অবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। সাধারণতঃ সপরিষদ গভর্নর জেনারেল ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখতেন। দেশীয় রাজন্যবর্গ বাস্তবে নীতি নির্ধারণের কোন স্বাধীনতা ভোগ করতেন না। দরবারের স্থায়ী ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মিত্রভাবে পরামর্শ দিয়ে রাজাকে শাসনকার্য পরিচালনায় সাহায্য করতেন। রেসিডেন্টদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশ

সরকারের স্বার্থ রক্ষা করা। তাঁরা ব্রিটিশ সার্বভৌম শক্তি এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই ছিলেন দেশীয় রাজ্যের শাসক। এই প্রসঙ্গে কে. এম. পানিক্কর বলেন, "All those who have direct experience of Indian states know that the whisper of the Resedency is the thunder of the state and there is no matter on which the Resident does not feel qualified to give his advice." প্রকৃতপক্ষে রেসিডেন্টের পরামর্শই ছিল আদেশের নামান্তর। ব্রিটিশ সরকার সকল প্রকার উপাধি প্রদান, সম্মান প্রদর্শন, সামরিক অভিবাদন গ্রহণ এবং সম্মানজনক অবস্থান স্থল প্রভৃতির রীতি-নীতি নির্ধারণের অধিকার দাবি করত। ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি ব্যতীত কেউ কোন বিদেশী উপাধি গ্রহণ করতে পারতেন না। কাউকে উপাধি প্রদান করার ক্ষমতা থেকেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে ব্রিটিশ সরকার রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করে অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করতে পারত। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে বরোদা এবং ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে মণিপুরের তদানীন্তন রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করে নতুন শাসক নিযুক্ত করে। ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতা কিভাবে দেশীও রাজ্যগুলোর উপর কর্তৃত্ব করতো তা এই দুটি রাজ্যের ঘটনা থেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়।

দেশীয় রাজন্যবর্গ উত্তরাধিকার কর দিতে বাধ্য ছিলেন, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা মকুব করা হত। দেশীয় রাজ্যের কোন প্রজা বিদেশে যেতে ইচ্ছুক হলে ছাড়পত্রের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন করতে বাধ্য ছিল। তাদের অস্ত্রশস্ত্র রাখার অনুমতিপত্রও ব্রিটিশ সরকার মঞ্জুর করত। রাজ্যের দেওয়ান, প্রধানমন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ অন্যান্য রাজকর্মচারীর নিয়োগ-ব্যবস্থাও ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষ ছিল। নাবালক রাজা সিংহাসন আরোহণ করলে অথবা সাময়িকভাবে কোন রাজাকে গদিচ্যুত করলে অথবা চিরদিনের জন্য বিদায় দিলে ব্রিটিশ সরকার একজন প্রতিনিধি বা রিজেন্ট নিযুক্ত করত। নাবালক রাজার শিক্ষা-দীক্ষার জন্যও ব্রিটিশ সরকার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করত। এই প্রসঙ্গে লর্ড কার্জন মন্তব্য করেন যে নাবালক রাজা সাবালক হওয়ার পর যাতে যোগ্যতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখাও ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের পূর্বেও ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি লাভ করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলো নিজস্ব মুদ্রা নির্মাণের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। দেশীয় রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে নিষ্ফল প্রতিবাদ জানান। এমন কি রাজাদের শাসন-নীতির প্রতিবাদে তাঁদের প্রজারা ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন পেশ করে এই ব্যবস্থার প্রতিকার দাবি করতে পারতেন। ব্রিটিশ সরকারের এই নীতিকে তাঁরা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা করলেও ব্রিটিশ সরকার তার নীতির কোন পরিবর্তন করে নি। তবে সাধারণতঃ অবস্থা খুব সংকটাপন্ন না হলে ব্রিটিশ

সরকার দেশীয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত না। তবে দেশীয় রাজন্যবর্গ যাতে বিদেশী কোন শক্তি বা কোন বিদেশীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা না করেন সেদিকে ব্রিটিশ সরকার খুব কঠোর দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করত। প্রয়োজন হলে ব্রিটিশ সরকারের মাধ্যমে তাঁরা বিদেশী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারতেন। বিদেশী কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত রক্ষারও কোন অধিকার তাঁদের ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোন ইয়োরোপীয় কর্মচারী নিযুক্ত করার অধিকার তাঁরা ভোগ করতেন না।

(৪) পরবর্তী পদক্ষেপ :

১৮৫৮ থেকে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের দ্বারা একটি সংগঠন গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভই ছিল ব্রিটিশ নীতির মূল উদ্দেশ্য। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারীর এক রাজকীয় ঘোষণা অনুসারে 'চেম্বার অফ প্রিন্সেস' নামে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার স্থায়ী কমিটি দিল্লীতে প্রতি বছর দুই বা তিনবার মিলিত হয়ে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করত এবং চেম্বার অফ প্রিন্সেস-এর নিকট নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করত। এই সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের মধ্যে নতুন একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ দেখা দেয় এবং অনেক সময় বে-সরকারী ভাবে তাঁরা অনেক বিষয় আলোচনা করার সুযোগ পেতেন।

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড ব্রিটিশ সার্বভৌম শক্তি ও দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যেকার তদানীন্তন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক পর্যালোচনার জন্য মিস্টার হারকোর্ট বাটলারের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি বাটলার কমিটি নামে পরিচিত। বাটলার কমিটি স-পরিষদ গভর্নর জেনারেলের পরিবর্তে ভাইসরয়ের উপর দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি অর্পণ করে। তা ছাড়া, কমিটি আশ্বাস দেয় যে ভবিষ্যতে দেশীয় রাজাদের সম্মতি ব্যতীত ব্রিটিশ রাজমুকুট ও দেশীয় রাজন্যবর্গের বর্তমান সম্পর্কের কোন পরিবর্তন করা হবে না। প্রকৃতপক্ষে বাটলার কমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ-ভারতের পরিবর্তে ব্রিটিশ রাজমুকুটের সঙ্গে দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক 'চীনের প্রাচীর' তুলে পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা। সেজন্য সি. ওয়াই. চিন্তামনি এবং নেহেরু রিপোর্ট বাটলার কমিটির কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। বাটলার কমিটি দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ রাজমুকুটের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত করার ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের উপর অর্পণ করায় রাজন্যবর্গও খুব ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা আরও বেশি রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করার প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ধীরে ধীরে তাঁদের স্বাধীনতা

ব্রিটিশ এরূপভাবে সংকুচিত করে ফেলে যে, একমাত্র গোপনে ক্ষোভ প্রকাশ করা ছাড়া তাঁদের আর অন্য কোন উপায় ছিল না।

Q. 44. Give an account of the Indian foreign trade between 1857 and 1947.

Ans. (১) ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য :

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওলন্দাজ, ফরাসী এবং পোর্তুগীজ বণিকদের অধিকার খর্ব করে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া কর্তৃত্ব লাভ করে। কোম্পানীর উদ্ভবের প্রথম দিকে ভারতের রপ্তানির বৃহদংশ ছিল সূতীবস্ত্র এবং মশলা এবং ভারতে যে সকল দ্রব্য আমদানি হত তার মধ্যে প্রধান ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য পিণ্ড। কিন্তু ইংলণ্ডের একদল লোক যথেষ্ট স্বর্ণ ও রৌপ্য পিণ্ড ভারতে রপ্তানি করার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু করে এবং তাদের এই আন্দোলনের ফলে ভারতীয় সূতীবস্ত্রের উপর ইংলণ্ড উচ্চহারে আমদানি শুল্ক ধার্য করে এবং কয়েক প্রকার সূতী বস্ত্রের আমদানি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডের বয়ন শিল্পে 'শিল্প বিপ্লব' দেখা দেয়। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে সূতীবস্ত্রের আমদানি ভারতে আমদানিকৃত মোট বিদেশী পণ্যদ্রব্যের অর্ধাংশ হয়ে দাঁড়ায়। ইংলণ্ডের যন্ত্র শিল্পে প্রস্তুত বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ভারতের হস্তচালিত বস্ত্রশিল্প যখন ধ্বংসের সম্মুখীন হয় ঠিক সেই সময়েই ব্রিটিশ বাজারে ভারতের কাঁচা তুলার আমদানির পথ সুগম হয়। ব্রিটেনে ভারতের কাঁচা তুলার চাহিদা বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল: (১) ব্রিটেন আমেরিকার তুলা সরবরাহের উপর তার একান্ত নির্ভরতা হ্রাস করতে চেষ্টা করে। (২) ভারতে রেলপথ নির্মাণের ফলে তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলোর সঙ্গে বন্দরের সরাসরি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। (৪) ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে সুয়েজ খাল খননের ফলে ইংলণ্ড ও ভারতের দূরত্ব তিন হাজার মাইল হ্রাস পায় এবং জাহাজ ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার ফলে পণ্যদ্রব্যের মাশুলও যথেষ্ট কমে যায়। তুলা ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত কাঁচা মাল ভারত থেকে রপ্তানি হত তার মধ্যে প্রধান ছিল পাট, তৈলবীজ, কাঁচা চামড়া, গম, চাল, চা, কফি প্রভৃতি। রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে অধিকাংশ রপ্তানি শুল্কই রহিত করা হয়, আভ্যন্তরীণ অনেক শুল্ক ১৮৩৬ থেকে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রহিত করা হয়।

আমদানির ক্ষেত্রে শিল্পজাত দ্রব্যই ছিল প্রধান। প্রথম দিকে ইংলণ্ড থেকে প্রধানতঃ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হত। পরবর্তীকালে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আমদানিকারী দেশের তালিকায় জার্মানী, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি স্থান লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতের আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৮৬৪-৬৫ থেকে ১৮৬৮-৬৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বার্ষিক গড় রপ্তানির মূল্য ছিল ৫৫.৮৬ কোটি টাকা এবং

বার্ষিক গড় আমদানির মূল্য ছিল ৩১'৭৫ কোটি-টাকা। ১৮৯৪-৯৫ থেকে ১৮৯৮-৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বার্ষিক গড় রপ্তানির মূল্য ছিল ১০৭'৫৩ কোটি টাকা এবং বার্ষিক গড় আমদানির মূল্য ছিল ৭৩'৬৭ কোটি টাকা। ১৯২৪-২৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯২৮-২৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বার্ষিক গড় রপ্তানির মূল্য ছিল ৩৫৩'৫৬ কোটি টাকা এবং বার্ষিক গড় আমদানির মূল্য ছিল ২৫১'০২ কোটি টাকা। বিশেষত ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে সকল আমদানি শুল্কের বিলোপ সাধন করা হলে বিদেশের শিল্পজাত দ্রব্যের অবাধ আমদানির পথ প্রশস্ত হয়।

(২) বাণিজ্য রূপান্তর :

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ অনুসারে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটে। ভারতের আমদানি এবং রপ্তানি সামগ্রী ব্রিটিশ জাহাজে পরিবহণ করতে হবে এই নিয়মটিও অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পরিত্যক্ত হয়। এই সকল কারণে ভারতের পক্ষে যে কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ থাকলেও ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের সর্বাধিক বাণিজ্য পরিচালিত হত। ভারতীয় শিল্পে ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি-গুলোর প্রাধান্য, ব্রিটিশ ব্যবসায়ী এবং জাহাজ কারবারীগণের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা এবং বিশেষভাবে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণের অনুকূলে এবং অন্যান্য বাণিজ্য সহযোগীদের প্রতিকূলে বিভেদমূলক আচরণের নীতি প্রভৃতি কারণের মধ্যে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ব্রিটিশ আধিপত্যের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

তা ছাড়া, ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেখা যায়। ভারতের শাসন বিভাগে বহু ইংরেজ রাজকর্মচারী উচ্চপদে আসীন থাকতেন। তাঁদের বেতন, ভাতা, বার্ধক্য ভাতা প্রভৃতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হত। অনেক সময় তাঁরা ইংলণ্ডের মুদ্রায় ইংলণ্ডে বসে এই অর্থ আদায় করতেন। 'হোম চার্জ' নামে অভিহিত বিভাগ থেকে এই অর্থ পরিশোধ করা হত। সুতরাং ইংলণ্ডের সুচতুর শাসকগণ এদেশ থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে এই অর্থ ভারতের কাছ থেকে আদায় করার চেষ্টা করত। ফলে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রধান অংশ বাধ্য হয়েই ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পাদন করতে হত।

(৩) বাণিজ্যের প্রসার :

১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ভারতের রপ্তানির প্রসার পূর্বেকার গতিতে বৃদ্ধি পায় নি। ১৮৬০-৭০-এর দশকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ তুলা ব্যবসায়ীগণ আমেরিকার দেশে ভারত থেকে তুলা ক্রয় করতে শুরু করলে রপ্তানির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৮৭৫ থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রপ্তানির গতিবেগ অপেক্ষাকৃত মন্থর হয়ে পড়ে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে খরা ও দুর্ভিক্ষ, বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে বিশৃঙ্খলা ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের পর টাকার বিনিময় মূল্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা প্রভৃতি কারণে রপ্তানির

পরিমাণ হ্রাস পায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম চৌদ্দ বছরে ভারতীয় রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণে পরিণত হয়। পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলে বিশাল সেচ প্রকল্পগুলোর নির্মাণকার্য শেষ হলে স্বাভাবিক ভাবেই কৃষিপণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। টাকার মূল্যে স্থিতিশীলতা স্থাপিত হওয়ার ফলে বাণিজ্য আবার পূর্বের গতি লাভ করে। জার্মানী ও জাপানে পূর্ণোদ্যমে শিল্পের বিকাশ শুরু হলে ভারতের কাঁচামালের চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৮-৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বছরের গড় হিসাবে ভারতীয় রপ্তানির মূল্য ছিল ১১০ কোটি টাকারও কম কিন্তু ১৯১৩-১৪ খ্রীস্টাব্দে পাঁচ বছরের রপ্তানির গড় মূল্য দাঁড়ায় ২২৪ কোটি টাকা।

১৮৬৫ থেকে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আমদানি বৃদ্ধির গতি রপ্তানি বৃদ্ধির গতি অপেক্ষা সামান্য দ্রুততর ছিল। এই সময়ের মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ চারগুণ বৃদ্ধি পায় কিন্তু আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় পাঁচগুণ। ভারতের বাজারে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রি করার জন্য ইংলণ্ড, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। এই সময় জার্মানী ও জাপান ভারতে তাদের জাতীয় ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করে এবং ভারত মহাসাগরে তাদের জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

(৪) বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় বাণিজ্য :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে ভারতের বহির্বাণিজ্যের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। যুদ্ধের ফলে স্বাভাবিক বাণিজ্যপথগুলো রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং জাহাজের মাশুলও খুব বৃদ্ধি পায়। বিশেষত ইংলণ্ডের শিল্পের কাঠামোতে পরিবর্তনের জন্যই ভারতের বহির্বাণিজ্য খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ১৯১৬-১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা আবার বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনেই চট ও চামড়ার চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সময় আমদানির পরিমাণ রপ্তানির পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর হ্রাস পায়। কারণ ভারতে আমদানিকৃত শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের প্রধান উৎস ছিল গ্রেট ব্রিটেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় ঐ দেশের পক্ষে বাণিজ্যের হার সমপরিমাণে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। অপরদিকে অন্য শক্তি জার্মানীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায় এবং জাপান ভারতে খুবই সামান্য পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করে।

যুদ্ধের পর ভারতে আমদানিকৃত শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে ভারতের রপ্তানিযোগ্য পণ্যদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়। ১৯২০-২৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ ১৯১৯-১৯২০-এর স্তর অপেক্ষা অনেক কম ছিল কিন্তু ১৯২০-২১ খ্রীস্টাব্দে আমদানি হঠাৎ বৃদ্ধি পেলেও অল্পদিনের মধ্যেই আবার পূর্বস্তরে নেমে যায়। ১৯১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দে রপ্তানির হার লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পায়। তবে এজন্য মূলতঃ দায়ী ছিল ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক অসন্তোষ, পরিবহণের অসুবিধা এবং টাকার মূল্যমানের অনিশ্চয়তা। ইয়োরোপের কয়েকটি দেশের রাজনৈতিক অশান্তিও ভারতের বহির্বাণিজ্যকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের যখন

এরূপ সংকটপূর্ণ অবস্থা তখনই ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে কৃষিজ পণ্যের মূল্যে বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দেয় এবং ভারতীয় রপ্তানি এবং উৎপাদনকারীদের উপর প্রচণ্ড আঘাত দেয়। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্য মন্দার প্রভাব থেকে মুক্তি পায় নি। বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় আমদানির পরিমাণও যথেষ্ট হ্রাস পায়। তবে আমদানি হ্রাসের হার রপ্তানি হ্রাসের হারের মতো তত অধিক ছিল না। কিন্তু ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি দেশী-শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয় এবং কয়েক প্রকার শিল্পসামগ্রীর আভ্যন্তরীণ উৎপাদন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানির পরিমাণ হ্রাস পায়।

মন্দা থেকে পুনরুজ্জীবনের পরই আমেরিকার বাণিজ্যে বিপর্যয় দেখা দিলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার আবার প্রতিহত হয়। ফলে ১৯৩৭-৩৮ খ্রীস্টাব্দে এবং ১৯৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় রপ্তানির মূল্য হ্রাস পায়। যদিও আর একটি যুদ্ধের আয়োজনের ফলে কিছু কিছু ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বাইরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, তথাপি ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য লাভজনক ছিল না। কিন্তু ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের বাজারে ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ও চাহিদা উভয়ই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বাধা এবং জাহাজের অপ্রতুলতার জন্য ভারতীয় রপ্তানিকারিগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। অপরদিকে অকস্মাৎ যুদ্ধ ঘোষণার ফলে ভারতের রপ্তানিবাণিজ্যে যে সংকট দেখা দেয় তার সমাধানের জন্য ভারত সরকার ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও শিল্পস্বার্থের প্রতিনিধি মোট ২২ জন সদস্য নিয়ে একটি রপ্তানি পরামর্শদাতা পর্ষদ গঠন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য উভয়ই বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। যুদ্ধের জন্য বিচ্ছিন্ন বাণিজ্য সম্পর্কগুলো পুনরায় স্থাপিত হওয়ার ফলেই অনুকূল বাণিজ্যিক পরিবেশের উদ্ভব ঘটে। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতে আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের মূল্য ছিল ৩৩০ কোটি টাকা এবং রপ্তানি বাণিজ্যের মূল্য ছিল ৩২০ কোটি টাকার সামান্য উর্দ্ধে।

HISTORY OF INDIA—Part II

Q. 1. Write a critical note on the origin of the Indian National Congress.

Ans. ভূমিকা ঃ

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। এর পূর্ববর্তীকালে অনেকগুলি রাজনৈতিক সংগঠনের উৎপত্তি হয়েছিল। এদের মধ্যে কলকাতায় ছিল—'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি', 'ল্যাণ্ডহোল্ডারস সোসাইটি' ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন', বোম্বাইতে ছিল 'বম্বে এসোসিয়েসন' আর মাদ্রাজে ছিল 'মাদ্রাজ নেটিভ এসোসিয়েসন'। এ ছাড়া ছিল কতকগুলি সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের পুনরুজ্জীবন, স্বামী দয়ানন্দের পরিচালনায় আর্য সমাজের জাগরণ, ঈশ্বর দর্শন ও ঐশ্বরিক প্রেরণালাভের আন্দোলন, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের পরিচালনায় রামকৃষ্ণ আন্দোলন প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক অসন্তোষ ও কুলগত তিক্ততার দ্বারা এই সময় স্বাদেশিকতা পুষ্টিলাভ করছিল। শিল্পের লোপ, সরকারী উচ্চপদগুলিতে নিয়োগের ব্যাপারে ভারতীয়দের বর্জন, দুর্ভিক্ষের দ্বারা অন্ধকারাবৃত ১৮৭৭ সালের দরবার—এগুলি সমালোচিত হয়েছিল ভারতীয় মালিকানার সংবাদপত্রগুলিতে। সেই সঙ্গে একই দুর্দশাভোগের পরিণতিরূপে জন্ম নিচ্ছিল জাতীয় ঐক্যের অনুভূতি। ইলবার্ট বিল সম্পর্কীয় বিরোধ ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ হবার ক্রমবর্ধমান অনুভূতিকে ত্বরান্বিত করে দিল। এমন কি ১৮৭৭ সালের দরবারও 'ছদ্মবেশী আশীর্বাদ' বলে পরিগণিত হয়েছিল, কারণ এ সংযুক্ত ভারতের ধারণাকে সুস্পষ্ট করে চোখের সামনে তুলে ধরেছিল।

ইলবার্ট বিল সম্পর্কিত শ্রেণীগত ঔদ্ধত্যের কাছে লর্ড রিপণের আত্মসমর্পণ প্রমাণিত করে যে দুর্দশা দূরীকরণের জন্য ভাইসরয়ের ভূমিকার দিকে বা 'হোম' সরকারের বদান্যতার দিকে তাকিয়ে থাকলে—তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এটা অনুভূত হয়েছিল যে ভারতীয়দের নিজেদের যুদ্ধ নিজেদেরই করতে হবে আর তাদের নিজেদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে আত্মশক্তি। সংগ্রামের পথও আবিষ্কৃত হয়েছিল—মিলন, সংগঠন, অর্থ-সংগঠন, অর্থ-সংগ্রহ ও বিক্ষোভকে কর্মসূচীতে ধরে নিয়ে। এ সম্পর্কে অম্বিকাচরণ মজুমদার বলেছেন, "এটা অনুভূত হয়েছিল—যদি রাজনৈতিক অগ্রগতিকে অর্জন করতে হয় তবে তা শুধু একটি জাতীয় পরিষদ সংগঠিত করার দ্বারাই হতে পারে। এই পরিষৎ—এ যাবৎ প্রত্যেকটি প্রদেশ পৃথক পৃথকভাবে যে সঙ্কীর্ণ রাজনীতিকে অনুসরণ করেছে তার পরিবর্তে—উদার ও বৃহত্তর রাজনীতি পরিচালনা করবে।" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অভিপ্রায় ছিল—জাতীয় শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা।

১৮৮৩ সালে কলিকাতায় একটি জাতীয় সম্মেলন আহূত হয়। আনন্দ মোহন বসু একে বলেছেন 'জাতীয় পার্লিয়ামেণ্ট গঠনের প্রথম ধাপ'। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের

মতে—"সর্বভারতীয় রাজনীতি পরিচালনার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানরূপে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ধারণা ও পরিকল্পনা—কলিকাতা সম্মেলনের মাঝেই খুঁজে পাওয়া যাবে।" বাংলাদেশের বাইরে বিক্ষিপ্ত কার্যকলাপের অস্তিত্ব ছিল। ১৮৮৪ সালের গোড়ার দিকে মাদ্রাজে 'মহাজন সভা' স্থাপিত হয় আর বোম্বাইতে 'প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েসন' স্থাপিত হয় ১৮৮৫ সালে।

(২) হিউমের ভূমিকা:

বাংলার রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের কার্যকলাপকে একত্রীভূত করার প্রয়োজনে—একটি স্থায়ী জাতীয় সংগঠনের উপযুক্ত পরিকল্পনা নির্মাণের জন্য এক সুদক্ষ স্থপতির প্রয়োজন ছিল। এই স্থপতির ভূমিকা গৃহীত হয়েছিল—ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অবসর প্রাপ্ত ব্রিটিশ-সভ্য এলান অক্টাভিয়ান হিউমের দ্বারা। লিটন-শাসিত ভারতের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ উদ্বিগ্ন হিউমের দ্বারা পরিলক্ষিত হয়েছিল। জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশা আর ক্ষুব্ধ মেধাবী সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত সরকারের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সাবধান-বাণী হিউমের কাছে পৌছেছিল। হিউমের দ্বারা উক্ত হয়েছে—'প্রামাণিক তথ্যগুলির থেকে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল—আমরা আসন্ন সাঙ্ঘাতিক কিছু সংগঠনের মধ্যে ছিলাম।" ৩০,০০০ চিঠিপত্র সম্বলিত রিপোর্টের সাতটি বৃহৎ ভলিউম হিউমের দ্বারা পরিদৃষ্ট হয়। সব চিঠিতেই আসন্ন হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল—কয়েকটি বিক্ষিপ্ত দুষ্কার্যের ঘটনাই ক্রমে ব্যাপক অরাজকতার সৃষ্টি করে সরকারকে অচল করে দেবে। পরে, শিক্ষিত শ্রেণী নেতারূপে এতে যোগ দেবে—এই সংগঠনকে সুসঙ্গতি দিয়ে জাতীয় বিদ্রোহের পথে পরিচালিত করবে।

হিউমের বিশ্বাস হয়েছিল ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা প্রশমনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। হিউমের মতে সবচেয়ে ভালো নীতি ছিল শিক্ষিত ভাবী নেতা যারা বিদ্রোহের পরিচালক হতে পারে তাদের বশে আনা, আর তাদের বিপ্লবাত্মক মনো-ভাবকে ঘুরিয়ে নির্দোষ ও সাংগঠনিক পথে পরিচালিত করা। ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির কি ভাবে সীমা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তাদের সম্পর্কে কিভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এ সম্বন্ধে হিউমের পরিপূর্ণ ধারণা ছিল। ১৮৮৩ সালে কলকাতার স্নাতকদের কাছে তার বিচক্ষণ আবেদন ছিল যে তারা যেন দলাদলি ভুলে, অভীষ্ট লক্ষ্য-জনিত সুসংগঠিত কাজের জন্য একত্রিত হয় এবং জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে।

মিসেস্ বেসান্তের মতে—১৮৮৪ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত 'থিওজফিক্যাল সোসাইটি'র সভায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস গঠনের ধারণাটি উদ্ভাবিত হয়। ১৮৮৫ সালে হিউম-প্রবর্তিত 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন' বড়দিনের সময় পুণাতে একটি সর্ব-ভারতীয় সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পুণা সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল নেতাদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত করা এবং পরবর্তী বৎসরের জন্য আলোচনান্তে রাজনৈতিক কর্মসূচী স্থির

করা। পুণাতে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেওয়ায় সম্মেলনের স্থান পরিবর্তিত হয় বোম্বাই-এ। একই নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়—'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'।

(৩) কংগ্রেসের উদ্দেশ্য :

এখানে দুটি প্রশ্ন দেখা দেয়—প্রধানতঃ, কংগ্রেসের ভূমিকা সম্বন্ধে হিউমের ধারণা কি ছিল? দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসের উৎপত্তির সঙ্গে ডাফরিনের সম্পর্ক কতখানি ছিল? হিউমের জীবনীকারের মতে—তার ইচ্ছা ছিল সামাজিক দিক দিয়ে সংস্কারের প্রচার চালানো, কিন্তু ডাফরিনের কাছ থেকে পরামর্শ আসে রাজনৈতিক সংগঠনে হাত দিতে। ডব্লু. সি. ব্যানার্জি বলেন—হিউমের কাছে ডাফরিনের এই পরিকল্পনা প্রদত্ত হয়েছিল যে, ইংলণ্ডে রাণীর বিরোধীরা যা করে থাকে, সেই কাজগুলো করার জন্য একটি দল সংগঠিত করা হোক। ১৮৮৮ সালে সেন্ট এণ্ড্রুজ দিবসে নৈশভোজের বিখ্যাত বক্তৃতায় ডাফরিন কর্তৃক এই অভিমত ব্যক্ত হল যে, কংগ্রেস শুধু সামাজিক বিষয়গুলির দিকেই মনঃসংযোগ করবে। সম্ভবতঃ ইচ্ছাকৃতভাবেই হিউমের প্রতি গোপন উপদেশটুকুর গোপনীয়তা ভঙ্গ করা হল না। সব মিলিয়ে মনে হয় হিউমের আসল লক্ষ্য ছিল বিপ্লবাত্মক ঘটনার সম্ভাবনাকে নিবৃত্ত করা। সুনিয়ন্ত্রিত বিরোধীপক্ষের মতো কোনো কিছু তৈরী করা সম্পর্কে ডাফরিনের পরামর্শও হিউম কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। এই কারণেই রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যাঁরা অগ্রণী তাঁদের (যেমন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) কংগ্রেসের সূত্রপাতের সময় বাদ দেওয়া হয়েছিল, আর সভাপতির পদে বসানো হয়েছিল নরমপন্থী ডব্লু সি. ব্যানার্জিকে।

(৪) সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের তত্ত্ব :

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তিকে বিশ্লেষণ করে রজনী পাম দত্ত ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন—যদিও তাঁর সংবাদ সংগ্রহের উৎসগুলি একই। তিনি বলেন: "ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ সরকারী নীতির উদ্যম ও পরিচালনা থেকে সরাসরি উদ্ভূত। ভাইসরয়ের সঙ্গে গোপন পরামর্শের দ্বারা এই নীতি পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়েছিল।" জনগণের উত্তেজনা আর ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল—এর হাত থেকে ব্রিটিশ-শাসনকে রক্ষা করবার জন্য কংগ্রেস হয়েছিল অস্ত্রস্বরূপ। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে—"জাতীয় কংগ্রেস গঠন—সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ পেলে দেখা যাবে—এটি একটি আসন্ন বিপ্লবকে পরাজিত করার জন্য, এমনকি আগের থেকেই ধ্বংস করার জন্য প্রচেষ্টা।"

সরকারের প্রতিনিধি হিউম ও ডাফরিন আর তার সাথে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের ভূমিকা বিচার করে দেখলে ব্রিটিশ সরকারের চক্রান্তের তত্ত্বটি গ্রহণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। এই চক্রান্তের তত্ত্বটি স্ফীত করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত দত্ত ১৮৮৫ সালে ভারতের জনসাধারণের অনুমতি বিপ্লবাত্মক মানসিক অবস্থাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ কথা ঠিক তখন ভূমি-সম্পর্কীয় অসন্তোষ ছিল। দাক্ষিণাত্যে 'রায়টস কমিশন' ও 'ফেমিন কমিশন'

অসন্তোষের নজির দেখতে পেয়েছিল। বাংলাদেশের পাবনায় জমি নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা যায় বাংলাদেশের অসন্তুষ্ট মধ্যবিত্তদের কথা। জমিদারেরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলেন রিপণের 'সমাজতান্ত্রিক' তত্ত্ব শুনে। এ সব সত্ত্বেও বাংলাদেশে জমি-সংক্রান্ত অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ঘটতে বা উচ্চারিত হতে শোনা যায় না, মাদ্রাজ অথবা পাঞ্জাব থেকেও এ ধরনের কোন নজির নেই। আসন্ন বিপ্লবের কোন লক্ষণই ছিল না—বড় জোর একটা ষড়যন্ত্র-ধরনের কিছু হতে পারত। ভাইসরয়ের সঙ্গে পূর্বাহ্ণেই যদি কোন পরিকল্পনা স্বিরীকৃত হত, তবে সেটা নিশ্চয়ই সেক্রেটারি অফ স্টেটের হাতে আসত এবং এই সম্বন্ধে সেক্রেটারিরও কিছু মন্তব্য প্রকাশ পেত। এও লক্ষ্য করতে হবে কংগ্রেস নেতারা যারা অভিযোগে বর্ণিত ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের কেউই সরকারের তরফ থেকে পুরস্কার পান নি।

(৫) **সিদ্ধান্ত ঃ**

১৮৮৫ সালের ঘটনাগুলিতে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কোন অংশই গ্রহণ করেন নি। তখন পর্যন্ত তাঁরা রাজনীতি-সচেতন হয়ে ওঠেন নি। মধ্যবিত্ত নেতারা যারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে রাজনৈতিক ভাব-ধারণা লাভ করেছিলেন তাঁরাই বিরোধিতা প্রকাশের জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ন্যাশনাল 'কনফারেন্সে দুটি দল ছিল। প্রথম দলটি নরমপন্থীদের—এঁদের মধ্যে ছিলেন ফিরোজ শাহ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জি ও অন্যান্যেরা। এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল হিউমের। অপর দলে ছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ও তাঁদের বন্ধুরা। পুনাতে হিউম কর্তৃক অধিবেশন যদি আহূত না হত—যে অধিবেশন পরে স্থানান্তরিত হয়েছিল বোম্বাইতে এবং নাম পরিবর্তন করে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' নাম গ্রহণ করেছিল—তাহলে 'ন্যাশনাল কনফারেন্সই বৃদ্ধি পেয়ে একটি সর্ব-ভারতীয় দলের রূপ পরিগ্রহ করতে পারত—রাজনৈতিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারত। এইরকম একটি দলে পূর্বাভাষ সূচিত হয়েছিল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ভাবধারণা ও কার্যাবলীর দ্বারা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই এসোসিয়েসনকে 'প্রকৃত জাতীয়' আখ্যা দিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে রাজনীতি-সচেতন ভারতীয়দের কার্যাবলীই যৌক্তিক পদ্ধতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছিল। এতে হিউম ও ডাফরিনের অংশগ্রহণকে মোটামুটি আকস্মিক বলা চলে।

Q. 2. Discuss the conspiracy theory of the origin of the Indian National Congress.

Ans. (১) **রজনী পাম দত্তের ষড়যন্ত্র-বাদ ঃ**

বিখ্যাত মার্কসবাদী লেখক রজনী পাম দত্তের কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ— এ

সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু তাঁর সংবাদ-সংগ্রহের উৎসগুলি একই। তিনি লিখেছেন—"ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ সরকারী নীতির উদ্যম ও পরিচালনা থেকে সরাসরি উদ্ভূত। ভাইসরয়ের সঙ্গে গোপন পরামর্শের দ্বারা এই নীতি পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়েছিল। জনগণের উত্তেজনা আর ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল—এর হাত থেকে ব্রিটিশ-শাসনকে রক্ষা করবার জন্য কংগ্রেস হয়েছিল অস্ত্র-স্বরূপ। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে "জাতীয় কংগ্রেস গঠন—সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ পেলে দেখা যাবে—এটি একটি আসন্ন বিপ্লবকে পরাজিত করার জন্য, এমনকি আগের থেকেই ধ্বংস করার জন্য প্রচেষ্টা।

এই ভাবেই শ্রীযুক্ত দত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অশুভ হাতকে কর্মরত দেখেছিলেন। যখন সরকার বুঝতে পেরেছিল—শিক্ষিত ভারতীয়েরা একটি সর্বভারতীয় দল গঠনের কথা চিন্তা করেছে—তখন সে একটি আন্দোলনের নেতৃত্ব নেবার জন্য এগিয়ে এসে-ছিল। এই আন্দোলন যে-কোন অবস্থাতেই ঘটত। শ্রীযুক্ত দত্ত লিখেছেন, এর থেকেই বোঝা যায়—কেন ও কিভাবে কংগ্রেস একদিকে জনগণকে জাতীয়-সংগ্রামে পরিচালিত করেছে, আর অপর দিকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। শ্রীযুক্ত দত্ত গান্ধী ও গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসকে মর্যাদা দিতে চান নি। এর জন্যই—যার ধাত্রী হিউম ও ডাফরিন—উচ্চতর শ্রেণীকে নিয়ে এর গঠন পরিস্ফুট করেছিল আর সূচিত করেছিল এর সুচিন্তিত ব্যর্থতা।

(২) ভূমি সম্বন্ধীয় অসন্তোষ-বাদ :

শ্রীযুক্ত দত্ত কি করে তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে কংগ্রেস-নেতাদের সাথে ব্রিটিশ রাজ্যের সুগভীর চক্রান্ত ছিল—এটা বিশ্লেষণ করে দেখতে কৌতূহল হয়। শ্রীযুক্ত দত্ত ভারতের জনসাধারণের অনুমিত বিপ্লবাত্মক মানসিক অবস্থাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। একথা ঠিক তখন ভূমি-সম্পর্কীয় অসন্তোষ ছিল। দাক্ষিণাত্যে 'রায়টস কমিশন' ও 'ফেমিন কমিশন' অসন্তোষের নজির দেখতে পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের পাবনায় জমি নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয়েছিল। কিন্তু এ সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেছিল ১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে। যাই হোক, দাক্ষিণাত্যে 'রায়টস কমিশনে'র রিপোর্ট দাখিল করার পরে—অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। ১৮৭৯ থেকে ৮৫ সালের মধ্যে—'ডেকান এগ্রিকালচারাল রিলিফ এ্যাক্ট', ল্যাণ্ড ইমপ্রুভমেণ্ট লোনস এ্যাক্ট' ও 'বেঙ্গল টেনেন্সি এ্যাক্ট' পাস হয়ে—দুঃস্থ চাষীদের দুর্দশা অনেকখানি লাঘব করে দিয়েছিল। 'বেঙ্গল টেনেন্সি এ্যাক্ট' জমিদারদের কাছে এত ক্ষতিকর বিবেচিত হয়েছিল যে, ভাইসরয়ের 'লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে' তাদের প্রতিনিধিরা এটাকে সমাজ-তন্ত্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বর্ণনা করেছিলেন।

(৩) উচ্চতর শ্রেণীর অসন্তোষ :

কার্যতঃ আমরা দেখতে পাই কংগ্রেসের জন্মের পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীই কৃষক সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশী অসন্তুষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, দেখা যায়—

সেক্রেটারি অফ স্টেট (কিম্বার্লে ও ক্রস) এবং ডাফরিনের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মধ্যে জনগণের অসন্তোষের কোন উল্লেখ নেই। তৃতীয়তঃ, তখনকারকালে লিখিত কোনো স্মৃতিকথায় বা অন্য কোন পুস্তকে এই ধরনের অসন্তোষের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অসন্তোষ যদিও বা ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়—তবে সেটা পূর্ববর্তী কালের বলে ধরতে হয়। হিউমের যদি গোয়েন্দা রিপোর্টের সঙ্গে পরিচয় ঘটে থাকে তবে সেটা ঘটেছিল ১৮৮২-র পূর্বে—হিউমের কার্যকালীন সময়ে। তাই, হিউমের উল্লিখিত ভূমি-সংক্রান্ত অসন্তোষের কথার আর যাই থাক—কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীযুক্ত দত্ত 'ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' ও 'আর্মস এ্যাক্ট'কে রুশীয় পুলিশ পদ্ধতির সমগোত্র বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বোঝা যায় না এই আইনগুলি কাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। উদার-নৈতিক দলভুক্ত 'ওয়েডারবার্ন' এই সংস্কারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতপূর্ণ প্রামাণিক তথ্য উপস্থিত করেছে। পুলিশ রিপোর্টগুলি সম্বন্ধে বলা যায় তাদের অনেকগুলি ছিল নানারকমের ধর্মীয় সংস্থার গুরুশিষ্যের চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার অনেকগুলিকে চুটকি-রচনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তবে এদের সবগুলিই ছিল ইংরেজীতে অনূদিত। ডাফরিন-হিউমের সিমলা সম্মেলনে আসন্ন বিপ্লব নিয়ে সরকারীভাবে কোনো বিপদাশঙ্কার চিহ্ন দেখা যায় না। ভারতে সামাজিক, বাস্তব ও শিক্ষা-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্তৃক যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল পরিদৃষ্ট হয়েছিল লর্ড কিম্বারলির দ্বারা। শিক্ষিত দেশবাসী, যারা নিজেদের অগ্রগতির জন্য জনসাধারণকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছিলেন, তাদের উপর ছিল লর্ডক্রসের গভীর অবিশ্বাস।

(৪) ব্রিটিশের বিরাগপূর্ণ মনোভাব ঃ

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও তাঁর সম্প্রদায়ের কৌশলী পন্থা আর আইরিশ বিপ্লবীদের পন্থা একই ধরনের ছিল—এটা স্থিরীকৃত হয়েছিল ডাফরিনের দ্বারা। নরমপন্থীরা তাঁদের প্রভাব হারিয়ে ফেলেছেন—এই সংবাদ ১৮৮৬ সালের ২০শে এপ্রিল তরিখে ডাফরিন কর্তৃক কিম্বারলিকে প্রদত্ত হয়েছিল। ১৮৮৮ সালে ক্রসের কাছে লিখিত হয়েছিল—'আমার ভয় হচ্ছে এটা (কংগ্রেস) সম্ভবতঃ একটা ক্ষতিকারক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে।' অভিযোগে-বর্ণিত চক্রান্তে অংশ গ্রহণের জন্য কংগ্রেস নেতারা সরকারের কাছ থেকে কোন পুরস্কার পান নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জনজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত একদল ইংরেজদের সঙ্গে হিউমের এবিষয়ে পরামর্শ হয়েছিল। এতখানি ভিড়ের মধ্যে চক্রান্ত গঠন সম্ভব নয়।

(৫) সিদ্ধান্ত ঃ

১৮৮০ র দশকে দেশের যে রাজনৈতিক অবস্থা ছিল তার স্বাভাবিক চরম পরিণতি রূপেই কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। এর পিছনে জনগণের উদ্বেলিত হয়ে ওঠাও ছিল না;. সাম্রাজ্যবাদের কোনো ষড়যন্ত্রও ছিল না। তবে মধ্যবিত্ত ও আমীর ওমরাহের ঠিক নীচের ধাপের শ্রেণীদের অসন্তোষ কাজ করেছিল। যদি কোন ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে

তবে সেটা হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙালী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বোম্বাই-মাদ্রাজ গোষ্ঠী ও আমলাতন্ত্রের দ্বারা। যে শ্রেণী থেকে কংগ্রেস উদ্ভূত সেই শ্রেণীটি 'অতিক্ষুদ্র সংখ্যালঘু' রূপে ডাফরিন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এই দীন উদ্ভব থেকে বিংশ শতাব্দীর অতি বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে—এটা ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত বলা চলে।

Q. 3. Examine the factors behind the Partition of Bengal. To what extent was Lord Curzon personally responsible for it? What were its results?

Ans. (১) **বিভাগের বিভিন্ন পরিকল্পনা:**

বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনা কার্জনের নীতির দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। ইংরেজ আমলে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক বিভাগ ছিল—এরা হ'ল বঙ্গ প্রেসিডেন্সী, বম্বে প্রেসিডেন্সী ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী। শাসকদের কাছে বঙ্গ প্রেসিডেন্সী বহুদিন ধরেই দুরূহ সমস্যা উপস্থিত করেছিল। প্রদেশের আয়তন ও জনসংখ্যার পরিমাণ সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার পরিপন্থী ছিল। এই বিভাজনের পদ্ধতি কার্যতঃ আরম্ভ হয়েছিল ১৮৭৪ সালে, যখন আসামকে বিযুক্ত করে চীফ কমিশনারের কর্তৃত্বাধীন করা হয়। এতে অবশ্য সমস্যা মেটেনি। ১৮৯৬ সালে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। কিন্তু এটা ব্যয়-বহুল হওয়ার দরুন পরিত্যক্ত হয়েছিল। শুধু এর পরিণামস্বরূপ লুসাই পার্বত্য-অঞ্চল আসামে যুক্ত হয়েছিল। ১৯০১ সালের আদম সুমারীতে যখন দেখা গেল বাংলার জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ তখন আর একটি পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল উড়িষ্যাকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে একত্রিত করা।

এই অবস্থায় কার্জনের মাথায় এই চিন্তার উদয় হল যে "বাংলাদেশ একজনের পক্ষে নিঃসন্দেহে অতি বিশাল।" উপরন্তু কার্জনের মনে হয়েছিল—বাংলা, আসাম এবং মধ্যপ্রদেশের চতুঃসীমা—সেকেলে, অযৌক্তিক ও অদক্ষতার জন্মদাতা।

স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার কর্তৃক একটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল যেটা ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে সর্বসাধারণের কাছে বিদিত করা হয়েছিল। চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা জিলা, ময়মনসিংহ জিলা আসামের ভিতর যাবে, আর ছোটনাগপুর যাবে মধ্যপ্রদেশে। এর পরিবর্তে বাংলা মধ্যপ্রদেশ থেকে পাবে সম্বলপুর আর মাদ্রাজ থেকে পাবে গঞ্জাম। এই পরিকল্পনার পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখানো হয়েছিল—

(১) বাংলার অধিকতর নিজস্ব শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। পুনর্গঠনের পরে বাংলার লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে কমে ৬ কোটি ৭ লক্ষে দাঁড়াত।

(২) বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলি কলকাতার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হত।

(৩) পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলির মুসলমান অধিক: সুখ-সুবিধা পেত।

(৪) আসামের চা বাইরে আসার পথ পেত।

(৫) সমস্ত উড়িয়াভাষীরা একটি শাসন-ব্যবস্থার অধীন হত।

শেষ পর্যন্ত কার্জনের দ্বারা যে পরিকল্পনা অবলম্বিত হয়েছিল তাতে ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে ১৫টি জিলা নিয়ে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ তৈরী করা। এর রাজধানী ছিল ঢাকা। এর জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১ লক্ষ তাতে মুসলমানদেরই প্রাধান্য।

(২) রাজনৈতিক মতলব :

এই শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত যুক্তিগুলির পশ্চাতে এক ক্ষতিসাধক রাজনৈতিক মতলব ছিল যা প্রতিফলিত হয়েছিল লর্ড কার্জনের 'স্বদেশ'স্থ কর্তৃপক্ষের সাথে পত্র আদান-প্রদানের মধ্যে। 'ঐক্যবদ্ধ বাংলা একটি শক্তি'—এটি তার দ্বারাই লিখিত হয়েছিল এবং দেশভঙ্গের মধ্য দিয়ে সেই শক্তিকে খর্ব করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তার মতলব ছিল ব্রিটিশ শাসনের একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দলকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দুর্বল করে দেওয়া'। বাঙালীরা নিজেদের একটি জাতি বলে ভেবে নিয়েছিল ; এই ধরনের চিন্তা ছিল ব্রিটিশ শাসনের সুপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিপদজনক সুতরাং এই চিন্তাকে ধ্বংস করাই ছিল কার্জনের লক্ষ্য। কংগ্রেস রাজনীতির কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা, এই সহরটির প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্যহরণ ছিল লক্ষ্য।

অবশ্য লর্ড কার্জনের গোপন মতলবগুলি সে সময়ে সাধারণ লোকে কিছুই জানত না, শুধু এটা বুঝতে পেরেছিল যে বাঙালীর সংহতি ভেঙে দেওয়াটাই কার্জনের আসল অভিপ্রায়। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রবল প্রতিবাদ এসেছিল। এমন কি সেক্রেটারী অফ স্টেটের দ্বারাও একথা স্বীকৃত হয়েছিল যে, একটি সমশ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়কে খণ্ড খণ্ড করে দিলে তাদের প্রতিবাদ করাটাই স্বাভাবিক। সমালোচকদের বক্তব্য ছিল—মাত্র এক কোটি দশ লক্ষ লোককে সরিয়ে নিলে শাসন-ব্যবস্থার চাপ মূলতঃ হালকা হবে না। উপরন্তু, ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাবে। এই পরিকল্পনার পিছনে যে সাম্প্রদায়িক মতলব ছিল এটা স্পিয়ারের দ্বারাও স্বীকৃত হয়েছে। স্পিয়ারের বক্তব্য ছিল—"হিন্দু-অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সুন্দর ভারসাম্যে ছিল ; উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনগুলি পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা করা যেত।"

এই সাম্প্রদায়িকতার কীর্তিই কার্জনকে শক্তি জুগিয়েছিল ১৯০৪ সালে তার পূর্ববঙ্গ পরিদর্শনকালে। কার্জনের পরিকল্পনা একটি রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করেছিল। একটি মুসলিম প্রদেশ গঠনই ছিল তার উদ্দেশ্য যা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রাণ নাশক হবে। ১৯০৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে নবাব আতিকুল্লা খাঁ তাঁর বক্তৃতায় এই সংবাদটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে সত্য বলে ঘোষণা করেন।

পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা সকলেই এই পরিকল্পনার অংশীদার ছিলেন না। আব্দুল রসুল ও লিয়াকৎ হোসেন—বদরুদ্দিন তায়েবজি ও শিবলী নোমানির মহান্ ভাবধারাকে ধরে রেখেছিল। কিন্তু ঢাকার নবাব সালিমউল্লা খাঁ কার্জনের কাছ থেকে এক লক্ষ পাউণ্ড ধার পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে চক্রান্তের কাজে অংশ নিতে রাজী হয়েছিলেন।

স্যার হেনরী কটনের ভাষায় বলতে গেলে, 'লর্ড কার্জনের নীতির সারবস্তু ছিল বর্ধিষ্ণু শক্তিগুলিকে দুর্বল করে দেওয়া আর দেশপ্রেমের চেতনা থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক মনোভাবকে ধ্বংস করে দেওয়া।' স্পিয়ারের ভাষায়—'ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির পরিচালনায় জনগণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের রূপ নিয়েছিল।'

(৩) বিরোধিতা ঃ

একজন বিচক্ষণ শাসকের কর্তব্য এই ধরনের বিক্ষোভকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা কিন্তু জনগণের এই বিরোধিতা কার্জনকে করে তুলল আরও অদম্য। এই বিক্ষোভ কার্জনের কাছে স্বার্থপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক এই আখ্যা পেল, আর বলা হল এটা বাগাড়ম্বর ও অলঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উকিল সভার (Bar) বিরোধিতা কার্জনের কাছে মনে হল ঢাকায় পৃথক হাইকোর্ট গঠনের ফলে কলিকাতার হাইকোর্ট উকিল সভার কায়েমী স্বার্থের যে ক্ষতি হবে তার ভয়ে। কিন্তু যদি তাই হবে, তাহলে পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা উকিলেরা এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করতেন না। এঁদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার আনন্দ চন্দ্র রায়, শিলচরের কামিনীকুমার চন্দ ও বরিশালের দীনবন্ধু সেন।

এর পরে আসে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির কথা। সংবাদপত্রগুলি যে বিরোধিতা জানিয়েছিল সেটা কার্জনের মতে গ্রাহক হারানোর ভয়ে। এটা সত্য হলে একমাত্র 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র ক্ষেত্রেই ইহা সত্য হতে পারত, কিন্তু 'সঞ্জীবনী', 'সন্ধ্যা', 'নিউ ইণ্ডিয়া', ও 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র মতো অন্যান্য কাগজের ক্ষেত্রে নয়। আর 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া', 'স্টেট্স্‌ম্যান' ও 'ইংলিশম্যান' সম্বন্ধে কি বলা চলতে পারে ?

কার্জনের মতে—জমিদারেরা বিরোধিতা করেছিলেন খাজনা হারানোর ভয়ে। এটা সত্য যে মৈমনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত, পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিনাজপুরের রাজা এবং ভাগ্যকুলের জানকীনাথ রায় প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের আপত্তি যতটা ছিল খাজনা হারানোর জন্য, তার চেয়ে ঢের বেশী তারা রেভিনিউ বোর্ডের এক্তিয়ারের বাইরে হয়ে যাবেন বলে।

সবশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে—কার্জনের মতে, মধ্যবিত্ত হিন্দুরা বিরোধিতা করেছিলেন কর্ম সংস্থানের সুযোগ হারানোর ভয়ে।

প্রকৃতপক্ষে, এটা ছিল নবজাত আত্মসচেতন বাঙালী জাতীয়তাবাদের অনুভূতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তি থেকেই এই জাতীয়তাবাদ জন্ম নিয়েছিল আর আত্মপ্রকাশ করেছিল এই বিরোধিতার মাধ্যমে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো নেতারা শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য রাজ্যাংশের পুনর্গঠনের বিরোধী ছিলেন না। হিন্দীভাষী অঞ্চলকে বাদ দিয়ে একটি হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত ঘন-সন্নিবিষ্ট বাংলা-ভাষী রাজ্য গঠন করা যেত এবং সেটা অনেক ভালো হত। কিন্তু এটা হবার উপায় ছিল না। লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্য ছিল দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করানো যার দ্বারা

তারা পৃথক হয়ে যায়। আর তা হলে কংগ্রেস সৃষ্ট জাতীয়তাবাদও দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯০০ সালে লিখিত কার্জনের অভিমত ছিল—'কংগ্রেস পড়ে যাওয়ার আগে টলছে,—আমার ভারতবর্ষে অবস্থানকালে যে বড় বড় অভিলাষগুলি আছে তার মধ্যে একটি হল—কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ অবসানের জন্য সহযোগিতা করা।'

(৪) লর্ড কার্জনের ব্যক্তিগত দায়িত্ব :

বিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে কার্জনের ভূমিকা ছিল পাহাড়ের মত কঠিন, সংকল্প ছিল অটল। সেক্রেটারী অফ স্টেটের অনুমোদন নিয়ে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে দেশ-বিভাগ কার্যতঃ সাধিত হল। বিভাগের পরে বাংলার লোকসংখ্যা দাঁড়ল, ৪ কোটি ২০ হিন্দু এবং ৯০ লক্ষ মুসলমান, অপরদিকে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে লোক-সংখ্যা দাঁড়াল ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান এবং ১ কোটি ২ লক্ষ হিন্দু। এই মুসলিম-প্রধান প্রদেশ গঠন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করেছিল—১৯৪৭-এর ঘটনাগুলি ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাদের ছায়া ফেলেছিল। এই যে পরিকল্পনাকে সুপ্রসারিত করা এবং শাসন-ব্যবস্থার জন্য পুনর্গঠনকে রাজনৈতিক বিভাগে রূপান্তরিত করা, এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী কার্জন।

সুশাসনের দক্ষতাই যদি কার্জনের লক্ষ্য হত তাহলে হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাদ না লাগিয়ে বাংলার অসুবিধাজনক আয়তনকে কমিয়ে সুবিধাজনক করা যেত। তাই এই ক্ষেত্রে কার্জনের ভূমিকা শাসকের নয়, ধূর্ত রাজনীতিবিদের।

(৫) ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) :

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল এই অনুভূতি থেকে যে বাংলাদেশ বঙ্গ-ভাষীদের মাতৃভূমি তার সন্তানদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেই দেশকে খণ্ডিত করা হয়েছে বাঙালীকে রাজনীতির দিক থেকে দুর্বল করে দেবার জন্য। এই আন্দোলন প্রধানতঃ হিন্দুদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। এর প্রাণশক্তি যে গভীর আবেগময় জাতীয়তা তা মুসলমানদের স্পর্শ করে নি। আর তা ছাড়া ঢাকার নবাবের সাহায্যে ব্রিটিশেরা তাদের আন্দোলনের বাইরে রেখে দিয়েছিল।

এই আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করেছিল বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মধ্য দিয়ে, এর অনিবার্য পরিণাম দেখা দিল পরিপূরকরূপে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতো বড় বড় নেতারা। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাও এই আন্দোলনে যোগ না দিয়ে পারে নি। ১৯০৫ সালে গোখেলের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে এই বর্জনের আন্দোলন সমর্থিত হল। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হল দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে, তাতে বর্জন আন্দোলনের ন্যায্যতা প্রতিপাদিত হল এবং দাবী করা হল এই বিভাজনের প্রত্যাহার।

ব্রিটিশ লেখকদের মতে—ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন বিপ্লবী মতবাদ প্রচারের প্রচুর গুপ্ত সুযোগ দিয়েছিল। পূর্ববঙ্গে এই বর্জন আন্দোলনকে মুসলমানেরা বাধা দিয়েছিল। এবং

দাঙ্গাও বেধেছিল ঘন ঘন। জাতীয়তাবাদী লেখকদের মতে—এটা ঘটেছিল সরকারী প্ররোচনায় ও সমর্থনে। বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতিগুলি তৎপর হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছিল এই আন্দোলনকে। এদিকে নির্যাতনও সুরু হয়েছিল নানাভাবে।

যাই হোক, এ আন্দোলন বিফল হয় নি। ১৯১১ সালে এই বিভাজনকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। তবে বাঙালী হিন্দুদের দণ্ডিত করা হল বিশাল বাংলা-ভাষী এলাকাকে বিহারের সঙ্গে যুক্ত করে আর ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করে।

(৬) দেশ-বিভাগের ফলাফল :

দেশ বিভাগের ফলে কার্জনের উদ্দেশ্য একদিক দিয়ে সফল হয়েছিল। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ীভাবে একটা গোঁজ পুঁতে দেওয়া হল তাদের পৃথক করে রাখবার জন্য। জাতীয়তাবাদকেও অনেকখানি দুর্বল করে দিল এই বিভাজন আর পূর্বাভাস দিল ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের।

আর একদিক থেকে দেখতে গেলে, এই বিভাজন শক্তি ও প্রেরণা জুগিয়েছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে। এই বিভাজন বাঙালীর হৃদয়ে যে আত্মিক ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, বিশেষ করে পাশ্চাত্যপন্থীদের মনে, তা কোন সময়ই পূর্ণ নিরাময় হয়নি। এই 'আত্মিক ক্ষত' সন্ত্রাসবাদ ও উগ্র মতবাদ জাগিয়ে তুলেছিল। এ ছাড়া, মধ্যপন্থীদের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প্রেরণাকেও এই বিভাজন সবল করে তুলেছিল। তাই বঙ্গ-বিভাগ ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি সংকল্প গ্রহণের অধ্যায়কে সূচিত করে।

Q. 4. Examine the nature and different forms of opposition is the Bengal Partition of 1905.

Ans. (১) **বিরোধিতা :**

বঙ্গ-বিভাগ যা কার্জনের দ্বারা শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয়েছিল—জাগিয়ে তুলেছিল ব্যাপক প্রতিবাদ-আন্দোলন। একজন বিচক্ষণ শাসকের কর্তব্য এই ধরনের বিক্ষোভকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা—কিন্তু জনগণের এই বিরোধিতা কার্জনকে করে তুলল আরও অদম্য। এই বিক্ষোভ কার্জনের কাছে স্বার্থপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক এই আখ্যা পেল, আর বলা হল—এটা বাগাড়ম্বর ও অলঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উকিলসভার (Bar) বিরোধিতা কার্জনের কাছে মনে হল—ঢাকায় পৃথক হাইকোর্ট গঠনের ফলে কলিকাতার হাইকোর্ট উকিলসভার কায়েমী স্বার্থের যে ক্ষতি হবে তার ভয়ে। কিন্তু যদি তাই হবে, তাহলে পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা উকিলেরা এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করতেন না। এঁদের মধ্যে ছিলেন—ঢাকার আনন্দচন্দ্র রায়, শিলচরের কামিনীকুমার চন্দ ও বরিশালের দীনবন্ধু সেন।

তার পরে আসে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির কথা। সংবাদপত্রগুলি যে বিরোধিতা জানিয়েছিল সেটা কার্জনের মতে গ্রাহক হারানোর ভয়ে। এটা সত্য হলে একমাত্র 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র ক্ষেত্রেই সত্য হতে পারত, কিন্তু 'সঞ্জীবনী', 'সন্ধ্যা', 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র মতো অন্যান্য কাগজের ক্ষেত্রে নয়। আর 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া', 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' ও 'ইংলিশ ম্যান' সম্বন্ধে কি বলা চলতে পারে ?

কার্জনের মতে—জমিদারেরা বিরোধিতা করেছিলেন খাজনা হারানোর ভয়ে। এটা সত্য যে মৈমনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত, পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিনাজপুরের রাজা ও ভাগ্যকুলের জানকীনাথ রায় প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের আপত্তি ছিল যতটা খাজনা হারানোর জন্য তার চেয়ে ঢের বেশী তারা 'রেভিনিউ বোর্ডে'র এক্তিয়ারের বাইরে হয়ে যাবেন বলে।

সবশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে—কার্জনের মতে, মধ্যবিত্ত হিন্দুরা বিরোধিতা করেছিলেন কর্ম-সংস্থানের সুযোগ হারানোর ভয়ে।

প্রকৃতপক্ষে, এটা ছিল নবজাত আত্মসচেতন বাঙালী জাতীয়তাবাদের অনুভূতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোক প্রাপ্তি থেকেই এই জাতীয়তাবাদ জন্ম নিয়েছিল আর আত্মপ্রকাশ করেছিল এই বিরোধিতার মাধ্যমে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতো নেতারা শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য রাজ্যাংশের পুনর্গঠনের বিরোধী ছিলেন না। যদি হিন্দী-ভাষী অঞ্চলকে বাদ দিয়ে একটি হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত ঘন-সন্নিবিষ্ট বাংলা-ভাষাভাষী রাজ্য গঠন করা যেত তবে সেটা অনেক ভালো হত। কিন্তু এটা হবার উপায় ছিল না। লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্য ছিল – দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করানো যার দ্বারা তারা পৃথক হয়ে যায়। আর তা হলে কংগ্রেস সৃষ্ট জাতীয়তাবাদও দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯০০ সালে লিখিত কার্জনের অভিমত ছিল—'কংগ্রেস পড়ে যাওয়ার আগে টলছে,—আমার ভারতবর্ষে অবস্থানকালে যে বড় বড় অভিলাষগুলি আছে তার মধ্যে একটি হল —কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ অবসানের জন্য সহযোগিতা করা।'

(২) বিরোধিতায় অবলম্বিত পথ ঃ

ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে প্রধান অংশ নিয়েছিলেন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী। নেতা ছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ সেন ও মতিলাল ঘোষ। শহরে গ্রামে সর্বত্রই প্রতিবাদ প্রদর্শিত হয়েছিল। এমন কি অতি সাধারণ মানুষও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করেছিল বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মধ্যে। স্বদেশী শিল্পগুলিকে প্রেরণা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। ১৯০৫ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে এই বর্জনের নীতি সমর্থিত হল। দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়—তাতে দাবী করা হ'ল এই বিভাজন প্রত্যাহারের। এই বর্জন ও প্রতিরোধকে যেমন কর্মোদ্যমের দিক থেকে নেতিবাচক ধারণা বলা চলে—তেমনি স্বদেশী ও স্বরাজ এই

আন্দোলনে যা অন্তর্ভুক্ত করেছিল তাকে হাঁ-ধর্মী বলা চলে। স্বদেশী বারংবার চেষ্টা করে শিক্ষায় স্বয়ং সম্পূর্ণতা, গ্রামোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধে ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছিল। জাতীয় বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনাতে হাত দিলেন। এই গঠন ও বর্জন সমস্ত দৃষ্টিকোণ মিলে মিশে একাকার হয়ে—সব কিছু পরিব্যাপক একটি ধারণার জন্ম দিল—যার নাম স্বরাজ।

(৩) বিরোধিতার শক্তিবৃদ্ধি :

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের নির্দেশনামা ঘোষিত হয়। ১৬ই অক্টোবর এই নির্দেশনামা কার্যকরী করার কথাও সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হয়। সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর সঞ্জীবনী পত্রিকার মাধ্যমে বিদেশী পণ্য দ্রব্য ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে শপথ গ্রহণ করার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান। কলকাতা ও মফঃস্বল বাংলায় এই আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া তুলতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন স্থানে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আহ্বান করা হয় এবং জনসাধারণ বিদেশী বস্ত্র বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বাংলাদেশের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের জন্য আবেদন করেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই আগষ্ট কলকাতা টাউন হলে এক বিশাল জনসভা আহূত হয় এবং বিভিন্ন বক্তা এই সভার সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁদের বক্তব্য থেকেই তখনকার বাংলাদেশের জনসাধারণের মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি রজনীকান্ত সেন এবং অন্যান্য কবি ও গীতিকারগণ তাঁদের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ তাঁদের বক্তৃতার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। জাতীয়তাবাদী মনোভাব সৃষ্টি করার ব্যাপারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। বাংলার সন্ধ্যা, যুগান্তর, নবশক্তি, বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিপ্লবের বাণী প্রচারিত হতে থাকে। এই আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী মেয়েরাও যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারা সভা-সমিতিতে যোগ দেয়। স্কুল-কলেজের ছাত্র সভা-সমিতির আয়োজন করে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার চেষ্টা করে। জমিদার শ্রেণীর বহু ব্যক্তিও এই আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং আন্দোলনকারীদের মুক্তহস্তে অর্থদান করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন সংঘ ও সমিতি গড়ে ওঠে। এই সব সংগঠনের মধ্যে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা পরিচালিত ব্রতীসংঘ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নেতৃত্বে গঠিত বন্দেমাতরম্ সংঘ, দক্ষিণ কলকাতার তরুণদের দ্বারা পরিচালিত সন্তান সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৪) স্বদেশী আন্দোলন ও সরকারী নীতির বিরোধিতা :

স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচী ছিল বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বদেশী-পণ্য শিল্পের ব্যবহার ও প্রচার জাতীয় ভাবাদর্শের উন্মেষ সাধন। ঐ সময়ই প্রথম বন্দেমাতরম্

ধ্বনি উচ্চারিত হয়। স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী মনীষীদের উদ্যোগে জাতীয় মেডিক্যাল কলেজ, জাতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) গঠিত হয় এবং রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক এই সংস্থাকে এক লক্ষ টাকা দান করেন। তাছাড়া এই আন্দোলনের ফলে বহু কাপড়ের কল, জাতীয় ব্যাঙ্ক, জীবন বীমা কোম্পানী, সাবান প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর কল-কারখানা বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে এই সময়ই বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা স্থাপিত হয়। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সংগঠন আন্টি-সার্কুলার সোসাইটি সরকারী বাধা-নিষেধ অমান্য করতে শুরু করে। জনপ্রিয় নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও চারণ কবি মুকুন্দ দাসের নেতৃত্বে বরিশাল জেলার অধিবাসীরা এই আন্দোলনে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

বরিশালের জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন স্বদেশ বান্ধব সমিতি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে বরিশাল শহরে প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন আবদুল রসুল। রাসবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পুলিনবিহারী দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সুবোধকুমার মল্লিক প্রমুখ তৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট নেতারা ঐ সম্মেলনে যোগ দেন। সরকারী নিষেধ-আজ্ঞা অমান্য করে ঐ সম্মেলনে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারিত হলে ইংরেজ সরকারের গোর্খা রাইফেলস্ বাহিনীর আক্রমণে এই সম্মেলন ছত্রভঙ্গ হয়। সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবর্গের সকলেই গ্রেপ্তার হন। বঙ্গদেশের গণ-আন্দোলনের উপর ইংরেজ সরকারের সেই প্রথম পুলিশী নির্যাতন। এই ঘটনার পর বাংলার চরমপন্থী আন্দোলন গুপ্ত সন্ত্রাসবাদের পথ ধরে।

(৫) সন্ত্রাসবাদ :

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মীয় মনোভাব যুক্ত হয়ে পড়ে। সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী তরুণ সম্প্রদায় কালী, গীতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। সন্ত্রাসবাদ ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বহু ব্রিটিশ রাজকর্মচারী গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই সময় বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সমিতিও গঠিত হয়। সন্ত্রাসবাদ দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার নানাপ্রকার দমনমূলক আইন প্রণয়ন করে। স্যার আণ্ড্রু ফ্রেজার ও কিংসফোর্ডকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এই বছরেই বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসু, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনেকে গ্রেপ্তার হন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র সহ ন'জন জননেতাকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করে।

(৬) মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোভাব :

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সরকার বিশেষভাবে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে আবদুল রসুল, লিয়াকৎ হোসেন, গজনভী প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু লর্ড কার্জন একলক্ষ পাউণ্ড ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ঢাকার নবাব সলিম উল্লাকে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আনয়ন করতে সমর্থ হন। শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায় সাধারণভাবে সরকারী নীতির বিরোধিতা করতে প্রস্তুত ছিল না। কলকাতা বিচারালয়ের সহিত জড়িত মুসলিম আইন-ব্যবসায়ীগণ আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করতে শুরু করে। জাতীয় কেন্দ্রীয় মুসলিম সমিতি (National Central Muhammedan Association) বঙ্গভঙ্গের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করতে সম্মত হয় নি। এমন কি ঢাকার নবাব পরিবারও বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রথম পর্বে ঐক্যমত হতে পারে নি। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীগণ হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চনা ও ধর্মীয় মনোভাব জাগ্রত করার চেষ্টা করলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে বিদ্বেষ ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের পক্ষে বন্দেমাতরম্ ও কালীর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা সম্ভব ছিল না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হলে মুসলিম সম্প্রদায় স্বাভাবিক-ভাবেই বঙ্গভঙ্গের সরকারী নীতিকে সমর্থন করতে শুরু করে।

(৬) উপসংহার :

বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্রতাই শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারকে বঙ্গ বিভাগ বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে। দিল্লীর দরবারের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ভঙ্গবঙ্গ আবার যুক্ত হয়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এমন কি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য গান্ধীজির আবির্ভাব এবং জাতীয় আন্দোলন জনগণের আন্দোলনে পরিণত হওয়ার পূর্বেই আন্দোলনের নতুন কৌশল ও নীতি উদ্ভাবন করে তাকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হয়। স্বদেশী আন্দোলন, বিদেশী পণ্য বর্জন, শান্তিপূর্ণভাবে সরকারী নীতির বিরোধিতা করা এই সব অসহযোগিতামূলক আন্দোলনের কৌশল এই সময়ই প্রথম গ্রহণ করা হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ফলে ভারতের জাতীয় আন্দোলন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আন্দোলনের পরিবর্তে জনগণের আন্দোলনে পরিণত হয়। তবে এই আন্দোলনের সময় শ্রমিক, কৃষক ও মুসলমান সম্প্রদায় কোনরূপ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে নি। তথাপি বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই পরবর্তীকালের বৃহত্তর ও ব্যাপক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

Q. 5. How did the Partition of Bengal aggravate the Hindu-Muslim problem ?

Ans. (১) ভূমিকা :

বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর নিয়ে গঠিত একটি বিশাল প্রদেশ

একজন লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের পক্ষে ভালভাবে শাসন করা সম্ভব নয়—এরূপ অভিমত ইংরেজ শাসকবর্গ মাঝে মাঝেই প্রকাশ করতেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লেফটেন্যান্ট গভর্ণর এণ্ড্রু ফ্রেজার ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড কার্জনকে পুনরায় এই প্রস্তাব দিলে তিনি জনমতের কথা চিন্তা না করেই ফ্রেজারের প্রস্তাবে সম্মতি দেন। তারপর ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদনক্রমে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। ঢাকা, রাজসাহী, চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। অপর দিকে প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগ এবং বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয়। এই প্রদেশের নাম হয় বঙ্গদেশ। বঙ্গবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম হয় মুসলমান প্রধান এবং বঙ্গদেশ হয় অবাঙ্গালী প্রধান। শাসনের সুবিধার যুক্তিতে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত করা হলেও বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। ভঙ্গ বঙ্গ যুক্ত করার দাবিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখ নেতৃবর্গের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়। আবদুল রসুল, আবদুল হালিম গজনভী, লিয়াকৎ হোসেন প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানগণ এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে। ফলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটে এবং ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

(২) ব্রিটিশের নীতি ও তার প্রয়োগের ব্যবস্থা :

জাতীয় আন্দোলনের শীর্ষস্থানের অধিকারী বাঙ্গালীর ঐক্য বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে উগ্র সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শাসনতান্ত্রিক সুবিধা ছিল ব্রিটিশ সরকারের অজুহাত মাত্র। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঈর্ষার সৃষ্টি করার জন্যই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গ ভঙ্গের ব্যবস্থা করে। "It was to drive a wedge between the two communities (Hindus and Muslims) and create a new Muhammedan Province in which the Government was to be conducted on the basis of creedal differences."

প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে গঠিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রদেশ গঠন করে ব্রিটিশ সরকার তাদের প্রতি আনুগত্যের জন্য মুসলিমদিগকে পুরস্কৃত এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করার জন্য হিন্দুদের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করে। নবগঠিত প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে বেশি সংখ্যক মুসলমানই ব্রিটিশ সরকারের এই নীতিকে সমর্থন করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের হিন্দু নেতাদের তাদের স্বার্থ বিনষ্টকারী রূপে মনে করতে শুরু করে।

ফলে বঙ্গভঙ্গ ও তার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অকারণে তিক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং ব্রিটিশ সরকারের নীতি সাফল্য অর্জন করার সুযোগ পায়।

অপরদিকে প্রভাবশালী মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে সমর্থন লাভ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার যেসব কৌশল ও নীতি গ্রহণ করে তার ফলেও হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। ঢাকার নবাব সলিম-উল্লা প্রথমে বঙ্গভঙ্গ নীতির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু লর্ড কার্জন তাঁকে একলক্ষ পাউণ্ড ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং সরকারী নীতির অন্যতম প্রধান-সমর্থকে পরিণত হন। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের উপর নবাব সলিমের যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টাতেই পূর্ববঙ্গের অনেক মুসলিম পরিবারই বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মতামত প্রকাশ করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা শুরু করে। আর্থিক সুযোগ-সুবিধার লোভে নবাব সলিম-উল্লার মতো একজন প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সরকারী নীতি সমর্থন করার ফলে হিন্দু সম্প্রদায় নবাব ও তাঁর সমর্থকদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়।

(৩) হিন্দুদের আচরণ ও মুসলমানদের বিক্ষোভ :

বঙ্গভঙ্গ একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বাঙ্গালীর জাতীয় সম্মানের সহিত এই প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিন্দু তরুণ কর্মীরা কালী, গীতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, বিশেষতঃ বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতে শুরু করে। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে হিন্দুদের এই উগ্র ধর্মীয় মনোভাব পছন্দ করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। জাতীয়তাবাদী শক্তিকে জাগ্রত করে তোলার উদ্দেশ্যে হিন্দু দেবদেবীর শক্তির উপাসনা করা মুসলিমদের কাছে তাদের ধর্মশাস্ত্র বিরোধী রূপে বিবেচিত হত। ফলে এই আন্দোলনে তাদের পক্ষে অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং ধর্মীয় মনোভাবের পার্থক্যের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠার পরিবর্তে ব্যবধানের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়।

(৪) মুসলিম লীগের প্রভাব :

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয় এবং ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করা, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা ও জাতীয় কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মূল কর্মসূচী।

"...to support, whenever possible, all measures emanating from the Government, and to protect the cause and advance the interest of our co-religionists throughout the country to controvert the

growing influence of the so-called Indian National Congress which has a tendency to misinterpret and subvert British rule in India, or which might lead to that deplorable situation and to enable our youngmen of education, who for want of such an association have joined the Congress, to find scope, according to their fitness and ability for public life".

ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের চিন্তানায়কদের অগ্রদূত স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদের ভাবধারা থেকে মুসলিম সম্প্রদায় কোনদিনই মুক্ত হতে পারে নি। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার সময়ও এই চিন্তাধারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ জাতীয় কংগ্রেসকে একটি হিন্দু-প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন, মুসলিম লীগও হিন্দু-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব থেকে মুসলিম তরুণদের মুক্ত করার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি হয় মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার ফলে তা আরও বৃদ্ধি পায়।

(৫) **উপসংহার :**

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশ সরকার দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করলে বিপ্লব আন্দোলনও সন্ত্রাসবাদের পথ গ্রহণ করে। বিপ্লব আন্দোলনের তীব্রতার ফলেই ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত বঙ্গবিভাগ বন্ধের সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়। দিল্লী দরবারের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ভঙ্গবঙ্গ আবার যুক্ত হয়। সরকারী এই প্রস্তাবে হিন্দু সম্প্রদায় অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং জাতীয় কংগ্রেসও এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। তদানীন্তন জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার অম্বিকাচরণ মজুমদার সরকারী ঘোষণা সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

"What repressive laws, proscriptions and deportations have failed to achieve in six years, the kindly touch of the Royal Prerogative has accomplished in one minute."

কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের ভঙ্গবঙ্গ যুক্ত করার ঘোষণায় মুসলিম সম্প্রদায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। সরকারী ঘোষণার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে নবাব মুস্তাক হোসেন ভিকার-উল-মুলক বাহাদুর যে কথা বলেন তা থেকেই মুসলমানদের মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় :

"So, far as the Muslims are concerned, it may be understood to be the consensus of opinion that the re-union is generally disliked. In face of the assurances repeated given by successive ministers of the crown as to the portion being 'a settled fact', the amalgamation betrays the weakness of the Government and will in future, be regarded as one of the reasons for placing no trust in its utterences and actions."

Q. 6 Review the origin of the Swadeshi Movement. Narrate the role of the Muslims in the Swadeshi Movement.

Ans. (১) **ভূমিকা :**

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ও তার সরকারী ঘোষণা সারা বাংলাদেশে এক তীব্র ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সমাজের সকল শ্রেণী ও সকল স্তরের মানুষ এবং সংবাদ পত্র-পত্রিকা এই দুরভিসন্ধিমূলক আদেশের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করে এবং এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশের সরকার, ভারত সরকার ও ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে শত শত প্রতিবাদপত্র পাঠানো হতে থাকে। বিভিন্ন মেলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এইসব প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা জনগণকে এক ব্যাপকতর ও বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করে তোলে।

সঞ্জীবনী কাগজের সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র দেশবাসীকে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সঙ্কল্প গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে তা সর্বসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালী সমাজের অটুট মনোবলের স্থির সঙ্কল্পের কথা পুনঃ ঘোষণা করেন। ছাত্রসমাজের মধ্যেও এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গ রোধের দৃঢ় পণ ও 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার ছাত্র বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে যোগ দিতে থাকে। বিভিন্ন সংবাদপত্র, পত্রিকা এবং সাহিত্যের মাধ্যমে 'বয়কট' ও 'স্বদেশী'—এই দুই আদর্শ ও লক্ষ্য ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন প্রমুখ কবিদের গান, কবিতা, নাটক প্রভৃতি জনগণের স্বদেশপ্রেম ও ভাবাবেগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। 'ব্রতী সমিতি', সনাতন সম্প্রদায়, 'বন্দেমাতরম্', 'ডন সোসাইটি' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোও স্বদেশী ভাবধারা প্রচার ও স্বদেশ প্রেমের বিকাশে তৎপর হয়।

(২) **আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি :**

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ দিনটি 'রাখীবন্ধন' দিবসরূপে পালিত হয়। পূর্ব বাংলা, পশ্চিম বাংলা, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান-নির্বিশেষে বাঙ্গালীজাতির ভ্রাতৃত্ব ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের কথা ঘোষণা করাই ছিল এই উৎসবের তাৎপর্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "কোন শক্তি মদমত্ত রাজশক্তিই বাঙ্গালীর ঐক্যকে ভাঙ্গতে পারবে না," এ কথাই প্রমাণিত হল রাখীবন্ধন উৎসবে। রাখীবন্ধন ছাড়া ঐ দিনটি 'অরন্ধন দিবস' রূপেও পালন করা হয়। সমগ্র বাঙ্গালী জাতি সেদিন অরন্ধন পালন করে ব্রিটিশ সরকারের স্বৈরাচারী নীতির মৌন প্রতিবাদ জানায়। বঙ্গভঙ্গের দিনটিতে জনজীবনের স্রোত বন্ধ হয়ে যায়। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ, শোভাযাত্রা ও জনসভার মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অল্পকালের

মধ্যেই এই আন্দোলন এক বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে।

(৩) **আন্দোলনের কর্মসূচী :**

বিদেশী দ্রব্য বর্জন বা বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার বা 'স্বদেশী'—এই দুই ছিল আন্দোলনের প্রধান আদর্শ ও কর্মসূচী। এই দুই লক্ষ্য ও নীতি ছিল পরস্পরের সমপূরক। বিদেশী দ্রব্য বর্জন কার্যকরী না হলে স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি সম্ভব ছিল না। তেমনি উপযুক্ত বিকল্প স্বদেশী পণ্যদ্রব্য সহজলভ্য না হলে প্রয়োজনীয় বিদেশী দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন করা ছিল দুঃসাধ্য। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আর একটি লক্ষ্য ছিল যে, 'বয়কট' আন্দোলন সফল হলে ক্ষতিগ্রস্ত ইংরেজ বণিকরা ব্রিটিশ সরকারকে তাদের নীতি পরিবর্তনের জন্য চাপ দিতে বাধ্য হবে। তা ছাড়া, সুলভ ও উৎকৃষ্ট বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের ফলে জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তাদের মনোবল ও আত্মনির্ভরতা-বোধ বৃদ্ধি পাবে। স্বদেশী ভাবধারার অনুপ্রেরণায় বহু কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, মোজা, গেঞ্জি, সাবান, চামড়া, ঔষধ ইত্যাদির কারখানা, বীমা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে ওঠে। স্বদেশী দোকানও বিভিন্ন স্থানে খোলা হয়। কুটিরশিল্পেরও উন্নতি হতে শুরু করে। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক বাড়ী বাড়ী ঘুরে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় করতে শুরু করে। জনসভা, মিছিল, বিদেশী দ্রব্যের বহ্ন্যুৎসব, পিকেটিং দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের দুর্বারগতি অব্যাহত থাকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী ও গণভিত্তিক করে তুলতে সচেষ্ট হন।

বয়কট আন্দোলনের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শিক্ষা বর্জন কিন্তু বিদেশী পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগ পায় সে জন্য আন্দোলনের নেতৃবর্গ গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ 'জাতীয় শিক্ষা পর্ষৎ' গঠিত হয়। বঙ্গীয় জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়। জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের দায়িত্ব লাভ করেন অরবিন্দ ঘোষ। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক একলক্ষ টাকা এবং পরে ময়মনসিংহের জমিদারগণ প্রচুর টাকা দান করেন। এই সব দান ছাড়াও সাধারণ লোকও জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের তহবিলে প্রচুর অর্থ দান করেন। সাধারণ মানুষের স্বেচ্ছা-সেবায় এবং অকৃপণ দানে রাতারাতি গড়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গে ১১/১২টি এবং পূর্ববঙ্গে ৪০টি স্কুল। জন্ম হল যাদবপুর কারিগরী কলেজের যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বর্তমানের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের উ[illegible] ছিল—জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং জাতির মানসিকতার ভিত্তিতে জাতি প্রয়োজন মেটানো এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিদেশী শাসনের ঔপনিবেশিক ভাবধারা ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা

গড়ে তোলা। তাই জাতির অতীতকে জানবার জন্য জাতীয় স্কুলগুলোর পাঠক্রমে ভারতের ইতিহাস পাঠের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অপরদিকে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে গুরুত্ব দেওয়া হল কারিগরী বিদ্যার উপর। মাতৃভাষা ও সাহিত্য এবং উচ্চতর স্তরে মানবিক বিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা হয়।

ক্রমশঃ স্বদেশী আন্দোলনের মূল আদর্শগুলো বাংলার বাইরেও বিস্তার লাভ করে। স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার আদর্শ বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন দমন করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কুখ্যাত কার্লাইল সারকুলার বিধিবদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকার ছাত্রদের কঠোরভাবে দমন করার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতিকে উপেক্ষা করে দলে দলে ছাত্র স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয়। সরকারের পক্ষ থেকে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়াও নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু দেশের জনসাধারণ তখন নতুন জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ শাসনকে উপেক্ষা করতে শুরু করে এবং আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে কার্লাইল সারকুলারের প্রতিবাদে সারকুলার বিরোধী সোসাইটি গঠিত হয় এবং তাদের তরফ থেকে 'বয়কট সারকুলার' প্রচার করা হয়।

(৪) স্বদেশী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজ ঃ

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সহিত স্বদেশী আন্দোলন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, লর্ড কার্জন মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে পরিচিত নতুন প্রদেশটি গঠন করেন। তা ছাড়া, লর্ড কার্জন নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ঢাকার নবাবের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হন। সৈয়দ আহমেদ ও মহসীন-উল-মুলকের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মুসলমানগণও বঙ্গভঙ্গের সমর্থন করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা শুরু করেন। অপরদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনের পরিচালনার দায়িত্ব হিন্দু সম্প্রদায়ই প্রায় এককভাবে গ্রহণ করেন। মুষ্টিমেয় জাতীয়তাবাদী মুসলমান এই আন্দোলনে যুক্ত হলেও মুসলিম সমাজের উপর তাদের প্রভাব খুবই সামান্য ছিল। আবদুল রসুল, লিয়াকৎ হোসেন, আবদুল হালিম গজনভীর মতো মুসলমান নেতৃবর্গ এই আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যথেষ্ট প্রভাবশালী হলেও সাধারণ মুসলিম সমাজের উপর তাঁদের প্রভাব খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। অপরদিকে মুসলমান কৃষকসমাজ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য কোন প্রকার আগ্রহ প্রদর্শন করে নি। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত তাদের যোগাযোগ কম ছিল। সুতরাং বিলাতি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের তাৎপর্য তাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে কখনও প্রকাশিত হয় নি। ঢাকার নবাবও সাধারণ মুসলমানদের এই আন্দোলন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন এবং বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের যে প্রভূত উন্নতি ও সুযোগ লাভের সম্ভাবনা আছে এ কথা তিনি নানাভাবে প্রচার করার চেষ্টা করেন।

ব্রিটিশ সরকারের নীতির ফলেও মুসলমান সমাজ এই আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে

দেখতে শুরু করে। বাংলাদেশের গভর্নর অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার পূর্ব বঙ্গের গভর্নর বমফিল্ড ফুলার মুসলমানদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে শুরু করেন। কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মিস্টার বস এবং বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র সচিব মিস্টার বিজলিও স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানগণ যাতে অংশ গ্রহণ না করেন সে জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেন। এমন কি, যেসব মুসলিম নেতা স্বদেশী আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন তাঁদেরও তাঁরা তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। বরিশাল সম্মিলনের সভাপতি আবদুল রসুলকে তাঁরা হিন্দু অ্যাটর্নীদের মুখাপেক্ষী অযোগ্য ব্যারিস্টার বলে সমালোচনা করেন। কলকাতা সম্মেলনের সভাপতি হাসান খানকে তাঁরা রাজনীতির অনভিজ্ঞ ছাত্র; স্বদেশী আন্দোলনকারীদের অর্থভোগী বলে আখ্যা দেন। ফলে যে সমস্ত মুসলিম নেতৃবর্গ স্বদেশী আন্দোলনের সহিত জড়িত হয়ে পড়েন ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টার ফলে তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়। ব্রিটিশের এই নীতির ফলেই মুসলমানদের পক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

(৫) **উপসংহার ঃ**

স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবর্গও মুসলমান সমাজকে এই আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য অংশতঃ দায়ী। স্বদেশী আন্দোলনের সহিত হিন্দু দেব-দেবী এবং ধর্মীয় বহু অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে যুক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ শক্তির অধিকারিণী কালীমূর্তি হিন্দু আন্দোলনকারীদের প্রতীকে পরিণত হয়। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ গীতাও আন্দোলনকারীদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এইসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিম সমাজকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি বিরূপ করে তোলে। সেজন্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে নয় ধর্মীয় কারণেও মুসলিম সমাজ স্বদেশী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাই অধিকতর ছন্দ করে।

Q. 7. Discuss the political ideology and strategy of the Moderates in the Congress Did they succeed in achieving their aims if not, why ?

Ans. জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দুই দশকে ঃ

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে একটি নতুন রাজনৈতিক উপদলের উদ্ভব হয় এবং জাতীয় কংগ্রেসের এত দিনের অনুসৃত নীতির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতবিরোধ দেখা দেয়। নতুন এই উপদলটি চরমপন্থী নামে পরিচিত হয় এবং পুরাতন নীতির অনুসরণকারীরা নরমপন্থী নামে পরিচিত হতে থাকে।

জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসের প্রথম দুই দশকে নরমপন্থীরাই প্রাধান্য স্থাপন করার সুযোগ পায়। নরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি স্যার দাদাভাই নওরোজী তাঁর ভাষণে যুক্তরাষ্ট্র অথবা ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের মতো ভারতের জন্য

স্বায়ত্ত শাসন অথবা স্বরাজের দাবির কথা উত্থাপন করেন। তাঁরা মনে করতেন যে, ভারতের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর ব্রিটিশ শাসকদের হাতে এ দেশের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সুতরাং ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতি ভারতের আনুগত্য প্রচার অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। তা ছাড়া, ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের প্রতিও তাঁদের গভীর আস্থা ছিল। রাজনৈতিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতের বহিভূ্ত হওয়ার কথা তাঁদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে নরমপন্থীরা ভারত থেকে ব্রিটিশ সরকারকে বিতাড়িত করার পরিবর্তে তার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার জন্য বেশি আগ্রহী ছিলেন। "The Moderates worked not to supplant the British Government in India but to supplement it."

রাজনৈতিক আন্দোলনের কৌশল হিসাবে নরমপন্থীরা চুক্তি, আবেদন-নিবেদন এবং ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। নরমপন্থী এই কৌশল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে চরমপন্থীদলের অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেন, "ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং লণ্ডনের ব্রিটিশ কমিটি উভয়ই ভিক্ষাবৃত্তির প্রতিষ্ঠান। ভিক্ষাবৃত্তিকে আমরা একটি নতুন নাম দিয়েছি—আমরা তাকে আন্দোলন বলি।" ইংলণ্ডের সাংবিধানিক ইতিহাস যথাযথভাবে অনুকরণ করে নরমপন্থীরা তাঁদের আন্দোলন পরিচালনা করার চেষ্টা করেন। তাঁরা ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট এবং ব্রিটিশ জাতির বিবেকবুদ্ধির নিকট ইঙ্গ-ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের সহানুভূতিহীন দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আবেদন-নিবেদন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

কিন্তু নরমপন্থী এই আবেদন-নিবেদনের নীতির ফলে সামান্যতম রাজনৈতিক সুযোগও তাঁদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় নি। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট তাঁদের আবেদন-নিবেদনের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করে নি। ভারত সম্পর্কে আলোচনার সময় পার্লিয়ামেণ্টের অধিকাংশ সভ্যই সভাকক্ষ ত্যাগ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে নরমপন্থীরা তাঁদের সামান্যতম দাবিও সরকারীভাবে ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে আদায় করতে ব্যর্থ হন। বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। যথা—(১) বারবার দাবি করা সত্ত্বেও ভারত সচিবের পরামর্শ সভা বাতিল করতে অসম্মত হয়; (২) লর্ড ডাফরিন প্রদত্ত প্রতিশ্রুত অপেক্ষাও অনেক কম সুযোগ-সুবিধা ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল অ্যাক্টে মঞ্জুর করা হয় এবং এই শাসনতান্ত্রিক সংস্কার জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়; (৩) ইংলণ্ডে ও ভারতে যুগপৎ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রবর্তনের দাবিও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে অগ্রাহ্য করা হয়; (৪) সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাবও ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়; এবং (৫) ১৮৯৪ ও ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে সূতী-শিল্পের উপর শুল্ক সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং ১৯০২ ও ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি ব্রিটিশ সরকার কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ করতে অস্বীকার করে। ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়বিচারের উপর নরমপন্থীদের আস্থা স্থাপন যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও

ভিত্তিহীন ছিল উপরি-উক্ত উদাহরণসমূহই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাঁদের কার্যাবলী দেখে স্বাভাবিকভাবেই এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক চিন্তাধারা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তাঁরা আবেদন-নিবেদনের পথ গ্রহণ করেন ; কিন্তু তাঁদের এই নীতি ছিল যেমন ভ্রান্ত, তেমন যুক্তিহীন।

(২) কার্জন ও মিণ্টোর নীতি ঃ

ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত নীতি ব্যতীত লর্ড কার্জনের কার্যাবলীর ফলেও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা নানাভাবে বাধা পেতে শুরু করে। কলকাতা কর্পোরেশনের ভারতীয় প্রতিনিধি সংখ্যা তিনি হ্রাস করার ব্যবস্থা করেন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর আমলেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হয় কিন্তু উচ্চ শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টায় জনসাধারণের মনে নানা প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া, ঐ একই খ্রীস্টাব্দে বিধিবদ্ধ ইণ্ডিয়ান অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করতে সহায়তা করে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ করার ব্যবস্থা করেন। জনমতের প্রতি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ না করে লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী শাসন নরমপন্থীদের সযত্নে লালিত রাজনৈতিক আদর্শে বিরাট আঘাত দেয় এবং সাধারণভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ভারতীয়দের পক্ষে কোন প্রকার ন্যায়বিচার লাভের আশা চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেন, "The autocratic regime of Lord Curzon which set public opinion at naught, was a great blow to the Moderate party's cherished ideals and seemed to blast the hope of the people in general of receiving any justice from the British"

কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বারবার আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও নরমপন্থীদের চিন্তাধারার কোন পরিবর্তন হয় নি। বিশেষতঃ, ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে ইংলণ্ডে উদারনৈতিক দলের জয়লাভ এবং লর্ড গ্লাডস্টোনের উদারনৈতিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ জন মর্লির ভারত সচিবের পদে নিযুক্তির ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং নরমপন্থীরা প্রত্যাশিত সুদিনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে শুরু করেন। তা ছাড়া, আরও একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণে নরমপন্থীরা তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রাখার সুযোগ পান। চরমপন্থীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকার নিজেদের স্বার্থে নরমপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। তদানীন্তন ভাইসরয়, লর্ড মিণ্টো এবং ভারত সচিব লর্ড মর্লি নরমপন্থীদের অন্যতম নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলের সহায়তায় নরমপন্থীদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু গোখলের উপর নির্ভর করে তাঁরা হতাশ হন, কারণ সরকারবিরোধীদের নিরুৎসাহিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। গোখলে সম্পর্কে লর্ড মর্লির মন্তব্যই প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটন করে, "গোখলে কোন দিন বিদ্রোহ করতে চান নি, কিন্তু বিদ্রোহীদের মন থেকে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব দূর করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

অপরদিকে রাজনৈতিক আদর্শ ও কৌশলের পার্থক্যের জন্যই এই সময় চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, লালা লাজপৎ রায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল-এর নেতৃত্বে ইতিমধ্যে চরমপন্থী দল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ পায়। প্রকৃতপক্ষে লাল বাল-পাল ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন এবং বিদেশী পণ্যবর্জন নীতি চরমপন্থীদের মতবাদকে শক্তিশালী করে তোলে।

উভয় দলের আদর্শ ও কৌশলের বিরোধিতার আপোস মীমাংসার ফলে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কোন প্রকাশ্য সংঘর্ষ ঘটে নি কিন্তু পরবর্তী বছরে সুরাট অধিবেশনে প্রকাশ্য সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু অধিবেশনের স্থান ও সভাপতি নির্বাচনের বিষয়কে কেন্দ্র করেই পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরের দিন, অর্থাৎ ২৮শে ডিসেম্বর নরমপন্থীরা একটি সভায় মিলিত হন এবং চরমপন্থীদের সহিত কোনপ্রকার যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা না করে তাদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, মর্লি ও মিণ্টোর প্রভাবই ছিল নরমপন্থীদের আপোসহীন মনোভাবের প্রধান কারণ। লর্ড মর্লি সুরাটের ঘটনাকে তাঁদের নীতির জয় বলে মনে করেন এবং তাঁর ধারণা ছিল যে, অনতিবিলম্বেই চরমপন্থী রাজনীতির অবসান অনিবার্যরূপে দেখা দিবে।

তবে লর্ড মর্লির এই আশা পূরণ হয় নি। চরমপন্থী দলের অবলুপ্তি ঘটে নি, যদিও কয়েক বছর এই দল জাতীয় কংগ্রেসের সহিত কোন সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করে নি এবং নরমপন্থীরাই এই সময় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। নরমপন্থীদের সক্রিয় সহযোগিতায় মর্লি-মিণ্টো সংস্কার কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয়। উদার মতাবলম্বী ও আশাবাদী গোখলে মুসলমানদের অহেতুক ভীতি দূর করার জন্য আবশ্যকীয় কিন্তু ক্ষতিকর স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা গ্রহণ করতে সম্মত হন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের ফলে আইনসভার ভারতীয় সদস্যগণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের শাসনপদ্ধতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবেন এবং স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করার সুযোগ লাভ করবেন। কিন্তু তাঁর এই আশা কোনভাবেই পূরণ হয় নি। নরমপন্থী দলের অন্যান্য নেতারা মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের তীব্র সমালোচনা শুরু করেন। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে বলা হয় যে, দশ বছরের মধ্যেই মর্লি-মিণ্টো সংস্কার সম্পূর্ণভাবে অকেজো হয়ে পড়ে এবং ভারতবাসীর রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া পূরণ করতে একেবারে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে এই সংস্কার ভারতীয়দের নিরাশ করে। নরমপন্থীদের সন্তুষ্ট করে এই সংস্কার কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয়। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে নরমপন্থীরা ব্রিটিশ সরকারের নীতি গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন কিন্তু মর্লি-মিণ্টো সংস্কার তাঁদেরও প্রতারণা করে। পরবর্তীকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের রাজনীতিতে

গান্ধীজীর আবির্ভাব এবং মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের ফলে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং নরমপন্থীদের অস্তিত্ব রক্ষা করার আর কোন সুযোগ অবশিষ্ট ছিল না।

(৩) **উপসংহার :**

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নরমপন্থী নেতৃবর্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। তা ছাড়া, এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যা ধৈর্য ও দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা জাতির এই আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। নরমপন্থীরাই জাতীয় কংগ্রেসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি তাঁরা এরূপ দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে সক্ষম হন যে, যা নানারূপ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেও শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত করতে সমর্থ হয়।

তবে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য রেখে তাঁদের আদর্শ ও কৌশলের পরিবর্তন করার অক্ষমতাই ছিল নরমপন্থীদের প্রধান দুর্বলতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের তুলনায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ভারতীয়দের মন অনেক বেশি অশান্ত, অধৈর্য ও রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন হয়ে ওঠে। বিসমার্ক ও ডিসরেলির যুগের পৃথিবীর সঙ্গে রুশ জাপান যুদ্ধ ও রাশিয়ার প্রথম বিপ্লবোত্তর যুগের পৃথিবীর পার্থক্য অনেক। কালের গতির সঙ্গে সুসামঞ্জস্য রক্ষা করে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হলে নরমপন্থীদল রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্থায়িভাবে কুক্ষিগত করে রাখার সুযোগ পেতেন এবং ভারতের রাজনীতিতে চরমপন্থীদের উদ্ভবের সম্ভাবনা চিরদিনের জন্য দূরীভূত হত।

Q 8. Account for the rise of the Extremists and trace their progress till 1907.

Ans. (১) **চরমপন্থীদের উদ্ভবের কারণ :**

জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থীদের উদ্ভবের অনেক কারণ দেখা যায়। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল অ্যাক্ট নরমপন্থীদের সন্তুষ্ট করতেও ব্যর্থ হয়। আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে কোন কিছুই লাভ করা যে সম্ভব নয় তা সকলেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের এই নীতিকে ব্রিটিশ সরকার দুর্বলতা বলে মনে করতে শুরু করেন। বিপিনচন্দ্র পাল কংগ্রেসের এই ভিক্ষার মনোবৃত্তিকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। বি. জি. তিলকও কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবর্গের আবেদন-নিবেদনের নীতির কঠোর সমালোচনা করে মন্তব্য করেন, "Political rights will have to be fought for. The Moderates think that less can be won by persuasion. We think that they can only be obtained by strong pressure."

বিদেশী শাসকদের শোষণের ফলে ভারতের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ডি. ওয়াচা, আর. সি দত্ত, দাদাভাই নওরোজী প্রমুখ ব্যক্তিগণ যুক্তিসহকারে প্রমাণ

করেন যে, ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত নীতির ফলেই ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্য দিন-দিন বৃদ্ধি পায় এবং তাঁদের এই সব রচনা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের স্বার্থে ভারতের শিল্প ধ্বংস করা হয় এবং ভারতের শিল্প ধীরে ধীরে ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষও চরমপন্থীদের উদ্ভবের অন্যতম কারণ। খাদ্যাভাবে যখন লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুপথযাত্রী ঠিক সেই সময়ই ব্রিটিশ সরকার মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসবে ব্যস্ত। বিশেষতঃ, খাদ্যক্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যের অর্থ জুবিলী উৎসবে ব্যয় করায় ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নির্মম মনোভাব অনেককেই ব্যথিত করে তোলে। অপরদিকে এই সময় বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে প্লেগ মহামারীর রূপ নেয়। যদিও ব্রিটিশ সরকার এই মহামারী দূর করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে, তা হলেও, পুণের প্লেগ কমিশনার মিস্টার র‍্যাণ্ডের অত্যাচারে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বি জি. তিলক সরকারের প্লেগ-নীতিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে র‍্যাণ্ড ও তাঁর সহকারী আয়েস্টকে হত্যা করা হয়।

হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানও চরমপন্থীদের উদ্ভবের আর একটি প্রধান কারণ। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করেন। ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উপর বিবেকানন্দের প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল এবং তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে মনে করতেন যে, পরাধীন ভারতের পক্ষে এই চিন্তাধারা কার্যকরী-করা সম্ভব নয়। স্বামীজীর এই চিন্তাধারা ভারতের অনেককেই উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর কুসংস্কার মুক্ত মন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারাও শিক্ষিত ভারতীয়দের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। শ্রীঅরবিন্দও জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণের জন্য হিন্দু ধর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, "Independence is the goal of life and Hinduism alone will fulfil this aspiration of ours." বি. জি. তিলকের কার্যকলাপের মধ্যে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের চিন্তাধারা বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। তিনি হিন্দুদের বিভিন্ন উৎসবের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ভারতের মুক্তির জন্য সমস্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। চরমপন্থী চিন্তাধারার উদ্ভবে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির দানও অনস্বীকার্য। স্যার ভ্যালেন্টাইন চিরলের মতে, "The advent of the Theosophist, headed by Madame Blavatski, Colonel Olkott and Mrs. Besant gave a fresh impetus to the revival and certainly no Hindu has so much organised and consolidated the movement as Mrs Besant who has openly proclaimed the superiority of the whole Hindu system to the vaunted civilisation of the west." বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনাও ভারতীয়দের নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

উচ্চপদস্থ, সরকারী পদে শিক্ষিত ও দক্ষ ভারতীয়দের অনুপযুক্ত বিবেচনা করার ফলেও ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। লর্ড কার্জনের ভারত বিরোধী নীতির ফলে এই মনোভাব আরও বৃদ্ধি পায়। লর্ড কার্জন ঘোষণা করেন, "The highest rank of civil employment must as a general rule, be held by English men." শাসনতান্ত্রিক যে কোন সংগঠন থেকেই ভারতীয়দের বঞ্চিত করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে ক্যালকাটা করপোরেশন অ্যাক্ট, ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস্ অ্যাক্ট এবং অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করেন। এই সব আইনের দ্বারা ভারতীয়দের অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং এমন কি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরও হস্তক্ষেপ করা হয়। ফলে দেশের সর্বত্র অসন্তোষ দেখা দেয়। কিন্তু লর্ড কার্জন জনমত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুধুমাত্র বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না এই আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রায় সমগ্র ভারতেই বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পার্সিভাল স্পিয়ারের মতে বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলাদেশ, পশ্চিম ভারত ও পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদের সূচনা হয়। বাংলাদেশে এই আন্দোলনের সহিত শক্তির অধিকারিণী কালী, মহারাষ্ট্রে শিবাজীর আদর্শ ও সামরিক শক্তির ঐতিহ্য এবং পাঞ্জাবে অর্থ নৈতিক দুর্দশার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়ে।

(২) চরমপন্থী নেতৃবর্গ :

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে চরমপন্থীদল মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলকের মতো একজন সুযোগ্য নেতার নেতৃত্বে পরিচালিত হবার সুযোগ লাভ করে। শিবাজী উৎসব পালন এবং 'ডেকান সভা' স্থাপনের ফলে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই মহারাষ্ট্রে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে কংগ্রেসের সংগঠন বিভক্ত হয়ে পড়ে। কয়েক বছর পরে বাংলাদেশের বিপিনচন্দ্র পাল চরমপন্থী দলে যোগদান করেন। রাজনীতিবিদ্ না হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক রচনায় চরমপন্থীদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আদর্শ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। অরবিন্দ ঘোষও বিশ্বাস করতেন যে, বিপ্লবের মাধ্যমেই, স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, বিজাতীয় কংগ্রেসের (Un-national Congress) দুর্বল প্রচেষ্টায় তা কখনই সম্ভব নয়। পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় ১৮৯৩ থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে যোগ দেন নি। তাঁর মতে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ ছিলেন 'অবকাশ সময়ের দেশপ্রেমিক' (holiday patriots)! বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে লাল-বাল-পাল ছিলেন চরমপন্থী-আন্দোলনের অবিসম্বাদী নেতা।

(৩) চরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শের বৈশিষ্ট্য :

চরমপন্থীদল বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। বয়কট নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী পণ্য, সরকারী চাকুরী, খেতাব, উপাধি প্রভৃতি বর্জন। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন খুবই সার্থকতা লাভ করে। বয়কট নীতির সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কলকাতার The Englishman মন্তব্য করে, "In boycott, the

enemies of Raj have found a most effective weapon for injuring British interests in the country" জাতীয় কংগ্রেসের অনুসৃত আবেদন-নিবেদন পদ্ধতিরও তাঁরা একান্ত বিরোধী ছিলেন। লালা লাজপৎ রায় ঘোষণা করেন যে, "ইংরেজ জাতি ভিক্ষুকদের খুব ঘৃণার চোখে দেখে ; আমরা তাদের কাছে প্রমাণ করতে চাই যে, আমরা ভিক্ষুক নই।" বি. জি. তিলকও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন, "Our motto is self-reliance and not mendicancy." তবে চরমপন্থীদের নেতৃবর্গ রাজনীতির সঙ্গে ধর্মেরও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অরবিন্দ ঘোষণা করেন, "জাতীয়তাবাদ একটি ধর্ম, ঈশ্বর যার অনুপ্রেরণার উৎস।" দেশাই-র মতে, "চরমপন্থী নেতাগণ হিন্দুদের বৈদিকযুগের ঐতিহ্য এবং অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের গৌরবময় যুগ পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন, রাণা-প্রতাপ ও শিবাজীর বীরত্ব এমন কি, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ ও ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহা-বিদ্রোহের নেতৃবর্গ তাঁদের অনুপ্রেরণার প্রধান স্থান গ্রহণ করেন।" দুর্গা, কালী, ভবানী এবং অন্যান্য হিন্দুদের দেব-দেবীর পূজার্চনা প্রচলিত হয় এবং দেশের মুক্তির জন্য তাঁদের অনুগ্রহ একান্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হয়।

(৩) চরমপন্থী বনাম নরমপন্থী নেতৃবর্গ :

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থীদের সহিত নরমপন্থীদের মতবিরোধিতা শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই বিরোধিতা প্রকাশ্য সংঘর্ষে পরিণত হয়। আন্দোলনের আদর্শ ও কৌশলই নিয়েই ছিল এই সংঘর্ষের মূল কারণ। আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ফলে আত্মনিয়ন্ত্রিত ঔপনিবেশিক সরকার স্থাপন করাই ছিল নরমপন্থীদের চরম আদর্শ। কিন্তু চরমপন্থীরা এই আদর্শের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং নিজেদের ক্ষমতার দ্বারা রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করাই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, "If the Government were to come and tell me to-day,' Take Swaraj,' I would say, 'Thank you, for the gift, but I will not have that which I cannot-acquire by my own hands." বি.জি. তিলকও সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, নরমপন্থীদের পক্ষে দেশের মঙ্গল সাধন করা সম্ভব নয়। চরমপন্থীদের সম্বন্ধে তিনি বলেন, "what the New Party wants you to do is to realize the fact that your future rests entirely in your hands"

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের সুরাট অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সুরাট অধিবেশনের পর জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে বি.জি. তিলক ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু জনসভার আয়োজন করেন। তাঁর এই সব জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার মূল কথাই ছিল, "We are masters of our fortunes and can govern them if we only make up our minds to do so. Swaraj is

no far off from us. It will come to us if we learn to stand on our own legs. ' Swaraj is my birth right and I will have it."

লাল-বাল-পাল এই তিন নেতার অক্লান্ত চেষ্টায় চরমপন্থীদল খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ব্রিটিশ সরকার চরমপন্থীদের দমন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার কঠোর আইন প্রণয়ন করে। অপরদিকে শাসকগোষ্ঠী নরমপন্থীদের সাহায্যে মর্লি-মিণ্টো সংস্কার কার্যকরী করে চরমপন্থীদের শক্তি খর্ব করার জন্যও সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

(৫) উপসংহার ঃ

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে চরমপন্থীদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কার্যকলাপ প্রকৃতপক্ষে কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে অসমর্থ হয়। তাঁদের রাজনৈতিক সাফল্য ছিল অত্যন্ত নগণ্য। মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের ফলে ভারতের শাসনতন্ত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি। বিপিনচন্দ্র পালের দাবি অনুযায়ী স্বরাজ লাভ করা তো দূরের কথা, ভারতে সাংবিধানিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের কোন ব্যবস্থাই মর্লি-মিণ্টো সংস্কারে করা হয় নাই। অর্থ নৈতিক সাফল্যও তাঁদের কোনক্রমেই উল্লেখযোগ্য নয়। বয়কট আন্দোলনের সাফল্য ছিল নিতান্ত সীমিত। ব্রিটিশের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে তাঁরা কোনক্রমেই বিপদগ্রস্ত করতে পারে নি, ভারতীয় শিল্প খুব বেশি উন্নতি করার সুযোগ পায় নি। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁদের সাফল্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মাত্র পঁচিশটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও তিনশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় তাঁদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। অপরদিকে হিন্দুদের দেব-দেবীর পূজার্চনা প্রচলনের ফলে সাম্প্রদায়িকতার সূচনা দেখা দেয়।

চরমপন্থীদের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় করা খুবই সহজ। ব্রিটিশ সরকার পদাঘাত ও চুম্বনের নীতি (policy of kicks and kisses) গ্রহণ করে। চরমপন্থীদের দমন ও নরমপন্থীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করাই ছিল এই সময়ে ব্রিটিশ শাসকদের মূল নীতি। চরমপন্থীদের বিরোধী মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিও ব্রিটিশ সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পরই ব্রিটিশ সরকার *divide et impera* নীতিকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার সুযোগ পায়। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ চরমপন্থী রাজনীতি থেকে সমর্থন তুলে নেন। অরবিন্দ ঘোষ রাজনীতি পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবন পালন করতে শুরু করেন। তা ছাড়া, ভারতের অধিবাসীরা তখনও চরমপন্থীদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিশেষতঃ বি. জি. তিলকের মান্দালয়ে নির্বাসনের ফলে চরমপন্থীদের শক্তি যথেষ্ট হ্রাস পায়।

Q. 9. What led to the Surat split of 1907? Was it unavoidable?

Ans. (১) নরম ও চরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শের পার্থক্য ঃ

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট-অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের

দল চরমে ওঠে এবং জাতীয় কংগ্রেস এই দুটি দলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। চরম ও নরমপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত ও রাজনৈতিক পার্থক্যই ছিল উভয় পক্ষের দ্বন্দ্বের মূল কারণ। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম বিশ বছর নরমপন্থীরাই এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সকল প্রকার কর্তৃত্ব ভোগ করেন। ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়নীতি, সুবিচার, উদারতা প্রভৃতির উপর তাঁদের সীমাহীন বিশ্বাস ছিল এবং আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমেই তাঁরা তাঁদের দাবি আদায় করাকেই জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করতেন। পশ্চিমী সংস্কৃতি, সভ্যতা ও রাজনৈতিক মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না এবং ফলে প্রায় তাঁদের সকলের মনেই হীনম্মন্যতা বোধের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে চরমপন্থীরা বিশ্বাস করতেন যে, ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে ভারতের কোন মঙ্গলসাধন করার উদ্দেশ্য নেই, শাসিতদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য তাঁরা কোন চেষ্টা করতে প্রস্তুত নন এবং ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপরও তাঁদের অগাধ বিশ্বাস ছিল।

(২) চরমপন্থীদের উদ্ভব ও শক্তিবৃদ্ধি :

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই চরমপন্থীদের উদ্ভব শুরু হয়। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত নরমপন্থীরাও এই সংস্কারে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বিশেষতঃ ব্রিটিশ শাসকদের নিকট থেকে নরমপন্থীরা সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় জাতীয় কংগ্রেসের নীতির প্রতি অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তা ছাড়া, ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্পপতিদের স্বার্থে বয়ন শিল্পের উপর নানারূপ বাধানিষেধ আরোপ ও নতুন শুল্ক ধার্যের ফলেও চরমপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি হয়। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল এবং বাল গঙ্গাধর তিলক চরমপন্থীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দ ছিলেন প্রধানতঃ তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শের উৎস।

(৩) চরমপন্থীদের কৌশল :

ধীরে ধীরে চরমপন্থীদলের নেতৃবর্গ তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শকে কার্যকরী করার জন্য তাঁরা বিশেষভাবে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের সামাজিক সম্মেলনেই তাঁরা নরমপন্থীদের রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানান। ঐ বছরেই তাঁরা পুণের সার্বজনীন সভার কর্তৃত্ব থেকে নরমপন্থীদের ক্ষমতাচ্যুত করতে সমর্থ হন। কিছু দিনের জন্য লর্ড কার্জনের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন শাসন-নীতি ও বঙ্গভঙ্গের ফলে চরমপন্থীদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করার সুযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। পরিস্থিতির সুষ্ঠু মোকাবিলার জন্য অরবিন্দ ঘোষ একটি নতুন কার্যপ্রণালী গ্রহণ করার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। অহিংস প্রতিরোধ ব্যর্থ হলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করে এই সংস্থার মাধ্যমেই বিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য তিনি সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করতে শুরু করেন। কলকাতায়

অনুষ্ঠিত শিবাজী উৎসবে অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন' এবং জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে তাঁকে সভাপতির পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু চরমপন্থীদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে নরমপন্থীরা দাদাভাই নওরোজীকে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সভাপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে লালা লাজপৎ রায় বলেন, 'মিস্টার তিলক সম্পর্কে প্রাচীনপন্থী নেতাদের সন্দেহপরায়ণতার কোন কারণ ছিল না।" তবে সভাপতির পদ নিয়ে তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে অকারণে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি নিজেকে এই দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে রাখার চেষ্টা করেন। দাদাভাই নওরোজীর মতো একজন প্রধান নেতার পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের দুর্ভাগ্যজনক আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা সম্ভব মনে করে তিনি নতুন সভাপতিকে স্বাগত জানান।

(৪) কলকাতা সম্মেলন (১৯০৬):

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে চরমপন্থী দলের প্রকাশ্যভাবে প্রকৃত উদ্ভব ঘটে। অরবিন্দ ঘোষ বাংলাদেশের কংগ্রেসের সদস্যদের চরমপন্থী উপদলের জাতীয় নেতা হিসাবে বাল গঙ্গাধর তিলককে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। তবে তখন পর্যন্ত নরমপন্থীদের সঙ্গে চরমপন্থীদের সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন হয় নি। লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ কয়েকজন নেতা তখনও উভয় পক্ষের আদর্শগত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে মিলনের সূত্র খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাংলাদেশের সদস্যদের সংযত করা তাঁর পক্ষেও অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ, পাঞ্জাবের অজিত সিংহ চরমপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে এবং বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের সময় সভা ত্যাগ করেন।

ফলে জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে বাংলাদেশের চরমপন্থীরা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতা শুরু করেন। সুরেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জন্য অরবিন্দকে দায়ী করেন, অপরদিকে অরবিন্দ চরমপন্থীদের দমন করার জন্য সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে পুলিশ বিভাগের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করার অভিযোগ উত্থাপন করেন।

(৫) সুরাট অধিবেশন (১৯০৭):

জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন নাগপুরে অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দেই গৃহীত হয়। কিন্তু নাগপুরের পরিস্থিতি নরমপন্থীদের প্রতিকূলে ছিল, সুতরাং, তাঁরা কৌশলে অধিবেশনের স্থান পরিবর্তন করেন এবং নাগপুরের পরিবর্তে সুরাটে অধিবেশন বসে। সুরাটে উপস্থিত হয়েই বাল গঙ্গাধর তিলক ঘোষণা করেন যে, ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা অধিবেশনে গৃহীত 'স্বরাজই কংগ্রেসের লক্ষ্য' এই সিদ্ধান্ত

থেকে কংগ্রেসের কখনও বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেসকে দ্বিধাবিভক্ত করা অথবা নতুন একটি জাতীয় সংস্থা গঠন করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, তবে পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে তাঁরা অবশ্যই কংগ্রেসকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করবেন। I belong to the party which is prepared to do what it think right whether the government is pleased or displeased. We are against the policy of mendicancy No one has the authority to make the Congress recede from its ideal. We do not come here to embarrass tl e Moderate, but we are determined not to allow the Congress to retrograde If they are not prepared to brave the dangers, let them be quiet, but they should not ask us to retrograde. We are fighting against foreign autocracy. Why should we allow this home autocracy ?" কিন্তু তিলক ও তাঁর সহকর্মীদের পক্ষে নরমপন্থীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আদর্শগত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া এই অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেসের নতুন সংবিধান গ্রহণ করার প্রস্তাবও পূর্ব থেকেই গৃহীত হয়। কিন্তু মিস্টার গোখলের প্রস্তাবিত সংবিধানে জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐ প্রতিষ্ঠানের পূর্ব-অনুসৃত নীতির সহিত অনেক পার্থক্য থাকায় নরমপন্থীদের সম্পর্কে তিলকের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। বিশেষতঃ চরমপন্থীদের কৌশলে জাতীয় কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের নতুন আদর্শের প্রতি প্রত্যেক সদস্যের দ্বিধাহীন আনুগত্য এই সংবিধান অনুযায়ী দাবি করা হয়। ইতিমধ্যেই চরমপন্থীরা সুরাট অধিবেশনে সভাপতির পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন এবং ঐ পদের জন্য মান্দালয়ের কারাবাস থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত লালা লাজপৎ রায়ের নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিলক ঘোষণা করেন যে, নরমপন্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে দ্বন্দ্বের মীমাংসায় উৎসাহ প্রকাশ করলে লালা লাজপৎ রায়ের নাম প্রত্যাহার করা যেতে পারে। অপরদিকে লালা-লাজপৎ রায় নিজেকে দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে স্থাপন করার জন্য সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে নরমপন্থীদের মনোনীত প্রার্থী রাসবিহারী ঘোষই সুরাট অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর সুরাটে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়। ২৮শে ডিসেম্বর সভাপতির ভাষণ দেওয়ার সময় বি জি. তিলক সভামঞ্চে আরোহণ করে রাসবিহারী ঘোষকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ শুরু হয় এবং সভামণ্ডপে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।: সুরাট অধিবেশনের ঘটনা সম্পর্কে ইংরেজ সাংবাদিক নেভিনসন বলেন, Suddenly something flew through the air. A shoe! a Maratha shoe! reddish leather, pointed toe, sole studded with lead. It struck Surendranath

Banerjee on the cheek, it cannoned off upon Sir Pherozshah Mehta. It flew, it fell, and at a given signal, white waves of turbaned surged up to escarpment on the platform. Leaping, climbing, hissing the breath of fury, brandishing the long sticks and cane, striking at any head that looked to them Moderate, and in another moment between brown legs, standing upon the green baize table, I caught the glimpses of the Indian National Congress dissolving in chaos."

পরের দিন ২৮শে ডিসেম্বর নরমপন্থী দল কংগ্রেস সভামণ্ডপে এক সভায় মিলিত হন এবং এই সভায় চরমপন্থীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। তবে চরমপন্থীদের অনেকেই এই সভায় উপস্থিত হতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। ঐ দিন চরমপন্থীরাও আর একটি সভায় মিলিত হয়ে কলকাতা অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে সুরাট অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে এই আদর্শগত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা সম্ভব হয় নি বলে নরমপন্থীরা জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে চলার নীতি গ্রহণ করেন। পরে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে আবার চরমপন্থী ও নরমপন্থীরা মিলিত হন।

(৬) উপসংহার ঃ

আদর্শগত ও কৌশলগত পার্থক্যের জন্যই চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। সুতরাং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের কোন উপায় ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি নরমপন্থীদের আনুগত্যের মনোভাব চরমপন্থীদের পক্ষে কোনভাবেই সহ্য করা সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ ব্রিটিশ সরকারের স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র ও ভারতীয়দের প্রতি নগ্ন অবহেলা চরমপন্থীদের নিকট জাতীয় অসম্মানরূপে পরিগণিত হত। অপরদিকে চরমপন্থীদের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধিতে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন যে, জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব লাভের সুযোগ চরমপন্থীরা একবার হস্তগত করতে সমর্থ হলে তাঁদের স্থানচ্যুত করার সম্ভাবনা অকল্পনীয় ব্যাপার। সুতরাং কোনক্রমেই তারা চরমপন্থীদের নিকট পরাজয় স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এমন কি নিজেদের স্বার্থে তাঁরা চরমপন্থী নেতাদের দেশদ্রোহীরূপে ঘোষণা করতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নি। "Tilak has been feeding the flames which have burnt the Congress to ashes. He is not a patriot, but a traitor to the country, and has blackened himself. May God save us such patriots." নরমপন্থীদের এই মনোভাব দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে চরমপন্থীদের পক্ষে তাঁদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার কোন সুযোগই ছিল না। তবে চরমপন্থীরা নানারূপ অসুবিধা সত্ত্বেও নরমপন্থীদের

সহিত সহযোগিতা করে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এই সম্পর্কে তিলক তাঁর কেশরী পত্রিকায় তাঁর দলের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বলেন, "Whatever our difference may be about the ideals we Moderates and Extremists should unite in carrying on the w rk of National Congress The rise of a new party necessarily produces friction with the old but it is the duty of the wise men not to make much of this friction, but to carry on national work in cooperation with the New Party". কিন্তু চরমপন্থীদের বিশ্বাস করা নরমপন্থীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ভারতের নেতৃবর্গের আদর্শের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয় সুরাটের ঘটনা তারই স্বাভাবিক পরিণতি। দুটি আদর্শের সংঘাত একান্তই অনিবার্য ছিল। যুক্তি, বিচার, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তার শান্তিপূর্ণ সমাধান কোনভাবেই সম্ভব ছিল না।

Q. 10 Give a critical account of the Morley-Minto Reforms.

Ans. (১) ভূমিকা :

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ও ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের ভারতের নেতাদের মধ্যে অনেকেই চরমপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ব্রিটিশ সরকারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বিপ্লবী মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন—তাঁদের এই মতবাদকে ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের ভাষায় 'ভারতীয় বিক্ষোভ' বলা হয়। ব্রিটিশ সরকারের নিকট এই রাজনৈতিক অবস্থা চিন্তার কারণস্বরূপ হয়ে দেখা দিলেও তা কোনরূপ বিপদের সঙ্কেত বহন করত না, কারণ রাজনীতি তখন পর্যন্ত ছিল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গ্রামের অধিবাসী ও অশিক্ষিত গরিষ্ঠ ভারতীয়দের সঙ্গে এই রাজনীতির কোন সম্পর্কই ছিল না; ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তদানীন্তন ভাইসরয় চরমপন্থীদের শক্তি খর্ব ও নরমপন্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নতুন সরকারী নীতি ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে সময় ভারত সচিব ছিলেন লর্ড মর্লি। মর্লি ছিলেন মিলের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী এবং আইরিশ হোমরুল সংক্রান্ত বিষয়ে লর্ড গ্লাডস্টোনের প্রধান সাহায্যকারী। মর্লি ও মিণ্টোর চিন্তাধারার সমন্বয় ও প্রচেষ্টার ফলে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে মর্লি-মিণ্টো সংস্কার প্রণয়ন করা হয়।

(২) ভাইসরয়ের কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্য :

মর্লি-মিণ্টো সংস্কার বলবৎ করার পূর্বে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ভারত সচিবের কাউন্সিলে দু'জন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা হয় এবং গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক পরিষদে আইন বিভাগের সদস্য হিসাবে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে গ্রহণ করা হয়। এই পরিবর্তন সাধনের জন্য কোন নতুন

আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয় নি, তবে ভারতীয় সদস্যদের নিয়োগকে কেন্দ্র করে ইংরেজ-সরকারকে নানারূপ বাধা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। লর্ড মর্লি ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট ও মহারাণীর ঘোষণার শর্ত উল্লেখ করে সরকারের অনুসৃত নীতি সমর্থন করার চেষ্টা করেন। তাঁর যুক্তির মূল বক্তব্য ছিল যে, একমাত্র যোগ্যতাই উচ্চ পদে নিযুক্ত হওয়ার বিচারের মান নির্ণয় করতে পারে এবং সে দিক থেকে বিচার করলে সরকারের নীতি অভ্রান্ত ও ত্রুটিবিহীন।

(৩) ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কার ঃ

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট আইনসভার গঠন ও কার্যাবলীর অনেক পরিবর্তন করে। এই সংস্কারের ফলে কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়। ভাইসরয়ের কাউন্সিলে অতিরিক্ত সদস্যের সংখ্যা ১৬ থেকে বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ সংখ্যা ৬০ করা হয়। তাদের মধ্যে ৩৭ জন সরকারী ও ২৩ জন বেসরকারী সদস্য ছিলেন। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্যের সংখ্যা ৫০ এবং ব্রহ্মদেশ, আসাম ও পাঞ্জাবে এই সংখ্যা ৩০ করা হয়। লর্ড মর্লির মতে প্রাদেশিক কাউন্সিলে সরকারী সদস্যদের গরিষ্ঠতা রাখার কোন প্রয়োজন নেই, তবে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে সরকারী সদস্যদের গরিষ্ঠতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। নির্বাচন প্রথার সাধারণ পদ্ধতি নীতি হিসাবে গৃহীত হলেও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করার কোন ব্যবস্থা না করে তার পরিবর্তে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে বড় বড় শহরের মিউনিসিপ্যাল বোর্ড গঠন করা, ছোট ছোট শহরের মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, জেলা বোর্ড ও জমির মালিকদের সহযোগী হিসাবে সদস্য নির্বাচিত করার সুযোগ পেত। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় ও আইনসভার সদস্য নির্বাচন করার অধিকার ভোগ করত। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই লর্ড মিণ্টো মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবি মেনে নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িকতার স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীরূপে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত হন। মর্লি-মিণ্টো সংস্কার মুসলমানদের এই দাবি আইনতঃ স্বীকার করে নেয়। এই সংস্কার মুসলমানদের আরও কয়েকটি সুযোগ দিতে সম্মত হয়। পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের গুরুত্ব স্বীকার করে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য ও অন্যান্য কর্তব্য পালনের পুরস্কার হিসাবে এবং তাদের সংখ্যার অনুপাতে সদস্য সংখ্যা স্থির করা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর এই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার সমর্থনে বলা হয় যে, মুসলমান ধর্মাবলম্বিগণ সব দিক হতেই হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র, সুতরাং তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই তাদের রাজনৈতিক অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। "The difference between the Mohemmedonism and Hinduism is not a mere difference of articles of religious faith. It is a difference in life, in tradition, in history, in all social things as well as articles of belief that constitute a community." লর্ড মর্লির এই ঘোষণার ফলে স্যার সৈয়দ আহমেদ প্রচারিত দ্বিজাতি-তত্ত্ব সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

মর্লি-মিন্টো সংস্কারের ফলে আইনসভার সদস্যদের অধিকারও অনেক বৃদ্ধি করা হয়। তাঁরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ পান। এমন কি সদস্যগণ কর ধার্যের রীতি-নীতি পরিবর্তন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলোর প্রতি সরকারী অনুদান মঞ্জুরের জন্য প্রস্তাব আনয়ন করতে পারতেন। তবে এইসব প্রস্তাব বিচার-বিবেচনা করে গ্রহণ বা বর্জন করার অধিকার সরকার ভোগ করত। প্রাদেশিক কাউন্সিলে বাজেটের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আইনসভার কয়েকজন সদস্য দ্বারা একটি ছোট কমিটি গঠিত হত। এই কমিটির কম পক্ষে অর্ধেক সদস্যকে নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্য থেকে গ্রহণ করা হত। এই কমিটির অনুমোদিত বাজেটকেই পরে ভারত সরকারের সাধারণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হত।

মর্লি মিন্টো সংস্কারে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়। এই সংস্কারে আইনসভার সদস্যদের জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়। সরকারের বৈদেশিক নীতি ও দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধেও প্রশ্ন করার অধিকার সদস্যগণ লাভ করেন। তাছাড়া সদস্যগণ অতিরিক্ত প্রশ্ন করার অধিকার ভোগ করার সুযোগ পান। এই সংস্কারের একটি শর্ত অনুযায়ী মাদ্রাজ ও বোম্বাইর কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যদের সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করে ৪ করা হয়। বাংলাদেশেও একটি কার্যনির্বাহক পরিষদ গঠন করার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যান্য প্রদেশেও কার্যনির্বাহক পরিষদ গঠিত হয় তবে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের যে কোন কার্যই ইচ্ছা করলে এই পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার সুযোগ ভোগ করত। এই আইনের বলেই পরবর্তীকালে যুক্ত প্রদেশের কার্যনির্বাহক পরিষদ বাতিল করা হয়।

(৪) দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রথম প্রচেষ্টা :

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কারের উদ্যোক্তাগণ এই আইনের দ্বারা ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রচেষ্টার কথা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন। এই সম্পর্কে লর্ড মর্লি বলেন, "If it could be said that this chapter of reforms led directly or necessarily to the establishment of a Parliamentary system in India, I for one would have nothing at all to do with it." পরবর্তীকালে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কার প্রসঙ্গে মন্ট-ফোর্ড রিপোর্ট মন্তব্য করে, "মর্লি-মিন্টো সংস্কার প্রধানতঃ বিবর্তনধর্মী ছিল। স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত পদ্ধতিকে এই সংস্কার আরও সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে এই সংস্কারের মধ্যে কোন নতুন নীতি গৃহীত হয় নি। পরিবর্তনগুলোও ছিল মাত্রার পার্থক্য—রূপের পার্থক্য নয়। যদিও প্রদেশসমূহে বেসরকারী সদস্যগণ গরিষ্ঠ সংখ্যা লাভ করেন এবং নতুন আইন প্রণয়নের উপর জনপ্রতিনিধিদের সামান্য কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় তথাপি শাসনতান্ত্রিক প্রতিটি বিষয়েই ব্রিটিশ সরকার পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করার অধিকারী এই মৌলিক নীতির উপরই ভিত্তি করে

মর্লি-মিন্টো সংস্কার প্রবর্তন করা হয়।" তবে মন্ট-ফোর্ড রিপোর্টে একথাও বলা হয় যে, মর্লি-মিন্টো সংস্কার ভারতে অদূর ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রথম দৃঢ় পদক্ষেপ "– a decided step forward on a road leading at no distant period to a stage of which the question of responsible government was bound to present itself." Coupland-এর মন্তব্য আরও সুন্দর ও স্পষ্টভাবে মর্লি মিন্টো সংস্কারের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে। "The Act of 1909 brought the constitutional advance begun by the Act of 1861 to the threshold of representative Government."

(৫) সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা :

মর্লি-মিন্টো সংস্কারের অনুমোদনসমূহ কার্যকরী করার জন্য সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কিন্তু সরকার এই সংস্কারকে যথাযথভাবে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে যে সব বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিভিন্ন মহলেই তার প্রচণ্ড সমালোচনা শুরু হয়। তাছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করার সুযোগ দেওয়ার ফলে তারা একাধিকবার ভোট দেওয়ার অধিকার লাভ করে। স্বতন্ত্র মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলী ও মিশ্রিত নির্বাচকমণ্ডলী উভয় কেন্দ্রেই তারা ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়। অপরদিকে মুসলিমদের প্রত্যক্ষভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হলেও অমুসলিমদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভার সদস্য পদের প্রার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতার মাপকাঠি, নিয়ম ও নীতি গ্রহণ করা হয়। আবার ভারতের কয়েকটি অঞ্চল বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কুর্গ, আজমীর-মারওয়াড় প্রভৃতি স্থানে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন না করে প্রত্যক্ষভাবে গভর্নর জেনারেলের অধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

(৬) উপসংহার :

মর্লি-মিন্টো সংস্কারের প্রধান প্রধান ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি বিশেষ কোন দৃষ্টি না দিলেও জাতীয় কংগ্রেস এই সময় সম্প্রদায়-ভিত্তিক নির্বাচকমণ্ডলী প্রবর্তনের কঠোর সমালোচনা করে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন প্রথাকে জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় ঐক্যের ধ্বংসকারী বলে বর্ণনা করে। তবে মর্লি-মিন্টো সংস্কারের মৌলিক নীতি জাতীয় কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভারতে স্বায়ত্ত শাসন প্রচলনের কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নি। Coupland সে জন্যই এই সংস্কারকে "repudiation of the Parliamentary Government" বলে বর্ণনা করেন। মন্ট-ফোর্ড রিপোর্ট এই সত্য উদ্ঘাটন করতে কোন প্রকার কার্পণ্য করে নি এবং এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করে, "the Morley-Minto constitution ceased in the brief space of ten years' time to satisfy the political hunger of India." ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দেই জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শাসন বিষয়ে সমান ভিত্তিতে যুগ্ম অংশীদারের অধিকার দাবি করেন।

এই সংস্কার ভারতীয়দের কিছু কিছু সুযোগ দান করলেও তার গুরুত্ব ও মূল্য ছিল খুবই সামান্য। আইন পরিষদকে ব্রিটিশ রাজকর্মচারী সংসদ অপেক্ষা দরবার মনে করতেই বেশী পছন্দ করতেন। সংস্কারের উদ্যোক্তা ও সমালোচক উভয় পক্ষই ভারতবর্ষকে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অনুপযুক্ত মনে করতেন। তাঁদের এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের নিকট অত্যন্ত অপমানজনক বলে বিবেচিত হয়।

সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী প্রথা প্রবর্তন গণতান্ত্রিক নীতি বিরোধী ছিল। ভারতে গরিষ্ঠ-সংখ্যার শাসক প্রবর্তনের অর্থই হল হিন্দুদের শাসন—মুসলমান নেতৃবর্গের এই যুক্তিদ্বারা প্রভাবিত হয়ে লর্ড মর্লি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। জাতীয় কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণের পদ্ধতি ও মুসলমানদের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ এবং একাধিক ভোট দেওয়ার অধিকারের তীব্র নিন্দা করে। যুক্তপ্রদেশের মুসলিমগণ প্রত্যেকে তিনবার ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়। যুক্তপ্রদেশের লোকসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ মুসলমান হলেও তারা আইনসভার বে সরকারী ২৬টি আসনের মধ্যে ৮টি আসন অধিকার করে। সরকারী মতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য এই নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পাঞ্জাব অথবা পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু অমুসলিমদের ক্ষেত্রে এইরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। মাত্র পাঁচবছর পূর্বের স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্ত সমস্ত মুসলমানই ভোটের অধিকার লাভ করে, কিন্তু তিন বছর পূর্বের স্নাতক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, আর. জি. ভাণ্ডারকার প্রমুখ অমুসলিমগণ ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

নির্বাচকমণ্ডলী গঠনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসৃত না হওয়ার ফলে ভারতীয় রাজনীতির জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আইনসভায় প্রবেশ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ভারতের কাউন্সিলে জমিদার শ্রেণীর লোকরাই নির্বাচিত হতে শুরু করে এবং তারা দেশের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে শুরু করে। আইন সম্পর্কেও তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান খুবই সামান্য ছিল এবং নতুন আইন প্রণয়নেও তারা কোনপ্রকার সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কারের সমালোচকগণ মনে করেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় কায়ার পরিবর্তে ছায়া প্রদান করে—"the shadow rather than the substance." "The granted influence and not power and influence is not Government." ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থভাবেই এই সংস্কারকে "কেবলমাত্র চন্দ্রালোক" —"mere moon shine" বলে অভিহিত করেন।

(৭) বিফলতার কারণ :

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কার, সংস্কার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, অন্যান্য আইন প্রণয়ন ও আর্থিক বিষয়ে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ প্রভৃতি প্রমাণ করে যে, ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকারীই ছিল ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট। ফলে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করা

হলেও প্রকৃত শাসন ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নি এবং এই সংস্কারের ব্যর্থতার কারণ সংস্কারের বিভিন্ন শর্তের মধ্যেই নিহিত ছিল। মন্ট-ফোর্ড রিপোর্ট এই সংস্কারের ব্যর্থতার কয়েকটি প্রধান কারণ উল্লেখ করে। (ক) এই সংস্কারে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সম্প্রসারণের কোন ব্যবস্থা ছিল না ;

(খ) প্রাদেশিক অর্থ বিভাগকে কেন্দ্রের অর্থবিভাগ থেকে পৃথক করা হয় নি ;

(গ) সরকারী দপ্তরে ভারতীয়দের প্রবেশের পথ প্রয়োজন অনুসারে উন্মুক্ত করা হয় নি ;

(ঘ) ভারত সরকার স্থানীয় শাসন বিভাগে নিজেদের কতৃত্ব বিন্দুমাত্রও হ্রাস করে নি ;

(ঙ) সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর সহিত কাউন্সিলের সদস্যদের কোন সম্পর্ক ছিল না ;

(চ) বেসরকারী সদস্যদের প্রস্তাবের পক্ষে অথবা বিপক্ষে আলোচনা করা বা স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার এই সংস্কারে স্বীকৃতি লাভ করে নি। ফলে আইনসভার বিতর্ক অর্থহীন ও অবাস্তব হয়ে পড়ে এবং বেসরকারী সদস্যগণ আইন প্রণয়ন অপেক্ষা প্রস্তাব উত্থাপনের দিকে বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেন ; এবং

(ছ) জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জাতীয় চেতনাও বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করার ইচ্ছাও ভারতীয়দের ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কার ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং তাদের অসন্তোষ ও ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব আরও বৃদ্ধি পায়। অল্পদিনের মধ্যেই অন্তঃসারহীন মর্লি-মিন্টো সংস্কারের অসারতা তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

Q 11. How far did the Morley-Minto Reforms succeed in rallying the Moderates" ?

Ans. (১) নরমপন্থীদের সহযোগিতার প্রয়োজন :

জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থীদের উদ্ভব, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হওয়ার ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারতে রাজনৈতিক মিত্রের অনুসন্ধান শুরু করে। ভাইসরয় লর্ড মিন্টো ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। প্রথমতঃ, দেশীয় রাজন্যবর্গকে তিনি ব্রিটিশ সরকারের আরও বেশি অনুগত মিত্রে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য লর্ড লিটনের পরিকল্পিত রাজন্য-পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারত-সচিব লর্ড মর্লি ভাইসরয়ের এই প্রস্তাব নাকচ করেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ব্রিটিশ শাসনের সহিত সহযোগিতা করার জন্য মুসলিমদের সুকৌশলে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। তিনি

তাঁদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী রাজদ্রোহী জাতীয় কংগ্রেস থেকে তাদের দূরে রাখার ব্যবস্থা করেন। নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ গঠনের মধ্যেই তাঁর এই নীতির সাফল্য সূচিত হয়। তৃতীয়তঃ, তিনি ভারতের ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত রাখা ও চরমপন্থীদের শক্তি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবর্গের সহযোগিতা কামনা করেন। সামগ্রিকভাবে তাঁর এই নীতি সীমিতভাবে সাফল্য অর্জন করে। জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর থেকেই নরমপন্থীরা এই সংস্থা পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব লাভ করে। কিন্তু চরমপন্থীদের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নেতৃত্বের উপর নানাপ্রকার আক্রমণ ও আঘাত শুরু হয়। চরমপন্থীদের উদ্ভবের ফলে ব্রিটিশ সরকারও আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই চরমপন্থীদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ও জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবর্গ একযোগে নানা-প্রকার কৌশল গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। নরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা গোখলে, ইংলণ্ডে গিয়ে লর্ড মর্লিকে বঙ্গভঙ্গ রদ করার অনুরোধ করেন। জাতীয় কংগ্রেসের তদানীন্তন স্বাধীনতার আদর্শ অনুযায়ী ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রচলনের জন্যও তিনি ভারত সচিব লর্ড মর্লিকে বিশেষভাবে পরামর্শ দেন। প্রকৃতপক্ষে নরমপন্থীদের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব অব্যাহত রাখার জন্যই এইসব সুযোগ সুবিধাদানের একান্ত প্রয়োজন ছিল। সুরাটের কংগ্রেস অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ শুরু হলে লর্ড মর্লি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সংঘর্ষকে ব্রিটিশ নীতির সাফল্যরূপে দাবি করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করতেন যে, এই সংঘর্ষের পরেই চরমপন্থী দলের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে নানারূপ সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশায় নরমপন্থী নেতৃবর্গ সুরাটের সংঘর্ষের পর চরমপন্থীদের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ মর্লি ও মিণ্টোর ব্যক্তিগত প্রভাবে নরমপন্থী দল এইরূপ আপসহীন মনোভাবের পরিচয় দেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মত সমর্থন করেন ("This uncompromising attitude of the Moderates was due at least to a large extent, to the influence of Morley and Minto")

(২) ১৯০৯ খৃস্টাব্দের সংস্কার :

নরমপন্থীদের সম্পর্কে একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন যে, ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করার জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তারা প্রতারিত হন। মর্লি ও মিণ্টো গোখলের নিকট যে সাহায্য আশা করেন গোখলের পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না। চরমপন্থীদের চিরদিনের জন্য ধ্বংস করা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। মর্লি গোখলে সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিপ্লব পছন্দ না করলেও বিপ্লবী মতবাদে বিশ্বাসীদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তথাপি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য তিনি সর্বদাই চেষ্টা করতেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে মর্লি-মিণ্টো সংস্কার পরিকল্পনা সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসে আলোচনার সময় মুসলিমদের

অহেতুক ভীতি দূর করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা প্রয়োজনীয়, কিন্তু বিপজ্জনক নীতি হিসাবে মেনে নিতে রাজী হন। এই সময় তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, ত্রুটিপূর্ণ হলেও মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের ফলে আইনসভার ভারতীয় সদস্যগণ আর্থিক ও অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের পূর্ণ প্রভাব স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের উপর বিস্তার করার সুযোগ লাভ করবেন। কিন্তু তাঁর এই ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবে পরিণত হয় নি। কিন্তু পরবর্তীকালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মদনমোহন মালব্যের মতো নরমপন্থী নেতৃবর্গ এই সংস্কারের কঠোর সমালোচনা করেন।

(৩) ১৯০৯ খৃস্টাব্দের সংস্কার ও নরমপন্থীদের প্রতিক্রিয়া :

মর্লি-মিণ্টো বিল-আইনে পরিণত হওয়ার পরে নরমপন্থীরা স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করেন যে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবেই পূর্ণ হয় নি। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কোন শর্তই এই সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। লর্ড মর্লি অকপটভাবেই স্বীকার করেন যে, এই সংস্কারে কোনভাবেই ভারত সংসদীয় গণতন্ত্র স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয় নি। "If it could be said that this chapter of reform led directly or necessarily to the establishment of a Parliamentary system in India, I for one would have nothing at all to do with it." ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নরমপন্থী নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসু অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথের মতো সরকার ভারতে স্থাপন করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার নরমপন্থী নেতাদের কোন আবেদন-নিবেদন গ্রাহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না।

মর্লি-মিণ্টো সংস্কারে প্রবর্তিত নির্বাচন পদ্ধতির অনেক নীতিই নরমপন্থী নেতাদের কঠোর সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। মুসলিম সম্প্রদায়কে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দানের বিরুদ্ধে গোখলে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে একটি প্রস্তাবে জাতীয় কংগ্রেস এই সংস্কারের বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে; প্রথমতঃ, ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন; দ্বিতীয়তঃ, মুসলিম সম্প্রদায়কে অযৌক্তিকভাবে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা এবং সংখ্যার অনুপাতে বেশি প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ প্রদান; তৃতীয়তঃ, মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে অন্যায়ভাবে অপমানজনক পার্থক্য নির্ণয়; চতুর্থতঃ, অযৌক্তিক, উদ্দেশ্যমূলক এবং ন্যায়-নীতি লঙ্ঘন করে আইনসভার সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণ; পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন আইন প্রণয়নের দ্বারা শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্পর্কে গভীর অবিশ্বাস প্রকাশ করা এবং ষষ্ঠতঃ, প্রাদেশিক আইনসভায় সরকারী প্রতিনিধিদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে আলাপ-আলোচনার গুরুত্ব অস্বীকার করার উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্যরূপে গোখলে সরকারী সদস্যদের অবস্থার কথা মর্মে মর্মে অনুভব করে মন্তব্য করেন যে, "We, of the present generation of India can hope to serve our country by our failures."

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কারের দোষ-ক্রটিসমূহ দূর করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারের বিবেচনার জন্য জাতীয় কংগ্রেস আরও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে লেফটেন্যান্ট গভর্নর শাসিত যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং ব্রহ্মদেশে শাসন পরিষদ গঠনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান হয়। নির্বাচন প্রথার ক্রটি দূর করে সকল শ্রেণীর লোকদের আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন করা হয়। আইনসভার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধিরও প্রস্তাব পেশ করা হয়। এই প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, অন্যান্য প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা হলেও পাঞ্জাব ও পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ অমুসলিমদের স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি।

(৪) **উপসংহার :**

জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গের উপরি-উক্ত সমালোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মর্লি ও মিণ্টোর সুচতুর কৌশলে নরমপন্থীদের সহযোগিতা লাভ করার প্রচেষ্টা খুব সাফল্য অর্জন করে নি। নরমপন্থীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস তখনও অবিচল ছিল। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি লর্ড এস. পি. সিংহ সভাপতির ভাষণে বলেন যে, ইংলণ্ডের সাহায্য ও পরিচালনার দ্বারাই ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হতে পারে।

কিন্তু অল্পদিন পরেই পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু, জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যুগ্ম পরিকল্পনা এবং ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির অবির্ভাবের ফলে নতুন রাজনৈতিক যুগের সূচনা হয়। মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টেও ভারতের এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা এবং মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের ব্যর্থতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। এই প্রসঙ্গে মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্ট মন্তব্য করে (Morley-Minto scheme) "ceased in the brief space of ten years' time to satisfy the political hunger of India." তবে মর্লি-মিণ্টো সংস্কার প্রকৃতপক্ষে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ভারতবাসীদের 'রাজনৈতিক ক্ষুধা' (political hunger) নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়, মর্লি-মিণ্টোর সংস্কার সম্পর্কে চরমপন্থীদের অসন্তোষ ও কঠোর সমালোচনাই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

Q. 12. Locate the responsibility for the introduction of communal electorate under Morley Minto Reforms

Ans (১) **মিণ্টো ও অন্যান্য ব্রিটিশ কর্মচারীদের মনোভাব :**

ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল লর্ড মিণ্টোর অধীনস্থ ব্রিটিশ কর্মচারিগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের সংরক্ষণশীল ও গোঁড়াপন্থীদের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যরূপে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রিটিশ কর্মচারীদের এই মনোভাব ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা অক্টোবর থেকে শুরু করে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হওয়া

পর্যন্ত অবিচল থাকে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের অস্থায়ী লেফটেন্যান্ট গভর্নর মিস্টার হ্ল্যাক এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী থেকে নির্বাচিত মুসলিম প্রতিনিধিগণ কখনই মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিনিধিরূপে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল কমিটির সদস্যগণ 'ইলেকটোরাল কলেজের' মাধ্যমে মুসলিম প্রতিনিধিদের নির্বাচনের জন্য একটি প্রস্তাব সুপারিশ করেন। কিন্তু মিন্টোর সরকার এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। মিন্টো ভারত সচিব মর্লিকে এই প্রসঙ্গে জানান যে, গরিষ্ঠ হিন্দুদের সমর্থনে হিন্দুদের দ্বারা মনোনীত মুসলিম প্রার্থীই নির্বাচনে জয়লাভের সুযোগ পাবে, ফলে সেই মুসলিম প্রার্থী কোনক্রমেই মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে পরিচিত হওয়ার যোগ্য নয়। তিনি মর্লিকে স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, "The old fashioned Mohammadans .. will be left in the lunch if opportunity is given to the election of manipulated Hindu voters to secure seats for a younger Mahammedan generation."

মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রচলন করার নীতি গ্রহণ করে ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের ধারণা হয় যে, তাঁরা ভারতের বাস্তব অবস্থাকেই স্বীকৃতি প্রদান করেন। যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের মুসলিম সম্প্রদায় যথেষ্ট উন্নত ছিল এবং স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও তাঁদের প্রচুর প্রভাব ছিল। ব্রিটিশ সরকারও এই দুটি প্রদেশের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রকাশ করে। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায় ছিল একেবারেই অনুন্নত। ব্রিটিশ সরকার নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য ও বিদ্বেষের কথা বিশেষভাবে প্রচার করতে শুরু করে। পাঞ্জাবের সরকার দাবি করে যে. ঐ প্রদেশের রাজনীতি যথেষ্ট সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা প্রভাবান্বিত। সুতরাং নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়নের নীতি গ্রহণ করাই সরকারের উচিত। উত্তর প্রদেশের সরকার এই অভিমত প্রকাশ করে যে, শ্রেণীভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর পার্থক্য বৃদ্ধি পাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কাই স্বাভাবিক ; কিন্তু যুক্তপ্রদেশের রাজনীতিতে বর্তমানে এই পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান এবং আপাততঃ এই পার্থক্য দূর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত প্রদেশের সরকার এইরূপ মতও প্রকাশ করে যে, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হলে হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য অনেকাংশে দূর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

(২) মর্লির উপর রাজনৈতিক চাপের সৃষ্টি :

ডক্টর এ ত্রিপাঠির মতে ব্রিটিশ রাজকর্মচারিগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ কোন নীতি গ্রহণের পক্ষে লর্ড মিন্টোর উপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেন। এই ব্যাপারে মিন্টোর হেয়ারের মতো মুসলিম দরদী রাজকর্মচারীরা বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। লর্ড মিন্টোও এই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী কোন শক্তিকে জাগ্রত করে তোলার কথা গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন। আরুণ্ডেল কমিটির নিকট তাঁর মতামত প্রকাশ করার সময় তিনি বলেন যে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের কথা বিশদভাবে চিন্তা করেই

প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা উচিত। উদারপন্থী ভারতসচিব লর্ড মর্লি প্রথম মনে করেন যে, মিণ্টোর প্রস্তাবিত সীমিত নির্বাচন প্রথা নরমপন্থীদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হবে। কিন্তু স্যার আমীর আলির নেতৃত্বে মুসলিম প্রতিনিধিবর্গ লণ্ডনে উপস্থিত হয়ে মর্লির সহিত দেখা করার ফলে অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয় এবং মর্লি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের সংরক্ষণশীল দলের একদল সদস্যের এবং প্রভাবশালী দৈনিক টাইমস্ পত্রিকার সহায়তায় মুসলিম প্রতিনিধিগণ মর্লির উপর প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে। মুসলিম প্রতিনিধিগণ মর্লিকে যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। মিণ্টোও মর্লির উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে শুরু করেন। অ্যাণ্ট ফ্রেজার ও অ্যাডমসনও মিণ্টোর প্রচেষ্টা নানা যুক্তিসহকারে সমর্থন করার চেষ্টা করেন। ভারতের ব্রিটিশ সরকার সংরক্ষণশীল মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বের জন্যই মিণ্টোর পক্ষ অবলম্বন করে।

ইংলণ্ড ও ভারত উভয় দেশের প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের চাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে ফ্রেজার মিণ্টোকে জানান যে, মর্লি 'ইলেকটোরাল কলেজ' গঠনের জন্য দৃঢ়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী নন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর আগা খান, বিলগ্রামী, আমীর আলি প্রভৃতি মুসলিম নেতৃবর্গ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করার জন্য লর্ড মর্লিকে অনুরোধ করেন।

(৩) মর্লির দায়িত্ব :

সমস্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ডক্টর এ. ত্রিপাঠি মন্তব্য করেন যে, যুক্ত 'ইলেক-টোরাল কলেজের' প্রস্তাব প্রত্যাহার করার জন্য মর্লিই প্রকৃতপক্ষে দায়ী ছিলেন। ভারত সচিবের পদে মর্লির নিয়োগের ফলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোখলের মতো নরমপন্থী নেতাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। ভারতের শাসন বিভাগর সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে তিনি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আরও ব্যাপক এবং বাস্তব-সম্মত সাংবিধানিক সংস্কার সাধন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ভারতের ব্রিটিশ রাজ-কর্মচারী এবং ভারতের মুসলিম নেতৃবর্গের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। নিজের উদার মতের দ্বারা তাঁর বিরুদ্ধপক্ষকে প্রভাবিত না করে তিনি তাদের সঙ্কীর্ণ মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। আমীর আলি ও আগাখানের মতো মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং লর্ড মিণ্টোর ন্যায় ব্রিটিশ ভারতীয় আমলাবৃন্দ তাঁর মত পরিবর্তন করতে সমর্থ হন। নিজস্ব মতামত পরিত্যাগ করতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্যক্তিত্বের অভাবই ছিল তাঁর এই দুর্বলনীতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। গ্লাডস্টোনের উদারতাপূর্ণ ঐতিহ্য রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

(৪) উপসংহার :

ডক্টর পি. হার্ডির মতে ব্রিটিশ সরকার বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করার নীতিকে

সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টায় মুসলিমদের সপক্ষে আনয়ন করার উদ্দেশ্যে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করার ব্যবস্থা করে। এই ব্যাপারে মুসলিম নেতৃবর্গও ইংরেজ শাসকদের সাহায্য করতে প্রস্তুত হন। মিন্টোও মর্লিকে জানান যে, মুসলিম "নেতৃবর্গ নীরবতা অবলম্বন করলেও তিনি খুব দৃঢ়তার পরিচয় দেন।" মর্লি মিন্টোর মতবাদ মেনে নিয়ে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করতে সম্মত হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম নেতাদের তাঁর সাফল্যের কথা জানাবার ব্যবস্থা করেন। ভারতের শাসন-দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকা পর্যন্ত যুগ্ম অথবা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। পূর্বঙ্গ ও আসামের অস্থায়ী মুখ্যসচিব এই সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ভারতের শাসন দায়িত্ব ব্রিটিশের হস্তে ন্যস্ত থাকা পর্যন্ত পৃথক বা স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা সম্পূর্ণ মূল্যহীন। ডক্টর হার্ডির মতে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল, কারণ তারা জানত যে, অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের সৃষ্টির অর্থই হল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পরিসমাপ্তি। সুতরাং তাদের পক্ষে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করে নিজেদের কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করাই ছিল খুব স্বাভাবিক। মুসলিম নেতৃবর্গ এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাদের সাহায্য করে এবং তারা নিজেদের স্বার্থেই মুসলিম সম্প্রদায়কে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে।

পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করার ব্যাপারে লর্ড মর্লির দায়িত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তিনি এই নীতির কুফল সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সতর্ক ছিলেন। কারণ তিনি এই সম্পর্কে লর্ড মিন্টোকে জানান, 'Please remember in granting separate electorate, we are sowing dragon's teeth and the harvest will be better." লর্ড মর্লির এই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রকৃত স্রষ্টা লর্ড মিন্টো। তবে লর্ড মর্লি ও ব্রিটিশ কর্মচারীবৃন্দ তাঁর এই নীতি সমর্থন করে তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করতে সাহায্য করেন। মুসলিমদের আরও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য মিন্টো মর্লিকে অনুরোধ করলে মর্লি তাঁর উত্তরে লর্ড মিন্টোকে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জানালেন, "I won't follow you again in our Mohammadan dispute. Only I respectfully remind you again that it was your early speech about their extra claims that started (the Muslim) here. I am convinced my decision was best."

Q. 13. What led to the repeal of the partition of Bengal? Was the King Emperor in any way responsible for it?

Ans. (১) দিল্লীর দরবারের প্রয়োজনীয়তা :

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজকীয় দরবারে ইংলণ্ডেশ্বর ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের এক ঘোষণা অনুযায়ী বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার করা হয়। এই ঘোষণার

ফলে বঙ্গ-ভঙ্গ আবার যুক্ত বঙ্গে পরিণত হয়। দিল্লী দরবারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের সঙ্গে ইংলণ্ডেশ্বরের সম্পর্ক পুনরায় সৌহার্দপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা। ব্রিটিশ সরকারের ধারণা হয় যে, দীর্ঘ কয়েক বছরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে ভারতীয়দের মনে ইংলণ্ডেশ্বরের প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন এবং ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে তাঁদের ধারণা যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি পুরাতন আস্থা পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে দ্রুত কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অপরদিকে চরমপন্থী নেতৃবর্গ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বদাই কঠোর সমালোচনায় মুখর এবং ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত কঠোর দমনমূলক নীতির দ্বারা রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ দূর করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে বাংলাদেশের মেদিনীপুর ও পূর্ববঙ্গে সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রচণ্ড অবনতি দেখা দেয়।

(২) মিণ্টোর নীতি ঃ

লর্ড কার্জনের উত্তরাধিকারীরূপে লর্ড মিণ্টো ভারতের শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ভারতে এসেই জাতীয়তাবাদী বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দমন করার জন্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেন। লর্ড কার্জনের অনুসৃত কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। নানারূপ রাজনৈতিক অশান্তির প্রধান উৎস বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করে শাসিতদের শুভেচ্ছা অর্জন করার চেষ্টা করেন। তবে ব্রিটিশ সরকারের কোন প্রকার দুর্বলতা অথবা স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিক তিনি সতর্ক দৃষ্টি দেওয়ারও পক্ষপাতী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে লর্ড কার্জনের মতো তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তিকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেন যে, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অনেক গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পায় এবং দমনমূলক নীতির পরিবর্তে রাজনৈতিক উপায়ে এই আন্দোলনের মোকাবিলা করাই ব্রিটিশ সরকারের একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি চরমপন্থীদের শক্তি খর্ব করার জন্য নরমপন্থীদের নানাভাবে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করার চেষ্টা করেন। বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কেন্দ্র করেই চরমপন্থীদের শক্তি ও জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং লর্ড মিণ্টো বঙ্গ ভঙ্গ রদ করে চরমপন্থীদের শক্তি হ্রাস করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

(৩) বঙ্গ-ভঙ্গ সম্পর্কে ইংলণ্ডের রাজনীতিবিদদের ধারণা ঃ

ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দল কখনও বঙ্গ ভঙ্গ পছন্দ করতে পারে নি। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড মর্লি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, (the Partition) "Was and remains undoubtedly an administrative operation which went wholly and decisively against the wishes of most of the people concerned." ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড মর্লি হাউস

অক লর্ড সে স্বীকার করেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার না করার জন্য তাঁর বন্ধু বান্ধবগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। কিন্তু ভারতের ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় লর্ড মর্লি বঙ্গভঙ্গ রদ করতে ভয় পান। তাছাড়া তিনি মনে করেন যে, বঙ্গ ভঙ্গ রদ করা হলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের ধারণা জন্মাবে যে, উদারনৈতিক ভারত সম্পর্কে তারা তাদের মত পরিবর্তন করতে প্রস্তুত। সুতরাং বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিক্রিয়া সম্যক রূপে উপলব্ধি না করে তিনি ব্রিটিশ সরকারের নীতি পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

(8) ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দল ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ থেকেই বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে সরকারী এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য তারা একটি উপযুক্ত সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে দীর্ঘ প্রত্যাশিত এই সুযোগ পাওয়া গেল। লর্ড হার্ডিঞ্জ নতুন ভাইসরয় হিসাবে ভারতের শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ইতিমধ্যেই মর্লি মিণ্টো সংস্কার কার্যকরী করা হয় এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনও বহুলাংশে স্তিমিত হয়ে পড়ে। সুতরাং ওই অনুকূল পরিবেশে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ ব্রিটিশ সরকারের দুর্বলতা অপেক্ষা ন্যায়পরায়ণতার প্রতীকরূপেই ভারতীয়দের নিকট পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে। বঙ্গ ভঙ্গ প্রত্যাহারের সঙ্গেই কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মোগলদের রাজধানী দিল্লীতে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী স্থাপন করে ইংরেজ শাসকগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি বিধানের এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করেন।

(৫) হার্ডিঞ্জের নীতি ঃ

লর্ড হার্ডিঞ্জ গভর্নর জেনারেলরূপে ভারতে পদার্পণ করার পূর্বেই বঙ্গ-ভঙ্গ রদ ও রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত লণ্ডনে গৃহীত হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় লণ্ডনেই উপস্থিত ছিলেন। ভারতে পদার্পণ করার পর তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখীন হন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আন্দোলন স্থগিত রেখে ব্রিটিশ সরকারের নিকট একখানি স্মারকলিপি পেশ করতে পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের পঁচিশটি জেলার মধ্যে আঠারোটি জেলার প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরসহ যথারীতি একখানি স্মারকলিপি অবিলম্বে পেশ করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই স্মারকলিপিতে উপস্থাপিত অনেক যুক্তিই সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করার ন্যায়সঙ্গত কারণরূপে স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদ ও দিল্লীতে রাজধানী পুনঃস্থাপন সম্পর্কে লর্ড হার্ডিঞ্জের বিবরণ থেকে প্রকৃত ঘটনার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হার্ডিঞ্জ বঙ্গ-ভঙ্গ সম্পর্কে নীতি পরিবর্তন করার জন্য ভারত সচিব Lord Crewe-র নিকট থেকে একটি বার্তা পান। বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ভারতীয় নেতাদের সন্তুষ্টিবিধান করাই ছিল Lord Crewe র প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁর প্রস্তাব ছিল ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হাতে বাংলাদেশের শাসনদায়িত্ব অর্পণ করা এবং কলকাতা ও

পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ভাইসরয়ের প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তন করা। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দায়িত্ব লর্ড ক্রুর প্রস্তাব অনুযায়ীই সম্রাট পঞ্চম জর্জের উপর অর্পণ করা হয়।

লর্ড হার্ডিঞ্জও মনে করেন যে, অন্যায় এবং অসঙ্গতভাবে বঙ্গ-ভঙ্গ করে যে রাজনৈতিক অশান্তির সৃষ্টি করা হয় বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করেই তা দূর করা সম্ভব। বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের সর্বত্র চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং বাংলাদেশের সরকারের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বাংলাদেশে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপনের জন্যই কোন একটি দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার জন জেনকিনস্ ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জুন লর্ড হার্ডিঞ্জকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত করার অনুরোধ করে এক বার্তা পাঠান। তাঁর এই বার্তায় তিনি বলেন যে, "The transfer of the capital from Calcutta to Delhi would be a bold stroke of statesmenship which would give universal satisfaction and mark a new era in the history of India." লর্ড হার্ডিঞ্জ স্যার জেনকিনসের প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে জুলাই একান্ত গোপন রাখার শর্তে লর্ড ক্রুকে সমস্ত বিষয়টি বিশদভাবে জানান। ৭ই অগাস্ট লর্ড ক্রু ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রস্তাব কার্যকরী করার সম্মতি দেন এবং তাঁকে জানান, "entire support and full authority proceed"

ইতিমধ্যে লর্ড ক্রু পঞ্চম জর্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত পরিকল্পনা বিশদভাবে তাঁর কাছে প্রকাশ করেন। পঞ্চম জর্জও সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং তিনি স্বয়ং এই ঘোষণা করতে সম্মত হন। লর্ড ক্রু তারপর লর্ড মর্লি এবং লর্ড অ্যাসকুইথের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা উভয়ই ক্রুর পরিকল্পনার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। তবে এই পরিকল্পনার গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজন সম্বন্ধে সকলেই সম্মত হন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ্যে দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ কর্তৃক এই পরিকল্পনার কথা ঘোষিত হওয়ার পূর্বে ভারতের মাত্র ১২ জন ব্যক্তি এই পরিকল্পনার কথা জানতেন।

(৬) **সমালোচনা :**

বঙ্গ-ভঙ্গ রদ ব্যবস্থা ভারতে ও ইংলণ্ডে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। লর্ড কার্জন এই নীতিকে সংবিধান-বিরোধী বলে বর্ণনা করেন। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য লর্ড মিণ্টো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। তিনি মনে করেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের নিকট আত্মসমর্পণ করে ব্রিটিশ সরকার অনুগত মুসলিমদের স্বার্থ বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। হাউস অফ লর্ডসের পক্ষ সমর্থন করে সমালোচকদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করতে সমর্থ হন। তবে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করা হলেও পুরাতন বঙ্গদেশের সীমানা পুনরুদ্ধার করা হয় নি—নতুন করে বঙ্গদেশের নামে একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। এই প্রসঙ্গে P. E. Robert-এর মন্তব্য

বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। "These changes were striking and dramatic.... The re-union of Bengal was said to be not a reversal of the partition but a rearragement after experience—a statement hardly consistent with facts."

(৭) জর্জের দায়িত্ব :

ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জ বঙ্গ-ভঙ্গ রদের প্রস্তাবক বা উদ্যোক্তা নন। ইংলণ্ডের সংবিধান অনুযায়ী রাজা রাজত্ব করেন; কিন্তু শাসন করেন না। শাসন বিভাগের তিনি প্রধান হলেও তিনি নামমাত্র ক্ষমতার অধিকারী। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে Royal Titles Act অনুযায়ী ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী ভারতের সম্রাট উপাধি লাভ করলেও শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে তাঁর ক্ষমতার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নি। ভারতের শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করারও তাঁর কোন অধিকার ছিল না। ভারতীয়দের মনে অহেতুক শ্রদ্ধা ও ভক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের রাজাকে ভারতে সম্রাটরূপে ঘোষণা করা হয়। রাজতন্ত্রের প্রতি অনুগত ভারতীয়গণ ও ইংলণ্ডের রাজাকেই নিজেদের প্রধান শাসকরূপে মনে করতে অভ্যস্ত ছিল। সুচতুর ব্রিটিশ সরকার নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও ভারতীয়দের মনস্তুটির জন্য ইংলণ্ডের রাজার ব্যক্তিগত প্রভাব রাজনীতিতে ব্যবহার করে ভারতের অশান্তি ও শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা দূর করার চেষ্টা করে। বঙ্গভঙ্গ রদ অথবা রাজধানী স্থানান্তরিত করার বিষয়ে পঞ্চম জর্জের ব্যক্তিগত কোন ভূমিকাই ছিল না।

Q 13. Account for the decline of the extremist movement.

Ans. (১) সরকারী নীতি :

জাতীয় কংগ্রেসের একদল নেতার আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে চরমপন্থীমতবাদের প্রথম সূত্রপাত। কিন্তু পরবর্তীকালে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নতুন জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি এবং ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির ফলে চরমপন্থীদের শক্তি ও জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত চরমপন্থী দল ভারতের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাদের এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং তাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাই প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাদের এই ব্যর্থতার কারণ একাধিক। প্রধানতঃ চরমপন্থীদের আন্দোলন দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার কঠোর ও নির্যাতনমূলক বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে নানাপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সভা-সমিতি নিষিদ্ধকরণ, আন্দোলনকারীদের উপর নানাপ্রকার নির্যাতন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং বর্বরোচিতভাবে কারাবাসের অন্তরালে চরমপন্থীদের নির্বাসন দণ্ড বিধান করে ব্রিটিশ সরকার এই বিপ্লবী আন্দোলনকে চিরদিনের জন্য নির্মূল করার চেষ্টা করে। তবে একমাত্র সরকারী নীতির ফলেই এই আন্দোলনের শক্তি হ্রাস পায় নি—এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ার আরও অনেক কারণের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

(২) বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা :

বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্যের পৃষ্ঠপোষকতার নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এই স্বদেশী আন্দোলন আন্তরিকতার সহিত অনুসরণ করা হয় নি। বিশেষতঃ নরমপন্থী নেতাদের প্রভাবান্বিত প্রদেশসমূহে স্বদেশী আন্দোলনের উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। স্বদেশী পণ্যের অভাবও এই আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতীয় শিল্পের তখন শৈশব অবস্থা, তাদের পক্ষে বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব ছিল। গুণগতভাবেও বিদেশী পণ্য ছিল অনেক উন্নত মানের। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ক্রেতাগণ বিদেশী পণ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করত। ক্রেতাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ভারতে গড়ে ওঠা নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো আরও সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানই তাদের উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

অপরদিকে স্বদেশী পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অনেক স্থানেই জাতীয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ অনেক সময় জোর করেই ক্রেতাদের স্বদেশী পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য করে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে শুরু করে। বিশেষতঃ মুসলিম সম্প্রদায় স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। ফলে বিভিন্নস্থানে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথও বলপূর্বক স্বদেশী আন্দোলনকে সফল করার নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনার পদ্ধতি সমগ্র ভারতে কার্যকরী করার জন্য প্রচুর অর্থ, সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া এই শিক্ষাপদ্ধতির পক্ষে ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি বানচাল করাও দুঃসাধ্য ছিল। ফলে বিভিন্নস্থানে কয়েকটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পত্তন হলেও সামগ্রিকভাবে দেশের প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য ছিল।

(৩) মার্কস্‌বাদী ব্যাখ্যা :

সোভিয়েত ও মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক কোমারভ এবং লেভকোভস্কি চরমপন্থী আন্দোলন ধীরে ধীরে ধ্বংস হওয়ার একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁরা মনে করেন যে, "ধনতন্ত্রবাদের তীব্রতা ও ঔপনিবেশিক শোষণের" ফলেই চরমপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তাঁদের মতে চরমপন্থী নেতৃবর্গ সাধারণতঃ বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন এবং ব্রিটিশ মূলধন ও দেশীয় ভূস্বামীদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। চরমপন্থীদের তাঁরা অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন এবং এই সব ব্যক্তিরা কৃষিপণ্যের লভ্যাংশ কুসীদবৃত্তিতে লগ্নী করতেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপরও তাদের একাধিপত্য ছিল।

অপরদিকে চরমপন্থীদলের নেতৃবর্গ ছিল সাধারণতঃ সামান্য জোতদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, স্বল্প বেতনের কেরানী, শিক্ষক, শিল্পী, কারিগর এবং ছাত্র প্রভৃতি। এই শ্রেণীবৈষম্যই তাদের চিন্তাধারার পার্থক্যের মূল কারণ।

কিন্তু মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকদের এই বিশ্লেষণ সাধারণভাবে সত্য নয়। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের অনেক বড় বড় ভূ-স্বামী চরমপন্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ছোট ছোট জোতদারগণ ব্রিটিশ আমলে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির ফলে মোটামুটিভাবে স্বচ্ছলতার মধ্যেই জীবন-যাপন করার সুযোগ পেতেন। সুতরাং তাঁদের পক্ষে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করে চরমপন্থীদলের পৃষ্ঠপোষকতা করার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর ও পশ্চিমবঙ্গের হরিনাভি অঞ্চলে অভিজাতশ্রেণীর ব্যক্তিদের বসবাস। এই দুটি অঞ্চলই অনুর্বর এবং জীবিকা সংস্থানের সম্ভাবনাও খুব কম। কিন্তু এই দুটি স্থানেই চরমপন্থীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র গড়ে ওঠে। সুতরাং শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই চরমপন্থী আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এইরূপ মত পোষণ করার বিশেষ কোন সঙ্গত কারণ নেই। পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অশান্তি সৃষ্টি হলে রাওয়ালপিণ্ডির জনসভায় যাঁরা উপস্থিত হন তাঁদের বেশি সংখ্যকই ছিলেন আইনজীবী। প্রকৃতপক্ষে চরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শ ও চিন্তাধারার উপর সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ খুব কম গুরত্ব আরোপ করেন এবং তার ফলে তাঁদের এই বিশ্লেষণ ত্রুটিপূর্ণ এবং একদেশদর্শী। দেশপ্রেমের এক অদ্ভুত আদর্শের দ্বারা চরমপন্থী নেতৃবর্গ উদ্বুদ্ধ হন। অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা তাঁদের আদর্শের উপর প্রভাব বিস্তার করলেও, দেশপ্রেমই ছিল তাঁদের প্রেরণার প্রধান উৎস।

(৪) হিন্দুধর্ম ও বিপ্লবী মতবাদের অভাব :

চরমপন্থীদের বেশি সংখ্যক ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান এবং পেশায় ছিলেন কেরানী, শিক্ষক প্রভৃতি। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের দ্বারা বিপ্লব সংঘটিত করা প্রায় অসম্ভব। চরমপন্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক বা কৃষকদের যুক্ত করা সম্ভব হয় নি। কারণ এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের স্বার্থ জড়িত ছিল না এবং এই আন্দোলন জয়যুক্ত হলেও তাদের কোন বিশেষ সুযোগ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। অপরদিকে আন্দোলনের প্রধান দুই নেতা তিলক এবং অরবিন্দ ঘোষ ছাত্র সমাজের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। হিন্দুধর্মের ভাবাবেগের উপরও তাঁরা মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেন। কিন্তু ছাত্রসমাজের শক্তি প্রসংশনীয় হলেও তাদের ধৈর্য অত্যন্ত সীমিত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও তা অত্যন্ত দুর্বল। অপরদিকে হিন্দুধর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের এই আন্দোলনের উপর বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত, গীতার শ্লোক এবং কালীর আরাধনা ও হিন্দুদের ঐতিহ্যের কাহিনী মুসলিমদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে শুরু করে।

(৫) উপসংহার :

চরমপন্থীদের কার্যকলাপের পরিকল্পনা সংগোপনে গৃহীত হত এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে

কার্যকরী করার ব্যবস্থা ছিল। তাদের আন্দোলন কখনও প্রকাশ্যরূপ গ্রহণ করে নি ফলে জনসাধারণ এই আন্দোলনের অংশীদার হতে পারে নি অথবা তাদের সঙ্গে এই আন্দোলনের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে ওঠে নি। চরমপন্থীদের প্রত্যিটি ঘাঁটিই ছিল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র। সোভিয়েত ঐতিহাসিকদের মতে ব্যক্তিগতভাবে চরমপন্থীদলের সদস্যদের আক্রমণ রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং তাদের এই কার্যকলাপের ফলে চরমপন্থী আন্দোলন কখনও গণ-আন্দোলনে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায় নি। ডক্টর সুমিত সরকারের মতে, চরমপন্থীরা ছিলেন বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন স্বপ্নময় জগতের অধিবাসী। ফলে ব্যাপক আন্দোলনের সম্ভাবনাহীন চরমপন্থী মতবাদকে ধ্বংস করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সহজতর হয়ে ওঠে। উপদলীয় সংঘর্ষও চরমপন্থীদের শক্তি হ্রাস করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। অরবিন্দের রাজনীতি থেকে বিদায়, লর্ড কার্জনের ভারত ত্যাগ, লর্ড মর্লির নরমপন্থীদের প্রতি তোষণনীতি এবং বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহারের ফলে চরমপন্থীদের শক্তি ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় রাজনীতি একটি নতুন পথ গ্রহণ করে এবং চরমপন্থীদের সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়।

Q. 14. Narrate briefly the political condition of India after 1909 which led to Congress-Muslim League Pact of 1916.

Ans. (১) ভূমিকা :

নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগের গঠন এবং মর্লি-মিন্টো সংস্কার প্রবর্তনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা দেয়। নরমপন্থীদের ধারণা হয় যে, তাদের সামান্য চাহিদা পূরণ করতে ব্রিটিশ সরকার সম্মত হয় নি। গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতো নরমপন্থী নেতৃবর্গও ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়-পরায়ণতা ও গণতান্ত্রিক উদারতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেন। মর্লি-মিন্টো সংস্কার বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রায় উনষাট শতাংশ আইন বিনা আলোচনায় গৃহীত হয়।

(২) মুসলিম লীগ :

মর্লি-মিন্টো সংস্কার অনুসারে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন প্রথার প্রচলন শুরু হলে মুসলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধি হতে শুরু করে। যদিও নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিচালিত ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসলিম লীগ একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। ব্যক্তিগত মর্যাদা ও প্রভাবের ফলেই মুসলিম প্রার্থীগণ আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন—মুসলিম লীগের সদস্যরূপে তাঁরা মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট বিশেষ কোন সুযোগ লাভ করেন নি।

(৩) বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার :

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজকীয় দরবারে ইংলণ্ডের রাজা ভারতের সম্রাট পঞ্চম জর্জের এক ঘোষণা অনুযায়ী বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার করা হয় এবং বঙ্গ-ভঙ্গকে আবার যুক্তবঙ্গে পরিণত করা হয়। ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো তাঁর পূর্বসূরী লর্ড কার্জনের অনুসৃত কঠোর দমনমূলক নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাছাড়া লর্ড কার্জন ভারতের নব জাগ্রত জাতীয়তাবাদী শক্তির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করতেন না, কিন্তু লর্ড মিণ্টো ভারতের এই জাতীয়তাবাদ শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বন্ধ করে চরমপন্থীদের শক্তি হ্রাস করার জন্যও বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। দিল্লী দরবার অনুষ্ঠান এবং বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহারের প্রস্তাব সম্ভবতঃ লণ্ডনেই প্রথম গৃহীত হয়। ভারত সচিব লর্ড মর্লি ও তাঁর পদের উত্তরাধিকারী লর্ড ক্রু উভয়ই বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতিমধ্যে লর্ড মিণ্টোর স্থলে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি ভারতে পদার্পণ করেই বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি এই আন্দোলন কঠোর আইন ও দমনমূলক অত্যাচারের দ্বার বন্ধ না করে আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি স্মারকলিপি পেশ করতে পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলার প্রতিনিধিমূলক ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত এই স্মারকলিপি যথারীতি ভাইসরয়ের নিকট পেশ করা হয়। ব্রিটিশ সরকার মুসলিম নেতাদের সঙ্গে কোনপ্রকার পরামর্শ না করেই বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে মুসলিম নেতৃবর্গ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের এই নীতিকে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষী ইংরেজদের আন্দোলনকারীদের নিকট দুর্ভাগ্যজনক আত্মসমর্পণ বলে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন।

(৪) চরমপন্থীদের পতন :

বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হওয়ার ফলে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপিত হয়। অপরদিকে এই সময় থেকেই চরমপন্থীদের শক্তি হ্রাস হতে শুরু করে। বলপূর্বক বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার চেষ্টার ফলে সাধারণ লোক বিশেষতঃ মুসলমানগণ আন্দোলনকারীদের বিরোধিতা শুরু করে। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি, কালী ও গীতার প্রতি সীমাহীন আকর্ষণও মুসলিমদের অসন্তুষ্ট করে তোলে। অরবিন্দের রাজনীতি পরিবর্জন, সরকার কর্তৃক কার্জনের অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ, লর্ড মিণ্টোর নরমপন্থীদের প্রতি তোষণনীতি এবং বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার চরমপন্থীদের শক্তি ও জনপ্রিয়তা খর্ব করতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

(৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব :

ইয়োরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয় এবং ভারতীয়দের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে মিসেস অ্যানি বেসান্ত হোমরুল লীগ গঠন করেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে চরম ও নরমপন্থীদের বিরোধের অবসান ঘটে এবং উভয় দলের নেতৃবর্গ পুনরায় একযোগে আন্দোলন করতে সম্মত হন। মুসলিম নেতৃবর্গও এই সময় হিন্দু নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হন। ইয়োরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়াই ভারতের মুসলিম নেতৃবর্গের মত পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। ১৯১২-১৩ খ্রীস্টাব্দের বলকান যুদ্ধ ইয়োরোপের তুরস্কের শক্তি ধ্বংসোন্মুখ করে তোলে। এই যুদ্ধের সময় ইয়োরোপের খ্রীস্টান শক্তিসমূহ তুরস্কের বিরুদ্ধে যে নীতি গ্রহণ করে তাকে ভারতীয় মুসলমানগণ মধ্যযুগের ধর্মযুদ্ধের সহিত তুলনা করতে শুরু করে। ভারতের মুসলমানগণ তুরস্কের খলিফাকে মুসলিম জগতের অধিকর্তা বলে মনে করে। সুতরাং তাঁর প্রতি ইয়োরোপের খ্রীস্টান রাজ্যগুলোর ব্যবহারে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধেও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। বিশেষতঃ তুরস্কের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার কোন-প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সম্মত না হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। এই ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবই মুসলিম সম্প্রদায়কে জাতীয় কংগ্রেসের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে প্ররোচিত করে। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের সংগঠন ও সংবিধানেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। মুসলিম লীগের তরুণ সদস্যগণ মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে সংগঠনের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম লীগের সংবিধান সংশোধিত হয় এবং আগা খান এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সময় মুসলিম লীগ তার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি পরিত্যাগ করে এবং ঘোষণা করে যে, ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জন করাই এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়া মুসলিম লীগ এই সময় বেশ কয়েক বছর জাতীয় কংগ্রেসের একই স্থানে এবং একই তারিখে তাদের বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করার ব্যবস্থা করে।

(৬) লক্ষ্ণৌ চুক্তি ঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক ইংলণ্ডের বিপক্ষে যোগদান করে। ফলে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের দুই প্রধান নেতা মোহম্মদ আলি ও শৌকত আলি ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী দলের মুখপাত্র। সুতরাং যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার এই দুই নেতাকে অন্তরীণ রাখার ব্যবস্থা করে। মুসলিম লীগ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক পরিবর্তন সাধনের জন্য এই সময় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে শুরু করে। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ শহরে একই সঙ্গে মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চারশ মুসলিম প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন। এই অধিবেশনের সময় তরুণ মুসলিম নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত একটি রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তিই 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' নামে পরিচিত।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি অনুসারে আগামী দিনের সম্প্রসারিত প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম

সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে একটি সূত্র গৃহীত হয়। জাতীয় কংগ্রেস মুসলিমদের সংরক্ষিত আসন ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশ যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আইন সভায় নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যরা যথাক্রমে ৩০, ২৫, ৩৩ ও ১৫ শতাংশ অধিকার করার সুযোগ পাবে। মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের আইনসভায় তারা যথাক্রমে ৪০ ও ৫০ শতাংশ সদস্যপদ অধিকার করার সুযোগ পাবে।

(৭) লক্ষ্ণৌ চুক্তির গুরুত্ব ঃ

মুসলিম লীগের তরুণ নেতা মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্ কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনার সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তি সম্পাদিত হয় যুক্তপ্রদেশের তরুণ মুসলিম নেতৃবর্গ এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে। এই চুক্তির ফলে সংখ্যাগুরু মুসলিম প্রদেশগুলোর স্বার্থে, সংখ্যালঘু মুসলিম প্রদেশগুলোর স্বার্থের প্রতি, বিশেষভাবে উত্তর প্রদেশের স্বার্থের প্রতি, যথেষ্ট অবিচার করা হয়। কিন্তু উত্তর প্রদেশের প্রবীণ ও সংরক্ষণশীল মুসলিম নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে মুসলিমদের মধ্যে যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয় সেই সুযোগেই তরুণ মুসলিম নেতাগণ এরূপ একটি চুক্তি সম্পাদন করার সুযোগ লাভ করেন। ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশের মুসলিম লীগ দল মর্লি-মিন্টো সংস্কার অনুযায়ী প্রদত্ত প্রাদেশিক আইনসভার আসনসংখ্যা অপেক্ষা এই চুক্তি অনুসারে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে খুবই সন্তুষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে মর্লি-মিন্টো সংস্কারের ফলে মুসলিম সম্প্রদায় যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে লক্ষ্ণৌ চুক্তির ফলে তার পরিমাণ আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে Coupland মন্তব্য করেন, "The concession made by the Congress were far more substantial concessions that the Muslims had been given by Morley and Minto to secure their acquiescence in the Reforms of 1909."

(৮) উপসংহার ঃ

লক্ষ্ণৌ চুক্তির ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাময়িকভাবে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এই চুক্তির এই একটিই মাত্র সুফল। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সহ-যোগিতার ফলে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একটি নতুন পথের সন্ধান পায়। কিন্তু এই চুক্তি স্থায়ী হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং সুযোগ-সুবিধা দান করে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যবোধকে দূর করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ব্রিটিশ শাসনবিরোধী জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ আদর্শে উদ্বুদ্ধ মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করা সম্ভব ছিল না। ডক্টর লালবাহাদুরের মতে, 'The Pact was bound to be transitory in character, for it was a child of circumstance ....A communal body, that from its very birth, had

consistenly advocated anti-patriotic dogmas and done all in its power to widen the gap between the Hindus and Muslims, could be least expected to experience an overnight change in its fundamentals and pin its faith to the Congress ideology. Even war against Turkey would not shake the sense of loyalty which the Indian Muslims had developed for British Government in the country. The Congress programme, on the other hand, demanded active opposition to the Government. The ideological differences between the two bodies made them ill-assorted-mates that was ready to part company at the first opportunity. Looked at from whatever angle of vision, the Lucknow Pact was foredoomed to failure."

Q. 15. Trace the genesis of Montague's Announcement of 1917. How far was it implemented in the Act of 1919.

Ans (১) ১৯১৭ খৃস্টাব্দের মূলকথা :

মর্লি-মিণ্টো সংস্কার চরমপন্থীদের তো দূরের কথা নরমপন্থী নেতাদেরও সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য-সমূহ সমালোচনা করে একটি বিস্তারিত প্রস্তাব গ্রহণ করে। নরমপন্থী নেতা এবং ব্রিটিশ শাসকদের উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতায় অবিচল বিশ্বাসী গোপালকৃষ্ণ গোখলে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যরূপে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন, "We, of the present generation of India can only hope to serve our country by our failures." মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টেও মর্লি-মিণ্টো সংস্কার সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয় যে, দশবছরের মধ্যেই এই সংস্কার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ভারতীয়দের রাজনৈতিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে অসমর্থ হয়। এই সংস্কার সম্বন্ধে মনোভাব দেখে মনে হয় যে, মর্লি-মিণ্টোর প্রবর্তিত শাসনপ্রণালী ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় রাজনীতিবিদদের চাহিদাও পূরণ করতে সক্ষম হয় নি।

মর্লি-মিণ্টো সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার পর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয়দের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করতে সাহসী করে তোলে। অপর-দিকে যুদ্ধের প্রথম পর্বে জার্মানীর সাফল্যে ও ইংলণ্ডের ব্যর্থতায় ভারতীয়দের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। কারণ অনেকেই এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন যে, ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্যই ভারতের সুযোগের শুভ ইঙ্গিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার দুবছরের মধ্যেই ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতের রাজনীতিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

প্রথমতঃ, জাতীয় কংগ্রেসে চরমপন্থীদের পুনঃ প্রবেশ। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের সুরাট অধিবেশনে বিচ্ছেদের পর চরমপন্থী দল জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করলে তিনটি পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করে নি। বিশেষতঃ চরমপন্থী দলের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর দমনমূলকনীতি তাঁদের দল গঠনের পক্ষে সবচাইতে বড় অন্তরায় ছিল। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে লালা লাজপৎ রায়কে দীপান্তরে প্রেরণ করা হয়, ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষ কারান্তরালে প্রেরিত হন ও পরে তিনি রাজনীতির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে টিলকের প্রতি আট বছর কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে নরমপন্থীদলের দুই প্রধান গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও ফিরোজশাহ মেহতা ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তবে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে টিলক কারাগার থেকে মুক্তি পান। ইতিমধ্যে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করা হয় এবং স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মিলনের পথ সুগম হয়ে ওঠে এবং এই সংযুক্তি সাধনের জন্য কংগ্রেসের সংবিধানেরও সামান্য সংশোধন করা হয়। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে আবার চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনেই জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়। পরবর্তীকালে উভয় দলের এই চুক্তি খুব ফলপ্রসূ না হলেও সাময়িকভাবে এই চুক্তি জাতীয় আন্দোলনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে সাহায্য করে।

তৃতীয়তঃ, ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের মিসেস অ্যানি বেসান্ত হোমরুল লীগ গঠন করেন। বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত স্থানেই প্রায় এই সংস্থার শাখা স্থাপিত হয়। বাল গঙ্গাধর টিলক হোমরুল আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানান। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে মিসেস অ্যানি বেসান্ত জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। জাতীয় কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই সর্বপ্রথম ভারতীয়দের নিকট স্বায়ত্তশাসনের একটি বাস্তব পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা হয়।

ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতের এই রাজনৈতিক পরিবর্তন অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন প্রকার দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু দমনমূলক আইনের দ্বারা বা নিষ্ঠুর অত্যাচারের সাহায্যেও সন্ত্রাসবাদ দূর করা সম্ভব হল না। বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের অসন্তোষ দূর করার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করতে চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার ফলেই ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মন্টেগুর ঘোষণা।

নতুন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের প্রাথমিক কাজ শুরু করেন ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং এই প্রস্তাবের

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইংলণ্ডের সরকারের নিকট পেশ করেন। কিছুদিন পরে ভারত সম্পর্কে সহানুভূতিসম্পন্ন উদারপন্থী এডুইন মণ্টেগু ভারত সচিবের পদে নিযুক্ত হন এবং তিনি ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে আগস্ট ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি নতুন নীতি ঘোষণা করেন।

(২) ১৯১৭ খৃস্টাব্দের ঘোষণা :

এডুইন মণ্টেগু স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, শাসনতন্ত্রের প্রতিটি বিভাগে ভারতীয়দের প্রতিটি ক্রমবর্ধমান সংযুক্তিকরণ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে ধীরে ধীরে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করাই ব্রিটিশ সরকারের প্রধান নীতি। The policy of His Majesty's Government with which the Government of India are in complete accord is that of the increasing association of Indians in every branch of administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the British Empire" তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, বিভিন্ন পর্যায়ে সংস্কার সাধনের মাধ্যমেই এই নীতির সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। তবে ব্রিটিশ সরকারই এই পরিবর্তনের সময় এবং সংস্কারের রূপ নির্ণয় করার অধিকার ভোগ করবে। তাছাড়া সময় ও সংস্কার নির্ণয় করার জন্য দুটি বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন :—(১) ভারতবাসীর নিকট থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতার সঠিক মূল্য নিরূপণ, এবং (২) ভারতীয়দের দায়িত্ববোধের উপর কি পরিমাণ বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব।

(৩) মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার :

শাসনতান্ত্রিক ঘোষণার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনমত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে মণ্টেগু ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারতে আগমন করেন এবং ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের সহযোগিতায় একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রশংসনীয় পর্যালোচনা প্রকাশ পায়। রিপোর্টে বলা হয় যে, দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রথম পদক্ষেপই হবে প্রাদেশিক সরকারের উপর আংশিক দায়িত্ব অর্পণ করা। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ভারত সচিবের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের নিকট দায়িত্ব বহন করবে। এই রিপোর্টে আইনসভার বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার সুপারিশ করে এবং সম্ভাব্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করার পক্ষে মতামত জ্ঞাপন করে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সহিত সামঞ্জস্যহীন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন প্রথাকেও এই রিপোর্টে নিন্দা করা হয়, যদিও মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে এই নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়।

মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হওয়ার পর ১৯২১ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই আইন কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হয়।

(৪) সংস্কারের প্রয়োগ :

মণ্টেগুর ঘোষণা খুবই সংক্ষিপ্ত ; ভারতে কি ধরনের শাসনতন্ত্র গঠিত হবে সে সম্পর্কে এই ঘোষণা মাত্র সামান্য ইঙ্গিত দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমেই এই সংস্কারের পূর্ণ রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হয়। এমন কি ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের এডুইন মণ্টেগুর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও নীতি সম্পর্কেও এই রিপোর্ট স্পষ্টভাবে কিছু প্রকাশ করে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে দ্বৈত-শাসন পদ্ধতির (Dyarchy) মাধ্যমে প্রদেশগুলোতে আংশিক দায়িত্বপূর্ণ সরকার গঠিত হলেও কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বের মতোই দায়িত্বহীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনার সুযোগ লাভ করে। তাছাড়া স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী সম্পর্কে মণ্টেগুর ঘোষণায় কোন প্রকার উল্লেখ না থাকলেও ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের বিধিবদ্ধ সংস্কার আইনে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা রক্ষা করা হয়। ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং এই উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে দায়িত্বশীল সরকার গঠন সম্ভব ছিল না। তবে মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টের অনুমোদনের কিছু অংশ পার্লিয়ামেণ্টের যুক্ত সিলেক্ট কমিটি পরিবর্তন করে, কিন্তু এই রিপোর্টের মূল কাঠামোর বিশেষ কোন রদ-বদল হয় নি।

(৫) উপসংহার :

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে মণ্ট ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ভারতের জাতীয়তাবাদী মহলে এই রিপোর্টের প্রস্তাবগুলোকে অত্যন্ত অসন্তোষজনক বলে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনে মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টের প্রস্তাবগুলোকে কঠোর ভাবে নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়। তবে নরমপন্থী নেতৃবর্গ এই প্রস্তাবগুলোকে অসন্তোষজনক বিবেচনা করেও এইগুলোকে কার্যকরী করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অধিকাংশ ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা এই সংস্কারকে 'disappointing and unsatisfactory' বলে বর্ণনা করলেও ব্রিটিশ সরকার দ্বিধাহীন চিত্তে এই সংস্কার বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করে।

Q. 16. Review the working of the Montague Chelmsford Reforms in the light of the Montford Report of 1918 and the Government of India Act of 1919.

Ans. (১) ভূমিকা :

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে লর্ড চেমসফোর্ড হার্ডিঞ্জের স্থলে ভারতের গভর্নর জেনারেলের কার্যভার গ্রহণ করেন। এই সময় হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যের দ্বারা ভারতের

জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং নরমপন্থীগণ সংখ্যালঘু হয়ে পড়ায় চরমপন্থীগণের আধিপত্য স্থাপিত হয়। সুতরাং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ ব্যাপক গণ-আন্দোলনের আয়োজন না থাকা সত্ত্বেও, ব্রিটিশ সরকার ভারতের সমস্যা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বিচার করতে প্রণোদিত হয়। চেমসফোর্ড শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কিভাবে সাধিত হওয়া উচিত এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে শুরু করেন এবং এই সম্পর্কে তিনি কতিপয় নিজস্ব প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর এই প্রস্তাবগুলো কিন্তু যথেষ্ট সন্তোষজনক ছিল না। এমন কি বড়লাটের শাসন পরিষদেরই ভারতীয় সদস্য শ্রীশঙ্করণ নায়ার এবং ভারত সচিব অস্টেন চেম্বারলেনও এই প্রস্তাবগুলোকে যথোপযুক্ত বলে মনে করতে পারেন নি। চেমসফোর্ড তখন ভারত সচিবকে ভারতে উপস্থিত হয়ে স্বয়ং অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ করেন। এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নবনিযুক্ত ভারত সচিব লর্ড মণ্টেগু। ইতিমধ্যে অস্টেন চেম্বারলেন পদত্যাগ করেন। ভারতে আসার পূর্বে মণ্টেগু ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট কমন্সসভায় ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের নীতি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বলা হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে শাসন-কার্যের সকল বিভাগের সহিত ভারতীয়দের উত্তরোত্তর সংযোগ স্থাপন এবং স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমিক সম্প্রসারণই মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের নীতি এবং ভারত সরকারও এই নীতির সঙ্গে একমত "The policy of His Majesty's Government with which the Government of India are in complete accord is that of the increasing association of indians in every branch of administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to progressive realisation of responsible Government in India as an integral part of the British Empire."

(২) মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট :

এই ঘোষণায় স্পষ্টই বলা হয় যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতের দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ইচ্ছা পোষণ করে, তবে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন ধীরে ধীরে করা হবে এবং এই দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনও সহজ করার উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমিক সম্প্রসারণ করা হবে। এই ঘোষণার কয়েকমাস পরেই১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সচিব মণ্টেগু ভারতে উপস্থিত হন। তিনি প্রায় ছয়মাস কাল অবস্থান করে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ আলোচনা করেন এবং বড়লাট চেমসফোর্ডের সহিত সংযুক্তভাবে ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির প্রস্তাব গ্রথিত করে একটি বিবরণী রচনা করেন। ১৯১৮ সালের জুন মাসে এই বিবরণী প্রকাশিত হলে ভারতের জাতীয়তাবাদী মহলে মণ্ট-ফোর্ড বিবরণীর প্রস্তাবগুলো অত্যন্ত অসন্তোষ-জনক বলে বিবেচিত হয়। বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনে যুক্ত বিবরণীর প্রস্তাবগুলোর কঠোর সমালোচনা ও নিন্দা করা হয়। কিন্তু

এই যুক্ত বিবরণীর ভিত্তিতেই একটি বিল রচিত হয় এবং ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের উভয় সভার প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটি যুক্ত সিলেক্ট কমিটির দ্বারা এই বিল বিবেচিত হয়। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই বিল পার্লিয়ামেন্টের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে ভারত শাসন আইনে পরিণত হয়।

(৩) শাসন বিধি—কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা :

ভারত শাসন আইনের দ্বারা স্থির হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার বলতে সপরিষদ বড়লাটকেই নির্দেশ করবে, অর্থাৎ বড়লাট ও তাঁর শাসন পরিষদ। তবে এই আইনে শাসন পরিষদের সদস্যসংখ্যা কিন্তু নির্দিষ্ট করা হয় নি। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হলেও ব্রিটিশ ভারতে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বা অন্য যে কোন স্বার্থে প্রয়োজনীয় যে কোন আইন বিধিবদ্ধ করার বিশেষ ক্ষমতা বড়লাটের উপর ন্যস্ত করা হয়। তবে এই সকল আইন পার্লিয়ামেন্টের নিকট অবশ্যই প্রেরণ করতে হত এবং আইন কার্যকরী করার জন্য রাজার সম্মতিরও প্রয়োজন ছিল।

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদকে এক কক্ষ থেকে দ্বিকক্ষ আইন পরিষদে পরিণত করা হয়। ঊর্ধ্ব কক্ষের নাম রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State) এবং নিম্ন কক্ষের নাম হয় ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly)। ঊর্ধ্ব কক্ষের সদস্যসংখ্যা নির্দিষ্ট হয় ৬০—এই সদস্যদের মধ্যে ৩৪ জন অন্ততঃ কম সংখ্যক নির্বাচকের দ্বারা অর্থাৎ সীমাবদ্ধ ভোট দানের ভিত্তিতে নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। বাকী ২৬ জন ছিলেন বড়লাটের মনোনীত সদস্য। নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয় ১৪৫—তাঁদের মধ্যে ১০৫ জন নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট বড়লাটের মনোনীত সদস্য। ১৯০৯ সালের শাসন সংস্কারে যে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হয় তা ভারত শাসন আইনেও বজায় রাখা হয়। তাছাড়া এই নিয়ম এই সময় ইয়োরোপীয়, ইঙ্গ-ভারতীয় এবং শিখদের জন্যও সম্প্রসারিত করা হয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সাংগঠনিক সম্প্রসারণ করা হলেও তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় নি—এমন কি শাসন পরিষদকে নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতাই তাকে দেওয়া হয় নি। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও বড়লাটের দ্বারা আইন পরিষদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। তবে অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে আইন পরিষদের ক্ষমতা কিছু বৃদ্ধি করা হয়।

(৪) প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা :

আটটি প্রদেশ (পরে বর্মাসহ নটি) গভর্নর শাসিত প্রদেশরূপে সমান মর্যাদা এবং একই প্রকারের শাসন কাঠামো লাভ করে। এই প্রদেশগুলো হল মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলাদেশ, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং আসাম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান, দিল্লী, কুর্গ, আজমীর, মারোয়ার এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে স্থাপন করা হয়। গভর্নর শাসিত প্রদেশগুলোতে পূর্বেই আইন পরিষদের অস্তিত্ব ছিল। নতুন আইন অনুসারে

এই আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ১৯১৯ সালের আইনে বলা হয় যে, প্রাদেশিক আইনসভার মোট সদস্য সংখ্যার ৭০ ভাগ নির্বাচিত হবে এবং অনধিক ২০ ভাগ মনোনীত হবে। প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে গভর্নরকে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হয়। আইনসভার দ্বারা প্রণীত যে কোন আইনই বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা গভর্নর লাভ করেন। অপরদিকে নিজ দায়িত্ব পালনের পক্ষে প্রয়োজনবোধে যে কোন আইনের প্রস্তাবই গভর্নর স্বীয় অধিকার বলে আইন বলে ঘোষণা করতে পারবেন। আইনসভা এইরূপ আইন প্রণয়নে আপত্তি করলেও গভর্নর নিজের ক্ষমতা বলেই আইন ঘোষণা করতে পারতেন।

(৫) দ্বৈত-শাসনব্যবস্থা ঃ

প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা শাসনযোগ্য বিষয়গুলোকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়—সংরক্ষিত (Reserved) ও হস্তান্তরিত (Transferred)। এই আইনে বলা হয় যে, প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে গভর্নর থাকবেন এবং গভর্নরের সহিত যুক্ত থাকবে একটি শাসন পরিষদ এবং অপরদিকে কয়েকজন মন্ত্রী। গভর্নর তাঁর শাসন সহযোগিতায় সংরক্ষিত বিষয়গুলো সম্পর্কে শাসন পরিচালনা করবেন। অপরদিকে গভর্নরই মন্ত্রীদের সহযোগে হস্তান্তরিত বিষয়গুলো সম্পর্কে শাসন পরিচালনা করবেন। মন্ত্রিগণ প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের মধ্য হতেই নিযুক্ত হবেন এবং আইন পরিষদের নিকটেই তাঁরা দায়িত্ব বহন করবেন। সুতরাং আইনসভার আস্থাভাজন সদস্যদের মধ্য হতেই মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ফলে একদিকে আইনসভার নিকট দায়িত্বহীন শাসন পরিষদের দ্বারা কতিপয় বিষয় শাসন, অপরদিকে আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের দ্বারা অন্যান্য বিষয়গুলো শাসন—এইরূপ দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হয়। এইরূপ দ্বৈত-শাসনের মধ্য দিয়েই স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়—অর্থাৎ যে পরিমাণে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা মন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত হয়, প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ দায়িত্বশীল শাসনের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, কারণ মন্ত্রিগণ ছিলেন জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত আইন পরিষদের নিকট দায়ী।

(৬) রাজস্ব বণ্টন বিধি ঃ

কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা এই আইনে করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় রাজস্বের মধ্যে প্রধান হয় বহির্বাণিজ্য শুল্ক ও আয়কর এবং প্রাদেশিক রাজস্বের প্রধান উৎস হয় ভূমি-রাজস্ব। কয়েক বছরের জন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছু পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। তবে প্রাদেশিক সরকারকে সীমাবদ্ধ কর আদায় করার এবং ঋণ সংগ্রহ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা সংগৃহীত রাজস্ব কি উপায়ে হস্তান্তরিত এবং

সংরক্ষিত বিষয়গুলোর মধ্যে বন্টিত হবে তা দুটি পর্যায়ের মধ্যে আলোচনার দ্বারা, অন্যথায় গভর্নরের দ্বারা স্থির হবে বলে ব্যবস্থা করা হয়।

(৭) সমালোচনা :

মন্ট-ফোর্ড সংস্কারের সাফল্য ছিল প্রচুর সময়সাপেক্ষ এবং ভারতীয়দের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। ধীরে ধীরে দায়িত্বশীল সরকারের সম্প্রসারণ ছিল এই সংস্কারের মূল কথা। বিশেষতঃ সংস্কার অনুযায়ী অনুষ্ঠিত ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচন জাতীয় কংগ্রেস বর্জন করে। কিন্তু নরমপন্থীদের কোন কোন নেতা এবং তাঁদের সমর্থকগণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে জয়লাভ করেন এবং মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেন। এই সকল নরমপন্থীদের মতের সমর্থনকারীরাই পরে মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে স্বরাজ দল গঠন করেন। ফলে জাতীয় কংগ্রেসের গরিষ্ঠ সংখ্যার অসহযোগিতার ফলে এই সংস্কার প্রথম থেকেই নানারূপ বাধার সম্মুখীন হয়। তাছাড়া দ্বৈত-শাসন পদ্ধতি প্রচলনের ফলেও নানারূপ অসুবিধা দেখা দিতে শুরু করে। স্বতন্ত্র-নির্বাচক মণ্ডলী নীতি অক্ষুন্ন রাখার জন্যও এই সংস্কার কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয় এবং শাসন সংস্কারের জন্য আবার আন্দোলন শুরু হয়। সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার দশ বছর পরে এই কার্যকারিতা বিচারের জন্য অনুসন্ধান সমিতি গঠন করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু জনমতের চাপে পড়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দেই এই অনুসন্ধান সমিতি গঠন করতে বাধ্য হয়। এই সমিতি বিশেষভাবে দ্বৈত-শাসন প্রথা প্রবর্তনের তীব্র সমালোচনা করে। প্রকৃতপক্ষে মণ্টফোর্ড সংস্কার চারদিক থেকে নানাপ্রকার বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ার ফলে তার গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কথা সাধারণভাবেই সমস্ত সমালোচকই উপেক্ষা করেন। বিশেভাবে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরদের অতিরিক্ত ক্ষমতা, কেন্দ্রে মন্ত্রীদের দায়িত্ববিহীন মন্ত্রিসভা ও সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথাই সমালোকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী Percival Spear-এর মতে, "They (the Reforms) were an essential milestone on the road to self-government. Without them Indian political progress would have been belated, erratic and probably revolutionary. They gave, by and large, enough inducement to enough people to work them, and enough scope to provide experience and incentives for the future ....Though tensions and frustrations could not be avoided, the new system went far enough and worked well enough to make further advance inevitable. This was its essential justification. It started a constitutional clock which would not stop. The present Indian Government is the heir of Montague as well as of Gandhi.

Q. 17 Examine the Montague-Chelmsford Reforms in the light of criticism of the Congress.

Or,

Point out the principal defects of the Montague-Chelmsford Reforms.

Ans. (১) ভূমিকা :

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে অগাস্ট ভারতসচিব লর্ড এডুইন মণ্টেগু কমন্সসভায় ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের নীতি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অচ্ছেদ্য অংশরূপে ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য শাসনকার্যের সকল বিভাগের সহিত ভারতীয়দের উত্তরোত্তর সংযোগ স্থাপন এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমিক সম্প্রসারণই মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের নীতি এবং ভারত সরকারও এই নীতির সহিত একমত। "The policy of his Majesty's Government with which the government of India are in complete accord is that of the increasing association of Indians in every branch of administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to progressive realisation of responsible grovernment of India as an integral part of the British Empire."

এই ঘোষণার কয়েকমাস পরেই ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর মণ্টেগু ভারতে উপস্থিত হন এবং প্রায় ছ'মাসকাল এদেশে অবস্থান করে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন এবং ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের সহিত সংযুক্তভাবে ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির প্রস্তাব গ্রথিত করে একটি বিবরণী রচনা করেন।

(২) কংগ্রেসের সমালোচনা :

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ভারতের জাতীয়তাবাদী মহলে এই রিপোর্টের প্রস্তাবগুলো অত্যন্ত অসন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয় এবং এই রিপোর্ট সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনার জন্য ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাসে বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেস এক বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হয়। ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত সংস্কার সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের বিষয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গের মধ্যে মতবিরোধিতা দেখা দেয়। দিনশা ওয়াচা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রভৃতি নরমপন্থী নেতৃবর্গ বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিতে সম্মত হন নি। বোম্বাই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, "সংস্কারের কোন কোন প্রস্তাবে বর্তমান পরিস্থিতি অপেক্ষা

কোন কোন বিষয়ে অনেক অগ্রগতির সম্ভাবনা থাকলেও, জাতীয় কংগ্রেস এই প্রস্তাবসমূহকে হতাশাব্যঞ্জক ও অসন্তোষজনক বলে বিবেচনা করে।" জাতীয় কংগ্রেস দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য বাস্তবমুখী ও গঠনমূলক প্রস্তাব দাবি করে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত সংস্কারের অবশ্য প্রয়োজনীয় নানারূপ পরিবর্তন ও সংশোধন উত্থাপন করে।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সাধারণ অধিবেশনে বোম্বাই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব দুটি শর্তাধীনে পুনরায় সমর্থিত হয়। এই দুটি শর্ত হল, (১) প্রত্যেক প্রদেশে অবিলম্বে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠন করতে হবে; এবং (২) বেসরকারী ইয়োরোপীয়দের স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে হবে। কিন্তু এই অধিবেশনের সভাপতি মদনমোহন মালব্য ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের অনুরূপ পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের পরিবর্তে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবি করেন।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে চার দফা সম্বলিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয়, (১) ভারত পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকারের জন্য উপযুক্ত; (২) মণ্টফোর্ড সংস্কার আইন অপর্যাপ্ত, অসন্তোষজনক ও হতাশাব্যঞ্জক; (৩) আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসরণ করে দ্রুত পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন; এবং (৩) দ্রুত পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের এই সংস্কারকে কার্যকরী করার জন্য সহযোগিতা করা একান্ত প্রয়োজন।

এই অধিবেশনের সভাপতি মতিলাল নেহরু কয়েকটি বিশেষ কারণে এই সংস্কারের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর সমালোচনার উল্লেখযোগ্য কারণগুলো ছিল, (১) দায়িত্বহীন কেন্দ্রীয় সরকার গঠন; (২) আইন প্রণয়নে গভর্নর জেনারেলকে প্রদত্ত অধিকার মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ; (৩) বাজেট সম্পর্কে গভর্নর জেনারেল এবং গভর্নরদের ক্ষমতা সীমাহীন ও সুদূরপ্রসারী; (৪) এই সংস্কার জনসাধারণের প্রাথমিক অধিকারও স্বীকার করে নি, বিশেষতঃ পাঞ্জাবের অমানুষিক দমনমূলক ঘটনার পর জনসাধারণের অধিকার সম্পর্কে সরকারী স্বীকৃতির একান্ত প্রয়োজন; এবং (৫) সংস্কারের কার্যকারিতা সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের অনুসন্ধানের ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে একটি জাতির জন্মগত অধিকার বহিরাগত ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল করে রাখা।

তবে নানাপ্রকার বিরূপ সমালোচনা করা সত্ত্বেও সাধারণভাবে ভারতীয় নেতৃবর্গ ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের কয়েকটি ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। কেন্দ্রীয় আইনসভা ভারতীয় সদস্যদের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও সরকারী সদস্যদের সমর্থনে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে রাওলাট আইন বিধিবদ্ধ করে। মহাত্মা গান্ধী এই নির্যাতনমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে হরতাল পালন করতে আহ্বান

জানান। বিভিন্নস্থানে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয় এবং পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী করা হয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের শান্তিপূর্ণ জনসমাবেশের উপর কর্নেল ডায়ারের নির্দেশে ১৬৫০ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করা হয়। এই গুলিবর্ষণের ফলে ৪০০ লোক নিহত হয় এবং ১২০০ লোক আহত হয়। পাঞ্জাবের নেতৃবর্গকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং জনসাধারণের উপর নির্মম অত্যাচার করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের এইরূপ কঠোর অত্যাচারের ফলে জনসাধারণ তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

ভারতের এইরূপ জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে স্বরাজ্য স্থাপনের জন্য প্রস্তাব পাশ করা হয় এবং মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস পুনরায় স্বরাজ্য স্থাপনের দাবি পেশ করে এবং ভারতের জনসাধারণের নিকট ভারত সরকারের দায়িত্ব হস্তান্তরিত করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। সভাপতির ভাষণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কারের প্রতিটি শর্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেন এবং তীব্র ও কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। প্রথমতঃ, 'উত্তরোত্তর দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন' (Progressive realisation of responsible government)-কে তিনি 'অস্পষ্ট শব্দসমূহ' বলে বর্ণনা করেন, কারণ, ভারতীয়দের জন্মগত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার এই শর্তে আদৌ স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। অপরদিকে মণ্টফোর্ড সংস্কার ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমমর্যাদাসম্পন্ন অংশীদার রূপে স্বীকার করতে কখনও সম্মত হয় নি।

দ্বিতীয়তঃ, সংস্কারে ব্যবহৃত 'Indian peoples' কথাটির দ্বারা ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট ভারতের ঐক্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে।

তৃতীয়তঃ, প্রতিবার রাজনৈতিক অগ্রগতি, পরিমাপ ও সময় নির্ধারণ করার ক্ষমতা পার্লিয়ামেন্টের হস্তে ন্যস্ত করার ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণিত হয় যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের 'চিরন্তন নাবালক' (perpetual infants) বলে মনে করে।

চিত্তরঞ্জন দাশ এই বক্তৃতায় আরও বলেন যে, "স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার এবং কিস্তিতে কিস্তিতে অথবা ভাগে ভাগে নয়, আমি একেবারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃতি দাবি করি' ("Freedom is my birth right, and I demand a recognition of that right, not by instalments or in compartments but whole and entire.") তিনি দ্বৈতশাসন প্রথারও তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, প্রাদেশিক আইনসভার সরকারী আয়-ব্যয়ের কোন কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় নি, কারণ সংরক্ষিত বিষয় সম্বন্ধে মন্ত্রিগণ নীরব দর্শকমাত্র এবং হস্তান্তরিত বিষয়েও গভর্নরের হস্তক্ষেপ করার অধিকারের ফলে তাদের ক্ষমতা একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়ে। সুতরাং সরকারের সহিত সহযোগিতা করার জন্য এই আইন কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অপরদিকে নরমপন্থীরা এই আইনের শর্ত অনুসারে সরকারের সহিত সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত থাকলেও তাদের পক্ষে আইনের সীমাবদ্ধতার জন্য ব্রিটিশ সরকারের নীতিতে সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সরকার স্থাপনের জন্য আইনসভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের উপর দীর্ঘদিন আলোচনার পর স্বরাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম ভিনসেন্ট-এর পরামর্শ অনুযায়ী আইনসভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, "That this Assembly recommends to the Governor-General-in-Council that he should convey to the Secretary of State for India the view of this Assembly that the progress made by India on the path of responsible government warrants a re-examination and revision of the constitution at an earlier date than 1929." ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কার সম্পর্কে নরমপন্থীদের কিরূপ ধারণা ছিল উপরিউক্ত প্রস্তাব থেকেও তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়।

তবে সাধারণভাবে জাতীয় কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কারের সমালোচনা করে। একথা ঠিক যে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলেও একবাক্যে বলা যায় যে, ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কার জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হয়।

Q. 18. Give a critical assessment of the Dyarchy.

Ans. (১) দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা :

মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রাদেশিক শাসনস্তরে দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থার প্রচলন। প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা শাসনযোগ্য বিষয়গুলোকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়—সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত। এই আইনে বলা হয় যে, প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে গভর্নর থাকবেন এবং গভর্নরের সহিত সংযুক্ত থাকবেন একদিকে একটি শাসন পরিষদ অপরদিকে কতিপয় মন্ত্রী। তাঁর শাসন পরিষদ সহযোগে সংরক্ষিত বিষয়গুলো সম্পর্কে শাসন পরিচালনা করবেন; অপরদিকে গভর্নরই মন্ত্রীদের সহযোগে হস্তান্তরিত বিষয়গুলো সম্পর্কে শাসন পরিচালনা করবেন। মন্ত্রিগণ প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হবেন এবং আইন পরিষদের নিকটই তাঁরা দায়িত্ব বহন করবেন। একদিকে আইনসভার নিকট দায়িত্ববিহীন শাসন পরিষদের দ্বারা কতিপয় বিষয়ে শাসন, অপরদিকে আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের দ্বারা অন্যান্য বিষয়গুলো শাসন—মন্টফোর্ড সংস্কারের ফলে এইরূপ দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ দ্বৈতশাসনের মধ্য দিয়ে স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়—অর্থাৎ যে পরিমাণে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা মন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত হবে, প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ দায়িত্বশীল শাসনের

ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, কারণ মন্ত্রিগণ ছিলেন জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত আইন পরিষদের নিকট দায়ী। প্রকৃতপক্ষে দ্বৈতশাসন দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের অংশ নিয়ে গঠিত হয়, যদিও সংস্কারের উদ্যোক্তাগণ আশা করেন যে, একটি সরকার হিসাবেই তাঁরা একযোগে কাজ করবার চেষ্টা করবেন।

মণ্টফোর্ড সংস্কারে এই দ্বৈতশাসন ব্যবস্থাকে যুগ পরিবর্তনকালের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাসনপদ্ধতি রূপে বর্ণনা করা হয়। মণ্টেগু-র প্রতিশ্রুতি অনুসারে উত্তরোত্তর সংযোগ স্থাপন ও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমিক সম্প্রসারণের জন্যই প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রে আংশিকভাবে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করার প্রস্তাব করা হয়।

(২) দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার ত্রুটি :

প্রদেশসমূহে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই এই শাসনপদ্ধতি কতকগুলো অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এই অসুবিধার কারণও অনেক। প্রথমতঃ, দ্বৈতশাসন পদ্ধতি নীতি হিসাবেই ত্রুটিপূর্ণ। পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নয় এই রকম দুটি বিভাগে শাসন পদ্ধতিকে বিভক্ত করাই রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ এবং সরকারী নীতি হিসাবেও বিভ্রান্তিকর। রাষ্ট্রের গঠন জীবদেহের মতো, সুতরাং তাকে সম্পূর্ণ আলাদা দুটি ভাগে ভাগ করা অসম্ভব। তা ছাড়া ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের আইন যুক্তিহীনভাবেই বিভিন্ন বিভাগকে পৃথক করে।

দ্বিতীয়তঃ, শাসন পরিষদের সদস্যগণ ছিলেন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং মন্ত্রিগণ ছিলেন জনগণের প্রতিনিধি। এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে কখনও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল না।

তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিদের অবস্থাও ছিল খুবই দুর্বল। গভর্নর ও আইনসভা এই দুই প্রভুর মনস্তুষ্টি করা তাঁদের পক্ষে কখনও সম্ভব ছিল না। অপরদিকে গভর্নর কখনই শাসন পরিষদ ও মন্ত্রীসভার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। বিশেষতঃ মন্ত্রিদের হাতে জাতির গঠনমূলক সমস্ত বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হলেও অর্থ বিভাগের উপর কর্তৃত্ব ছিল শাসন পরিষদের। ফলে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর না করার জন্য মন্ত্রীদের পক্ষে কোন প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করাও সম্ভব ছিল না। দপ্তর পরিচালনার ব্যাপারেও এই কারণেই তাঁরা বিশেষ কোন যোগ্যতার পরিচয় দিতে সমর্থ হন নি।

(৩) জাতীয় কংগ্রেস বনাম দ্বৈতশাসন প্রথা :

প্রথম থেকেই জাতীয় কংগ্রেস দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করে। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস অবিলম্বে প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার দাবি করে। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দ্বৈতশাসন প্রথার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, এই প্রথা

অনুসারে সংরক্ষিত বিষয় সম্পর্কে মন্ত্রিগণ নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং হস্তান্তরিত বিষয় সম্পর্কেও গভর্নরের হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় তাঁদের বিশেষ কিছু করা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ এদেশের আয়-ব্যয়ের উপর তাঁদের কোন কর্তৃত্বই স্বীকৃত হয় নি। দ্বৈত-শাসনের ব্যর্থতা সম্পর্কে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি খুব সুন্দর মন্তব্য করেন, "That Dyarchy is neither a helpful stage in the progressive realisation of responsible government nor serves as an apt machinery for grinding down good government, has been the unanimous verdict of experience and is now practically admitted on all hands."

(৪) মুড্ডীম্যান কমিটি :

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে সরকারীদের সম্পর্কে লী কমিশন নামে একটি বিশেষ কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের কার্য ছিল সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগ কি হারে করা হবে এবং কিভাবে সিভিল সার্ভিসকে আরও লোভনীয় করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করা। এই কমিশনের সুপারিশ ভারতের জাতীয়তাবাদী মহলে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তার কিছুদিন পরেই ১৯১৯ সালের নতুন বিধির কার্যকারিতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য মুড্ডীম্যান কমিটি নিযুক্ত করা হয়। স্যার আলেকজাণ্ডার মুড্ডীম্যান এই কমিটির সভাপতি ছিলেন, তাঁর নাম অনুসারেই এই কমিটি মুড্ডীম্যান কমিটি নামে পরিচিত। এই কমিটিতে কয়েকজন ভারতীয় সদস্যও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মুড্ডীম্যান কমিটি তাঁদের অনুসন্ধান সম্পর্কে একমত হতে পারেন নি। —সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু দুটি অংশ দুটি বিবরণী প্রদান করেন। তবে উভয় বিবরণীতেই নতুন সংস্কারের কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রতিকূল অভিমত প্রকাশ করা হয়।

(৫) সংখ্যাগুরু সদস্যদের রিপোর্ট :

সংখ্যাগুরু সদস্যদের রিপোর্টে বলা হয় যে, পূর্ণ দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করা হয় নি—আংশিকভাবে যে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রচলন করা হয় তাকে সংক্ষেপে জটিল এবং শৃঙ্খলাহীন পদ্ধতি বলা যেতে পারে। তবে সাক্ষ্য-প্রমাণে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নি যে, এই পদ্ধতি অর্থাৎ আংশিক দ্বৈতশাসন পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ, কারণ বিভিন্ন প্রদেশে এই শাসন-পদ্ধতির ফলাফল বিভিন্ন প্রকার। বিশেষতঃ মাদ্রাজ প্রদেশে এই ব্যবস্থা খুব সাফল্য অর্জন করে, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে এই পদ্ধতির সাফল্য একান্ত ভাবেই নগণ্য।

সাক্ষীসাবুদের নির্দিষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে সংখ্যাগুরু সদস্যগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

(১) প্রাদেশিক সরকারের দুটির অংশের মধ্যে যুক্তভাবে চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনা করার বিষয় সম্পর্কে কোনভাবেই উৎসাহ প্রদর্শন করা হয় নি ;

(২) মন্ত্রীদের যুগ্ম দায়িত্বের অভাব ;

(৩) মন্ত্রীদের সহিত স্থায়ী কর্মচারীদের সহযোগিতার অভাব ;

(৪) হস্তান্তরিত বিভাগের উপরও শাসন পরিষদের সদস্যদের আর্থিক কর্তৃত্ব ; এবং (৫) মন্ত্রীদের উপর ভারতসচিব ও ভাইসরয়ের কর্তৃত্বের ফলে মন্ত্রীদের দায়িত্ববোধ থেকে অব্যাহতি।

(৬) মুড্ডীম্যান কমিটির সংখ্যালঘু সদস্যদের রিপোর্ট :

মুড্ডীম্যান কমিটির সংখ্যালঘু সদস্যবৃন্দ স্পষ্টভাবে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বর্তমানে প্রচলিত দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ এবং এই ব্যবস্থার ফলে কখনও সুফল লাভ করা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রদেশে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে এবং শাসনকার্য অচল হয়ে পড়ে। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতার কয়েকটি কারণও এই রিপোর্ট নির্দেশ করে, যথা—

(১) মন্ত্রীদের কোন ক্রমেই কোন প্রকার দায়িত্ব ছিল না ;

(২) একমাত্র মাদ্রাজ ও বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে সরকারের দুই অংশের মধ্যে একসঙ্গে কাজ ও বিবেচনা করা সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করা হয় নি ;

(৩) অর্থবিভাগের বিশেষ আধিপত্য এই শাসন-পদ্ধতির উপর অহেতুক চাপের সৃষ্টি করে ;

(৪) মাদ্রাজ ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রদেশেই গভর্নরগণ সমষ্টিগতভাবের পরিবর্তে ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রীদের সহিত আলাপ-আলোচনার পক্ষপাতী ছিলেন যার ফলে শাসনতান্ত্রিক অসুবিধা দেখা দেয় ;

এবং (৫) মেস্টন কমিশনের রায় প্রদেশসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও পঙ্গু করে তোলে।

বিহার সরকারের অনুমতিক্রমে এই রিপোর্ট দ্বৈতশাসন সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, এই শাসনব্যবস্থায় নানাপ্রকার ত্রুটি, সামান্য সংশোধনে দু একটি ত্রুটি দূর হতে পারে কিন্তু সমস্ত ত্রুটি দূর করা সম্ভব নয়।

Q. 19. Account for Gandhiji's rise to power.

Ans. (১) **ভূমিকা :**

একদিকে রাজদ্রোহী ভারতের অর্ধনগ্ন ফকিররূপে নিন্দিত, অপরদিকে জাতির জনকরূপে সম্মানিত এবং আধুনিক ভারতের প্রতিমূর্তিরূপে পরিচিত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীজীর কৃতিত্ব ও সাফল্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা সহজসাধ্য নয়। বিশেষতঃ তাঁর চরিত্রের কতকগুলো অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁর সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করাও অস্বাভাবিক নয়। তবে আপাতদৃষ্টিতে এই সব বৈশিষ্ট্য পরস্পর-বিরোধী প্রতীয়মান হলেও একটু গভীরভাবে বিচার করলে তাঁর চিন্তাধারার অস্পষ্টভাব দূরীভূত হয়ে যায় এবং তাঁর চিন্তাধারা এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়।

২) গান্ধীজীর চিন্তাধারা :

গান্ধীজীর যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য—শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত বস্তুতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। অপরদিকে বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সত্যতা স্বীকার করার জন্যও একদল চিন্তাশীল লোক বিভিন্নভাবে নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করতে শুরু করেন। বিশেষতঃ এই দলের প্রধান সমর্থকগণ সবাই ছিলেন মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী এবং তারা আধুনিক যন্ত্রসভ্যতাকে স্বীকার করেই পৃথিবীকে নতুন করে গঠন করার চেষ্টা করতে শুরু করেন। গান্ধীজী ভিক্টোরিয়ার যুগের চিন্তানায়কদের মতো বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন আবার অপরদিকে তিনি মার্ক্সবাদের অন্যতম মূল নীতি পণ্যশিল্পের উৎপাদনের জন্য মূলধন ও শ্রম যৌথভাবে বিনিযোগ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারাও ছিল স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ। তিনি ইয়োরোপের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষক ভারতীয় নরমপন্থীদের পছন্দ করতে পারেন নি। আবার হিংসার নীতিতে বিশ্বাসী চরমপন্থীদের রাজনীতির প্রতিও বিতৃষ্ণা পোষণ করতেন। গীতার দর্শনের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল এবং তিনি গীতায় বর্ণিত কর্মবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। মেকিয়াভেলীর কূটনীতিও তিনি পছন্দ করতে পারেন নি। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, কর্মপন্থার উপরই ফললাভ নির্ভর করে, সুতরাং সৎপথেই সুফল লাভ করা সম্ভব।

(৩) ভারতের রাজনীতিতে শূন্যতা :

ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের সময় ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক শূন্যতাই গান্ধীজীর উত্থান সহজতর করে তোলে। জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থীদের মধ্যে এই সময় ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে বারবার আঘাত পাওয়ার জন্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং সংবিধানগত আন্দোলনের ব্যর্থতাও তাঁদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপরদিকে চরমপন্থীদের স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি আন্দোলন ব্যর্থ হয় এবং দেশের বিভিন্নস্থানে সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব ঘটে। বিশেষতঃ জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের বিচ্ছেদের ফলে ভারতের রাজনীতিতে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং ভারতের এই রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু মন্তব্য করেন, "India was politically dull." মৌলানা আজাদ, জওহরলাল নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি তরুণ রাজনীতিবিদ্‌গণ উন্নত চরিত্রের কোন নেতার নেতৃত্বের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তা ছাড়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের প্রতিক্রিয়ার ফলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে প্রচুর মূলধন সঞ্চিত হওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

(৪) গান্ধীজীর ভাবমূর্তি—চরম ও নরমপন্থীর সমন্বয় :

রাজনীতিতে প্রবেশ করার পরেই গান্ধীজী ত্রাণকর্তারূপে সকলের প্রতি আহ্বান

জানান এবং তাঁর এই আহ্বান ভারতের অধিবাসীদের অন্তর স্পর্শ করে এবং তাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ভাবমূর্তিই ভারতীয়দের নিকট আদর্শ পুরুষরূপে পরিচিত এবং অর্ধনগ্ন ফকির গান্ধীজী অবিলম্বে এই আদর্শ পুরুষের স্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হন। বহিরাগত গান্ধীজী রাজনৈতিক দিক থেকেও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। তা ছাড়া, এই সময় ভারতের রাজনীতির দুই দিকপাল—গোলাপকৃষ্ণ গোখলে এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুও গান্ধীজীর উত্থানের পথ আরও সুগম করে তোলে। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে নরমপন্থীদলের নেতা গোখলে এবং ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে চরমপন্থীদলের নেতা তিলক মারা যান।

সুচতুর রাজনীতিবিদ গান্ধীজী চরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে নরমপন্থীদের রাজনৈতিক উপায়ের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেন। তিনি চরমপন্থীদের বহু ব্যবহৃত স্বরাজ শব্দটি একাধিক বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন কিন্তু স্পষ্টভাবে কখনও তার সংজ্ঞা নিরূপণ করেন নি। চরমপন্থীদের বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আদর্শ তিনি গ্রহণ করতে আপত্তি করেন নি আবার নরমপন্থীদের অহিংস আন্দোলন ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিও তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নি। এমন কি, নরমপন্থীদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের বেশি কোন দাবি ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করতেও স্বীকৃত হন নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি নরমপন্থীদের সংসদীয় রাজনীতির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানাতে কুণ্ঠিত হন নি।

(৫) গণ-আন্দোলন :

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের রাজনীতি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বদেশী বয়কট আন্দোলন ও কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে সমর্থ হয় নি। এই ব্যাপারে চরমপন্থীরা চরম-ব্যর্থতার পরিচয় দেন। কিন্তু গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আন্দোলনে শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী নয়, কৃষক ও শ্রমিকদেরও যুক্ত করতে সমর্থ হন। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে পরিণত করাই গান্ধীজীর রাজনৈতিক গভীর জ্ঞান ও দূরদর্শিতার প্রধান পরিচায়ক। অপরদিকে চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি নেতৃবর্গ আঞ্চলিক নেতা হিসাবেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে আত্মতৃপ্ত ছিলেন কিন্তু গান্ধীজী জাতীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্যই প্রথম থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করেন।

(৬) ন্যায়নীতির প্রতীক :

গান্ধীজীর নৈতিক মান, ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর স্বেচ্ছাকৃত আত্মনিগ্রহ এবং তাঁর দুঃসাহসিক কার্যকলাপ আদর্শবাদী ভারতীয়দের নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে এবং ভারতীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যের প্রতীকরূপে তিনি পরিগণিত হতে শুরু করেন। তবে, প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখা দেয়, যার ফলে ইয়োরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী এবং

ভারতীয় ভাবধারার ঐতিহ্যবহনকারী সাধারণ ভারতবাসী দ্বিধাহীনচিত্তে গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করে। "He was confronting Caesar by the Sermon of the Mount, Ricardo by Ruskin, terror with Tolstoy and Kippling's imperialism with Krishna's wisdom"—এই মন্তব্যের মধ্যে গান্ধীজীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণভাবে প্রকাশিত হয়।

(৭) রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

প্রথমবার সাক্ষাতের পর জওহরলাল নেহরু গান্ধীজীকে অ-রাজনৈতিক বলে মনে করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাঁর আশা ছিল যে,এই সাহায্যের বিনিময়ে ভারতীয়গণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করবে। কিন্তু তাঁর এই আশা পূরণ হয় নি এবং অনেক রাজনীতিবিদ এজন্য তাঁকে তীব্রভাবে সমালোচনাও করেন। কিন্তু জওহরলাল নেহরু অথবা অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গান্ধীজী সম্পর্কে ধারণা সঠিক ছিল না। গান্ধীজী অত্যন্ত কূটকৌশলী রাজনীতিবিদ্ ছিলেন এবং অত্যন্ত গভীরভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসকে একটি প্রকৃত রাজনৈতিক দলে পরিণত করার জন্য চরম ও নরমপন্থীদের চিন্তাধারার ব্যবধান দূর করা একান্ত প্রয়োজন ছিল ; এবং তিনি এই উদ্দেশ্যে একটি সুষ্ঠু নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেন।

(৮) বাস্তবপন্থা গ্রহণ ঃ

ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য আবেদন করেন। ভারতের অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে গ্লাডস্টোনের পদ্ধতিতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তৃতাও যে একেবারে মূল্যহীন সে কথাও তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন এবং সভা-সমিতিতে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দানের নীতিরও তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। অপরদিকে তিনি রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। সুস্থ ও স্বাভাবিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তিনি খাদি ও চরকা প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন ; তিনি চরকাকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ও শ্রমের মর্যাদার প্রতীকরূপে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। শিক্ষাব্যবস্থাকে সরলীকরণের জন্যও তিনি বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

(৯) মুসলিমদের প্রতি নীতি ঃ

মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টার মধ্যেও গান্ধীজীর রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গান্ধীজীর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক জাতীয়বাদী নেতাগণ উচ্চশ্রেণীর মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থনলাভের জন্য চেষ্টা করতেন কিন্তু গান্ধীজী তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মুসলমানদের নিকটও স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী প্রচার করেন। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের খিলাফৎ আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানান এবং এই সমর্থনের ফলেই জাতীয় কংগ্রেসের উপর তিনি একাধিপত্য স্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে মুসলিম প্রতিনিধিগণ গান্ধীজীর নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

(১০) কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন :

সত্যাগ্রহের মাধ্যমে গান্ধীজী তাঁর আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর মতে সত্যাগ্রহের অর্থ—একদিকে তাঁর ব্যক্তিগত আসক্তি অন্য দিকে অপরের আসক্তির বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন। শাসকগোষ্ঠীর ন্যায়-নীতি ও সুবিচারের বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত করে তোলার জন্য তিনি এই আন্দোলন পরিচালনা করারও পক্ষপাতী ছিলেন। চম্পারণের নীলচাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচার দূর করার জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করেন। তারপর তিনি আহমেদাবাদের সূতী-শিল্পের শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু করেন এবং তাঁর দৃষ্টান্ত শিল্পমালিকদের নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গের চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাদেও সাধারণ শ্রমিকদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়ার চেষ্টা করেন।

(১১) ব্রিটিশ-বিরোধী পরিস্থিতি :

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের একাধিক ঘটনা ভারতীয়দের মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক আলোড়নের সৃষ্টি করে। মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষেও প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব, আয়ারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ইজিপ্ট ও তুরস্কের অনুরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অপরদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমাজের প্রতিটি শ্রেণীই জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। ইতিমধ্যে ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে চরমপন্থীরা অবিলম্বে ভারতের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবি করে। মুসলিম লীগও অনুরূপ চরমপন্থী মনোবৃত্তি প্রকাশ করে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল অংশও সম্পূর্ণরূপে মন্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রস্তাবগুলোকে কঠোরভাবে নিন্দা করেন। অপরদিকে রাজনৈতিক অপরাধ দমনের জন্য রাউলাট নামক একজন ব্রিটিশ বিচারপতির সভাপতিত্বে একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি রাজনৈতিক অপরাধ দমনের পদ্ধতি সুপারিশ করে যে বিবরণী প্রদান করে, তা মন্টেগু-চেমসফোর্ড বিবরণীর সহিত একই সময়ে প্রকাশিত হয়ে রাজনৈতিক আবহাওয়াকে আরও বিষাক্ত করে তোলে। গান্ধীজী রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত কঠোর হস্তে তা দমন করে। কিছুদিন পরেই ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে অমৃতসরের জালিয়ান-ওয়ালাবাগে একটি সভা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সমবেত বিপুল সংখ্যক নিরস্ত্র জনতার উপর জেনারেল ডায়ার নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ নিষ্ঠুরভাবে শতশত গুলিবর্ষণ করে নারী-পুরুষ-শিশু-নির্বিশেষে বহু সহস্র ব্যক্তিকে নিহত ও আহত করলে সমগ্র দেশব্যাপী যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে তা রাজনৈতিক আবহাওয়াকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে।

(১২) গান্ধীজীর রাজনৈতিক গুণাবলী :

ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাব নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ এক

নতুন যুগের সূচনা করে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, সংরক্ষণশীল, বিপ্লবী, কৃষক, শ্রমিক, গ্রামবাসী ও শহরের অধিবাসী সকলকে নিয়ে গান্ধীজী ভারতব্যাপী এক জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন ও জীবিকা অর্জনের সুযোগের সম্ভাবনা দেখে নিশ্চিন্ত হয় এবং ধনিক গোষ্ঠী তাদের সম্পত্তির নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে তাঁর এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। গান্ধীজীর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিই তাঁর প্রভাব সৃষ্টির মূল কারণ। এই প্রসঙ্গে Judith Brown মন্তব্য করেন, "He (Gandhiji) was a leader with supreme political intelligence, a master strategist and a shrewd tactician." ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এবং ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবের প্রতি উপস্থিত সদস্যদের সমর্থন লাভের উপায় উদ্ভাবনের মধ্যেই তাঁর তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন ব্যর্থ হলেও খিলাফৎ আন্দোলন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার প্রতিবাদে গান্ধীজীর পরিচালিত আন্দোলন সাফল্য অর্জন করে এবং এই সাফল্যের ফলেই তিনি কংগ্রেসের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য লাভ করার সুযোগ পান।

(১৩) পুরাতন বনাম নতুন রাজনীতি :

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারতীয় রাজনীতি কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিন প্রেসিডেন্সী শহরকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। এই তিনটি শহরের রাজনীতিবিদ্‌গণই জাতীয় কংগ্রেস পরিচালনা করতেন। কিন্তু গান্ধীজী নতুন নতুন অঞ্চল থেকে তাঁর সমর্থক সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁর প্রধান সমর্থকে পরিণত হয়। মুসলিম ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে। গান্ধীজীই তাঁদের স্বার্থরক্ষা করতে সক্ষম এইরূপ ধারণাও তাদের মনে বদ্ধমূল হয়। অপরদিকে আঞ্চলিক ও ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত প্রেসিডেন্সি শহরের রাজনীতিবিদগণ গান্ধীজীর উত্থানের প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হন। Judith Brown-এর মতে তদানীন্তন কংগ্রেসের নেতৃবর্গের মধ্যে একমাত্র গান্ধীজীই সকলপ্রকার সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করতে সমর্থ হন এবং প্রতিপক্ষের সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করে তিনি সর্বভারতীয় নেতৃত্ব লাভ করেন।

Q. 20 Sketch the history of the Khilafat movememt and show how it came to be associated with the Non-Co-operation movement ?

Ans. (১) ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় ও খলিফা :

তুরস্কের অটোমান বংশীয় সুলতান মুসলিম জগতের অধিপতি বা খলিফার পদ অলংকৃত করতেন। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ও তুরস্কের খলিফার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগদান করে। স্বাভাবিকভাবেই গ্রেট ব্রিটেন তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে খলিফার পদচ্যুতি ও লাঞ্ছনার আশঙ্কা দেখা দেয়। মুসলিম জগতের অধিকর্তা খলিফার অসম্মানের আশঙ্কায় ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তবে ভারতের মুসলিমদের উদ্বেগ দূর করার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, "প্রধানতঃ তুর্কীজাতির দ্বারা অধ্যুষিত সমৃদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ এশিয়া মাইনর ও থ্রেস অঞ্চলের আধিপত্য থেকে তুরস্ককে বঞ্চিত করার জন্য গ্রেট ব্রিটেন তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় নি। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করার পর গ্রেট ব্রিটেন ও তার মিত্র রাষ্ট্রসমূহ তুরস্কের সুলতানের উপর ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে সেভরেসের চুক্তির কঠোর শর্তসমূহ আরোপ করে। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে তুরস্ক মিত্রপক্ষের হস্তে ইজিপ্ট, সুদান, সাইপ্রাস, ত্রিপোলিতানিয়া, মরক্কো, টিউনিসিয়া, আরব, প্যালেস্টাইন, মেসোপোটামিয়া ও সিরিয়া সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সাম্রাজ্যের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিত্যাগ করার পর তুরস্কের সুলতানের সাম্রাজ্য একমাত্র পর্বতসঙ্কুল আনাতোলিয়া ও ইয়োরোপের সামান্য এক প্রান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দু'বছর পূর্বে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত মুদ্রসের যুদ্ধ বিরতি চুক্তির মধ্যেই এইরূপ কঠোর শর্তের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। মুসলিম ধর্মের পবিত্রস্থান রূপে পরিচিত মেসোপোটামিয়া, আরব, সিরিয়া এবং প্যালেস্তাইন প্রভৃতি স্থানের উপর তুরস্কের সুলতানের আধিপত্যের বিলুপ্তি ভারতের মুসলমানদের পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মতো ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও প্রচণ্ড অসন্তোষের সূত্রপাত হয়।

(২) গান্ধীজী ও খিলাফৎ আন্দোলন ঃ

সেভরেসের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই ভারতের মুসলিম সমাজের কতিপয় নেতা খলিফার সমস্যা ও খিলাফতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় মুসলিম নেতৃবর্গ এই সম্পর্কে কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং গান্ধীজীর সহযোগিতা লাভ করতে সমর্থ হন। ইতিপূর্বে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর বোম্বাই শহরে কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয় এবং ভারতীয় মুসলিম সমাজের অসন্তোষে সহানুভূতি ও তাদের প্রতি সমর্থন জানান লোকমান্য তিলক, মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহরু, মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী প্রমুখ নেতৃবর্গ।

ভারতে খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন আলি ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত মোহম্মদ আলি ও সৌকৎ আলি। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে দেশের জনসাধারণের প্রতি একটি ইস্তাহার প্রচারের মাধ্যমে ভারতে খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ধর্মের অন্যতম প্রধান ও অপরিহার্য নীতি অনুসারে ঐহিক ও পারত্রিক জগতের অধিকর্তা খলিফার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অক্ষতভাবে রক্ষার প্রচেষ্টা করা। তাঁদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মুসলিম নেতাগণ ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল

এবং ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে, তুরস্কের সহিত মিত্রপক্ষের সম্পাদিত চুক্তির শর্ত ভারতীয় মুসলমানদের সন্তুষ্টি বিধানে অসমর্থ হলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করবেন। তুরস্ক সম্পর্কে গ্রেট ব্রিটেনের নীতির তিনি কঠোর সমালোচনা করেন এবং ঘোষণা করেন যে, "England cannot expect a meek submission by us to an unjust usurption of rights which to Muslims means a matter of life and death."

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে মে মাসে মিত্রপক্ষের সহিত তুরস্কের চুক্তির শর্তসমূহ প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হয়। ইংল্যাণ্ডের আচরণ ভারতের মুসলিমদের মনে গভীর অসন্তোষের কারণ-রূপে দেখা দেয়। অপরদিকে পাঞ্জাবের মর্মান্তিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হান্টার কমিশনের বিবরণীও এই সময় প্রকাশিত হয়। হান্টার কমিশনের বিবরণী ভারতীয়দের মনে পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে আরও শতগুণে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। ফলে খিলাফতের প্রশ্ন নিয়ে যে বিক্ষোভ পূর্বেই দেখা দেয় হান্টার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের ফলে ভারতের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই একযোগে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়। কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটিও গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব সমর্থন করে ইংরেজ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সম্মত হয়।

গান্ধীজী কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ৮ই সেপ্টেম্বর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই সময় খিলাফৎ আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক ঘটনা এবং মণ্ট-ফোর্ডের সংস্কারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মন প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ ছিল। এই বিক্ষোভের ফলেই গান্ধীজীর পক্ষে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এই সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে পট্টভি সীতারামাইয়া বলেন, "The *Tribeni* of the Khilafat and Punjab wrong and the invisible flow of inadequate reforms became full to the brim, and by their confluence enriched both in volume and content the stream of national discontent" গান্ধীজীর উত্থাপিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবের পক্ষে ১৮৮৬ ভোট এবং বিপক্ষে ৮৮৪টি ভোট প্রদত্ত হয়। খিলাফতের প্রশ্নে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ এবং পাঞ্জাবের জনসাধারণের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অমানুষিক অত্যাচার—এই দুটি অন্যায়ের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে অসহযোগ আন্দোলন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবি আদায়ের জন্য হিন্দুদের সমর্থন করতে অনুরোধ জানান হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, "......it is the duty of every non-Muslim Indian in every legitimate manner to assist his Muslim

brother in his attempt to remove the religious calamity that has overtaken him." পরে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নানারূপ বাধা-বিপত্তির মধ্যেই ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে যুগ্মভাবে অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন পরিচালিত হয়। জনসাধারণও এই আন্দোলনে অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। আন্দোলন মোটামুটিভাবে শান্তিপূর্ণ থাকলেও কোথাও কোথাও এই আন্দোলন হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ মালাবার অঞ্চলের মোপলা আন্দোলন অহিংস-রূপ গ্রহণ করে। এই অঞ্চলে মুসলিম ধর্মাবলম্বী আরব বংশোদ্ভূত মোগলদের বসবাস। মালাবারে স্বাধীন খিলাফৎ রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে মোপলারা ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে আগস্ট মাসে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ধর্মান্ধ মুসলিমদের ব্যাপক আক্রমণে ঐ অঞ্চলের বহু হিন্দু নিহত হয় এবং অনেকে প্রাণ রক্ষা করতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পাহাড় ও বনে দুর্গম মালাবার অঞ্চল গেরিলা যুদ্ধের আদর্শ স্থান বলে মোপলাদের দমন করতে কয়েক মাস সময় লাগে। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে। অপরদিকে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে করাচিতে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ সম্মেলনে মুসলিমদের ইংরেজ সরকারের অধীনে সামরিক বিভাগে চাকরীবাকরী করার উপর নিষেধ-আজ্ঞা জারী করে এবং ঘোষণা করে যে, ব্রিটিশ সরকার কামাল পাশার নেতৃত্বে গঠিত তুরস্কের জাতীয়তাবাদী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলে মুসলিমগণ স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করবে। ইংরেজ সরকার তখন এই আন্দোলন দমন করার জন্য আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে। জাতীয় কংগ্রেসও ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির প্রতিবাদে প্রাদেশিক সরকার-সমূহকে নিজ নিজ রাজস্ব প্রদান বন্ধসহ দায়িত্বে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার অনুমতি দেয়।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজী গুজরাটের বারদৌলিতালুকে রাজস্ব প্রদান বন্ধের আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সময় যুক্তপ্রদেশের চৌরিচোরার ঘটনা ঘটার ফলে সমস্ত পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারী এক ক্রুদ্ধ জনতা যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচোরা থানা আক্রমণ করে কয়েকজন পুলিশকে গৃহে আবদ্ধ অবস্থায় পুড়িয়ে হত্যা করায় অসহযোগ আন্দোলনের হঠাৎ রূপান্তর ঘটে এবং ঐ হিংসা যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। বারদৌলিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের যুগ্ম আন্দোলনেরও অবসান ঘটে। কারণ খিলাফৎ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাময়িকভাবে সম্প্রীতি ও ঐক্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে মুলতানে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। পরবর্তী বছরে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সাময়িক ঐক্য

বিনষ্ট হওয়া সম্পর্কে একজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী মন্তব্য করেন, "The structure so painfully erected by Mr. Gandhi has crumbled hopelessly."

ইতিমধ্যে তুরস্কের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। সেভরেসের চুক্তির পরিবর্তে মিত্রপক্ষ ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তুরস্কের সহিত লজনের চুক্তি সম্পাদন করে। অপরদিকে তুরস্কের নতুন গঠিত গ্রাণ্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী সরকারীভাবে ঘোষণা করে যে, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দেই তুরস্কের রাজতন্ত্রের অবসান হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে এই অ্যাসেম্বলী আরও ঘোষণা করে যে,শিক্ষা এবং চরিত্রের ভিত্তিতে অটোমান রাজবংশের কোন ব্যক্তিকে খলিফার পদে স্থাপন করা হবে। কিন্তু ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে খলিফার পদ চিরদিনের জন্ম বাতিল করা হয়; কারণ কামালপাশা প্রবর্তিত বিপ্লবী রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে খলিফার পদ সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। ফলে খিলাফৎ আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের নিকট একেবারেই অর্থহীন রূপে পরিগণিত হতে শুরু করে।

(৩) উপসংহার :

খিলাফৎ আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, এই আন্দোলনের সহিত জড়িত হয়ে পড়া জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে কোন রকমেই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। খিলাফৎ আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের ধর্মীয় আন্দোলন এবং খিলাফতের প্রশ্ন ইংল্যাণ্ডের সরকারের বৈদেশিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং, ভারতের ব্রিটিশ সরকারের এই বিষয়ে কোন কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। তা ছাড়া, কংগ্রেসের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বা রাজনৈতিক আদর্শের সহিতও খিলাফৎ আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না। এমন কি অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান দুই কারণ, খিলাফৎ আন্দোলন ও পাঞ্জাবের মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যেও কোন সম্পর্ক ছিল না। তুরস্কের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায় অসহযোগ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং গান্ধীজীর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে পড়ে।

Q. 21. Discuss briefly the Khilafat Movement and point out whether it helped or hindered Gandhiji's Non-co-operation Movement.

Ans. (১) ভূমিকা :

খলিফা কথাটির অর্থ উত্তরাধিকারী, প্রতিষ্ঠানটির নাম খিলাফৎ। পয়গম্বর মোহম্মদ-এর মৃত্যুর পর ৬৩২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৯৮ জন খলিফা মুসলিম দুনিয়ার প্রধানরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। পয়গম্বরের ধর্মপ্রবর্তন ছাড়া অন্য সব দায়িত্ব ও কাজের উত্তরাধিকারী ছিলেন খলিফা।

১৫১২ থেকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন মুসলিম দুনিয়ার খলিফা। খলিফাই ছিলেন মুসলিম জগতের অধিকর্তা। সুতরাং ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ও তুরস্কের সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করত।

(২) খিলাফৎ আন্দোলন :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মিত্রপক্ষের অন্যতম অংশীদাররূপে ইংলণ্ড তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয় শুরু হলে তুরস্কের অধিপতি খলিফার পদচ্যুতি ও লাঞ্ছনার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে ভারতের মুসলিমদের মধ্যে বিক্ষোভের মনোভাবের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের আশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ঘোষণা করেন যে, তুরস্ককে প্রধানতঃ তুর্কী জাতি অধ্যুষিত সমৃদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ এশিয়া মাইনর অঞ্চল ও থে্রস থেকে বঞ্চিত করার কোন ইচ্ছাই মিত্রপক্ষের নেই। কিন্তু যুদ্ধে ইংলণ্ড ও তার মিত্রশক্তির জয়লাভের পর ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে সেভরেসের কঠোর চুক্তি তুরস্কের উপর আরোপ করা হয় এবং এই চুক্তির ফলে তুরস্ক, ইজিপ্ট, সুদান, সাইপ্রাস, ত্রিপোলিতানিয়া, মরক্কো, টিউনিসিয়া, আরব, প্যালেস্তাইন, মেসোপোটামিয়া ও সিরিয়া মিত্রপক্ষের হস্তে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তির পর একমাত্র আনাতোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চল ও ইয়োরোপ মহাদেশের একপ্রান্তে তুরস্ক সাম্রাজ্যের নামমাত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে। তবে সেভরেসের চুক্তির কঠোর শর্তের পূর্বাভাস দু'বছর পূর্বে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত মুদ্রসের যুদ্ধ বিরতির চুক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় মেসোপোটামিয়া, আরব, সিরিয়া, প্যালেস্তাইন প্রভৃতি স্থানের উপর খলিফার অধিকার বিলুপ্ত হওয়ায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। বিশেষতঃ মুসলিমদের অনেক তীর্থস্থানই এই সব অঞ্চলে অবস্থিত। তবে শুধু ভারতবর্ষে নয়, খলিফার ক্ষমতা লোপ পাওয়ায় সমগ্র মুসলিম জগতেই প্রচণ্ড আলোড়নের সূচনা হয়।

(৩) গান্ধীজী ও খিলাফৎ আন্দোলন :

সেভরেসের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই ভারতের কয়েকজন মুসলিম নেতা খিলাফতের প্রশ্নটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর বোম্বাই শহরে 'সেনট্রাল' খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয়। ভারতের মুসলিম সমাজের অসন্তোষে সহানুভূতি এবং তাদের প্রতি সমর্থন জানান লোকমান্য তিলক, মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহেরু, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবর্গ। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একটি ইস্তাহারের মাধ্যমে ভারতব্যাপী খিলাফৎ আন্দোলনের কথা প্রচার করা হয়। মুসলিম জগতের ঐহিক ও পারত্রিক অধিকর্তারূপে খলিফার পদ অক্ষুণ্ণ রাখাই ছিল এই আন্দোলনের মূল দাবি। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মার্চ গান্ধীজী খিলাফৎ দাবির সমর্থনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রকাশ করেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মে সেনট্রাল খিলাফৎ কমিটির কনফারেন্সেও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে আন্দোলনের কর্মসূচী সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেন এবং গান্ধীজীর সমর্থন লাভ করতে সমর্থ হন। আলি ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত মোহম্মদ

আলি ও সৌকৎ আলি ভারতের খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খিলাফতের প্রশ্নের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল-এর সহিত এবং ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। গান্ধীজী ইতিমধ্যে ঘোষণা করেন যে, তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের শান্তিচুক্তি সন্তোষজনক না হলেও তিনি অসহযোগ আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হবেন। তাঁর ঘোষণায় বলা হয় যে, "England cannot expect a meek submission by us to an usurption of rights which to Muslim means a matter of life and death."

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে তুরস্কের সহিত মিত্রপক্ষের চুক্তির শর্তসমূহ প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়। ইংলণ্ডের প্রবঞ্চনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে এই সময় পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং এই রিপোর্টকে কেন্দ্র করে সমস্ত ভারতবাসীর মনে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার ও ক্রোধের সৃষ্টি হয়। জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের কোন পথের সন্ধান না পেয়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটিও কংগ্রেসের এই প্রস্তাব সমর্থন করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করতে প্রস্তুত হয়।

(৪) খিলাফৎ বনাম জাতীয় কংগ্রেস :

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। খিলাফৎ আন্দোলন মণ্টফোর্ড সংস্কারের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার ফলে ভারতের জনসাধারণের বিক্ষোভ তখন চরমে ওঠে এবং গান্ধীজী পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনকে তীব্র করে তোলার ব্যবস্থা করেন। ডক্টর পট্টভি সীতারামাইয়ার মতে "The *Tribeni* of the Khilafat and the Punjab wrong, and the invisible flow of inadequate reforms, became full to the brim, and by their confluence enriched both in volume and content the stream of national discontent". গান্ধীজীর প্রস্তাবের পক্ষে ১৮৮৬টি ভোট পড়ে এবং এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ৮৮৪টি ভোট পড়ে। দুটি বিষয়ের প্রতিকারের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়—খিলাফতের প্রশ্ন এবং পাঞ্জাবের জনসাধারণের উপর ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় অত্যাচার। তবে প্রস্তাবে খিলাফতের প্রশ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং মুসলিম জগতের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিকারের জন্য অমুসলিম সম্প্রদায়কে এই

আন্দোলনে যোগ দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্ম আহ্বান জানানো হয়। "It is the duty of every non-Muslim Indian in every legitimate manner to assist his Muslim brother in his attempt to remove the religious calamity that has overtaken him." অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে গ্রহণ করা হয়।

নানারূপ বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন একযোগে পরিচালিত হয়। দেশের সর্বত্র আন্দোলন যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও লাভ করে। তবে কোথাও কোথাও এই আন্দোলন সঙ্গীন হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ মালাবার অঞ্চলে মোপলা বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করে। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে করাচী শহরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ব্রিটিশ সৈন্যবিভাগে যোগদানের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। এই সিদ্ধান্তে আরও বলা হয় যে ব্রিটিশ সরকার কামাল পাশার নেতৃত্বে গঠিত তুরস্কের নতুন জাতীয়তা বাদী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করবে। ব্রিটিশ সরকার খিলাফৎ আন্দোলন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আলী-ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে। জাতীয় কংগ্রেস এই প্রত্যেকটি প্রাদেশিক সরকারকে নিজ নিজ দায়িত্বে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করা সহ আইন-অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করতে নির্দেশ দেয়।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজী গুজরাটের বারদৌলি তালুকে সরকারের রাজস্ব বন্ধ করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। এই সময় যুক্তপ্রদেশের চৌরিচোরার ঘটনা সমস্ত রাজ-নৈতিক পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। বোম্বাই ও মাদ্রাজেও দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। ফলে বাধ্য হয়ে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে ছ'বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির সম্পর্কেরও অবসান ঘটে। হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির সম্পর্কই ছিল খিলাফৎ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। ইতিমধ্যে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের মুলতানে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানেও দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের উপর একজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী এই সময় মন্তব্য করেন, "The structure so painfully erected by Mr. Gandhi had crumbled hopelessly."

ইতিমধ্যে তুরস্কের রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। সেভরেসের চুক্তির পরিবর্তে মিত্রপক্ষ ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তুরস্কের সহিত লজনের চুক্তি সম্পাদন করে। তা ছাড়া, গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী ১৯২০ খ্রীস্টাব্দেই তুরস্কের রাজতন্ত্রের অবসানের কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করে। গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর এই ঘোষণায় আরও বলা হয়

যে,এখন.থেকে শিক্ষা ও চরিত্রের ভিত্তিতে অটোমান রাজবংশের কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে খলিফার পদে নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু কামাল পাশার দ্বারা পরিচালিত গণতান্ত্রিক সরকারের সহিত খলিফাপদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন বলে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে খলিফার পদই বিলুপ্ত করা হয়। ফলে খিলাফৎ আন্দোলন মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং ভারতীয় মুসলিমগণও এই আন্দোলন পরিত্যাগ করে।

(৫) খিলাফৎ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন :

খিলাফৎ আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজী ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহিত যুক্ত করার সুযোগ গ্রহণ করেন। গান্ধীজীর ধারণা ছিল যে, অসহযোগ আন্দোলনের সহিত খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত করলে সমগ্র দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন পরিচালনা করার সুযোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গান্ধীজীর এই আশা পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, আজমল খান প্রভৃতি মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেও বেশিরভাগ মুসলমান নেতাই এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করেন। বিশেষতঃ মুসলিম লীগের তরুণ সদস্যদের এই আন্দোলনের প্রতি কোন প্রকার আকর্ষণ ছিল না। অপরদিকে মালাবার অঞ্চলের উগ্র ও ধর্মান্ধ মোপলা নামে পরিচিত আরবের মুসলিমদের বংশধরগণ খিলাফৎ আন্দোলনের নামে হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে এবং বহু হিন্দু প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে হিন্দুদের মধ্যেও খিলাফৎ তথা অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। তবে জুডিথ ব্রাউনের মতে, খিলাফৎ আন্দোলনই গান্ধীজীকে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের পদে স্থাপন করতে সাহায্য করে। তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, অসহযোগ আন্দোলনের সহিত খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত হওয়ার ফলে অসহযোগ আন্দোলনের শক্তি কোনপ্রকারেই বৃদ্ধি পায় নি। অপরদিকে খিলাফতের মতো একটি আন্তর্জাতিক সমস্যার সহিত ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যুক্ত হওয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে তা কোন প্রকারেই হিতকর হয় নি। ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজী লাভবান হলেও অসহযোগ আন্দোলনের সহিত খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত হওয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Q. 22 Was Gandhiji right in combining the Khilafat issue with the Swaraj issue ? Give reasons for your answer

Ans. (১) ভূমিকা :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে ইংলণ্ড তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের ফলে মিত্রপক্ষ অটোমান সাম্রাজ্যের এক বিরাট অংশের উপর তুরস্কের আধিপত্য ধ্বংস করার চেষ্টা করে। মেসোপোটামিয়া, ইজিপ্ট, সুদান, সাইপ্রাস,

ত্রিপোলিতামিয়া, মরক্কো, টিউনিসিয়া, আরব, প্যালেস্তাইন, সিরিয়া প্রভৃতি স্থান মিত্রপক্ষের হস্তে সমর্পণ করে তুরস্ক মিত্রপক্ষের সহিত সেভরেসের চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের সময় গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেও ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন প্রকার চেষ্টা করা হয় নি। অপরদিকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের পরাজয় ও পতনের ফলে ইসলাম জগতের অধিকর্তা খলিফার অবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান ধর্মাবলম্বীগণ তাদের ঐহিক ও পারত্রিক অধিকর্তার শক্তি ও ক্ষমতা রক্ষার জন্য বিশেষভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। খলিফাকে রক্ষা করার চেষ্টাই খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিত।

সেভরেসের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই ভারতের কয়েকজন মুসলিম নেতা খিলাফতের প্রশ্নটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর বোম্বাই শহরে কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয়। ভারতের মুসলমানদের অসন্তোষের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে তাদের সমর্থন করতে প্রস্তুত হন লোকমান্য তিলক, মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহেরু, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবর্গ। কিছুদিন পরে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মার্চ গান্ধীজী খিলাফৎ দাবির সমর্থনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রকাশ করেন। খিলাফৎ আন্দোলনের মুসলিম নেতৃবর্গও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে স্বীকৃত হন।

(২) খিলাফৎ আন্দোলন ও গান্ধীজীর ভূমিকা :

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মে-জুন মাসে মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ গ্রহণ করে গান্ধীজী খিলাফৎ আন্দোলনের প্রচারের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে জনমত গঠন করার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচারের মূল বক্তব্য ছিল যে, ইংলণ্ডের সরকার ভারতের মুসলিমদের মনোভাবের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে বিরাট অন্যায় সাধন করেছে। তুরস্কের খলিফার প্রতি আরও সদয় ব্যবহার করা মিত্রপক্ষের উচিত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করার সময়ই গান্ধীজী মুসলিমদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তিনি ধর্ম ও নীতির ভিত্তিতে খিলাফৎ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি খিলাফতের প্রশ্নের প্রতি সমর্থন জানাতে উদ্বুদ্ধ হন। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

(৩) গান্ধীজীর রাজনৈতিক কৌশল :

একাধিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গান্ধীজী খিলাফৎ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। খিলাফৎ আন্দোলনের দুই প্রধান মুসলিম নেতা মোহম্মদ আলি ও সৌকৎ আলির গ্রেপ্তারের পর গান্ধীজী হিন্দু ও মুসলিম এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের এক নতুন পথের সন্ধান পান এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন পরিচালনার এক নতুন সুযোগ লাভ করতে সমর্থ হন। গান্ধীজী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ

সরকারের জন্য যে-কোন অন্যায়ের তুলনায় খিলাফতের প্রতি তাদের অন্যায়ের গুরুত্ব ও পরিমাণ অনেক বেশি। এই-খিলাফৎ-কে কেন্দ্র করেই তিনি ব্রিটিশ সরকারের অন্যান্য অবিচার-অত্যাচারের প্রতিকার করার চেষ্টা করেন।

(৪) গান্ধীজীর প্রতি মুসলিমদের সমর্থন ঃ

জুডিথ ব্রাউনের মতে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হওয়া থেকে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১লা অগাস্ট অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণার অন্তর্বর্তী পর্বেই গান্ধীজীর দ্রুত নেতৃত্ব লাভের পথ সুগম হয়। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের মে-জুন মাসে খিলাফৎ আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য গান্ধীজী রাজনৈতিক প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে বিশেষভাবে প্রয়াসী হন। তিনি মনে করেন যে, খিলাফতের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় আচরণের ফলে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় তাঁর এই আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবে এবং ভারতের গ্রাম-গঞ্জ শহর-নগর সর্বত্র এই আন্দোলনের প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়বে। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় খিলাফতের প্রশ্নে দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং গান্ধীজীর পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। একমাত্র যেসব স্থানে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্থানীয় স্বার্থের সহিত খিলাফৎ আন্দোলনের কোনরূপ সংঘাতের আশঙ্কা ছিল না, গান্ধীজী সেইসব স্থানেই তাঁর এই আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের সমর্থন লাভ করেন। মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ সাংবাদিকগণ এবং তাঁদের মতবাদে প্রভাবান্বিত উলেমাগোষ্ঠীই গান্ধীজীর আন্দোলনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তবে সাধারণ মুসলমানদের উপর এই সব উলেমাদের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল এবং তাঁদের প্রচারের ফলে খিলাফৎ আন্দোলন আংশিকভাবে সাফল্য অর্জন করে। অপরদিকে খিলাফৎ আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে উদাসীন জাতীয় কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবর্গ পরোক্ষভাবে গান্ধীজীর জাগরণের জন্য মূলতঃ দায়ী। খিলাফৎ আন্দোলন পরিচালনা করেই গান্ধীজী হিন্দু ও মুসলমান রাজনীতিবিদদের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পান। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এবং ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে খিলাফৎপন্থী মুসলমানদের সমর্থনের ফলেই গান্ধীজী কংগ্রেসের অবিংসবাদী নেতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পান।

(৫) গান্ধীজীর ত্রুটি ও ব্যর্থতা ঃ

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য গান্ধীজীকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। তাঁর মতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃত্ববোধই ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির পথের প্রধান প্রতিবন্ধক। তা ছাড়া, জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য স্বরাজ লাভের প্রচেষ্টার সহিত খিলাফৎ আন্দোলনের কোনরূপ সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না। গান্ধীজীর সনির্বন্ধ অনুরোধে হিন্দু নেতৃবর্গ খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে বাধ্য হন। জুডিথ ব্রাউনও মনে করেন যে,

গান্ধীজী যে উপায়ে মুসলিমদের সমর্থন লাভ করার চেষ্টা করেন তার ফলাফলও যথেষ্ট বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ গান্ধীজী অহিংস উপায়ে খিলাফৎ আন্দোলন পরিচালনা করার চেষ্টা করলেও বিভিন্ন স্থানে এই আন্দোলন হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। মালাবার অঞ্চলের আরব বংশীয় মোপলা নামে পরিচিত মুসলমান সম্প্রদায় খিলাফৎ আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে হিন্দুদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করে। তাদের অত্যাচারে বহু হিন্দু নিহত হয় এবং আবার অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে প্রাণ রক্ষা করার চেষ্টা করে। মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের উপর সীমাহীন কলঙ্ক লেপন করে এবং এই আন্দোলনের মধ্যেই মুসলিম সাম্প্রদায়িক উগ্রতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময় পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে এবং মুলতান, বোম্বাই ও বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। ফলে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের আবেদন সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হয়।

অপরদিকে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার সহিত খিলাফৎ আন্দোলনের কোন প্রকার সাদৃশ্য নেই। সুতরাং এই দুটি বিষয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা কোন ভাবেই সাফল্য অর্জন করতে পারে না। কিন্তু গান্ধীজী এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের অধিবাসীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নের সহিত একটি আন্তর্জাতিক সমস্যাকে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। তুরস্কের খলিফার পদচ্যুতি এবং তুরস্কের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খিলাফতের প্রশ্ন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং ভারতীয় মুসলিমগণও গান্ধীজীর প্রতি তাদের সমস্ত সমর্থন অবিলম্বে পরিত্যাগ করে।

(৬) খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে গান্ধীজীর বিচ্ছেদ :

গান্ধীজীর সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃবর্গের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য ভাইসরয় লর্ড রীডিং বিশেষভাবে প্রয়াসী হয়ে ওঠেন এবং তিনি খিলাফৎ আন্দোলনের মুসলিম নেতাদের গান্ধীজীর প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। লর্ড রীডিং দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, অত্যন্ত অনিশ্চিত ভিত্তির উপর হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি গান্ধীজীর আশ্বাসের অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশ করে তিনি মোহম্মদ আলি এবং গান্ধীজীর মধ্যে অবিশ্বাস ও মনোমালিন্য গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে লর্ড রীডিং ব্রিটিশ সরকারের সামরিক বিভাগ বর্জন করার জন্য প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার না করে আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তা ছাড়া, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম নেতৃবর্গ গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। বিশেষতঃ মোহম্মদ সাফি, মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্, আগা খান প্রভৃতি মুসলিম নেতৃবর্গ খিলাফৎ আন্দোলনের অযৌক্তিকতার কথা দৃপ্ত কণ্ঠে প্রচার করতে শুরু করেন। গান্ধীজীর প্রধান অনুরাগী ছিলেন মুসলিম নেতাদের মধ্যে আলি ভ্রাতৃদ্বয়, আনসারী ও আবদুল বারী। আবার

এই সকল মুসলিম নেতা তাঁদের সমর্থন সংগ্রহ করার জন্য উলেমাদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সাধারণ মুসলমানদের উপর উলেমাদের গভীর প্রভাব থাকলেও শিক্ষিত মুসলমান সমাজ তাঁদের সংরক্ষণশীল মতের উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

(৬) উপসংহার ঃ

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে স্বরাজের সহিত খিলাফতের প্রশ্ন যুক্ত করে গান্ধীজী রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বুদ্ধ এবং পৃথক্ পন্থা অনুসরণে অভ্যস্ত মুসলিম রাজনীতিবিদগণ হিন্দুদের নেতৃত্ব অথবা কর্তৃত্ব অপেক্ষা ব্রিটিশদের আনুগত্যের প্রতি অধিকতর আস্থাশীল ছিলেন। খিলাফতের প্রশ্নে সাময়িকভাবে হিন্দুদের সহিত যোগ দিতে স্বীকৃত হলেও মুসলিম সম্প্রদায় রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা ব্রিটিশ সরকারের সহিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে বেশি পছন্দ করতেন। ব্রিটিশ সরকার নানারূপ প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে মুসলিমদের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তারের পক্ষপাতী ছিল। গান্ধীজী নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারের উদ্দেশ্যে মুসলিমদের সমর্থন লাভ করার জন্য ভারতের জাতীয়তাবাদী স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করেন এবং সাময়িকভাবে তাঁর হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা ফলবতী হলেও, এই ঐক্য ছিল নিতান্ত অনিশ্চিৎ এবং ক্ষণস্থায়ী। খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত অসহযোগ আন্দোলন যুক্ত হওয়ার ফলে বিভিন্ন স্থানে নানারূপ অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হয়। বিশেষতঃ সাধারণ মুসলিমগণ কখনও হিন্দুদের রাজনীতির প্রতি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাতে প্রস্তুত ছিল না। তাঁদের এই মনোভাব মুসলিম নেতৃবর্গের আচরণ ও কার্যকলাপে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্ প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে, গান্ধীজী অপেক্ষা ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় খিলাফৎ আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে গান্ধীজীর পরিকল্পিত ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসম্ভব ছিল।

Q. 23. Write a critical essay on the Non-co-operation Movement.

Ans. (১) **ভূমিকা :**

অসহযোগ আন্দোলনই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম সর্বভারতীয় মুক্তি আন্দোলন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ভারতের রাজনীতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার ভারতীয়দের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে ভারতীয়দের অসন্তোষ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তা ছাড়া, ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মার্চ রাউলাট আইনের ঘোষণা, ঐ বছরের ১৩ই এপ্রিলের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবে ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতি ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে আরও জটিল করে তোলে। অপরদিকে

খিলাফতের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোভাবও ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ বিরোধী সক্রিয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য তারাও প্রস্তুত হয়। এই সময় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করার জন্য ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এই অধিবেশনেই গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গান্ধীজীর এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রধানতঃ দুটি কারণে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ, খিলাফতের প্রশ্নে ভারতীয়দের পক্ষে নীরবতা অবলম্বন করা সম্ভব নয়। কারণ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাঁর অঙ্গীকার লঙ্ঘন করেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের সাম্রাজ্যের এক বিরাট অঞ্চল অধিকার করে মুসলিম জগতের অধিকর্তা খলিফার পদ ও সম্মানের প্রতি বিন্দুমাত্র মর্যাদা প্রকাশ করেন নি। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, ইসলাম ধর্মের এই বিপদের সময় ভারতের প্রত্যেক অমুসলিম নাগরিকেরই কর্তব্য তার মুসলিম ভ্রাতার সহিত সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করা।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ সরকারের পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর নীতির বিরুদ্ধে এবং ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেন্টের হাউস অফ লর্ডসে বিতর্কে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌দের ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিহীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।

প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, এই দুটি অন্যায়ের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত ভারতবাসীদের পক্ষে সন্তুষ্টি প্রকাশের কোনই কারণ নেই এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পথ গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই এবং যতদিন পর্যন্ত এই অন্যায়ের প্রতিকার না হয় ও স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮৮৬টি ভোটে গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হয়, এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ৮৮৪টি ভোট পড়ে। তবে জাতীয় কংগ্রেসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ গান্ধীজীর এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন এবং চিত্তরঞ্জন দাশ গান্ধীজীর উত্থাপিত অসহযোগ আন্দোলনের কঠোর সমালোচনা করেন।

(২) অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঃ

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সভায় অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গান্ধীজীর একক প্রচেষ্টাই জাতীয় কংগ্রেসকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য করে এবং নাগপুরের জাতীয় কংগ্রেসের এই অধিবেশনের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত জয়ের ইতিহাস। কংগ্রেসের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সদস্যগণ গান্ধীজীর নীতির বিরোধিতা করলেও তাঁরা গান্ধীজীর মতামত উপেক্ষা করতে পারেন নি। ডক্টর পট্টভি সীতারামাইয়ার মতে "The session was a personal triumph for Gandhi. It left everyone

of the older Congressmen—senior, leaders and patriarchs—aghast, asking themselves and each other. 'Who is this man that speaketh this with a tone of authority and whence doth he come?' Seasoned men like Pal and Malaviya and Jinnah and Khaparde, stalwarts like C. R. Das and Lala Lajpat Rai, were simply overpowered." ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে নাগপুর অধিবেশনের সময় গান্ধীজী জাতীয় কংগ্রেসের উপর যে একাধিপত্য স্থাপন করেন ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সে অধিকার তাঁর সমানভাবে অব্যাহত থাকে।

নাগপুর অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনকে একটি বাস্তবসম্মত রূপ দেওয়া হয় এবং এই আন্দোলনের একটি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ঘরে ঘরে চরকায় সূতা কাটা ও খদ্দর পরিধান, মাদকদ্রব্য বর্জন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচার, বিদেশী পণ্য বর্জন, বিদেশী খেতাব বর্জন, বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থা ও বিচার-ব্যবস্থার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ, ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা গঠিত আইন পরিষদ বর্জন এবং একই সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়াই ছিল অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচী। তবে সম্পূর্ণ অহিংসভাবে এই আন্দোলন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গান্ধীজী প্রতিশ্রুতি দেন যে, অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী সঠিকভাবে অনুসৃত হলে এক বছরের মধ্যে স্বরাজলাভ অবশ্যম্ভাবী।

(৩) অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১-১৯২২):

নাগপুর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত সমগ্র ভারতে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই আন্দোলনে যোগদান করতে এগিয়ে আসে। এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই এদেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। চরকাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হয় এবং আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগী এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে আসায় এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ব্রিটিশ সরকারও এই আন্দোলন বন্ধ করার জন্য অত্যন্ত কঠোর দমন নীতি অবলম্বন করে। সরকারের এই নীতির প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেস ও প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে আয়োজিত সমস্ত অনুষ্ঠান বর্জন করার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করে। আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী সম্পর্কেও এই সময় বিচার-বিবেচনা শুরু হয়। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ব্যক্তিগতভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে খিলাফৎ আন্দোলনের দুই প্রধান নেতা মোহম্মদ আলি ও সৌকৎ আলিকে গ্রেপ্তার করা হলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রতিটি প্রদেশকে নিজ নিজ দায়িত্বে রাজস্ব প্রদান বন্ধ সহ আইন-অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করার সম্মতি দেয়।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজী গুজরাটের বারদৌলি তালুকে সরকারের প্রতি রাজস্ব বন্ধের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করেন।

প্রথম দিকে অসহযোগ আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ছিল এবং সারা ভারতে প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী অসহযোগ আন্দোলনের জন্য কারারুদ্ধ হন। বিশেষতঃ অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন একসঙ্গে চলতে থাকায় দেশে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু জনসাধারণের প্রতি অহিংস উপায়ে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেও বিভিন্ন স্থানে এই আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। মালাবার অঞ্চলের মোপলা নামে পরিচিত আরবের মুসলমানদের বংশধরগণ খিলাফৎ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে। মোপলাদের অত্যাচারের ফলে বহু হিন্দু নিহত হয় এবং অনেকে প্রাণরক্ষার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অপরদিকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি এক ক্রুদ্ধ জনতা উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা থানা আক্রমণ করে কয়েকজন পুলিশকে গৃহে অবরুদ্ধ অবস্থায় পুড়িয়ে হত্যা করায় আন্দোলনের হঠাৎ রূপান্তর ঘটে এবং ঐ হিংসা যাতে আরও ব্যাপ্ত হতে না পারে সেজন্য গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সংকল্প গ্রহণ করেন। বারদৌলিতে কংগ্রেস কার্য-নির্বাহক কমিটির সভায় আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে সামগ্রিক-ভাবে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলেও ব্যক্তিগতভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বত্র কঠোর সমালোচনা শুরু হয়। কারান্তরাল থেকে লালা লাজপৎ রায় এবং মতিলাল নেহেরু গান্ধীজীকে দীর্ঘ পত্র পাঠান। তাঁরা মনে করেন যে, একটি স্থানে অনুষ্ঠিত অন্যায়ের জন্য গান্ধীজী সমস্ত জাতিকে শাস্তি প্রদান করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পরবর্তী বৈঠকে মিস্টার মুনজি গান্ধীজীর বিরুদ্ধে একটি নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনয়ন করেন কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভোটে এই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। তবে এই ঘটনার কিছুদিন পরে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে ছ' বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

(৪) উপসংহার :

অসহযোগ আন্দোলন প্রথমদিকে সাফল্য অর্জন করলেও কোনরূপ স্থায়ী ফল লাভ করতে ব্যর্থ হয়। তবে এই আন্দোলনের ফলে ভারতীয়দের জাতীয় চেতনা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়, "The old feelings of impotent rage and unfortunate requests gave place to a new sense of responsibility a spirit of self-reliance people realised that if they would be free they must strike the blow themselves. It was a definite call to them to cross the Rubicon and burn their boats. They cheerfully agreed to the course and began to march forward."

অসহযোগ আন্দোলন বিশেষতঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই আন্দোলনের সময় হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় যে খিলাফৎ আন্দোলন গড়ে ওঠে তার অসাফল্যের ফলে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের অন্যতম প্রধান ভিত্তি বিনষ্ট হয়। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের জন্য মহাত্মা গান্ধী বিশেষভাবে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয় নি। বিশেষতঃ খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না। খিলাফৎ আন্দোলন এবং পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সরকারের নিষ্ঠুর দমনমূলক নীতিকে কেন্দ্র করে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এই দুটি সমস্যার মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল না। আন্তর্জাতিক সমস্যা খিলাফতের সহিত জাতীয় সমস্যা ভারতের স্বরাজ্য লাভের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে গিয়ে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তিকেই শিথিল করে তোলেন। অপর-দিকে তুরস্কের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে খলিফার পদ ও মর্যাদা বিলুপ্ত হওয়ার ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের খিলাফৎ আন্দোলন মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং তারা জাতীয় কংগ্রেসের ও অসহযোগ আন্দোলনের সহিতও সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। ফলে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের জন্য গান্ধীজীর সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হয়।

Q. 24 Was Gandhiji justified in calling off the Non-cooperation Movement? Discuss, in this connection, the reasons for the collapse of the Movement.

Ans. (১) ভূমিকা :

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ভারতের সর্বত্র অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের চৌরিচৌরা গ্রামের উত্তেজিত জনতা থানা আক্রমণ করে সেখানে মোট একুশ জন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করায় আন্দোলনের হঠাৎ রূপান্তর ঘটে এবং গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। বারদোলিতে কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার জন্য গান্ধীজী কয়েকটি কারণের উল্লেখ করেন, যথা—(১) ধর্মীয় কারণেই এই আন্দোলন স্থগিত রাখা প্রয়োজন ; (২) অন্যান্য এলাকায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য এই আন্দোলন অবিলম্বে স্থগিত রাখা উচিত ; (৩) অনেক অঞ্চলে জাতীয় কংগ্রেসের যথেষ্ট প্রভাব নেই ; এবং (৪) জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির জন্যই এই আন্দোলন স্থগিত রাখা প্রয়োজন। তা ছাড়া, বিভিন্ন স্থানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বিশেষতঃ মালাবার অঞ্চলের মোপলাদের বিদ্রোহ এবং পাঞ্জাবের আকালি দলের আন্দোলন গান্ধীজীকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। তাঁর ধারণা হয় যে, আন্দোলন ক্রমে ক্রমে তাঁর মহান্ আদর্শ পরিত্যাগ করে ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করতে শুরু করে। তিনি তাঁর সহকর্মীদের কাছে প্রশ্ন করেন যে, "একদল হিংসাশ্রয়ী ব্যক্তি কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী

শয়তান প্রকৃতির শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের উন্নত ধরনের নৈতিকতার পরিচয় দিতে পারে ?" চৌরিচৌরার ঘটনাই গান্ধীজীকে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিতে বাধ্য করে। গান্ধীজী এই সময় উদ্দেশ্য সিদ্ধি অপেক্ষা আন্দোলনের কৌশলের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন।

(২) গান্ধীজীর নীতির সমালোচনা ও গান্ধীজীর উত্তর :

জওহরলাল নেহেরু এবং লালা লাজপৎ রায়ের মতো উদারপন্থী নেতৃবর্গ গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তকে তুলনারহিত ভ্রান্ত নীতি বলে বর্ণনা করেন। তাঁদের মতামত কয়েকটি বিশেষ যুক্তির উপর নির্ভরশীল, যথা—(১) গান্ধীজী ইতিমধ্যেই ভাইসরয়ের নিকট তাঁর চরমপত্র প্রেরণ করতে আপত্তি করেন নি ; (২) অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করা হলে জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচীর উপর বিরাট আঘাত পড়বে ; (৩) চৌরিচৌরার ঘটনার উপর অহেতুক বেশি গুরুত্ব আরোপ করা অসমীচীন, এবং (৪) অসহযোগ আন্দোলন ইতিমধ্যেই জনসাধারণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। গান্ধীজী স্বাভাবিকভাবেই এই সমালোচনার উত্তরে বলেন যে, হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য তিনি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এই নীতি গ্রহণ করা হয় নি। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজীর নীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর নীতির প্রতিই উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সমর্থন জানান।

(৩) মার্কসবাদী সমালোচনা :

মার্ক্সবাদী সমালোচক রজনীপাম দত্ত মনে করেন যে, ১৯২০-২১ খ্রীস্টাব্দের ভারতের আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয় এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সেইজন্য এই আন্দোলনকে পছন্দ করতে পারে নি। এই আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় শিল্পপতি ও জমিদারদের স্বার্থে জনসাধারণের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের উপর রাজনৈতিক চাপের সৃষ্টি করা। এই আন্দোলনের সাহায্যে জাতীয় কংগ্রেস বোম্বাই, আহমেদাবাদ ও কলকাতার কলকারখানার মালিক ও মহাজনদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনসাধারণের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবকে সুকৌশলে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে। ভারতীয় শিল্পপতিগণ নেপথ্য থেকে সক্রিয়ভাবে জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালকদের গণ-আন্দোলনের সংগঠন করতে নির্দেশ দেন, কিন্তু পরে এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং এই আন্দোলন বন্ধ করতে অথবা অন্য পথে পরিচালিত করার পরামর্শ দেন। ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ কখনও উৎসাহী ছিলেন না, অন্নক্লিষ্ট ক্ষুধাতুর জনসাধারণকে শোষণ করার পথের উদ্ভাবন করাই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য ; অপরদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখনও পর্যন্ত নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে তুলতে সমর্থ হয় নি।

(৪) নেহেরুর জাতীয়তাবাদী মতামত :

জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে মার্ক্সবাদী এই সমালোচনার উত্তরে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করেন।

প্রথমতঃ, মার্ক্সবাদী লেখকগণ ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ইয়োরোপের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন এবং শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবর্গের দ্বারা বার বার প্রতারণার সঙ্গে সাদৃশ্য আবিষ্কার করে ভারতীয় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন। ভারতের আন্দোলন শ্রমিক বা সর্বহারার আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন জাতীয় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের আন্দোলন—এই আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সামাজিক পরিবর্তন নয়, স্বাধীনতা অর্জন। তবে আন্দোলনের উদ্দেশ্য সুদূরপ্রসারী নয় এবং বর্তমান চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমালোচনার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, আন্দোলনের মূলভিত্তির কথা বিচার করলে নেতৃবর্গ জনসাধারণকে প্রতারণা করার চেষ্টা করেন—এরূপ মন্তব্য করার কোন যুক্তি নেই। কারণ, এই আন্দোলনের মাধ্যমে নেতাগণ কখনই শিল্পপতি বা জমিদারদের উচ্ছেদ করতে চেষ্টা করেন নি এবং এই সমালোচনার বিরুদ্ধেও তাঁরা কোন প্রকার প্রতিবাদ করেন নি।

তৃতীয়তঃ, এ কথা ঠিক যে, ভারতীয় শিল্পপতিগণ বিদেশী পণ্য বর্জনের আন্দোলনের ফলে প্রচুর লাভবান হয়। স্বদেশী পণ্য দ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সাধারণভাবেই শিল্পপতিদের লাভের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বোম্বাই-র সূতী শিল্পের কারখানার মালিকগণ ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্পপতিদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে।

(৫) ঐতিহাসিকদের মতে মতবিরোধ :

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সহকারী ঐতিহাসিক ডক্টর পট্টভি সীতারামাইয়া মনে করেন যে, জনগণ আন্দোলনের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত ছিল না বলেই এই আন্দোলন ব্যর্থ হয় এবং গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর বিখ্যাত রচনা The Indian Struggle-এ ব্রিটিশ সরকার যখন সব দিক থেকে বিপর্যস্ত তখন এই অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করার নীতিকে গান্ধীজীর পক্ষে আত্মহত্যার সমতুল্য বলে বর্ণনা করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরুও প্রায় অনুরূপ মত পোষণ করতেন। খিলাফৎ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা মৌলানা মোহম্মদ আলি মনে করেন যে, গান্ধীজীর নীতির ফলে ভারতের জনসাধারণ প্রচণ্ড আঘাত পায়।

(৬) আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা :

গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের সবচাইতে বড় ত্রুটি এই আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা। গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে, স্বরাজ এই আন্দোলনের

মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বরাজ শব্দটির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা কখনই নির্ণয় করা হয় নি। নরমপন্থী দলের অনেক নেতাই স্বরাজ অর্থে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় স্বায়ত্ত শাসনের কথা বুঝতেন। আবার অনেকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে স্বরাজ শব্দটি ব্যবহার করতেন। তবে গান্ধীজী স্বয়ং স্বরাজ শব্দটির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা দ্বিধাহীন ছিলেন এবং সকল সময়ই সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ করতেন, কারণ স্বরাজ শব্দটিকে তিনি সকল বন্ধন থেকে মুক্ত অর্থে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন।

(৭) অর্থনৈতিক কর্মসূচীর অভাব :

ব্রিটিশের মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক ও দীর্ঘ সংগ্রামে জনসাধারণকে লিপ্ত করার পূর্বেই নেতৃবর্গের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করার একান্ত প্রয়োজন ছিল। অন্নক্লিষ্ট ক্ষুধাতুর ভারতের জনসাধারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপেক্ষা দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেক বেশি আগ্রহী ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গও প্রচার করতেন যে, বিদেশী শাসনই জনসাধারণের দারিদ্র্যের মূল কারণ। সেজন্য অসহযোগ আন্দোলনের নেতাদের রাজনৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম যোগদানকারী লক্ষ লক্ষ কৃষক জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী ছিল, সুতরাং জাতীয় কংগ্রেসের এই সময় ভূমি-রাজস্ব সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী প্রস্তুত করা উচিত ছিল। কিন্তু গান্ধীজীসহ অসহযোগ আন্দোলনের কোন নেতাই এ বিষয়ে কোনপ্রকার দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি। রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা কখনও সম্ভব নয়।

(৮) সাম্প্রদায়িকতা :

হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যের প্রশ্নেও এই আন্দোলন যথেষ্ট দুর্বলতার পরিচয় দেয়। তবে নিঃসন্দেহে একথা বলা যেতে পারে যে, এই আন্দোলনের সময়ই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সর্বাধিক সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু এই সম্প্রীতির ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তুরস্কের খলিফার পদ ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য মুসলিম সম্প্রদায় যে খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করে তার প্রতি হিন্দুদের সমর্থনের ফলে এই সম্প্রীতির ভিত্তি রচিত হয়। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের অদ্ভুত ও অবাঞ্ছিত মিশ্রণের দ্বারা গান্ধীজী হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না। গান্ধীজী ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতাদের উচিত ছিল বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভিত্তির উপর হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা। কিন্তু নেতৃবর্গ এই পথ গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে তুরস্কের রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য খিলাফৎ আন্দোলন অর্থহীন হয়ে পড়লে মুসলিমগণ, এমন কি, তাদের

নেতৃবর্গও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে আবার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করতে শুরু করেন।

(৯) স্ব-বিরোধী আন্দোলন :

অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবর্গ, এমন কি, স্বয়ং গান্ধীজীও আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজনীয় কৌশল সম্পর্কে কোন কিছুই পূর্বে নির্ধারণ করার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ভারতীয় নেতৃবর্গের এই সম্পর্কে বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করার একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং সেই অনুসারে স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ দেওয়াও উচিত ছিল। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অভাবে স্থানীয় নেতৃবর্গ নিজেদের বিবেচনা অনুসারে আন্দোলন পরিচালনা করতে শুরু করেন। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের আন্দোলন বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে এবং গান্ধীজী অকস্মাৎ আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলে অবস্থা আরও জটিল আকার ধারণ করে।

গান্ধীজীর অনুচরবর্গের মতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আন্দোলন দমন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার কঠোর নীতি গৃহীত হলে আন্দোলন স্বাভাবিক ভাবেই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অল্পদিনের মধ্যেই আন্দোলন একেবারে স্তিমিত হয়ে যেত। সুতরাং গান্ধীজী উপযুক্ত সময়েই আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এই সম্পর্কে জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতেও অনুরূপ মন্তব্য করেন, "Our movement, in spite of its apparent power and widespread enthusiasm, was going to pieces" কিন্তু রজনী পাম দত্তের মতে জনগণের প্রচণ্ড শক্তি ও মনোবল থাকা সত্ত্বেও নেতৃবর্গের দুর্বলতার ফলেই আন্দোলন বন্ধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। গুণ্টুর অঞ্চলে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করার আন্দোলনের মধ্যেই জনসাধারণের শৃঙ্খলা ও মনোবলের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। গান্ধীজীর পক্ষ থেকে আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রচারিত হওয়ার পূর্বে ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চল থেকে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ রাজস্ব আদায় করতে সমর্থ হয়। রাজস্ব প্রদান বন্ধ করার নীতির বিরোধিতা করার জন্য রজনী পাম দত্ত গান্ধীজীকেও সমালোচনা করেন। সমস্ত পরিস্থিতি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে জহরলাল নেহেরুর মত কিছুতেই গ্রহণ করা সম্ভব নয় যে, জনগণের মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে তারা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে শুরু করে। আবার অপরদিকে নেতৃত্বের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়, রজনী পাম দত্তের এই মতও গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে অসহযোগ আন্দোলন সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হয়ে পড়লে গান্ধীজীর পক্ষে তাকে নিজের আয়ত্তে রাখা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। তবে এই আন্দোলনে সাফল্য বা ব্যর্থতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মতামত দেওয়া যে খুবই কঠিন গান্ধীজীও তা স্বীকার করেন। জুডিথ ব্রাউন বলেন যে, অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। নানারূপ উপাদান দিয়ে গঠিত ভারতীয় সমাজে এই পার্থক্য খুবই স্বাভাবিক। রাজপুতানায় নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিরা বিদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করতে আপত্তি করে, কারণ তাদের

ধারণা হয় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করলে তাদের অর্থ নৈতিক দুরবস্থা এবং সামাজিক অনগ্রসরতা আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রকৃতপক্ষে অনগ্রসর অনেক ব্যক্তিই মনে করত যে বর্জনকর্মসূচী 'ভদ্রলোকদের' দ্বারা 'ভদ্রলোকদের' জন্যই পরিচালিত হয়।

(১০) গান্ধীজীর বিরোধী দল এবং লর্ড রীডিং-এর নীতি :

অসহযোগ আন্দোলনের আর একটি প্রধান ত্রুটি ছিল যে গান্ধীজীর সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর, বিশেষতঃ সংবিধান সংস্কারের কোন কর্মসূচীর কোন পরিকল্পনা না থাকার জন্য নরমপন্থীদের সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু গান্ধীজীর আন্দোলনমূলক অথচ নেতিবাচক কর্মসূচীর ফলে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আস্থাশীল নরমপন্থী নেতৃবর্গের মনে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাঁদের অনেকেই ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কারের ফলে উদারনীতির সমর্থক হিসাবে আইনসভায় প্রবেশ করার সুযোগ পান। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্য সরকারকে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করতে প্ররোচিত করে। ভাইসরয় লর্ড রীডিং-এর প্রচেষ্টা ও কৌশলে গান্ধীজীর সহিত মদনমোহন মালব্যের সম্পর্কে অনেক অবনতি ঘটে। তাঁর নিকট থেকে সংবিধান সংস্কারের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার ফলে নরমপন্থী দলের অনেকেই গান্ধীজীর পথ অনুসরণ করতে অসম্মত হন। এমন কি, লর্ড রীডিং-এর চেষ্টার ফলে গান্ধীজী ও খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা মোহম্মদ আলির মধ্যে অসদ্ভাবের সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম নেতৃবর্গও গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করতে অসম্মত হন। বিশেষতঃ গান্ধীজীর রামরাজত্বের ধারণা ও আদর্শ তাঁদের তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। গান্ধীজীর জনপ্রিয়তা হ্রাসের আভাস পেয়েই লর্ড রীডিং তাঁকে গ্রেপ্তার করে ছ'বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

(১১) উপসংহার :

আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা, নেতৃবর্গের দুর্বলতা এবং জনসাধারণের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর অভাবের জন্য ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অত্যন্ত গৌরবহীন ভাবে পরিসমাপ্ত হয়। আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়ার পর গান্ধীজী প্রচণ্ড আশাবাদীর মতো ঘোষণা করেন যে, তাঁর এই সিদ্ধান্ত সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোস-মীমাংসা নয়। তিনি আরও বলেন যে, অনিবার্য কারণে আপাততঃ এই আন্দোলন স্থগিত থাকলেও উপযুক্ত সময়ে আবার আন্দোলন শুরু হবে। তবে এই আন্দোলনের ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রস্তুত করার অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ হয়। দশ বছর পরে চালিত আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় এই অভিজ্ঞতা প্রভূত সাহায্য করে এবং গান্ধীজী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই আন্দোলন পরিচালনা করতে সমর্থ হন।

Q. 20. Account for the decline of the extremist movement.

Ans. (১) সরকারী নীতি ঃ

জাতীয় কংগ্রেসের একদল নেতার আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে চরমপন্থী মতবাদের প্রথম সূত্রপাত। কিন্তু পরবর্তীকালে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নতুন জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি এবং ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির ফলে চরমপন্থীদের শক্তি ও জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত চরমপন্থী দল ভারতের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাদের এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং তাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাই প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাদের এই ব্যর্থতার কারণ একাধিক। প্রধানতঃ চরমপন্থীদের আন্দোলন দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার কঠোর ও নির্যাতনমূলক বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে নানাপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সভা-সমিতি নিষিদ্ধকরণ, আন্দোলনকারীদের উপর নানাপ্রকার নির্যাতন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং বর্বরোচিতভাবে কারাবাসের অন্তরালে চরমপন্থীদের নির্বাসন দণ্ড বিধান করে ব্রিটিশ সরকার এই বিপ্লবী আন্দোলনকে চিরদিনের জন্য নির্মূল করার চেষ্টা করে। তবে একমাত্র সরকারী নীতির ফলেই এই আন্দোলনের শক্তি হ্রাস পায় নি—এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ার আরও অনেক কারণের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

(২) বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা ঃ

বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্যের পৃষ্ঠপোষকতার নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এই স্বদেশী আন্দোলন আন্তরিকতার সহিত অনুসরণ করা হয় নি। বিশেষতঃ নরমপন্থী নেতাদের প্রভাবান্বিত প্রদেশসমূহে স্বদেশী আন্দোলনের উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। স্বদেশী পণ্যের অভাবও এই আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতীয় শিল্পের তখন শৈশব অবস্থা, তাদের পক্ষে বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব ছিল। গুণগতভাবেও বিদেশী পণ্য ছিল অনেক উন্নত মানের। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ক্রেতাগণ বিদেশী পণ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করত। ক্রেতাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ভারতে গড়ে ওঠা নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো আরও সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানই তাদের উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

অপরদিকে, স্বদেশী পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অনেক স্থানেই জাতীয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সাধারণ লোকের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ অনেক সময় জোর করেই ক্রেতাদের স্বদেশী পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য করে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে শুরু করে। বিশেষতঃ মুসলিম সম্প্রদায় স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। ফলে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা

দেখা দেখ। রবীন্দ্রনাথও বলপূর্বক স্বদেশী আন্দোলনকে সফল করার নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনার পদ্ধতি সমগ্র ভারতে কার্যকরী করার জন্য প্রচুর অর্থ, সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া, এই শিক্ষাপদ্ধতির পক্ষে ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি বানচাল করাও দুঃসাধ্য ছিল। ফলে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পত্তন হলেও সামগ্রিকভাবে দেশের প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য ছিল।

(৩) মার্কস্‌বাদী ব্যাখ্যা ঃ

সোভিয়েত ও মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক কোমারভ এবং লেভকোভস্কি চরমপন্থী আন্দোলন ধীরে ধীরে ধ্বংস হওয়ার কারণ সম্পর্কে একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁরা মনে করেন যে, "ধনতন্ত্রবাদের তীব্রতা ও ঔপনিবেশিক শোষণের" ফলেই চরমপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তাঁদের মতে চরমপন্থী নেতৃবর্গ সাধারণতঃ বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন এবং ব্রিটিশ মূলধন ও দেশীয় ভূস্বামীদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। চরমপন্থীদের তাঁরা অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন এবং এই সব ব্যক্তিরা কৃষিপণ্যের লভ্যাংশ কুসীদবৃত্তিতে লগ্নী করতেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপরও তাদের একাধিপত্য ছিল। অপরদিকে চরমপন্থীদলের নেতৃবর্গ ছিলেন সাধারণতঃ সামান্য জোতদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, স্বল্প বেতনের কেরানী, শিক্ষক, শিল্পী, কারিগর এবং ছাত্র প্রভৃতি। এই শ্রেণীবৈষম্যই তাদের চিন্তাধারার পার্থক্যের মূল কারণ।

কিন্তু মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকদের এই বিশ্লেষণ সাধারণভাবে সত্য নয়। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের অনেক বড় বড় ভূস্বামী চরমপন্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ছোট ছোট জোতদারগণ ব্রিটিশ আমলে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির ফলে মোটামুটিভাবে স্বচ্ছলতার মধ্যেই জীবন-যাপন করার সুযোগ পেতেন। সুতরাং তাঁদের পক্ষে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করে চরমপন্থীদলের পৃষ্ঠপোষকতা করার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর ও পশ্চিমবঙ্গের হরিনাভি অঞ্চলে অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিদের বসবাস। এই দুটি অঞ্চলই অনুর্বর এবং জীবিকার সংস্থানের সম্ভাবনাও খুব কম। কিন্তু এই দুটি স্থানেই চরমপন্থীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র গড়ে ওঠে। সুতরাং শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই চরমপন্থী আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এইরূপ মত পোষণ করার বিশেষ কোন সঙ্গত কারণ নেই। পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অশান্তি সৃষ্টি হলে রাওয়ালপিণ্ডির জনসভায় যাঁরা উপস্থিত হন তাঁদের বেশি সংখ্যকই ছিলেন আইনজীবী। প্রকৃতপক্ষে চরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শ ও চিন্তাধারার উপর সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ খুব কম গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তার ফলে তাঁদের এই বিশ্লেষণ ত্রুটিপূর্ণ এবং একদেশদর্শী। দেশপ্রেমের এক অদ্ভুত আদর্শের দ্বারা চরমপন্থী নেতৃবর্গ উদ্বুদ্ধ হন। অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থা তাদের আদর্শের উপর প্রভাব বিস্তার করলেও, দেশপ্রেমই ছিল তাদের প্রেরণায় প্রধান উৎস।

(৪) **হিন্দুধর্ম ও বিপ্লবী মতবাদের প্রভাব :**

চরম পন্থীদের বেশি সংখ্যক ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান এবং পেশায় ছিলেন কেরানী, শিক্ষক প্রভৃতি। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের দ্বারা বিপ্লব সংঘটিত করা প্রায় অসম্ভব। চরমপন্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক বা কৃষকদের যুক্ত করা সম্ভব হয় নি। কারণ এই আন্দোলনের সঙ্গে তাদের স্বার্থ জড়িত ছিল না এবং এই আন্দোলন জয়যুক্ত হলেও তাদের কোন বিশেষ সুযোগ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। অপরদিকে আন্দোলনের প্রধান দুই নেতা তিলক এবং অরবিন্দ ঘোষ ছাত্র সমাজের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। হিন্দুধর্মের ভাবাবেগের উপরও তাঁরা মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেন। কিন্তু ছাত্রসমাজের শক্তি প্রশংসনীয় হলেও তাদের ধৈর্য অত্যন্ত সীমিত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও তারা অত্যন্ত দুর্বল। অপরদিকে হিন্দুধর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের এই আন্দোলনের উপর বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত, গীতার শ্লোক এবং কালীর আরাধনা ও হিন্দুদের ঐতিহ্যের কাহিনী মুসলিমদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে শুরু করে।

(৫) **উপসংহার :**

চরমপন্থীদের কার্যকলাপের পরিকল্পনা সংগোপনে গৃহীত হত এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কার্যকরী করার ব্যবস্থা ছিল। তাদের আন্দোলন কখনও প্রকাশ্যরূপ গ্রহণ করে নি, ফলে জনসাধারণ এই আন্দোলনের অংশীদার হতে পারে নি অথবা তাদের সঙ্গে এই আন্দোলনের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে ওঠে নি। চরমপন্থীদের প্রতিটি ঘাঁটিই ছিল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র। সোভিয়েত ঐতিহাসিকদের মতে ব্যক্তিগতভাবে চরমপন্থীদলের সদস্যদের আক্রমণ রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং তাদের এই কার্যকলাপের ফলে চরমপন্থী আন্দোলন কখনও গণআন্দোলনে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায় নি। ডক্টর সুমিত সরকারের মতে চরমপন্থীরা ছিলেন বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন স্বপ্নময় জগতের অধিবাসী। ফলে ব্যাপক আন্দোলনের সম্ভাবনাহীন চরমপন্থী মতবাদকে ধ্বংস করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সহজতর হয়ে ওঠে। উপদলীয় সংঘর্ষও চরমপন্থীদের শক্তি হ্রাস করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। অরবিন্দের রাজনীতি থেকে বিদায়, লর্ড কার্জনের ভারত ত্যাগ, লর্ড মর্লির নরমপন্থীদের প্রতি তোষণনীতি এবং বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহারের ফলে চরমপন্থীদের শক্তি ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় রাজনীতি একটি নতুন পথ গ্রহণ করে এবং চরমপন্থীদের সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়।

Q. 21. Narrate briefly the political condition of India after 1909 which led to Congress-Muslim League Pact of 1916.

Ans (১) **ভূমিকা :**

নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগের গঠন এবং মর্লি-মিন্টো সংস্কার প্রবর্তনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা দেয়। নরমপন্থীদের ধারণা হয়েছে,

তাদের সামান্য চাহিদা পূরণ করতে ব্রিটিশ সরকার সম্মত হয় নি। গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নরমপন্থী নেতৃবর্গও ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়পরায়ণতা ও গণতান্ত্রিক উদারতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেন। মর্লি-মিন্টো সংস্কার বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রায় উনষাট শতাংশ আইন বিনা আলোচনায় গৃহীত হয়।

(২) **মুসলিম লীগ :**

মর্লি-মিন্টো সংস্কার অনুসারে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন প্রথার প্রচলন শুরু হলে মুসলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধি হতে শুরু করে। যদিও নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিচালিত ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসলিম লীগ একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। ব্যক্তিগত মর্যাদা ও প্রভাবের ফলেই মুসলিম প্রার্থীগণ আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন—মুসলিম লীগের সদস্যরূপে তাঁরা মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট বিশেষ কোন সুযোগ লাভ করেন নি।

(৩) **বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার :**

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজকীয় দরবারে ইংলণ্ডের রাজা ভারতের সম্রাট পঞ্চম জর্জের এক ঘোষণা অনুযায়ী বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার করা হয় এবং বঙ্গ-ভঙ্গকে আবার যুক্তবঙ্গে পরিণত করা হয়। ভাইসরয় লর্ড মিন্টো তাঁর পূর্বসূরী লর্ড কার্জনের অনুসৃত কঠোর দমনমূলক নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তা ছাড়া, লর্ড কার্জন ভারতের নব জাগ্রত জাতীয়তাবাদী শক্তির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করতেন না, কিন্তু লর্ড মিন্টো ভারতের এই জাতীয়তাবাদ শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বন্ধ করে চরমপন্থীদের শক্তি হ্রাস করার জন্যও বিশেষ-ভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। দিল্লী দরবার অনুষ্ঠান এবং বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহারের প্রস্তাব সম্ভবতঃ লণ্ডনেই প্রথম গৃহীত হয়। ভারত সচিব লর্ড মর্লি ও তাঁর পদের উত্তরাধি-কারী লর্ড মর্লি ক্রু উভয়ই বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতিমধ্যে লর্ড মিন্টোর স্থলে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি ভারতে পদার্পণ করেই বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি এই আন্দোলন কঠোর আইন ও দমনমূলক অত্যাচারের দ্বারা বন্ধ না করে আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি স্মারকলিপি পেশ করতে পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলার প্রতিনিধিমূলক ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত এই স্মারকলিপি যথারীতি ভাইসরয়ের নিকট পেশ করা হয়। ব্রিটিশ সরকার মুসলিম নেতাদের সঙ্গে কোনপ্রকার পরামর্শ না করেই বঙ্গ-ভঙ্গ রদ্ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে মুসলিম নেতৃবর্গ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের এই নীতিকে তারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষী ইংরেজদের আন্দোলনকারীদের নিকট দুর্ভাগ্যজনক আত্মসমর্পণ বলে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন।

(৪) **চরমপন্থীদের পতন :**

বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হওয়ার ফলে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপিত হয়।

অপরদিকে এই সময় থেকেই চরমপন্থীদের শক্তি হ্রাস হতে শুরু করে। বলপূর্বক বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার চেষ্টার ফলে সাধারণ লোক, বিশেষতঃ মুসলমানগণ আন্দোলনকারীদের বিরোধিতা শুরু করে। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি, কালী ও গীতার প্রতি সীমাহীন আকর্ষণও মুসলিমদের অসন্তুষ্ট করে তোলে। অরবিন্দের রাজনীতি পরিবর্জন, সরকার কর্তৃক কার্জনের অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ, লর্ড মিন্টোর নরমপন্থীদের প্রতি তোষণনীতি এবং বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার চরমপন্থীদের শক্তি ও জনপ্রিয়তা খর্ব করতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

(৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব :

ইয়োরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়,এবং ভারতীয়দের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে মিসেস অ্যানি বেসান্ত হোমরুল লীগ গঠন করেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে চরম ও নরমপন্থীদের বিরোধের অবসান ঘটে এবং উভয় দলের নেতৃবর্গ পুনরায় একযোগে আন্দোলন করতে সম্মত হন। মুসলিম নেতৃবর্গও এই সময় হিন্দু নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হন। ইয়োরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়াই ভারতের মুসলিম নেতৃবর্গের মত পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। ১৯১২-১৩ খ্রীস্টাব্দের বলকান যুদ্ধ ইয়োরোপে তুরস্কের শক্তি ধ্বংসোন্মুখ করে তোলে। এই যুদ্ধের সময় ইয়োরোপের খ্রীস্টান শক্তিসমূহ তুরস্কের বিরুদ্ধে যে নীতি গ্রহণ করে তাকে ভারতীয় মুসলমানগণ মধ্যযুগের ধর্মযুদ্ধের সহিত তুলনা করতে শুরু করে। ভারতের মুসলমানগণ তুরস্কের খলিফাকে মুসলিম জগতের অধিকর্তা বলে মনে করে। সুতরাং তাঁর প্রতি ইয়োরোপের খ্রীস্টান রাজ্যগুলোর ব্যবহারে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধেও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। বিশেষতঃ তুরস্কের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার কোনপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সম্মত না হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। এই ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবই মুসলিম সম্প্রদায়কে জাতীয় কংগ্রেসের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে প্ররোচিত করে। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের সংগঠন ও সংবিধানেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। মুসলীম লীগের তরুণ সদস্যগণ মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে সংগঠনের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম লীগের সংবিধান সংশোধিত হয় এবং আগাখান এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সময় মুসলিম লীগ তার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি পরিত্যাগ করে এবং ঘোষণা করে যে, ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জন করাই এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। তা ছাড়া, মুসলিম লীগ এই সময় বেশ কয়েক বছর জাতীয় কংগ্রেসের একই স্থানে এবং একই তারিখে তাদের বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করার ব্যবস্থা করে।

(৬) লক্ষ্ণৌ চুক্তি :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক ইংলণ্ডের বিপক্ষে যোগদান করে। ফলে ভারতের

মুসলিম সম্প্রদায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের দুই প্রধান নেতা মোহম্মদ আলি ও সৌকত আলি ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী দলের মুখপাত্র। সুতরাং যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার এই দুই নেতাকে অন্তরীণ রাখার ব্যবস্থা করে। মুসলিম লীগ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক পরিবর্তন সাধনের জন্য এই সময় জাতীয় কংগেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে শুরু করে। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ শহরে একই সঙ্গে মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চার'শ মুসলিম প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন। এই অধিবেশনের সময়ই তরুণ মুসলিম নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত একটি রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তিই লক্ষ্ণৌ চুক্তি নামে পরিচিত।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি অনুসারে আগামী দিনের সম্প্রসারিত প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে একটি সূত্র গৃহীত হয়। জাতীয় কংগ্রেস মুসলিমদের সংরক্ষিত আসন ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশ যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আইন সভায় নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যরা যথাক্রমে ৩০, ২৫, ৩৩ ও ১৫ শতাংশ অধিকার করার সুযোগ পাবে। মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের আইনসভায় তারা যথাক্রমে ৪০ ও ৫০ শতাংশ সদস্যপদ অধিকার করার সুযোগ পাবে।

(৭) লক্ষ্ণৌ চুক্তির গুরুত্ব ঃ

মুসলিম লীগের তরুণ নেতা মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্ কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনার সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তি সম্পাদিত হয় যুক্তপ্রদেশের তরুণ মুসলিম নেতৃবর্গ এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে। এই চুক্তির ফলে সংখ্যাগুরু মুসলিম প্রদেশগুলোর স্বার্থে, সংখ্যালঘু মুসলিম প্রদেশগুলোর স্বার্থের প্রতি, বিশেষভাবে উত্তর প্রদেশের স্বার্থের প্রতি, যথেষ্ট অবিচার করা হয়। কিন্তু উত্তর প্রদেশের প্রবীণ ও সংরক্ষণশীল মুসলিম নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে মুসলিমদের মধ্যে যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয় সেই সুযোগেই তরুণ মুসলিম নেতাগণ এরূপ একটি চুক্তি সম্পাদন করার সুযোগ লাভ করেন। ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশের মুসলিম লীগ দল মর্লি-মিন্টো সংস্কার অনুযায়ী প্রদত্ত প্রাদেশিক আইন সভার আসন সংখ্যা অপেক্ষা এই চুক্তি অনুসারে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে খুবই সন্তুষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে মর্লি-মিন্টো সংস্কারের ফলে মুসলিম সম্প্রদায় যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে লক্ষ্ণৌ চুক্তির ফলে তার পরিমাণ আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে Coupland মন্তব্য করেন, "The concession made by the Congress were far more substantial concessions that the Muslims had been given by Morley and Minto to secure their acquiescence in the Reforms of 1909".

(৮) উপসংহার :

লক্ষ্ণৌ চুক্তির ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাময়িকভাবে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এই চুক্তির এই একটিই মাত্র সুফল। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সহযোগিতার ফলে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একটি নতুন পথের সন্ধান পায়। কিন্তু এই চুক্তি স্থায়ী হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং সুযোগ-সুবিধা দান করে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যবোধকে দূর করা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া, ব্রিটিশ শাসন বিরোধী জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ আদর্শে উদ্বুদ্ধ মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করা সম্ভব ছিল না। ডক্টর লালবাহাদুরের মতে, "The Pact was bound to be transitory in character, for it was a child of circumstances. ....A communal body, that from its very birth, had consistently advocated anti-patriotic dogmas and done all in its power to widen the gap between the Hindus and Muslims, could be least expected to experience an overnight change in its fundamentals and pin its faith to the Congress ideology. Even war against Turkey would not sake the sense of loyalty which the Indian Muslims had developed for British Government in the country. The congress programme, on the other hand, demanded active opposition to the Government. The ideological differences between the two bodies made them ill-assorted-mates that was ready to part company at the first opportunity Looked at from whatever angle of vision, the Lucknow Pact was foredoomed to failure."

Q. 22. What were the causes of the Civil Disobedience Movement in 1930? Why was it suspended in 1934?

Ans. (১) **আইন অমান্য আন্দোলনের কারণ :**

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ভারতের জাতীয় আন্দোলন নানারূপ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইন:পরিষদের বিশেষ ভোটে নিরাপত্তা আইনের খসড়া বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু কিছুদিন পরে সরকার পক্ষ নতুন করে এই বিলের খসড়া আবার আইন পরিষদে পেশ করে এবং এই খসড়া বিলকে কেন্দ্র করে আইন পরিষদের ভিতরে ও বাইরে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন তার প্রাথমিক অনুসন্ধান সমাপ্ত করে এবং কমিশনের অক্সিলিয়ারী কমিটি দেশীয় রাজ্য এবং শিক্ষা বিভাগ সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে পরিবর্তন সাধিত হয় এবং রক্ষণশীল দলের পরিবর্তে উদারনৈতিক দল সেখানে মন্ত্রীত্ব গঠন করার সুযোগ

লাভ করে। নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড এবং ওয়েজউড বেন ভারত সচিবের পদ লাভ করেন। ভাইসরয় লর্ড আরউইন ভারতের শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ইংলণ্ডে যান এবং ভারতে প্রত্যাবর্তন করে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁর বিখ্যাত ঘোষণা প্রকাশ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই সময় অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করে। নানাপ্রকার রাজনৈতিক মামলা-মোকদ্দমা রুজু করে তারা বহুলোককে বিভিন্ন রকম দণ্ডে দণ্ডিত করে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিশ বর্বরোচিত অত্যাচার শুরু করে। বিনা বিচারেও বহুলোককে দীর্ঘকাল পর্যন্ত আটক রাখা হয়। বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হলে শ্রমিক-নেতাদের উপরও প্রচণ্ড অত্যাচার করা হয়। এই সময় পুলিশের বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতিবাদে রাজনৈতিক বন্দী যতীন্দ্রনাথ দাস ৬০ দিন অনশন করে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত লর্ড আরউইনের ঘোষণায় কোন নতুন প্রতিশ্রুতি ছিল না। পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি এবং বিশদ ব্যাখ্যাই ছিল তার মূল বক্তব্য। তা ছাড়া, এই ঘোষণার পর মণ্টেগুর ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের প্রতিবেদন এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কেও সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভাইসরয় আরউইন ইংলণ্ডের সরকারের সম্মতিক্রমে ঘোষণা করেন যে, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশিত যে, ভারতের সাংবিধানিক অগ্রগতির প্রধান লক্ষ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ হিসাবে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের মর্যাদা লাভ করা।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন যে, শক্তিশালী ব্যক্তিরাই জয়লাভ করতে সক্ষম এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস লাভ করলেও—ভারতবাসীর পক্ষে প্রকৃত ক্ষমতা অধিকার করা সম্ভব হবে না। এই অধিবেশনের প্রধান প্রস্তাবে জাতীয় কংগ্রেসের সংবিধানে স্বরাজ শব্দটি পূর্ণ স্বাধীনতার সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। এই অধিবেশনে আরও ঘোষণা করা হয় যে, নেহেরু কমিটির বিবরণীর প্রস্তাবিত ডোমিনিয়ন স্টাটাস বর্তমান পরিস্থিতিতে একান্তভাবেই অচল; সুতরাং কংগ্রেসের সদস্যগণ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াসী হওয়ার চেষ্টা করবেন। তা ছাড়া, কংগ্রেসের সদস্যদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আগামী দিনের সমস্ত নির্বাচন বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং আইনসভার সমস্ত কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্যদের অবিলম্বে পদত্যাগ করার জন্য অনুরোধ জানান হয়।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ভারতবাসীরা একটি শপথ বাক্য পাঠ করে এবং বছরের পর বছর এই ঘটনা ও শপথ বাক্য পাঠের পুনরাবৃত্তি করা হয়। এই শপথ বাক্যে বলা হয় যে, We believe that it is the inalienable right of the Indian people to

have freedom and enjoy the fruits of their toil and have the necessities of life, so that they may have full opportunities of growth" তবে জাতীয় কংগ্রেস অহিংস উপায়েই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং এই প্রস্তাবের শেষাংশে অহিংস আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা হয়। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের পর গান্ধীজী ভাইসরয়ের নিকট কয়েকটি সুযোগ দাবি করেন। রাজনৈতিক দিক থেকে সেইসব সুযোগ ছিল একান্তই গুরুত্বহীন। লবণের উপর ধার্য কর রহিত করা এবং ভূমি-রাজস্ব হ্রাস করাই ছিল এই সব দাবির মধ্যে প্রধান। কিন্তু ভাইসরয় এইসব দাবি পূরণ করার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করেন নি। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীকে এবং অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করার অধিকার দান করে। পরবর্তীকালে অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক ভারতবাসীকেই আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানায়। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে গান্ধীজী ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল লর্ড আরউইনকে লবণ আইন ভঙ্গের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। লর্ড আরউইনের নিকট প্রেরিত পত্রে গান্ধীজী লিখলেন, "I regard this tax to be the most iniquitious of all from the poor man's standpoint As the Independence Movement is essentially for the poorest in the land, the beginning will be made with this evil" লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ১২ মার্চ ৭৯ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে গান্ধীজী সবরমতী আশ্রম থেকে সমুদ্রতীরবর্তী ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করেন। ২৪১ মাইল পথ অতিক্রম করে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ৫ই এপ্রিল গান্ধীজী ডাণ্ডিতে পৌছান ও পরদিন ভোরে সমুদ্র উপকূলে একমুঠো লবণ সংগ্রহ করে আবগারি আইন লঙ্ঘন করেন। সেইদিন থেকে, অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

লবণ আইন ভঙ্গ করে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বলে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় আন্দোলন লবণ সত্যাগ্রহ নামে পরিচিত। লবণ আইন ভঙ্গ করে এই আন্দোলনের সূচনা হলেও পরবর্তীকালে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা আরও অনেক আইন ভঙ্গ করে। নিষিদ্ধ রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা প্রচার, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, বিদেশী কাপড় ও মাদক দ্রব্য বর্জন প্রভৃতিও আন্দোলনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

আইন অমান্য আন্দোলন দমনের জন্য ইংরেজ সরকার ভারতের নানাস্থানে আন্দোলনকারী জনতার উপর লাঠিচালনা ও গুলিবর্ষণ করে। লক্ষাধিক সত্যাগ্রহীকে কারাগারে প্রেরণ করা হত। সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফুর খানের নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহী আন্দোলন দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করে। সৈন্যদের গুলিতে প্রায় তিনশ পাঠান সত্যাগ্রহী নিহত হয়।

(২) আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার কারণ ঃ

আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার এক বছর পরে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে গান্ধীজীর সহিত ভাইসরয় আরউইনের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে স্বীকৃত হন, তার বিনিময়ে জাতীয় কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখতে প্রস্তুত হয়। ঐ বছরে করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের প্রতি পুনরায় সমর্থন জানান হয় এবং লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের এই দাবি উত্থাপন করার দায়িত্ব গান্ধীজীর উপর অর্পণ করা হয়। গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। কিন্তু জিন্নাহর কঠোর মনোভাবের জন্য তাঁর পক্ষে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে কোন সুযোগ আদায় করাই সম্ভব হয় নি। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইতিমধ্যে যুক্তপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলাদেশে নানারূপ রাজনৈতিক অশান্তি দেখা দেয়। ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতনমূলক নীতিই ছিল এই অশান্তির মূল কারণ। এই সময় লর্ড আরউইনের কার্যকাল শেষ হওয়ায় লর্ড উইলিংডন ভারতের ভাবী ভাইসরয় নিযুক্ত হন। নতুন ভাইসরয়ের সহিত ভারতের ব্রিটিশ সরকারের চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান থেকে জানা যায় যে, ভারত সরকার আইন অমান্য আন্দোলন দমন করার জন্য আরও কঠোর নীতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। ব্রিটিশ সরকারের নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে হুমকি দিলে ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজীকে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গ্রেপ্তার করে কারান্তরালে প্রেরণ করে এবং আইন অমান্য আন্দোলন দমন করার জন্য কয়েকটি অরডিন্যান্স জারী করে।

গান্ধীজী বন্দী থাকা কালে ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়কে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য উদ্যোগী হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। গান্ধীজীর প্রতিবাদে এবং এই ব্যাপারে তফসিলি নেতা ডক্টর আম্বেদকরের সহিত গান্ধীজীর পুনাচুক্তি স্বাক্ষর হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার তখনকার মতো তফসিলিদের জন্য পৃথক আসন রক্ষার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে গান্ধীজী হরিজনদের স্বার্থরক্ষার জন্য পুনরায় অ-শন শুরু করেন।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় অনেকেই ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার-মূলক এবং অর্ডিন্যান্সের দ্বারা পরিচালিত শাসনতন্ত্রের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। অপরদিকে রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে আইন সভায় প্রবেশের প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা উপলব্ধি করেন। এই সময় ডক্টর আনসারীর নেতৃত্বে নিখিল ভারত স্বরাজ্য দলকে পুনর্গঠিত করার প্রস্তাব গ্রহণ করা

হয়। গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসের সদস্যদের আইন সভায় প্রবেশের নীতিকে সমর্থন না করলেও, ইচ্ছুক ব্যক্তিদের প্রবেশের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করতে অসম্মত হন। গান্ধীজী এই সময় কংগ্রেসের সদস্যপদও ত্যাগ করেন এবং সম্পূর্ণরূপে সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি সমস্ত কংগ্রেস সদস্যকে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দেন। তাঁর এই নির্দেশে বলা হয়, "I must advise all congress men to suspend civil resistance for swaraj as distinguished from specific grievances. They should leave it to me alone. It should be resumed by others in my life time only under my direction. I give this opinion as the author and initiator of Satyagraha." এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণ হিসাবে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সত্যাগ্রহের প্রকৃত অর্থ জনসাধারণের নিকট সুস্পষ্ট নয়—বাণী প্রেরণের ত্রুটি-বিচ্যুতিই এই অবস্থার জন্য মূলতঃ দায়ী। গান্ধীজীর বক্তব্য অনুসারে, "I feel that masses have not received the full message of Satyagraha owing to its adulteration in the process of transmission. It has become clear to me that spiritual instruments suffer in their potency when their use is taught through non-spiritual media." তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, সর্বান্তঃকরণে অনুসন্ধান এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করেই গান্ধীজী উপরি-উক্ত বক্তব্য পেশ করেন এবং আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

Q. 23. Point out the salient features of the Civil Disobedience Movement during 1930-34.

Ans. (১) অসহযোগ আন্দোলন বনাম আইন অমান্য আন্দোলন ঃ

১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনের কারণগুলো সাধারণভাবে ১৯২১-১৯২২ খ্রীস্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের কারণের অনুরূপ। বিশেষতঃ অসহযোগ আন্দোলনের পশ্চাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলো পরবর্তী দশ বছরেও ব্রিটিশ সরকার পূরণ করার চেষ্টা করে নি। অসহযোগ আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হলেও গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে, প্রয়োজনবোধে যে কোন মুহূর্তে আবার আন্দোলনের পথ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সুতরাং সেদিক থেকে বিচার করলে আইন অমান্য আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের একটি ব্যাপক ও বৃহত্তর অধ্যায় হিসাবে মনে করা যেতে পারে। তবে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি স্বরাজের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতাই আইন অমান্য আন্দোলনের চরম লক্ষ্য বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজী ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নবাগত নেতারূপে পরিচিত ছিলেন কিন্তু ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের

প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নেতারূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তা ছাড়া, ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে গণ-আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত না করেই অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়, কিন্তু ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে গণ-আন্দোলনের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পরই আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডক্টর পার্সিভাল স্পিয়ার খুব সুন্দরভাবে এই দুটি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন, "Both were avowedly non-violent, but whereas the first was passively, the second was actively revolutionary. The first hoped to bring the government to a standstill by withdrawing from the administration, the second sougth to paralyse the government by the mass performance of specific illegal acts".

(২) আইন অমান্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য :

উপযুক্তভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে সংগঠিত আইন অমান্য আন্দোলনের কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ, ব্যাপকহারে সভা-সমিতি-মিছিল সংগঠন করা এবং হরতাল ও ধর্মঘটের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা। এমন কি, গান্ধীজীর নির্দেশ অমান্য করেও জনসাধারণ শান্তভাবে প্রতিবাদ জানানোর পরিবর্তে উগ্র ও সক্রিয় পথ গ্রহণ করতে শুরু করে। সরকারী নীতির ফলেই হরতাল ঘোষণা করার সুযোগের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। বোম্বাই অঞ্চলে আইন অমান্য আন্দোলন সবচাইতে ব্যাপকতা লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে বোম্বাই অঞ্চলে সরকারী শাসনের অবসান ঘটে এবং জনসাধারণই আঞ্চলিক শাসনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয়ত, সংরক্ষণশীল ও অভিজাত পরিবারের মহিলারা এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরের দোকানপাট, হাট-বাজারে পিকেটিং-এ অংশ গ্রহণ করেন।

তৃতীয়তঃ, আইন অমান্য আন্দোলন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় কিন্তু অনগ্রসর অধিবাসীদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে খান ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে পাঠানরা কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে যোগ দেয় এবং এই অধিবেশনেই আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সময়ই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফুর খানের নেতৃত্বে গঠিত অহিংস আদর্শে বিশ্বাসী সমাজসেবী মুক্তি সেনাবাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনী লালকুর্তা এবং খোদা-ই-খিদমতগার নামেও পরিচিত। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে খোদা-ই-খিদমতগার কংগ্রেসের অংশরূপে স্বীকৃতিলাভ করে এবং ১৯৩০-৩৪ খ্রীস্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে এই বাহিনী ইংরেজ সরকারের প্রচণ্ড অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করতে বাধ্য হয়। পেশোয়ারের গণ-মিছিলের উপর ব্রিটিশ সরকার প্রচণ্ড অত্যাচার করে। এমন কি, পুলিশ নির্বিচারে

জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষণ করে। কিন্তু নির্যাতন সত্ত্বেও খোদা-ই-খিদমতগার অহিংস আদর্শের বিশ্বাসে অবিচল থাকে।

চতুর্থতঃ, আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকারের শক্তির প্রধান উৎস সৈন্যবাহিনীও ব্রিটিশের দমনমূলক নীতির প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। জাতীয়তাবাদী ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারা সৈন্যবাহিনীর উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পেশোয়ারে একদল হিন্দু গাড়োয়ালী সৈন্য নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষণ করতে আপত্তি জানায় এবং জনসাধারণের দাবি-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে। এই ঘটনার বিবরণ দ্রুত বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক জায়গায়ই সৈন্যবাহিনী গাড়োয়ালী সৈন্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করে। তবে ব্রিটিশ সরকার এই সংবাদ গোপন রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। জওহরলাল নেহেরু মনে করেন যে, সৈন্যবাহিনীর ধারণা হয় যে, ব্রিটিশ রাজত্বের দ্রুত অবসান অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তারা ব্রিটিশের স্বার্থবিরোধী কার্যে লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে নি।

পঞ্চমতঃ, আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জওহরলাল নেহেরু কর বন্ধের আন্দোলন শুরু করেন। সামগ্রিক পরিস্থিতি এই আন্দোলনের অনুকূল ছিল। কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু সতর্ক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ্ নেহেরু জাতীয় কংগ্রেসের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারই যে সব অঞ্চলের জমির মালিক গান্ধীজী বেছে বেছে সে সব অঞ্চলে কর-প্রদান বন্ধের আন্দোলন শুরু করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অঞ্চল বিহার ও বাংলাদেশে এই আন্দোলন শুরু হয়—তবে এই সব অঞ্চলে কর প্রদান বন্ধ আন্দোলন কেবলমাত্র চৌকিদারী কর প্রদান বন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। গুজরাটের এই আন্দোলন খুব সাফল্য লাভ করে। বিশেষতঃ বরোদার কৃষকগণ ভূমি-রাজস্ব কর দিতে অস্বীকার করে। বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলার কাঁথি এবং ঢাকার বিক্রমপুরে এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। সরকার পক্ষের প্রচণ্ড অত্যাচার সত্ত্বেও কৃষকদের মনোবল হ্রাস পায় নি।

ষষ্ঠতঃ, আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ বিভিন্ন সরকারী অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে জনসাধারণ তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। ফলে পরোক্ষভাবে সরকারের নীতির ফলে আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। অর্ডিন্যান্সগুলো সাধারণভাবে সভাসমিতি, গণমিছিল এবং সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে জারি করা হয়। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে এবং অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ কংগ্রেসের নেতৃবর্গ পত্র-পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করার জন্য জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে আবার পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশনা অনেক দিন পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়।

সপ্তমতঃ, আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে পরে বিদেশী পণ্য বর্জনের নীতিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতের শিল্পের কলকারখানা ও কুটির শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার

প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য চেষ্টা শুরু হয়। জনসাধারণ সিগারেটের পরিবর্তে বিড়ি খেতে শুরু করে, ফলে বিড়ি শিল্প খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করে।

(৩) আইন অমান্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য (১৯৩২-১৯৩৪ খৃস্টাব্দ):

(ক) ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে সরকার দমনমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইন অমান্য আন্দোলনের গতি পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়। ফলে আইন অমান্য আন্দোলনের পরিচালনার কর্তৃত্ব জাতীয় কংগ্রেসের হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যায়। জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নীতির ফলে আন্দোলনও ধীরে ধীরে অন্য পথ গ্রহণ করতে শুরু করে।

(খ) কিন্তু সাংগঠনিক ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের ডাকে জনসাধারণের অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। কংগ্রেস গোপন সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য সমগ্র ভারতব্যাপী শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গোপনে বুলেটিনও প্রকাশ করা হতে থাকে।

(গ) আন্দোলন শুরু হওয়ার প্রথম পর্বে জাতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া সমর্থকগণ আন্দোলনকারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেও পরে বিষয়সম্পত্তি হারাবার ভয়ে তাদের সহানুভূতি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। কিন্তু কংগ্রেস বিরোধী প্রচার উপেক্ষা করেও কৃষকগণ নিজেদের অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্যই এই আন্দোলন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

(ঘ) জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বানের উপর নিষেধ-আজ্ঞা জারী হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস দিল্লী ও কলকাতায় দুটি অধিবেশন সংগঠন করতে সমর্থ হয়। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের পথিমধ্যে অবরোধ এবং গ্রেপ্তার করা হয়, তথাপি বহুলোক এই অধিবেশনে যোগ দেন এবং প্রকাশ্যে তাঁরা ব্রিটিশ সরকারকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেন।

(ঙ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অত্যাচার করার জন্য ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, আঞ্চলিক ভিত্তিতে জরিমানা আদায় এবং গ্রামাঞ্চলে শান্তিরক্ষার জন্য বিশেষ পুলিশবাহিনী মোতায়েন করার নীতি গ্রহণ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঠানদের দমনের জন্য সামরিক বাহিনী নিযুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যুবক ও যুবতীদের বাধ্যতামূলকভাবে পরিচয়পত্র ব্যবহার করার প্রথা চালু করা হয়। চাবুকের ব্যবহার খুবই সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়। মহিলাদের প্রতিও কোন বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করা হত না। একমাত্র রাজভক্ত ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করেই ব্রিটিশ সরকার শাসনকার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করে। যে সমস্ত অঞ্চলে কংগ্রেস কৃষকদের সংগঠিত করার সুযোগ লাভ করে, সেই সব জায়গায় স্থানীয় নেতাদের শাস্তি প্রদান করে অথবা অযোগ্যতা প্রমাণ করে ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনের শক্তি ধ্বংস করার ব্যবস্থা করে। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেসের উপর নানাপ্রকার মিথ্যা দুর্নাম আরোপ করে সংগঠনের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করে। ব্রিটিশ সরকার নিজেকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং জাতীয় কংগ্রেসকে

একনায়কতন্ত্রের পূজারীরূপে বর্ণনা করার চেষ্টা করে। কানপুরের দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির জন্যও তারা কংগ্রেসকে দায়ী করার চেষ্টা করে। ইঙ্গভারতীয় সংবাদপত্রগুলো ও সাংবাদিকগণ ব্রিটিশ সরকারের মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করে।

(৪) **উপসংহার :**

অসহযোগ আন্দোলনের মতো আইন অমান্য আন্দোলনও গগনচুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করার পর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই গান্ধীজী আন্দোলনের ব্যর্থতার সমস্ত দায়িত্ব জনসাধারণের স্কন্ধে আরোপ করেন। তাঁর মতে আন্দোলনের মূলনীতি জনসাধারণের পক্ষে উপলব্ধি করা কখনও সম্ভব হয় নি। ফলে প্রতিবারই প্রচণ্ড হতাশার মধ্যে আন্দোলন স্থগিতের নির্দেশ দিতে তিনি বাধ্য হন। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি এই সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "I feel that the mass have not received the full message of Satyagraha owning to its adulteration in the process of transmission. It has become clear to me that spiritual instruments suffer in their potency when their use is taught through non-spiritual media"

Q. 24. Under what circumstances did Gandhi start the Civil Disobedience Movement ?

Ans. (১) **অর্থ নৈতিক কারণ :**

মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার কার্যকরী হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভারতের অর্থনীতিতে প্রচণ্ড মন্দা দেখা দেয়। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পায় এবং পণ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য বিষয়ে সরকারী অর্থ বিনিয়োগও যথেষ্ট পরিমাণে কমে যেতে শুরু করে। কে. এম মুখার্জীর মতে ভারতের কৃষিজাত উৎপাদনের বৃদ্ধির সূচক ১৯২২-২৩ খ্রীস্টাব্দে খুব হ্রাস পায়, ১৯২৭-২৮ খ্রীস্টাব্দে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পুনরায় ১৯৩১-৩২ খ্রীস্টাব্দে বিশেষভাবে হ্রাস পায়। পণ্যদ্রব্য ও অন্যান্য বিষয়ে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১৯২২-২৩ খ্রীস্টাব্দে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭০·৪০ কোটি টাকায় পরিণত হয় কিন্তু ১৯২৪-২৫ খ্রীস্টাব্দে এই অর্থের পরিমাণ সাংঘাতিক হ্রাস পেয়ে ৩২৪·৩৩ কোটি টাকায় পরিণত হয়। প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এই পর্যাকৃত অর্থ হ্রাসের যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৯২২-২৩ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবে আদায়ীকৃত আয়করের মোট পরিমাণ ছিল ৭৫ লক্ষ টাকা, কিন্তু পরবর্তী বছরে এই অর্থের মোট পরিমাণ ৭১ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। আয়করের হ্রাস প্রকৃতপক্ষে বিত্তশালী শ্রেণীর অর্থনৈতিক নিশ্চলতার পরিচায়ক।

(২) **অর্থ নৈতিক নিশ্চলতা ও উন্নতির অভাব :**

প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রে দ্বৈতশাসনের প্রবর্তনের অর্থনৈতিক ফলাফলে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মনে প্রচণ্ড হতাশার সৃষ্টি হয়। মণ্ট-ফোর্ড বিবরণীতে বলা হয় যে, কেন্দ্র ও

প্রদেশের আয়ের উৎসগুলোকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক্ করা প্রয়োজন। এই বিবরণীর অনুমোদন অনুযায়ী রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎসসমূহ, যথা—শুল্ক, ভূমিরাজস্ব, আয়কর প্রভৃতি কেন্দ্র অথবা প্রদেশের উপর নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। কিন্তু মেস্টনের অনুমোদন অনুযায়ী আয়কর, শুল্ক, লবণের উপর ধার্য আবগারী শুল্ক, রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতি উৎস থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব কেন্দ্রের জন্য এবং ভূমিরাজস্ব, মাদকদ্রব্যের উপর ধার্য আবগারী শুল্ক, সরকারী দলিল-দস্তাবেজে ব্যবহৃত স্ট্যাম্পের ধার্য কর প্রভৃতি প্রদেশের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। মেস্টন অনুমোদনের কর্মকর্তাগণের ধারণা ছিল যে, এই সব থেকে আদায়ীকৃত অর্থের উদ্বৃত্ত অংশ প্রাদেশিক সরকার জাতীয় গঠনমূলক কাজে ব্যয় করার সুযোগ পাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যায় এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। অপরদিকে সম্পত্তিসম্পন্ন জমিদার শ্রেণীর নির্বাচকমণ্ডলীর উপর বর্দ্ধিত হারে ভূমিরাজস্ব ধার্য করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯২২ থেকে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রধানতঃ স্ট্যাম্প কাগজ, সেচখালের তীরবর্তী উপনিবেশের জমির মালিক এবং আদালতের ফী বৃদ্ধি করে ৬৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই নীতির ফলে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের উপর আর্থিক চাপের সৃষ্টি হয়। ১৯২০-এর দশকে বাংলাদেশের চার কোটি দশ লক্ষ লোকের শিক্ষাখাতে প্রতি বছর দশ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করার সামর্থ্যও প্রাদেশিক সরকারের ছিল না। সরকারের পক্ষ থেকে অর্থব্যয় হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণের উন্নতিমূলক সকলপ্রকার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। ঐতিহাসিক P. Hardy-র মতে "India was a prey in the 1920s to the tension generated by the respectable classes finding that a stagnant or logging economy was thwarting their rising expectations"

(৩) কৃষক আন্দোলন :

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে পর পর কয়েক বছর কৃষি উৎপাদনে বিরাট সংকট দেখা দেয়। পর পর কয়েক বছর অজন্মার ফলে কৃষকরা নিয়মিত কর দিতে অসমর্থ হলে ভূস্বামীগণ তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করতে শুরু করে। অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকেই কৃষকদের আন্দোলন জমিদারদের অধীনস্থ এলাকায় প্রজা বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। বিশেষতঃ যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বাংলাদেশে এই জমিদার ও প্রজার সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে। জমিদার ও প্রজার এই সংঘর্ষে বহুস্থানেই সামন্ত শ্রেণীর দ্বারা কৃষকদের শোষণের রূপ প্রতিফলিত হয়। যুক্ত প্রদেশে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এই আন্দোলন শুরু হয় এবং অবিচ্ছিন্নভাবে ঐ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী দলগুলো কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে এবং আমূল ভূমি রাজস্ব সংস্কারের জন্য জনমত গঠন করার চেষ্টা করে। জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গও কৃষক আন্দোলনের প্রতি বিশেষ

দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করেন, কারণ ভারতের অধিবাসীদের প্রায় নব্বুই শতাংশই কৃষিজীবী সুতরাং তাদের শক্তিকে উপেক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত বিশটি মূল প্রস্তাবের মধ্যে ভূমি-রাজস্বের পঞ্চাশ শতাংশ হ্রাস ও ক্ষুদ্র চাষীদের ভূমিরাজস্ব প্রদানের হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

(৪) শিল্পক্ষেত্রে অশান্তি :

শিল্পক্ষেত্রেও এই সময় দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দেয়। শ্রমিকসংঘগুলোর মধ্যে সাম্যবাদে বিশ্বাসী নেতৃবর্গ শ্রেণীসংগ্রামের মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। জাতীয় কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সদস্যগণ জওহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু, আয়েঙ্গার প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পরামর্শ অনুযায়ী কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহিত যুক্ত করতে চেষ্টা করেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী ও নরমপন্থী নেতৃবর্গের দ্বারা পরিচালিত হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দেই শ্রমিক আন্দোলন সবচাইতে প্রবল হয়ে ওঠে। বোম্বাইর বয়ন শিল্পের সব কারখানাগুলোই শ্রমিক ধর্মঘটের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ বোম্বাইর শোলাপুর ও যুক্তপ্রদেশের কানপুরের বয়ন শিল্পের শ্রমিক সংঘের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিহারের জামসেদপুরের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পাটশিল্পের এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানের রেলপথের শ্রমিকদের উপরও কমিউনিস্ট নেতাদের আধিপত্য স্থাপিত হয়। শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত রয়াল কমিশনের বিবরণীতে বলা হয়, অন্যান্য কারণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণই শ্রমিক আন্দোলনের অশান্তির জন্য মূলতঃ দায়ী। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের সময় শ্রমিকদের এক বিরাট মিছিল সংগঠন করা হয়।

(৫) জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক বিক্ষোভ :

আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাক্কালে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই অধিবেশনে ভারতের সঙ্কটাপন্ন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। গান্ধীজী এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের দ্বারা প্রস্তুত এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, "India has been ruined economically." এই ইস্তাহারে আরও বলা হয় যে, ভারতবাসীদের আয়ের অনুপাতে সরকার অনেক বেশি রাজস্ব আদায় করে। ভারতবাসী, গড়ে প্রতিদিন আয় সাত পয়সা মাত্র এবং সরকার কর্তৃক আদায়ীকৃত রাজস্বের বিশ শতাংশ ভূমিরাজস্ব থেকে এবং তিন শতাংশ লবণের উপর ধার্য শুল্ক থেকে আদায় করা হয়। ভূমিরাজস্ব ও লবণ শুল্ক বিশেষভাবে গরীবদের উপর প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে।

এই ইস্তাহারে আরও বলা হয় যে, ব্রিটিশ সরকারের নীতির ফলে হাতে কাটা সুতোর কাপড় তৈরীর মতো কুটির শিল্পগুলো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস পায়। ফলে বছরে

কমপক্ষে চারমাস কৃষকদের অলসভাবে জীবন কাটাতে হয় অপরদিকে ধ্বংস প্রাপ্ত হস্ত শিল্পের পরিবর্তে অন্য কোন শিল্প গ্রামের মানুষের নিকট প্রচলিত করার জন্য সরকার কোন প্রকার চেষ্টা করে নি। শুল্ক আদায়ের পদ্ধতি এবং নতুন মুদ্রা সুকৌশলে প্রচলনের ফলে কৃষকদের উপর করের বোঝা আরও বৃদ্ধি লাভের সুযোগ পায়। আমদানি পণ্যদ্রব্যের বেশিরভাগই ইংলণ্ড থেকে আনয়ন করার ব্যবস্থা করা হয়। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যও সুকৌশলে ও নিজেদের স্বার্থে পরিচালনা করার ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে। ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা ভারতের বাইরে চলে যাওয়ার সুযোগ দেখা দেয়।

(৬) আন্দোলনের প্রস্তুতি :

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ভারতবাসীরা একটি শপথ বাক্য পাঠ করে এবং বছরের পর বছর এই ঘটনা ও শপথ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়। এই শপথ বাক্যে বলা হয় যে, "We believe that it is the inalienable right of the Indian people to have freedom and enjov the fruits of their toil and have the necessities of life, so that they may have full opportunities of growth." তবে জাতীয় কংগ্রেস অহিংস উপায়েই পূর্ণস্বাধীনতা লাভ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং এই প্রস্তাবের শেষাংশে অহিংস আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা হয়। পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের পর ভাইসরয়ের নিকট কয়েকটি সুযোগ দাবি করা হয়। তবে রাজনৈতিকদিক থেকে এই সব সুযোগ ছিল একান্তই গুরুত্বহীন। লবণের উপর ধার্য কর রহিত করা এবং ভূমিরাজস্ব হ্রাস করাই ছিল এই সব দাবির মধ্যে প্রধান। কিন্তু ভাইসরয় এই সব দাবি পূরণ করার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করেন নি। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীকে এবং অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করার অধিকার দান করে। পরবর্তীকালে অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক ভারতবাসীকেই আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে গান্ধীজী ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল লর্ড আরউইনকে লবণ আইন ভঙ্গের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। লর্ড আরউইনের নিকট প্রেরিত পত্রে গান্ধীজী লিখলেন, "I regard this tax to be the most iniquitious of all from the poor man's standpoint. As the Independence Movement is essentially for the poorest in the land, the beginning will be made with this evil"

লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ ৭৯ জন সত্যাগ্রহী সহ গান্ধীজী সবরমতীর আশ্রম থেকে সমুদ্রতীরবর্তী ডাণ্ডি অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করেন। ২৪১ মাইল পথ অতিক্রম করে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল গান্ধীজী ডাণ্ডিতে পৌছান

ও পরদিন ভোরে সমুদ্র উপকূল থেকে একমুঠো লবণ সংগ্রহ করে আবগারী আইন লঙ্ঘন করেন।০ সেইদিন থেকে, অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

Q. 25. Review critically the Gandhi-Irwin Pact of March 1931.

(১) পটভূমিকা:

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলন সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত করে। এই আন্দোলন দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকারও নানারকম নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অপরদিকে আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার জাতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে আপোস মীমাংসার চেষ্টা করতে শুরু করে। প্রথমদিকে তেজবাহাদুর সাপ্রু, মিস্টার জয়া কর প্রমুখ সাংবাদিকদের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার আপোস প্রস্তাব উত্থাপন করার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফলে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ব্যক্তিগতভাবে আপসের জন্য চেষ্টা করতে শুরু করেন এবং পরবর্তী গোল টেবিল বৈঠকে জাতীয় কংগ্রেসকে আহ্বান করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল করার উদ্দেশ্যে তিনি গান্ধীজীসহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তার নীতির দুর্বলতাকে গোপন করে রাখার উদ্দেশ্যে দমনমূলক ব্যবস্থা আরও কঠোরভাবে কার্যকরী করার চেষ্টা করে।

(২) আপোস-মীমাংসার প্রস্তুতিপর্ব:

ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোস-মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনার সমস্ত দায়িত্ব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীর উপর ন্যস্ত করে। গান্ধীজীর আপোস মীমাংসার প্রস্তুতি হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট ছটি দাবি পেশ করেন। এই ছটি দাবি হল অপরাধীদের প্রতি ব্যাপক ক্ষমা প্রদর্শন, নির্যাতনমূলক নীতি প্রত্যাহার, সমস্ত বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ, রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের পূর্বপদে পুনর্বহাল, লবণ তৈরির স্বাধীনতা ও মাদকদ্রব্য ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করা এবং পুলিশী অত্যাচারের তদন্ত করা।

(৩) চুক্তির শর্তাবলী:

ভাইসরয় লর্ড আরউইনও আপোস-মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির প্রধান প্রধান শর্ত—(১) আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করতে হবে; (২) অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সাধন করতে প্রস্তুত থাকবে এবং লণ্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করবে। তবে এই গোল-টেবিল বৈঠকের আলাপ-আলোচনায় সরকারের প্রতিরক্ষা ও সৈন্যবাহিনীর উপর

একচেটিয়া অধিকার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। ফলে প্রতিরক্ষা ও সৈন্য বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের নিকট সম্পূর্ণ অধিকার পরিত্যাগ করে; (৩) দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতীত বিদেশী পণ্য বর্জনের নীতি ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি লাভ করে; (৪) পুলিশ বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন তদন্ত করা হবে না; (৫) ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন অর্ডিন্যান্স ও অন্যান্য সরকারী নির্দেশ প্রত্যাহার করতে এবং আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে রুজু মামলা-মোকদ্দমা বাতিল করতে সম্মত হয়। পদত্যাগী কর্মচারীদের পুনর্বহালের জন্য স্থানীয় সরকার যতদূর সম্ভব উদারনীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করবে। তবে হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত অথবা হিংসাত্মক কার্যে প্ররোচিত করার অপরাধে অভিযুক্ত এবং অবাধ্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হবে না; (৬) আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করতে ব্রিটিশ সরকার স্বীকৃত হয়; (৭) কুটির শিল্প হিসাবে অথবা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে লবণ প্রস্তুত করার উপর সরকারী নিষেধ-আজ্ঞা বহাল রাখা হলেও ভারতীয়দের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে লবণ প্রস্তুত করার সম্মতি দিতে ব্রিটিশ সরকার রাজি হয়; (৮) আদায়ীকৃত জরিমানা প্রত্যর্পণ করতে ব্রিটিশ সরকার অসম্মত হয় কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে অনাদায়ী জরিমানা মকুব করার নির্দেশ দেওয়া হয়; এবং (৯) কংগ্রেসের নেতৃবর্গের নির্দেশে জনসাধারণ আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার না করলে ব্রিটিশ সরকার তাদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার ভোগ করবে।

(৪) গান্ধী-আরউইন চুক্তির সমালোচনা :

দিল্লীতে সম্পাদিত গান্ধী-আরউইন চুক্তি জাতীয় কংগ্রেসের মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি করে। কিন্তু অর্ধনগ্ন ফকিরের প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে এইরূপ সম্মান প্রদর্শনে উইনস্টন চার্চিলের মতো রক্ষণশীল ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। নির্যাতনমূলক নীতি পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ সরকার আলাপ-আলোচনার পদ্ধতি গ্রহণ করতে স্বীকৃত হওয়ায় ভারতবাসীর মনে নতুন আনন্দ ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আলোচনার ফলাফলে ব্রিটিশ সরকারের নীতির জয় সূচিত হলে জনসাধারণ আবার বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তা ছাড়া গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্ত যে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনের গৃহীত পূর্ণ স্বরাজ সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী এ সত্যও সকলের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(৫) চুক্তির স্বপক্ষে গান্ধীজীর যুক্তি :

চুক্তির বিভিন্ন শর্তের সমর্থনে গান্ধীজীর কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করেন। (১) সরকারের সহিত সহযোগিতার ফলে জাতীয় কংগ্রেসের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে; (২) পূর্ণ স্বরাজের সিদ্ধান্তের প্রতি পুনরায় সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়, তবে একমাত্র ক্রমান্বয়িক পদ্ধতির মাধ্যমেই তা লাভ করা সম্ভব; (৩) স্বাধীনতার অর্থ ব্রিটিশ সরকারের সহিত

সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন নয়; (৪) এই চুক্তি সাময়িক চুক্তিমাত্র, জাতীয় কংগ্রেসের সম্মতি পাওয়ার পর চুক্তি স্থায়ীচুক্তিতে পরিণত হবে; (৫) এই চুক্তি কার্যকরী হওয়ার পর জাতীয় কংগ্রেস সরকারের নিকট আরও দাবিদাওয়া পেশ করার সুযোগ পাবে; (৬) কমিউনিস্ট দলের সমালোচনার উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, এই চুক্তির ফলে কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ কোনভাবেই বিনষ্ট হবে না এবং তিনি বিশেষভাবে ঘোষণা করেন যে, তাঁর পরিকল্পিত স্বরাজের প্রধান লক্ষ্যই শ্রমিক ও কৃষকদের উন্নতি বিধান করা; (৭) আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় শুরু না করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে এগারো দফা দাবি পেশ করা হয়, গান্ধীজীর মতে গোলটেবিল বৈঠকের সময় তা আদায় করা সম্ভব হবে; (৮) গান্ধীজী সকলকে উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ত্যাগ করে ধৈর্য ধরতে পরামর্শ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, আপোস-মীমাংসায় উভয় পক্ষেরই কিছু স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন দেখা দেয়।

(৬) চুক্তির প্রতি কংগ্রেসের সমর্থন ও বিক্ষোভ:

গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কিছুদিন পরে এই চুক্তি অনুমোদনের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ করাচী অধিবেশনে সম্মিলিত হন। সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর সঙ্গীদের জীবন রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় গান্ধীজীর নীতির প্রতি ইতিমধ্যেই জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। গান্ধীজী করাচীতে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি কৃষ্ণ পতাকা প্রদর্শন করা হয় এবং 'গান্ধীজী নিপাত যাক,' 'ভগৎ সিং-এর ফাঁসির জন্য গান্ধীজীই দায়ী' প্রভৃতি ধ্বনি দেওয়া হয়। অধিবেশনে উপস্থিত উদারপন্থী নেতৃবর্গও জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে এই চুক্তির তীব্র সমালোচনা করেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু মন্তব্য করেন, "The agreement was a great disappointment to the politically minded sections of the people and the youth organisation of the country" কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি রোধের উদ্দেশ্যে জাতীয় কংগ্রেসের উদারপন্থী নেতৃবর্গ গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদন করতে সম্মত হন। তবে এই অনুমোদনের পরিবর্তে তাঁরা নেতৃত্বের অংশীদাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করার এবং তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করার সুযোগ পান।

করাচী কংগ্রেসে গান্ধী-আরউইন চুক্তির প্রতি অনুমোদন জ্ঞাপনের ফলে সমগ্রভারতে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সংগঠিতভাবে বিভিন্ন কংগ্রেস কর্মীগণ, বিশেষতঃ তরুণ কংগ্রেস কর্মীগণ এই চুক্তি ও তার অনুমোদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। এমন কি, গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর লণ্ডন যাত্রার সময়ও তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অপরদিকে গান্ধীজী কংগ্রেস কর্মীদের আন্দোলন প্রত্যাহার করতে এবং কৃষকদের ভূমিরাজস্ব পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু লণ্ডনের গোলটেবিলের বৈঠক থেকে গান্ধীজী প্রায় রিক্ত হস্তে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে ভারতের সর্বত্র বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই বৈঠকেই গান্ধী-আরউইন চুক্তির অসারতাও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে পড়ে। ফলে চতুর্দিকেই আবার আইন অমান্য আন্দোলনের

প্রস্তুতি শুরু হয়। উত্তর প্রদেশে খাজনা বন্ধের আন্দোলন শুরু হয় এবং বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ পুনরায় জেগে ওঠে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লাল-কুর্তার দল নানাস্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সরকারও পুনরায় দমননীতি গ্রহণ করে।

(৬) **উপসংহার :**

লর্ড আরউইন এবং গান্ধীজী উভয়ে সর্বান্তঃকরণে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থা করার চেষ্টা করলে ভারতে রাজনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত। বিশেষতঃ দিল্লী চুক্তি একটি সাময়িক শান্তি চুক্তি মাত্র, স্থায়ী ব্যবস্থার মাধ্যমে এই শান্তি অব্যাহত রাখার প্রয়োজন ছিল। উভয় পক্ষের চরমপন্থী দল প্রথম থেকেই এই চুক্তির সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। উইনস্টন চার্চিলের মতো রক্ষণশীল ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যক্তিরা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে কোন প্রকার আপোস-মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন না; অপরদিকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির সহিত এই চুক্তির সামঞ্জস্যহীনতার কথা সম্যকরূপে উপলব্ধি করে এই চুক্তির প্রতিটি শর্তকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। সর্দার ভগৎ সিং-এর মতো বিপ্লবীদের প্রতি সাধারণভাবে ক্ষমা প্রদর্শনের নীতি এই চুক্তিতে গৃহীত না হওয়ার ফলেও অনেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। গান্ধীজী দেশে প্রত্যাবর্তনের পর আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলেও তার তীব্রতা অনেক হ্রাস পায় এবং গান্ধীজীর ব্যক্তিগত আকর্ষণীয় ক্ষমতাও ইতিমধ্যে যথেষ্ট লোপ পায়। তবে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে জাতীয় কংগ্রেস প্রায় ব্রিটিশ সরকারের সমান মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু অপরদিকে ব্রিটিশ সরকার দমনমূলক নীতির তীব্রতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় লাভ করতে সমর্থ হয়।

Q 26 Discuss the work of the Round Table Conference

Ans. (১) **পটভূমিকা :**

সাইমন কমিশনই গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব উত্থাপন করে। ভারতের সাংবিধানিক সমস্যার বিশদ আলোচনাই ছিল গোলটেবিল বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে সাইমন কমিশনের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড আরউইন গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানের ঘোষণা প্রকাশ করেন।

(২) **গোলটেবিল বৈঠক :**

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে লণ্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক আহূত হয়। কিন্তু এই সময় জাতীয় কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে এবং গোলটেবিল বৈঠক বর্জন করে। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে। ইতিমধ্যে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য গান্ধীজীকে একমাত্র প্রতিনিধি মনোনয়ন করেন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে এবং এই বৈঠকেও জাতীয় কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করতে সম্মত হয় নি।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বসে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ১২ নভেম্বর, চলে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত। কংগ্রেস নেতৃবর্গ ঐ বৈঠক বর্জন করেন। মোট ৮৯ জন প্রতিনিধি বৈঠকে যোগ দেন। তার মধ্যে ১৬ জন ছিলেন ভারতের রাজন্যবর্গের, ৫৭ জন কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং ১৬ জন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস এই বৈঠক বর্জন করার ফলে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

(৩) দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক :

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর, চলে ঐ বছরের ১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত রাজনৈতিক দলই অংশগ্রহণ করে। তা ছাড়া, দেশীয় নৃপতিবর্গ এবং ইংলণ্ডের তিনটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণই এই বৈঠকে যোগদান করে। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীর যোগদানের ফলে এই সম্মেলনের মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এই সম্মেলনের প্রতিটি বিষয় সম্পাদন করার চেষ্টা করেন। এই সম্মেলনের ফলে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রই ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করে।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো' এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষা—এই দুইটিই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। তবে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের সমস্যাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারূপে দেখা দেয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ তাঁদের পৃথক দাবি-দাওয়া সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। এই বৈঠকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনই মীমাংসা হয় নি, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা এবং কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর আর্থিক সঙ্গতির বন্টন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা অগ্রসর হয়। অধিবেশনের শেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, "সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের মহান আদর্শ তখনও অক্ষুন্ন আছে। দায়িত্বশীল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার স্থাপনের নীতিও অপরিবর্তিত রাখা হল—তবে সাময়িকভাবে দায়িত্বশীল শাসনেরও কিছু ব্যতিক্রম ও রক্ষা-কবচ থাকবে এবং এই বিষয়ে আমরা একমত যে, ভবিষ্যতে গভর্নরশাসিত প্রদেশগুলো দায়িত্বশীল শাসনকেন্দ্রে পরিণত হবে এবং নিজস্ব এলাকার মধ্যে নিজস্ব নীতি অনুসরণে বাইরের হস্তক্ষেপ ও নির্দেশ পালনের দায়িত্ব থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাকবে।" "The great idea of an All India Federation still holds the field. The principal of responsible Federal Government, subject to certain reservation and safeguard through a transition period, remains unchanged. And we are all agreed that the Governor's provinces of the future are to be responsibly governed units, enjoying the greatest possible measure of freedom from outside interference and dictation in carrying out their own policies in their own sphere."

কিন্তু মহান্ ও উচ্চ আদর্শের ঘোষণা সত্ত্বেও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় এবং গান্ধীজী রিক্ত হস্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে দেশের সর্বত্র বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়। জনসাধারণের নিকট জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক মর্যাদাও যথেষ্ট হ্রাস পায়। গান্ধীজীর ব্যর্থতা ও তাঁর রাজনৈতিক মর্যাদা বিশেষভাবে নষ্ট হওয়ার ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় রাজনীতির উপর নিজের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পূর্ণ সুযোগ লাভ করে।

(৪) তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ঃ

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয় ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর, শেষ হয় ঐ বছরের ২৪শে ডিসেম্বর। তৃতীয় বা শেষ গোলটেবিল বৈঠকে ইংলণ্ডের শ্রমিক দল এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কোনরূপ অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করাই ছিল এই বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য। মুসলিম নেতৃবর্গের দাবি অনুসারে এই বৈঠকে স্বতন্ত্র সিন্ধু প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তৎকালীন ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ঘোষণা করেন যে, ভারতের প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলিমদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। এই অধিবেশনে স্থির হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উর্ধ্বতন কক্ষের সদস্যবৃন্দ প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষের সদস্যগণ জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। এই বৈঠকে উপস্থিত হিন্দু প্রতিনিধিগণ বাড়তি ক্ষমতা (residuary powers) কেন্দ্রের হস্তে অর্পণ করার জন্য দাবি তোলেন, কিন্তু মুসলমান প্রতিনিধিগণ প্রদেশের উপর এই ক্ষমতা অর্পণের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে শুরু করেন। ফলে গভর্নর জেনারেলের উপর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, সংবিধান সংশোধন, সার্বভৌম ক্ষমতা ও প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয় ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেন্টের উপর ন্যস্ত থাকবে, অন্যান্য বিষয়ে গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে ভারতীয় আইন পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এই বৈঠকে ভারতের অর্থবিভাগ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সম্পর্কেও প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। বৈঠকে স্থির হয় যে, এই দুটি বিভাগ সম্পর্কে উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের যুগ্ম মনোনীত কমিটির নিকট পেশ করতে হবে। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে শাসনতান্ত্রিক এই সকল পরিবর্তনের প্রস্তাব গ্রথিত করে ব্রিটিশ সরকার একটি শ্বেতপত্র বা সরকারী দলিল প্রকাশ করে। রক্ষণশীল দলের কঠোর সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহতি লাভই ছিল এই শ্বেতপত্র প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। ভারতের শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবগুলো পরীক্ষা করার জন্য পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে একটি যুক্ত কমিটি গঠন করা হয়। লর্ড লিনলিথগোর সভাপতিত্বে এই কমিটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারগুলোর প্রতি সমর্থন জানায়। কিন্তু

উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্বে পার্লামেন্টের একদল সদস্য ভারতীয়দের প্রতি এই সুযোগ-সুবিধা দানের নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন।

তেজবাহাদুর সাপ্রু এবং জয়াকরের মতো উদারপন্থী ভারতীয় নেতৃবর্গ অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী প্রদেশগুলোর আরোপিত শর্তসমূহ প্রকাশের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট দাবি করেন। বিশেষ এবং সংরক্ষিত ক্ষমতা সম্পর্কেও তাঁরা কয়েকটি সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু সম্মেলন শেষ হওয়ার পূর্বেই এই দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার ব্যর্থতার কথা সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সম্মেলন সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারে নি। ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল ইতিমধ্যেই ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। ফলে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের পর জাতীয় কংগ্রেসের সহিত ইংরেজ শাসকদের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠে।

(৫) গোলটেবিল বৈঠকের মূল্যায়ন :

নানারূপ ব্যর্থতা ও দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ভারতের সংবিধান প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গোলটেবিল বৈঠকের মূল্য অপরিসীম। গোলটেবিল বৈঠকেই শাসক ইংরেজ ও শাসিত ভারতীয়গণ সমান মর্যাদায় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। কুপল্যাণ্ডের মতে নিতান্ত সীমিত হলেও গোলটেবিল বৈঠক ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দাবী পূরণ করতে চেষ্টা করে এবং কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধাও দান করার ব্যবস্থা করে। গোলটেবিল বৈঠকের ফলেই ইংলণ্ড তথা ইয়োরোপের জনসাধারণ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। গুরুত্বপূর্ণ অনেক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলেও গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমেই বহু জটিল সমস্যা সমাধানের পথের অনুসন্ধান পাওয়া সম্ভবপর হয়। ভারতে সাংবিধানিক বিবর্তনের ইতিহাসে গোল-টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

Q. 27. Write a note on the Government of India Act, 1935.

Ans. (১) **ভূমিকা :**

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে লণ্ডনে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ইংলণ্ডের শ্রমিকদল এই বৈঠক বর্জন করে, ফলে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক প্রতিনিধি এই বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে গোলটেবিল বৈঠকে আলোচিত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাবসমূহ গ্রথিত করে ব্রিটিশ সরকার একটি শ্বেতপত্র বা সরকারী দলিল প্রকাশ করে। লর্ড লিনলিথগোর সভাপতিত্বে শাসনতন্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করে দেখার জন্য পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে একটি যুক্ত কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এই যুক্ত কমিটির বিবরণের উপর ভিত্তি করে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে একটি বিল রচিত ও পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়। অনেক তর্ক-বিতর্ক ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ১৯৩৫

খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে এই বিল পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে রাজস্বাক্ষর লাভ করে এবং আইনে পরিণত হয়। এই আইনই ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন বিধি নামে পরিচিত।

(২) প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা :

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের শাসন বিধি অনুযায়ী প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের ব্যবস্থা হয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে যে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, নতুন আইন অনুসারে তা বিলোপ করা হয়। প্রাদেশিক শাসন বিষয়গুলোর মধ্যে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এইরূপ যে বিভাগ পূর্বে প্রচলিত ছিল তাও রহিত হয়। নতুন আইন অনুসারে গভর্নরের শাসন পরিষদেরও বিলুপ্তি ঘটে। তবে প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত সকল বিষয়ের শাসনের ক্ষেত্রেই গভর্নর কয়েকজন মন্ত্রীর সহযোগে কার্য পরিচালনা করবেন বলে এই আইনে স্থির হয়। মন্ত্রিগণ প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত হবেন এবং আইসভার নিকট তাঁরা দায়িত্ব বহন করবেন। কিন্তু প্রাদেশিক গভর্নরকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়, এই বিশেষ ক্ষমতার বলে গভর্নর অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করার আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের সহিত আদৌ পরামর্শ না করার ক্ষমতা লাভ করেন।

(৩) কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা :

ভারতের রাষ্ট্র সংগঠন এতদিন ছিল এককেন্দ্রিক—কিন্তু বর্তমানে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রবর্তন করার ব্যবস্থা করা হয়। ব্রিটিশ-ভারতের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত প্রদেশ এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে ইচ্ছুক দেশীয় রাজ্যসমূহ নিয়ে এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। তবে নতুন আইনে স্থির হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষেত্রে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি বিষয় গভর্নর জেনারেল কয়েকজন পরামর্শদাতার সাহায্যে শাসন করবেন। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র সম্পর্ক ও রাজকীয় বিষয়গুলো এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়গুলো গভর্নর জেনারেল কয়েকজন মন্ত্রীর সাহায্যে শাসন করবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হবেন এবং ঐ আইন সভার নিকট দায়ী থাকবেন। তবে এ ক্ষেত্রেও প্রাদেশিক গভর্নরের ন্যায় বড়লাট কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করার সুযোগ পাবেন। যে কোন দেশীয় রাজ্য ইচ্ছা করলেই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবে। তবে সে ক্ষেত্রে ঐ রাজ্য ভারত সরকারকে 'অধিরোহণ পত্র' (Instrument of Accessio..) নামে একটি দলিল প্রদান করবে।

ব্রিটিশ-ভারতের প্রদেশগুলো সম্পর্কে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র দেশে পরিণত করা হয়। সিন্ধু ও উড়িষ্যাকেও দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হয়। তা ছাড়া, চীফ-কমিশনার শাসিত এলাকা ব্যতীত সকল প্রদেশকেই সমান মর্যাদা অর্থাৎ অভিন্ন শাসন কাঠামো প্রদান করা হয়।

(৪) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ঃ

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সম্প্রসারণ করা হয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদকে দ্বিকক্ষ পরিষদে পরিণত করা হয়। ঊর্ধ্ব কক্ষের নাম হয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ এবং নিম্ন কক্ষের নাম হয় ব্যবস্থা পরিষদ। অনধিক ২৬০ জন সদস্য নিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত করার ব্যবস্থা করা হয়। তার মধ্যে ১৫৬ জন থাকবেন ব্রিটিশ ভারতের পক্ষ থেকে। এবং অনধিক ১০৪ জন থাকবেন দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণ—স্ব-স্ব নৃপতিগণের দ্বারা তাঁরা মনোনীত হবেন। এই কক্ষটি স্থায়ী পরিষদরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু প্রতি তিন বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের পদ শূন্য হবে। নিম্ন পরিষদের উর্ধ্বতম সদস্য সংখ্যা ধার্য হয় ৩৭৫ ; তার মধ্যে স্থির হয় যে ২৫০ জন থাকবেন ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রদেশগুলোর প্রতিনিধি এবং অনধিক ১২৫ জন থাকবেন দেশীয় রাজসমূহের প্রতিনিধি। ব্রিটিশ-ভারতের প্রতিনিধিগণ সকলেই হবেন নির্বাচিত এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ নৃপতিদের দ্বারাই নিযুক্ত হবেন। নিম্ন পরিষদের কার্যকাল স্থির হয় ৫ বছর।

যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় প্রদত্ত বিষয়গুলের উপর, যথা—দেশ রক্ষা, বহির্বিষয়, রেলপথ, মুদ্রাঙ্কন, বন্দর, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় ইত্যাদি বিষয়ে আইন রচনার ক্ষমতা এই কেন্দ্রীয় আইন পরিষদকে প্রদান করা হয়। যুগ্ম তালিকায় প্রদত্ত বিষয়গুলোর উপরও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এই পরিষদকে প্রদান করা হয়। তবে এই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নানারূপ বিধি-নিষেধের এবং বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। এই পরিষদের উপর রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়, যদিও বাজেটের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এই পরিষদকে দেওয়া হয় নি। বড়লাট কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকেই মন্ত্রীদের নিযুক্ত করতেন এবং মন্ত্রিগণ আইন পরিষদের নিকট দায়িত্ব বহন করতেন।

(৫) প্রাদেশিক আইন পরিষদ ঃ

প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহেরও সম্প্রসারণ করা হয়। কোন কোন প্রদেশের আইন পরিষদকে দ্বিকক্ষ এবং কোন কোন প্রদেশের আইন পরিষদকে এক কক্ষ করা হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলাদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসাম—এই ছ'টি প্রদেশে দ্বিকক্ষ আইন পরিষদ এবং অন্যান্য প্রদেশগুলোতে এক কক্ষ পরিষদ গঠিত হয়। দ্বি-কক্ষ আইন পরিষদের ঊর্ধ্বকক্ষের নামকরণ হয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এবং নিম্ন কক্ষের নামকরণ হয় লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী। ঊর্ধ্ব কক্ষের সদস্যগণ বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচক-মণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কতিপয় আসন 'সাধারণ', কতিপয় মুসলমান এবং কতিপয় ভারতীয় খ্রীস্টানদের জন্য নির্দিষ্ট হয়। সদস্যদের একাংশ প্রাদেশিক গভর্নরের দ্বারা মনোনীত হতেন এবং কোন কোন প্রদেশের ক্ষেত্রে কতিপয় সদস্য নিম্ন কক্ষের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার প্রথা গৃহীত হয়। ঊর্ধ্ব কক্ষের ন্যায় নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যাও সকল প্রদেশের জন্য সমান নির্দ্ধারিত করা হয় নি।

বাংলাদেশের নিম্ন কক্ষের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫০ জন, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ জন। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিম্ন কক্ষের সদস্যগণ নির্বাচিত হতেন। উর্ধ্ব কক্ষকে স্থায়ী পরিষদে পরিণত করা হয়—তবে প্রতি তিন বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের পদ শূন্য হত। নিম্ন-পরিষদের কার্যকাল নির্দ্ধারিত হয় পাঁচ বছর।

(৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠন :

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপূরকরূপে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের শাসন বিধির দ্বারা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত স্থাপনের ব্যবস্থাও করা হয়। একজন প্রধান বিচারপতি এবং অনধিক ছ'জন সাধারণ বিচারপতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে প্রধান বিচারপতি ব্যতীত আর ক'জন বিচারপতি নিযুক্ত থাকবেন তা নির্ভর করত গভর্নর জেনারেলের সুপারিশক্রমে ইংলণ্ডেশ্বরের অনুমতির উপর। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে আদিম বিচার ব্যবস্থা (Original Jurisdiction), আপীল বিচার বিভাগ (Apellate Jurisdiction) এবং পরামর্শদানমূলক কার্যের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

(৭) ভারত সচিবের পরামর্শদাতা নিয়োগ :

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের শাসনবিধির দ্বারা ভারত সচিবের সহিত যে পরিষদ (Indian Council) জড়িত ছিল তার বিলোপ সাধন করা হয়। এই পরিষদের পরিবর্তে ভারতের শাসন ব্যাপারে পরামর্শদানের জন্য কয়েকজন পরামর্শদাতা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

Q. 28. Critically discuss the part played by the British rulers in the growth and development of the separatist movement in India between 1930 and 1940.

Ans. (১) ভূমিকা :

খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার পর থেকেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আবার রাজনৈতিক অনৈক্যের সূত্রপাত ঘটে। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নানাপ্রকার অশান্তি দেখা দেয় এবং ব্রিটিশ সরকারের নীতিও এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভবের জন্যে অনেকাংশেই দায়ী।

(২) সাইমন কমিশন :

ব্রিটিশ সরকারও ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনার উদ্দেশ্যে গোল-টেবিল বৈঠক আহ্বানের সুপারিশ করে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসকে ব্রিটিশ সরকার ভারতের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে স্বীকার করতে অসম্মত হয়। মোহম্মদ আলি জিন্নাহ,

মুসলিম লীগ তথা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে স্বতন্ত্রভাবে এই বৈঠকে যোগ দেন। জাতীয় কংগ্রেস প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করে। দ্বিতীয় বৈঠকে জাতীয় কংগ্রেস যোগদান করে। এই বৈঠকেই ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক গোলটেবিল বাঁটোয়ারার নীতি ঘোষণা করে। মুসলিম লীগ এই বৈঠকেও আমন্ত্রিত হয় কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের এই বৈঠকে স্থান দেওয়া হয় নি। বিশেষতঃ স্যার স্যামুয়েল হোরের নীতির ফলে স্বতন্ত্রবাদী মুসলিমদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি হয় এবং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মোট আসন সংখ্যার $33\frac{1}{3}$ অংশ মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং সিন্ধু একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়।

ভারতের শাসন ব্যাপারেও ব্রিটিশ সরকার নিজেদের নীতি কার্যকরী করার চেষ্টা করে। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ রক্ষা এই দুটি বিষয়ই প্রাধান্য লাভ করে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাসের উদ্দেশ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা প্রতিহত করার জন্য দেশীয় রাজন্যবর্গের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির ফলে বালুচিস্তান ব্যতীত আরও চারটি প্রদেশের আইন পরিষদে মুসলিম সদস্যগণই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার সুযোগ পান। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি কার্যকরী হওয়ার পরও মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অমুসলিম সম্প্রদায় এই দুটি প্রদেশেই রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে।

(৩) ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইন :

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রথা রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রদেশের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাকে যথাসম্ভব কার্যে পরিণত করে মুসলিম লীগ তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে শুরু করে। মুসলিম লীগের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর শাসনক্ষমতা অধিকার করা। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের শাসনবিধি প্রকৃতপক্ষে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা করে নি, উপরন্তু এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলার জন্য এই আইনে বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র মনোভাবকে দূর করার জন্যও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে কোনপ্রকার চেষ্টা করা হয় নি। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপরই এই আইনবিধি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। স্বতন্ত্র নির্বাচনের সুযোগ নিয়েই মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্ এবং মুসলিম লীগ হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার সুযোগ লাভ করেন। ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা সৃষ্টি করাই ছিল এই সময়ের মুসলীম লীগের নেতৃবর্গের প্রধান প্রচেষ্টা। ব্রিটিশ সরকারের মৌন সম্মতি ও পরোক্ষ সাহায্য লাভ করে মুসলিম লীগ ধীরে ধীরে তাদের রাজনৈতিক আদর্শকে কার্যকরী করে তোলার সুযোগ

লাভ করে। ব্রিটিশ সরকারের পরোক্ষ সমর্থন না পেলে তাদের পক্ষে রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির এই প্রচেষ্টা কখনই সাফল্য অর্জন করতে পারত না।

(৪) নতুন নির্বাচন—সরকার গঠন ঃ

কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম লীগের নানারূপ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের শাসনবিধি অনুসারে ১৯৩৭ সালের প্রথমদিকে বিভিন্ন আইন পরিষদের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসই সেই নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং উড়িষ্যায় কংগ্রেস একক সংখ্যাধিক্য লাভ করে এবং বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আসাম ও বাংলাদেশে একক বৃহত্তম দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে এই বিরাট সাফল্য লাভ করে কংগ্রেস ঘোষণা করে যে, নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনে তারা ব্রিটিশের সহিত সহযোগিতা করবে না, কারণ গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতা মন্ত্রীদের ক্ষমতাকে ব্যাহত করবে। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলোকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করে নতুন শাসনতন্ত্র চালু করার চেষ্টা করে। শুধুমাত্র বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলো সম্মিলিত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু ঐ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ঘোষণা করেন যে, প্রাদেশিক গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতা থাকলেও প্রদেশের দৈনন্দিন শাসন পরিচালনায় মন্ত্রীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকবে। এই ঘোষণায় আংশিকভাবে আশ্বস্ত হয়ে এবং গঠনমূলক কাজের জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনে উদ্যোগী হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর-প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা স্থাপিত হয়। পরের বছর আসামে কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং সিন্ধু প্রদেশেও কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। শুধুমাত্র দুটি প্রদেশে—বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বাংলার মন্ত্রিসভা ছিল কৃষক প্রজাপার্টির এবং পাঞ্জাবে ছিল ইউনিয়নিস্টপার্টির। সমগ্র ভারতের কোন প্রদেশেই মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা ছিল না। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। কংগ্রেস ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানালে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী সরকার ভেঙ্গে দেয় এবং কংগ্রেস বিরোধী দলগুলোর সাহায্যে মন্ত্রিসভা গঠন করে। এই সময় মুসলিম লীগও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা প্রচারে নেমে পড়ে এবং ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে দাবি করেন যে, যে সকল পরস্পর সংলগ্ন অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকল অঞ্চলগুলো নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা উচিত এবং এই রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান।

(৫) ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব ঃ

অধ্যাপক টিঙ্কারের মতে অধিকাংশ ব্রিটিশ রাজনীতিবিদই মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা করা ও দাবি

মেনে নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠেন। পি. হার্ডি মনে করেন যে, ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌দের কথাবার্তা এবং কার্যকলাপে প্রমাণিত হয় যে, পাকিস্তান প্রস্তাবই ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। তবে ভাইসরয় লিনলিথগো পাকিস্তান প্রস্তাবকে নিন্দা করতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন নি। অপরদিকে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ইংলণ্ডের হাউস অফ লর্ডস-এ লর্ড জেটল্যাণ্ড ঘোষণা করেন যে, অনিচ্ছুক মুসলিমদের উপর জোর করে কোন সংবিধান চাপিয়ে দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। কিছুদিন পরে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ৮ই আগস্ট ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, ভারতীয় জাতীয় জীবনের শক্তিশালী একটি অংশের অমতে কোন সংগঠনের উপর ব্রিটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে প্রস্তুত নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে মুসলিম লীগের দর কষাকষির সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগকে প্রয়োগ করতে শুরু করে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে ব্রিটিশ সরকার মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌কে নেহেরু ও গান্ধীজীর সমান রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে শুরু করে। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে ঘোষণা করে যে, যুদ্ধ শেষ হলে ভারতীয়দের তাদের নিজস্ব শাসন-তন্ত্র রচনায় দায়িত্ব প্রদান করা হবে—তবে ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতৈক্য প্রয়োজন। ব্রিটিশ সরকারের এই ঘোষণার ফলে জিন্নাহ্‌ বিশেষ অধিকার ভোগ করার সুযোগ পান।

(৬) ব্রিটিশ নীতির সমালোচনা :

ওয়াহাবী আন্দোলনের সময় থেকেই ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় ভারতের অখণ্ড এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। শাসিতদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসনতন্ত্র স্থায়ী করার ব্রিটিশ সরকারের নীতি সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার নীতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করে। ব্রিটিশ শাসকগণ প্রথম থেকেই ঘোষণা করে যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে গঠিত ভারতীয় সমাজ বহুভাগে বিভক্ত। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে এককভাবে জাতীয় কংগ্রেসকে গ্রহণ করতেও তারা কোনদিন সম্মত হয় নি। আলীগড় আন্দোলনের যুগ থেকেই তারা মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য করতে শুরু করে এবং মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। নির্বাচন পদ্ধতিতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নীতি অনুসরণ ব্রিটিশ শাসকদের মুসলিম প্রীতির প্রথম নিদর্শন ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। যদিও ইংলণ্ডের বামপন্থী নেতৃবর্গ ভারতের অখণ্ড জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের কর্মপন্থার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু শাসন-তান্ত্রিক নীতি নির্ধারণের উপর তাঁদের প্রভাব ছিল খুবই সামান্য। তা ছাড়া, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড-ই ভারতের শাসনক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা পদ্ধতির প্রচলন করেন। অপরদিকে ইংলণ্ডের সংরক্ষণশীল

রাজনীতিবিদ্গণ চিরদিনই ভারতের জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত করার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন।

Q. 29. Discuss briefly the defects of the India Act of 1935. Why did the Muslim League opposed the Act ?

Ans. (১) শাসন সংস্কারের ত্রুটি ঃ

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে লর্ড উইলিংডনের কার্যকাল শেষ হলে লর্ড লিনলিথগো বড়লাট হয়ে ভারতের শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন বিধি-অনুযায়ী নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু প্রচুর অনিশ্চয়তার মধ্যে তাঁর শাসনকাল শুরু হয়। কারণ নতুন শাসনবিধি যে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের আয়োজন করে তা ভারতের জাতীয়তাবাদী মহলের কোন অংশকেই সন্তুষ্ট করতে পারে নি। যে ধরনের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যবস্থা হয় প্রথম থেকেই জাতীয় কংগ্রেস তার তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমালোচনাও ছিল অত্যন্ত কঠোর। কারণ প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা না ছিল সঠিক যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার সমপর্যায়ভুক্ত, না ছিল স্বায়ত্তশাসনের অনুকূল। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠন বলতে সাধারণতঃ যা বুঝা যায়, ১৯৩৫ সালের শাসন বিধির দ্বারা প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তার যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী অঞ্চলগুলোর মধ্যে ছিল ব্রিটিশ-ভারতের প্রদেশসমূহ এবং ব্রিটিশ-ভারতের বাইরে অবস্থিত দেশীয় রাজ্যগুলো। তাদের সমন্বয়েই গঠিত হওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু প্রদেশগুলোর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান ছিল বাধ্যতামূলক অথচ দেশীয় রাজ্যসমূহের পক্ষে তা ছিল ইচ্ছামূলক। প্রদেশগুলোর উপর এবং যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সমান ছিল না। কেন্দ্রীয় তালিকায় উল্লিখিত সকল বিষয়গুলো সম্পর্কেই সকল প্রদেশের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কোন দেশীয় রাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কতখানি বিস্তৃত হবে তা নির্ভর করত সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ইচ্ছার উপর। অধিকন্তু যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আভ্যন্তরীণ শাসন কাঠামোর সাদৃশ্য থাকে। ভারতের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রদেশগুলো ছিল অল্পাধিক গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতি প্রবর্তনেরও কিছু আয়োজন করা হয়। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলো ছিল সম্পূর্ণ স্বৈর-শাসনের অধীন। কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্যজনক শাসনতন্ত্র পরিচালনার ফলে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুতর অন্তরায়রূপে দেখা দেয়। তা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদে ব্রিটিশ-ভারতের প্রতিনিধিগণ সীমাবদ্ধ ভোটদানের ভিত্তিতে নির্বাচিত হলেও, জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন বলে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট স্বৈরশাসকের দ্বারা মনোনীত হতেন। আবার জনসংখ্যার হিসাব করলে, ব্রিটিশ-ভারতের প্রতি-

নিধিদের তুলনায় দেশীয় রাজ্যগুলোকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয় আনুপাতিকভাবে অধিক। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরও দুটি গুরুতর অভিযোগ ছিল, প্রথমতঃ, নতুন প্রবর্তিত দ্বৈতশাসনব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়তঃ, বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিষয়গুলোর উপর মন্ত্রিমণ্ডলীর শাসন ক্ষমতা স্বীকৃত হয় নি। কয়েকটি বিষয় মন্ত্রীদের ক্ষমতার বাইরে রাখা হয়। ইতিপূর্বে প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে দ্বৈত-শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ভারতীয়গণ বিস্মৃত হতে পারে নি। সুতরাং বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতার অধিকারের ফলে মন্ত্রীদের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করাও হয় নি। বড়লাটের এইসব বিশেষ ক্ষমতা স্বায়ত্তশাসনের একেবারেই পরিপন্থী ছিল।

(২) বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে প্রতিক্রিয়া :

যুক্তরাষ্ট্রের সংগঠনের ফলে ভারতের ঐক্যের পথ প্রশস্ত হতে পারে সে কথা উপলব্ধি করেও জাতীয়তাবাদী মহলে এই সংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ দেখা দেয়। জাতীয় কংগ্রেস এইরূপ যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বাধা দিতে প্রস্তুত হয়। মুসলিম লীগ এই শাসনরীতি স্বায়ত্তশাসন বিরোধী বলে তীব্রভাবে সমালোচনা শুরু করে। দেশীয় রাজ্যসমূহকে নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দ্বারা সন্তুষ্ট করার আয়োজন থাকলেও আভ্যন্তরীণ শাসনের স্বাধীনতা হারাবার ভয়ে তারাও যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের জন্য কোন উৎসাহ প্রদর্শন করে নি।

(৩) প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি :

প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তার বিরুদ্ধেও যথেষ্ট অভিযোগ দেখা দেয়। প্রাদেশিক শাসনে দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা রহিত করে মন্ত্রিপরিষদের হাতে সকল বিষয়ের শাসনভার অর্পণ করা হলেও, গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা মন্ত্রীদের দায়িত্ব বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। সুতরাং প্রদেশগুলোতেও স্বায়ত্তশাসন বাস্তবে কতখানি প্রতিষ্ঠিত হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দেয়।

১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এই নতুন শাসনবিধি কার্যকরী করা হবে বলে স্থির হয়। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিরোধিতা ব্যতীতও দেশীয় রাজন্যবর্গের বিরোধিতার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে পারে নি। এই তারিখের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক দেশীয় রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করতে অগ্রসর না হওয়ায় প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সুতরাং ঐ তারিখে শুধু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়—যুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যতে প্রবর্তিত হবে বলে স্থিত হয়। প্রদেশগুলোতে দ্বৈতশাসন তুলে দিয়ে নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ গঠনের আয়োজন হয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন বিধান অনুযায়ী ; অর্থাৎ কেন্দ্রে বড়লাট এবং তাঁর শাসন পরিষদই শাসন পরিচালনার অধিকারী রইলেন এবং এই শাসনতন্ত্র গঠিত হল শুধুমাত্র ব্রিটিশ-ভারতের জন্য। তবে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হলে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে শাসনবিষয়গুলো যে ভাবে বণ্টিত হওয়ার কথা ছিল সেগুলো সেভাবেই বণ্টন করা হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হল ১৯১৯ সালের শাসনবিধি

অনুযায়ী কিন্তু ক্ষমতা লাভ করল ১৯৩৫ সালের শাসনবিধি অনুযায়ী। সুতরাং সেভাবেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটল। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতটিও গঠিত হল।

(৪) **মন্ত্রিসভা গঠন :**

১৯৩৯ সালে বিভিন্ন আইন পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস অধিকাংশ প্রদেশেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় কংগ্রেস চূড়ান্তভাবে সংখ্যাধিক্য পায় এবং বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আসাম ও বাংলাদেশে একক বৃহত্তম দলরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে এই বিরাট সাফল্য লাভ করে কংগ্রেস ঘোষণা করে যে, নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনে তারা ব্রিটিশের সহিত সহযোগিতা করবে না, কারণ গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা—মন্ত্রীদের শাসনকে ব্যাহত করবে। এই ব্যবস্থার ফলে মন্ত্রিদের দায়িত্ব থাকবে কিন্তু ক্ষমতা থাকবে না—এই ছিল তাদের প্রধান অভিযোগ। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলোকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করে নতুন শাসনতন্ত্র চালু করে। শুধুমাত্র বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলো সম্মিলিত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু ১৯৩৭ সালের জুন মাসে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ঘোষণা করেন যে, প্রাদেশিক গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতা থাকলেও প্রদেশের দৈনন্দিন শাসন পরিচালনায় মন্ত্রীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকবে এবং গভর্নরগণ শাসনবিধির দ্বারা আরোপিত বিশেষ ক্ষমতা পরিত্যাগ করতে পারেন না, তবে দৈনন্দিন শাসনে তাঁরা সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না। এই ঘোষণায় কিছু পরিমাণে আশ্বস্ত হয়ে এবং গঠনমূলক কার্যের জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনে উদ্যোগী হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং সীমান্ত প্রদেশ এই—কয়টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা স্থাপিত হল। পরের বছর আসামে কংগ্রেসী-প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হল। সিন্ধুপ্রদেশেও কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। শুধুমাত্র দুটি প্রদেশে—বাংলা ও পাঞ্জাবে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বাংলাদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে কৃষক প্রজা পার্টি এবং পাঞ্জাবে মন্ত্রিসভা গঠন করে ইউনিয়নিস্ট পার্টি। সমগ্র ভারতের কোন প্রদেশেই মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গঠিত হয় নি।

(৫) **উপসংহার :**

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা করার প্রথা প্রবর্তন করে ব্রিটিশ সরকার মুসলিম সম্প্রদায়কে, বিশেষতঃ মুসলিম লীগকে কতগুলো সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল ব্রিটিশ সরকার এবং মুসলিম লীগকে অত্যন্ত হতাশ করে। জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবর্গ এই নির্বাচনে জয়লাভ করতে সমর্থ হলেও মুসলিম লীগের প্রার্থীগণ এই নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ

হয়। ভারতের কোন প্রদেশেই তাঁদের পক্ষে আইনসভার গরিষ্ঠতা লাভ করে মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয় নি। ফলে মুসলিম লীগ নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অন্য পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। উগ্র-সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করে তাঁরা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ অশান্তির সৃষ্টি হয়। ফলে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারের নীতি ব্যর্থ হলেও পরোক্ষভাবে তাদের নীতি জয়যুক্ত হয় এবং মুসলিম লীগের সহযোগিতায় ব্রিটিশ সরকার তাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার সুযোগ লাভ করে।

Q. 30. How did the Government Act of 1935 affect the communal problem ?

Ans. (১) পটভূমিকা :

খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সূচনা হয়। মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের লক্ষ্ণৌ চুক্তি অনুযায়ী যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে পরবর্তীকালে তাও সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় এবং এই রাজনৈতিক দল দুটি সম্পূর্ণ পৃথক পথ অনুসরণ করতে শুরু করে। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দিল্লীতে সর্বদলীয় সম্মেলন (All Parties Conference) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে নানারূপ আপত্তি উত্থাপনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। হিন্দু ও মুসলমানের এই অনৈক্য ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল বলে তারাও মুসলিম লীগের নীতিকে পরোক্ষভাবে সমর্থন জানায়। কারণ শাসিতদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাই ছিল ব্রিটিশ শাসকদের মূল লক্ষ্য। মুসলিম লীগ নেতা মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র মতামতের উপরও ব্রিটিশ শাসকগণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেন। মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌ এই সময় তাঁর চৌদ্দ দফা দাবি পেশ করেন এবং এই দাবিগুলোই মুসলিম লীগের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আদর্শের প্রকৃত পরিচয় বহন করে। গোলটেবিল বৈঠকে জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। সুতরাং তাঁদের পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাবও এই বৈঠকে পেশ করার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নি। গোলটেবিল বৈঠক শেষ হওয়ার পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মুসলিম লীগের সহিত শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য এলাহাবাদে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু এই সম্মেলনও রাজনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলিমদের মোট

সদস্য সংখ্যার $33\frac{1}{3}$ শতাংশ প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ দিয়ে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক উচ্চাশাকে আরও বৃদ্ধি করেন। মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি স্বতন্ত্র সিন্ধুপ্রদেশ গঠনেরও ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সময় ব্রিটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেসকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে একমাত্র প্রতিনিধিমূলক রাজনৈতিক সংগঠনরূপে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। তা ছাড়া, এই সময়ই ব্রিটিশ সরকার হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রবর্তন করে। স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্য আরও বৃদ্ধি পায় এবং মুসলিমদের দাবিও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

(২) ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের ভারত শাসন বিধি ঃ

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার কথা ছিল। এই যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাটি খুব স্পষ্ট না হওয়ায় এবং কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় গভর্নর জেনারেলের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকায় ভারতের নেতৃবৃন্দ ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটুকু গ্রহণে আপত্তি জানান। কিন্তু প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রস্তাব থাকায় এই অংশটুকু ভারতের নেতৃবর্গের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সেই কারণে ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতের এগারোটি ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশে নির্বাচন হয় এবং নির্বাচনের পর সকল প্রদেশে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার অনুযায়ী চলতে থাকে।

(৩) ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের ভারত শাসন বিধি ও মুসলিম লীগের রাজনীতি ঃ

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসনবিধি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে নির্বাচন প্রথা অব্যাহত রাখে। ফলে জাতীয় কংগ্রেসের ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের নীতিতে ক্ষুব্ধ হলেও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এই নীতিকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়। কিন্তু ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিশেষ কোন সাফল্যের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়। এমন কি, মুসলিম গরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতেও মুসলিম লীগের সাফল্য কোন ক্রমেই উল্লেখযোগ্য নয়। ফলে মুসলিম লীগ নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করতে শুরু করে। নির্বাচনে ব্যর্থতার পর মুসলিম লীগ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত হয়। মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্ বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে একটি সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করার প্রস্তাব করেন। জিন্নাহ্র মতে, "There is really no substantial, now at any rate, between the League and the Congress. We shall always be glad to co-operate with the Congress in their constructive programme". কয়েকটি শর্তে জাতীয় কংগ্রেসও মুসলিম লীগের সহিত

সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই সব শর্ত মুসলিম লীগের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। মুসলিম লীগের সদস্যদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে মিশে যাওয়ার শর্তই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান দাবি। কংগ্রেসের মতে সম্মিলিত মন্ত্রিসভার ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য এইরূপ নীতি গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু জিন্নাহ্ কংগ্রেসের এই নীতিকে মুসলিম লীগের প্রস্তাবকে প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যাখ্যান বলে মনে করেন এবং অনতিবিলম্বে ঘোষণা করেন যে, "the Muslims can expect neither justice nor fairplay under Congress Government." কংগ্রেসকে তিনি ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের, বিশেষতঃ মুসলিম লীগের বিনাশ সাধনে উদ্যত ফ্যাসিস্ট হিন্দুদের সংগঠন বলে আখ্যা দেন।

অপরদিকে মুসলিম ভূস্বামীগণ কংগ্রেস দলের ভূমি সংক্রান্ত আইন সংস্কারে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। নতুন আইন অনুসারে ভূমির উপর কৃষকদের অধিকার স্থাপিত হলে জমিদারদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কায় ভীত হয়ে তাঁরা মুসলিম লীগের সহিত সহযোগিতা শুরু করেন। মধ্যবিত্ত মুসলিমগণ নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন যে, শিল্প-বাণিজ্য ও অন্যান্য জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং হিন্দুদের সহিত প্রতিযোগিতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই তাঁরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। কংগ্রেসের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির সম্পর্কেও তাঁরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেন।

অপরদিকে কংগ্রেস নেতৃবর্গ, বিশেষতঃ জওহরলাল নেহেরু, মুসলমান জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের নীতি অনুসরণ করতে শুরু করলে, মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং জিন্নাহ্ কংগ্রেসের এই নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "calculated to divide and weaken and break to Musalmans and to detach them from their accredited leaders" প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের নীতিকে অহেতুক সমালোচনা করা ব্যতীত এই সময় মুসলিম লীগের অন্য কোন প্রকার গঠনমূলক কর্মসূচী ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের বদান্যতায় তারা স্বতন্ত্র ভোটাধিকার, স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী এবং আইন অনুমোদিত রক্ষাকবচ লাভ করে, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের জন্য দাবিই তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের উপর কাল্পনিক কাহিনী উদ্ভাবন করে তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করতে শুরু করে। মুসলমানদের উপর কংগ্রেস সরকারের অত্যাচার সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য পীরপুরের রাজার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেস মন্ত্রিসভার ব্যবহার সম্পর্কে ঐতিহাসিক কুপল্যাণ্ড মন্তব্য করেন, "The Congress Ministries had not lent themselves to a policy of communal injustice, still less of deliberate persecution." উত্তর প্রদেশের তদানীন্তন গভর্নরও বলেন যে, "The

Congress Ministries dealth with the Muslim fairly and justly" কিন্তু পীরপুরের রাজার নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, "no tyranny be so great as the tyranny of the majority." কিন্তু মুসলিম নেতৃবর্গের কল্পিত অভিযোগ মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা ও শক্তি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে খুব সাহায্য করে এবং জিন্নাহ্ ধীরে ধীরে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের অবিসংবাদী নেতারূপে পরিগণিত হন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ৬১টি উপনির্বাচন হয়, তার মধ্যে ৪৭টি আসন মুসলিম লীগ অধিকার করে এবং মাত্র ৪টি আসন কংগ্রেস লাভ করে এবং বাকি দশটি আসনে নির্দল প্রার্থীরা নির্বাচিত হন।

(৪) ব্রিটিশ সরকারের নীতি :

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়েই ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসনবিধি প্রণয়ন করে। মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারে অনুসৃত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবর্গ প্রতিবাদ জানালে ব্রিটিশ সরকার তার প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করতে অসম্মত হয়। এমন কি, পরবর্তী সংস্কারে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ আরও সুরক্ষিত করে তোলার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের আসন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়। ফলে সমস্ত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন এবং সংবিধান সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও বিদ্বেষের উৎসে পরিণত হয়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নীতি ভারতের জাতীয়তাবাদকে বিনষ্ট করে এবং জাতীয় ঐক্যের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে ওঠে। ফলে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ফলাফল মারাত্মক রূপ ধারণ করে এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ বুঝতে পারেন যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে ভারতের জাতীয় ঐক্য ধ্বংস হওয়ার পথ অচিরেই সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

(৫) উপসংহার :

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের বিধিবদ্ধ ভারত সংস্কার আইন ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে কার্যকরী হয়। মুসলিম লীগ ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে ভারতের কোন প্রদেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে অসমর্থ হয়। এমন কি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও বাংলাদেশ প্রভৃতি স্থানেও মুসলিম লীগের সাফল্য খুবই হতাশাব্যঞ্জক। সুতরাং মুসলিম লীগ দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে জন্য উগ্র সাম্প্রায়িকতা প্রচার করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ভারতবর্ষ ব্রিটেনের অধীন দেশ হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর কোনরূপ অভিমত যাচাই না করেই ভারতকে যুধ্যমান দেশরূপে ঘোষণা করে। যুদ্ধের প্রতিবাদে কংগ্রেসদল মন্ত্রিসভা পরিত্যাগ করলে মিস্টার জিন্নাহ্ রাজনৈতিক চালরূপে মুসলমান সম্প্রদায়কে পরিত্রাণ দিবস পালন করতে আহ্বান জানান। এই সময় থেকেই জিন্নাহ্ দাবি করেন যে, ভারতের মুসলমানগণ নিছক একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, তাদের সহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্ববিষয়ে এত

পার্থক্য রয়েছে যে, তাদের একটি জাতিরূপে গণ্য করা এবং তদনুযায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদান করা উচিত। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের শাসনবিধি প্রবর্তনের ফলেই মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবি উত্থাপনের পথ সুগম হয়।

Q. 31. Write a critical note on the Poona Pact (1932)

Ans. ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ফলে সাময়িকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নির্যাতনমূলক আইনের পুনঃপ্রবর্তন এবং ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য ভারতবাসীদের আবার ক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভেই গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভেঙ্গে যায় এবং চতুর্দিকে আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। উত্তরপ্রদেশে খাজনা বন্ধের আন্দোলন শুরু হয়, বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে লালকোর্তা দলের উদ্ভব ঘটে। ব্রিটিশ সরকারও পুরাদমে দমননীতি চালাতে শুরু করে।

ভারতের এই রাজনৈতিক অশান্তির মধ্যেই ইংলণ্ডে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। প্রথমে তিনটি কমিটি ভারতে এসে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তাদের বিবরণী প্রদান করে—এই তিনটি কমিটি হল—ভোটাধিকার কমিটি, দেশীয় রাজ্য অনুসন্ধান কমিটি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা কমিটি (Franchise Committee, States Inquiry Committee and Federal Finance Committee)। তারপর ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড একটি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে ঐক্যমতে পৌঁছুতে পারে নি বলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি বন্দোবস্ত করেন। সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকবে এবং বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও ঐ দুটি প্রদেশেও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত থাকবে। যেখানে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সেখানেও আইন পরিষদে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে অধিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে। পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখদের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা হবে। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অনুন্নত শ্রেণীর জন্যও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা করা হবে।

হিন্দুদের অনুন্নত শ্রেণীর জন্য এই পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হিন্দু ঐক্য চিরদিনের জন্য ধ্বংস করার একটি পদ্ধতি, ভারতের নেতৃবর্গের তা বুঝতে বিলম্ব হল না। কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি তদানীন্তন ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোরকে পত্র লিখে সতর্ক করে দেন যে, হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অনুন্নত শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে তিনি জীবন দিয়েও তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবেন। সাম্প্রায়িক বাঁটোয়ার ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার পর স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা গেল যে, ব্রিটিশ সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অনুন্নত শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা

কার্যকরী করতে বদ্ধপরিকর। তখন গান্ধীজী প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে জানালেন যে, বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ধর্মের সহিত যুক্ত সুতরাং রাজনৈতিক দিক থেকে তার বিচার করা উচিত নয়। তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে আরও জানান যে, "Do you realise that, if your decision stands and the constitution comes into being, you arrest marvellous growth of the work of the Hindu reformers who had dedicated themselves to the uplift of their suppressed brethren in every work of life?" কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর চিঠি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নি। এমন কি, মহাত্মা গান্ধী অনশনে প্রাণত্যাগ করলেও সম্ভবতঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না। কারারুদ্ধ অনশনরত গান্ধীজীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠলে ভারতীয় নেতৃবর্গ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সংশোধন করার চেষ্টা করেন। অনুন্নত সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করা যায় অথচ হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা যায় গান্ধীজী এমন একটি পদ্ধতি স্থির করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ডক্টর আম্বেদকার এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অনুন্নত সম্প্রদায়কে আইন সভাগুলোতে যতগুলো আসন প্রদান করা হয় তা থেকে বর্তমান বন্দোবস্ত অনুযায়ী আরও অধিক সংখ্যক আসন প্রদান করা হবে কিন্তু তার জন্য নির্বাচন পদ্ধতি হবে স্বতন্ত্র। প্রস্তাবিত এই নির্বাচন পদ্ধতি অনুযায়ী অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভোটদাতাগণ একটি প্রাথমিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাদের সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে নির্বাচিত করবে। তারপর হিন্দু সম্প্রদায়ের সব ভোটদাতাগণ, অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভোটদাতাসহ, চূড়ান্ত ভাবে ভোটদান করে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ঐ কতিপয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রকৃত প্রতিনিধি করবে। প্রাদেশিক আইন পরিষদের মতো কেন্দ্রীয় আইন পরিষদেও অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সংরক্ষিত আসন রক্ষা করা হবে এবং একই পদ্ধতিতে ঐ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে। ব্রিটিশ-ভারতের আঠারো শতাংশ আসন অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতি বছর বাজেটেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হবে। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের সংস্থাসমূহেও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। তবে প্রয়োজন হলে এবং উভয় পক্ষ সম্মত হলে দশ বছর পর এই নীতির পরিবর্তন সাধন করা হবে।

গান্ধীজীর এই পরিকল্পনা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ঠিক মনঃপূত হল না দেখে তিনি পুণা জেলের মধ্যে আবার অনশন শুরু করেন। তাঁর জীবনসংশয় দেখে উচ্চবর্ণের এবং অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দু নেতৃবর্গ পুণায় সমবেত হয়ে গান্ধীজীর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চুক্তিবদ্ধ হন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ব্রিটিশ সরকারও এই চুক্তি গ্রহণ করতে সম্মত হয়। পুণা-চুক্তি

অনুসারে অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত করা হয়। মাদ্রাজে ৩০, সিন্ধুসহ বোম্বাই-প্রদেশে ১৫, পাঞ্জাবে ৮, বিহার ও উড়িষ্যায় ১৮, মধ্যপ্রদেশে ২০, আসামে ৭, বাংলাদেশে ৩০ এবং উত্তরপ্রদেশে ২০টি আসন সংরক্ষিত করা হয়। সমগ্র ভারতে অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের আসন সংখ্যা হয় ১৪৮। তবে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সংরক্ষিত আসনের প্রস্তাবটি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়।

Q. 32 Write a short essay on the Quit India Movement of 1942.

Ans. (১) ভূমিকা:

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির অকস্মাৎ পরিবর্তন দেখা দেয়। ভারতের রাজনীতিতেও তার প্রভাব বিস্তৃত হয়। অপর দিকে ১৯৩০-৩৪ খ্রীস্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনের পরে ভারতে আর কোন ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। বিশেষতঃ এই সময় ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে জাপান মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে নিজের একাধিপত্য স্থাপন করে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলোর উপর অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করার সুযোগ পায়। জাপানের অভাবনীয় সাফল্যে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয় এবং তাঁরা ব্রিটিশ শক্তির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে দিয়ে জার্মানীতে আশ্রয় গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে ভারত ব্রিটেনের অধীন দেশ বলে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর কোনরূপ অভিমত যাচাই না করেই ভারতকে যুদ্ধমান দেশরূপে ঘোষণা করে। কংগ্রেস ব্রিটিশের এই নীতিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং ব্রিটিশজাতির সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে এই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কোনরূপ সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় গণতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাদের নীতি ঘোষণা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং যুদ্ধের দ্বারা কি নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো আনয়ন করা হবে তাও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করে। কিন্তু কংগ্রেসের এই আহ্বানে ব্রিটিশ সরকার সাড়া না দেওয়ায় কংগ্রেস যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে অস্বীকার করে প্রদেশগুলোতে তাদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়। কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলো দিয়ে ব্রিটিশ সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং কোন কোন প্রদেশে তা সম্ভব না হওয়ায় গভর্নরের একক স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

অপরদিকে এই সময় মুসলিম লীগ অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িকতা প্রচারে নেমে পড়ে। মিস্টার জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে নিছক একটি হিন্দুদল বলে বর্ণনা করে এবং হিন্দু শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানায়।

কংগ্রেস যে অল্পকাল প্রাদেশিক শাসন পরিচালনা করে সেই সময়ের মধ্যেই মিস্টার জিন্নাহ্ মুসলমানদের উপর কংগ্রেস অত্যাচারের কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করতে শুরু করেন। যুদ্ধের প্রতিবাদে কংগ্রেস যখন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা পরিত্যাগ করে মিস্টার জিন্নাহ্ তখন রাজনৈতিক চাল হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়কে 'পরিত্রাণ দিবস' পালন করতে আহ্বান জানান, কিছুদিন পরে মিস্টার জিন্নাহ্ দাবি করেন যে,ভারতের মুসলমান-গণ নিছক একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, তাদের সহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্ব-বিষয়ে এতই পার্থক্য যে, তাদের একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য করা উচিত এবং তদনুযায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা দেওয়া উচিত। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে মিস্টার জিন্নাহ্ প্রকাশ্যেই পাকিস্তান গঠনের দাবি জানান।

(২) ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা ঃ

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতি ক্রমশঃই গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিকূল হতে শুরু করে। অবশেষে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে জাপান অক্ষশক্তির সহিত যোগদান করে দূর প্রাচ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং দক্ষিণ-পূব এশিয়ায় তড়িৎ গতিতে রাজ্য জয় করে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। এই বিপদের সম্মুখীন হয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করে ভারতের আন্তরিক সহযোগিতা লাভের প্রয়োজন উপলব্ধি করে। ফলে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার চার্চিল ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের পক্ষ থেকে তাঁর অন্যতম সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির কতিপয় প্রস্তাব নিয়ে অবিলম্বে ভারতে উপস্থিত হবেন এবং ঐ সম্পর্কে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা করবেন। ঐ ঘোষণার ঠিক এগারো দিন পরে ১৯৪২ সালের ২২শে মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ দিল্লীতে উপস্থিত হন। কংগ্রেসের নেতৃবর্গ দাবি করেন যে, ভারতের স্বাধীনতার দাবি স্বীকৃত হোক এবং অবিলম্বে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হোক। কেন্দ্রে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক এবং বড়লাট নিয়মতান্ত্রিক প্রধানরূপে অবস্থান করবেন। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ দাবি করেন যে, মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা হোক এবং অখণ্ড ভারতের অভিন্ন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সাহায্য করতে তাঁরা আদৌ প্রস্তুত নন। কিন্তু ক্রিপসের প্রস্তাবে এই সব দাবির কোন স্বীকৃতি ছিল না। ফলে ব্রিটিশ সরকারের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব এবং ক্রিপসের আলাপ-আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ১৩ই এপ্রিল স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারত পরিত্যাগ করেন।

(৩) ভারত ছাড়ো আন্দোলন ঃ

ক্রিপসের প্রচেষ্টার অসাফল্য ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে পুনরায় নৈরাশ্যজনক করে তোলে। ব্রিটিশ সরকারের আন্তরিকতার অভাব এবং অবিশ্বাসের মনোভাব এবং রাজনৈতিক দম্ভই স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষকে আরও অসহিষ্ণু করে তোলে। যখনই কোথাও ব্রিটিশের সামরিক পরাজয় ঘটে তখন সমগ্র ভারতে একটা চাপা আনন্দের ঢেউ

দেখা দিতে শুরু করে। মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন যে, ভারতে ব্রিটিশ জাতির উপস্থিতিই জাপানকে ভারত আক্রমণে প্রণোদিত করে তুলবে, ব্রিটিশগণ ভারত ত্যাগ করলেই ভারতের বিপদ কেটে যাবে। "The presence of the British in India is an invitation to Japan to invade India Their withdrawal removes this bait ...." ব্রিটিশগণ ভারতবাসীর মধ্যে আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের যে অজুহাত তুলে থাকে তার উত্তরে গান্ধীজী হরিজন পত্রিকায় লিখলেন যে, ব্রিটিশগণ ভারতকে ঈশ্বরের হাতে বা নৈরাজ্যের হাতেই ছেড়ে যাক। সকল দলগুলো তখন কুকুরের মতো কামড়াকামড়ি করতে পারে অথবা প্রকৃত দায়িত্বের সম্মুখীন হয়ে তারা আপোস মীমাংসায় পৌছুতে পারে। "Leave India in God's hands or in modern parlance to anarchy. The all parties will fight one another like dogs, when real responsibility face them, come to a reasonable agreement." তারপর তিনি আরও বলেন যে, ব্রিটিশ জাতির কোন কারণেই ভারতে থাকার কোন অধিকার নেই। মহাত্মা গান্ধীর এই সব উক্তির মধ্যেই সমগ্র জাতির চরম অসহিষ্ণুতা ও রাজনৈতিক ধৈর্যের শেষ সীমানায় উপস্থিতিই প্রকাশ পায়।

অবশেষে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাশ করে যে, ব্রিটিশ যদি ভারত ছেড়ে দেওয়ার দাবি না মানে তাহলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অতি ব্যাপক কিন্তু অহিংস সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে। ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই অগাস্ট অনুমোদিত হয়। কংগ্রেস এই উপলক্ষে ঘোষণা করে, সম্মিলিত জাতিসমূহের উদ্দেশ্যে সাফল্যের জন্য এবং ভারতের স্বার্থে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আশু অবসান একান্তই প্রয়োজন। "........the immediate ending of British rule in India is an urgent necessity, both for the sake of India and for the success of the United Nations. The continuation of the rule is degrading and enfeebling and making her progressively less capable of defending herself and of contributing to the cause of world freedom"

কংগ্রেসের এই উগ্র মনোভাবের বিরুদ্ধে লর্ড লিনলিথগো কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ৯ই অগাস্ট সমগ্র দেশব্যাপী ধর-পাকড় শুরু হয়। গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহেরু, এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অপর সকল সদস্য এবং বহু কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেস কমিটিগুলোকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হয়। নেতৃবৃন্দকে সহসা এইরূপ গ্রেপ্তার করে কঠোর নীতি গ্রহণের ফলে দেশবাসী চতুর্দিকে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষিপ্ত জনতার আক্রমণ বহুস্থানেই সহিংস বিপ্লবরূপে দেখা দেয়। লর্ড লিনলিথগোর সরকার অত্যন্ত কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করে বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করে। তাঁর শাসন পরিষদের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সদস্যগণ দেশবাসীর উপর এই উৎপীড়নে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। অপরদিকে জনগণের এই সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য গান্ধীজী

ব্রিটিশ সরকারকেই দায়ী করেন। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি কারাগারেই অনশন ধর্মঘট করেন। অনশনে তাঁর জীবন বিপন্ন বলে তাঁকে মুক্তিদানের দাবি উত্থিত হল কিন্তু লিনলিথগো এই দাবির উপর কোন গুরুত্ব দিতে অসম্মত হন। তিনি ঘোষণা করেন যে, সরকারের উপর অনশনের চাপ দিয়ে মুক্তি আদায় করা সঙ্গত নয়, সম্ভবও নয়। এই সময় তাঁর শাসন পরিষদের তিনজন সদস্য পদত্যাগ করে মুখ রক্ষা করেন। পরে ১৯৪৪ সালের ৬ই মে গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হয়। অপরদিকে যুদ্ধের গতি ব্রিটিশের অনুকূলে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে পড়ে।

(৪) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রকৃতি ঃ

জাতীয় কংগ্রেসের মতে ভারত ছাড়ো প্রকৃতপক্ষে সাংবিধানিক আন্দোলন। জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করেই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসর নেতৃবৃন্দকে আন্দোলনের শুরুতেই গ্রেপ্তার করার ফলে অবস্থার যথেষ্ট অবনতি ঘটে এবং বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন সহিংস রূপ গ্রহণ করে। সরকারী বিবরণ অনুযায়ী ২৫০টি রেলওয়ে স্টেশন, ও ৫০০টি পোস্ট অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আন্দোলনের সময় ১৫০ জন পুলিশ আক্রান্ত হয় এবং কয়েকজন সরকারী কর্মচারী ও সৈন্য মারা যায় এবং প্রায় ৯০০ জন বেসামরিক ব্যক্তি প্রাণ হারায়। উত্তর প্রদেশে, বিহার ও বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে সাময়িকভাবে ব্রিটিশ সরকারের অবলুপ্তি ঘটে। বাংলাদেশের মেদিনীপুরে এই সময় স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলায়ও এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

অগাস্ট আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন গান্ধীজীর নেতৃত্বে এবং তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কিন্তু অগাস্ট আন্দোলনের প্রকৃত নেতৃত্ব গ্রহণ করে দেশের জনসাধারণ। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সারির সমস্ত নেতাই তখন কারান্তরালে অন্তরীণ। ফলে সাধারণ লোক কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। স্থানীয় নেতারাই তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ ইংরেজ রাজত্বের অবসানের সম্ভাবনায় সাধারণ লোক এই আন্দোলন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং অনেক সময় সহিংস উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে প্ররোচিত হয়।

(৫) আন্দোলনের গুরুত্ব ঃ

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ভারতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই আন্দোলনে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। তবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই বিপ্লবে কোন অংশ গ্রহণ করে নি। ব্রিটিশ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে ফ্যাসিস্ট শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে এই আশঙ্কায় তারা এই বিপ্লব থেকে নিজেদের দূরে রাখতে চেষ্টা করে। মিস্টার জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে

মুসলিম লীগও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে অসম্মত হয়। তিনি ঘোষণা করেন যে, "The object of the movement was not only to turn out the Englishmen from India, but also to subjugate the Muslims and the Muslim League. Moreover, the movement was directed to coerce the British Government to hand over to the Hindus the administration of the country." ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের আন্দোলন সম্পর্কে Dr. P. Hardy মন্তব্য করেন যে, "in fact, though not in form, partly an effort to destroy the power of the Muslim League—by removing the British as the third party preventing a direct confrontation between Congress and the League."

Q. 33. Describe in brief the Cabinet Mission Plan (1946). Would it have solved the Hindu-Muslim problem, if accepted by the Indian National Congress ?

Ans. (১) **ভূমিকা :**

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে ইতালি, জার্মানী ও জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তির যুদ্ধ জয় সম্পূর্ণ হয়। ঐ বছরের শেষের দিকে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই নির্বাচনে শ্রমিকদল হাউস অফ কমন্সে বিপুলভাবে সংখ্যাধিক্য লাভ করে রক্ষণশীলদলকে পরাজিত করে মন্ত্রিসভা গঠন করে। শ্রমিকদল ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল ছিল। নতুন পার্লিয়ামেন্ট উদ্বোধন করার সময় ইংলণ্ডরাজ তাঁর অভিভাষণে বলেন, "আমার ভারতীয় প্রজাসাধারণকে পূর্বপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমার সরকার ভারতীয় নেতৃবর্গের সহযোগে শীঘ্রই ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।" কিছুদিন পরে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অধ্যাপক রিচার্ডসনের নেতৃত্বে একটি পার্লিয়ামেন্টারী ডেলিগেসন ভারতে প্রেরিত হয়। তাঁরা ভারতবাসীর মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা উপলব্ধি করে বিলাতে প্রত্যাবর্তনের পর এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার স্থির করে যে, সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনার জন্য একটি সরকারী প্রতিনিধি প্রেরণ করা হবে। তিনজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিয়ে এই প্রতিনিধিদল গঠিত হবে বলে স্থির হয়—একজন হলেন ভারত সচিব স্যার পেথিক লরেন্স, আর একজন হলেন বাণিজ্যসচিব স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এবং তৃতীয়জন হলেন নৌ-সচিব মিস্টার এ. ভি. আলেকজাণ্ডার। এই প্রতিনিধিদল ক্যাবিনেট মিশন নামে পরিচিত। পার্লিয়ামেন্টে ক্যাবিনেট মিশনের উপর বিতর্কের সময় প্রধানমন্ত্রী মিস্টার ক্লিমেন্ট এ্যাটলি ঘোষণা করেন যে, ভারত যদি ব্রিটেন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পূর্ণ

স্বাধীনতা দাবি করে, আমরা সেই দাবি স্বীকার করি।......ঐ দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কি হবে এবং জগতে তার কি স্থান হবে ভারতই তা অবশ্যই স্থির করবে। ভারতবাসী ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা একান্ত হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে। তা ছাড়া, তাঁর আর একটি ঘোষণায় ভারতবাসী খুব উল্লসিত হয়। তিনি ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন, তারা নিঃশঙ্কচিত্তে ভারতে বসবাস করবে এই সদিচ্ছাও তারা পোষণ করে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠদের রাজনৈতিক অগ্রগতিতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বাধাপ্রদান তারা সহ্য করবে না। প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ব্রিটিশ সরকার জাতীয় অনৈক্যের অজুহাতে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন বিলম্বিত করবে না এবং মুসলিম লীগের দাবী-দাওয়ার জন্য ভারতের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করা হবে না। এই সকল ঘোষণার দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিল আবহাওয়ার অনেক উন্নতি সাধিত হয়।

(২) ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতি :

ইতিমধ্যে ভারতের সকল প্রদেশেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত ভারতের সকল প্রদেশেই মুসলমান আসনগুলোর অধিকাংশ দখল করে। তবে পাঞ্জাব, বাংলাদেশ ও সিন্ধুপ্রদেশ ব্যতীত অন্য সকল প্রদেশেই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পাঞ্জাবে কংগ্রেস অন্যান্য দলের সহিত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং বাংলাদেশ ও সিন্ধুপ্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

(৩) ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা :

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের শেষদিকে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে উপস্থিত হয়। ভারতের নেতৃবৃন্দের সহিত এবং বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সহিত তাঁরা বিস্তারিত আলোচনা করেন কিন্তু সর্বসম্মত কোন একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব হল না। এই ব্যর্থতার মূল কারণ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অখণ্ড ভারতের দাবি উত্থাপন কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন অধিক মাত্রায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী ছিল। অপর দিকে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের দাবি করা হয়। ভারতের নেতৃবর্গের কোনরূপ ঐক্যমতে উপনীত করতে অসমর্থ হয়ে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মে ক্যাবিনেট মিশন তাদের নিজস্ব একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রদান করে।

ক্যাবিনেট মিশনের এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে, দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং ব্রিটিশ-ভারতের প্রদেশগুলোর সহযোগে ভারতে একটি রাষ্ট্র সমবায় বা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয়—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনের বিষয় থাকবে পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই বিষয়গুলো ব্যতীত অপরাপর সকল বিষয়ে শাসন অধিকার থাকবে প্রদেশসমূহের। দেশীয় রাজ্যগুলো যুক্তরাষ্ট্রের নিকট যে, সকল ক্ষমতা অর্পণ করবে সেগুলো ব্যতীত সকল ক্ষমতাই নিজেরা ভোগ করবে। দেশীয় রাজ্য ও প্রদেশ সমূহের প্রতিনিধিদিগকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শাসন পরিষদ ও আইন পরিষদ গঠিত হবে,

আইন পরিষদে কোন গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের পৃথকভাবে সংখ্যাধিক্য ভোট প্রয়োজন হবে। তা ছাড়া, সমগ্র পরিষদেরও সংখ্যাধিক্য সদস্যের ভোট প্রয়োজন হবে।

ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটিশ-ভারতের প্রদেশগুলোকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম মণ্ডলীতে বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি হিন্দু সংখ্যাধিক্য অঞ্চল স্থান পায়। দ্বিতীয় মণ্ডলীতে পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ স্থান লাভ করে। তৃতীয় মণ্ডলীটি গঠিত হয় বাংলাদেশ ও আসাম নিয়ে। সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারকে যে তিনটি ক্ষমতা প্রদান করা হয় সেগুলো বাদে অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলো মণ্ডলী সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার নিজেদের মধ্যে বণ্টন করবে। মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলোই স্থির করবে যে, এই সকল ক্ষমতার মধ্যে কোনগুলো মণ্ডলী সরকারকে দেওয়া হবে এবং কোনগুলো প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতে চার প্রকার সরকার গঠিত হবে—প্রথমতঃ, সমগ্র ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকার, দ্বিতীয়তঃ, মণ্ডলী সরকার; তৃতীয়তঃ, প্রাদেশিক সরকার এবং চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্য সরকার।

ক্যাবিনেট মিশন আরও সুপারিশ করে যে, এই শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করার জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হবে। এই গণপরিষদ প্রদেশগুলোর ২৯২ জন এবং দেশীয় রাজ্যগুলোর অনধিক ৯৩ জন প্রতিনিধি লাভ করবেন। তা ছাড়া, চীফ কমিশনার শাসিত চারটি এলাকার চারজন প্রতিনিধি গণপরিষদে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ব্রিটিশ-ভারতের প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলোর আইনসভার নিম্নপরিষদের দ্বারা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। তার দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধি নির্ধারণের পদ্ধতি পরে স্থির করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং মণ্ডলী সরকারের গঠন-পদ্ধতি এইরূপভাবে নির্দ্ধারিত হবে যাতে যেকোন প্রদেশ দশ বছর অন্তর শাসনতন্ত্রের পুনর্বিবেচনা করার দাবি জানাতে পারে। তা ছাড়া, নতুন শাসনতন্ত্র রচিত হবে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর যে-কোন প্রদেশ তার সংশ্লিষ্ট মণ্ডলী থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। তবে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট আইন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। দেশীয় রাজ্যগুলো সম্পর্কে ক্যাবিনেট মিশন বলে যে, নতুন শাসনতন্ত্র প্রচলিত হলে দেশীয় রাজ্যগুলোর উপরে ব্রিটিশ সরকারের সার্বভৌমত্ব বিলুপ্ত হবে এবং তখন তারা ইচ্ছা করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবে অথবা যোগদান না করেও স্বাধীনভাবে থাকার সুযোগ পাবে। ক্যাবিনেট মিশন আরও সুপারিশ করে যে, গণপরিষদ দ্বারা শাসনতন্ত্র রচিত এবং বাস্তবে পরিণত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদের প্রধান দলগুলোর নেতৃবৃন্দকে গ্রহণ করে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হবে।

(৪) পরিকল্পনার রূপায়ণে বাধা :

প্রথমে জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু পরে মুসলিম লীগ গণপরিষদে কংগ্রেসের প্রাধান্যে যথাযথভাবে পাকিস্তান গঠন করা সম্ভব নয় মনে করে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য করতে অস্বীকার করে। ইতিমধ্যে গণপরিষদের জন্য যে নির্বাচন হয় এবং এই নির্বাচনে ৭৮টি মুসলমান আসনের মধ্যে ৭৩টি আসন দখল করে মুসলিম লীগ তাদের রাজনৈতিক শক্তির পরিচয় প্রদান করে। ১৯৪৬ সালের ২২শে জুলাই মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের বাঞ্ছিত পাকিস্তান স্বীকৃত না হ'লে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করে। ১৬ই অগাস্ট কলিকাতায় মুসলমানগণ অতর্কিতে হিন্দুদের আক্রমণ করে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে দেয়। কয়েক সপ্তাহ পরে নোয়াখালি ও ও ত্রিপুরায় মুসলমানগণ নিরপরাধ হিন্দুদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে। তখন বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে হিন্দুরাও ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানদের হত্যায় প্রবৃত্ত হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর জাতীয় কংগ্রেস পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে। মুসলিম লীগ প্রথমে এই মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে অসম্মত হয়। কয়েক সপ্তাহ পরে মুসলিম লীগ এই মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। তবে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবন করা—অন্তর্বর্তী সরকারের সহিত সহযোগিতা করা নয়। এমন কি, মুসলিম লীগ জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্ব এবং সরকারের যৌথ দায়িত্বও অস্বীকার করে।

কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করলেও মুসলিম লীগ গণপরিষদে যোগ দিতে অস্বীকার করে। মণ্ডলীর মধ্য থেকে কোন প্রদেশের বেরিয়ে আসার অধিকার আছে কিনা এই সম্পর্কে নতুন করে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতদ্বৈতো দেখা দেয়। উভয় দলের নেতৃবর্গের সহিত এই সম্পর্কে লণ্ডনে ব্রিটিশ সরকারের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগের ব্যাখ্যাই সমর্থন করে। বাধ্য হয়ে কংগ্রেসও তা মেনে নেয়। তথাপি মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকার ও গণপরিষদের সহিত সহযোগিতা করতে অসমর্থ হয়। কংগ্রেস তখন মুসলিম লীগের সদস্যদের অনুপস্থিতিতেই গণপরিষদের কার্য চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। মুসলিম লীগের সদস্যগণ এই অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন এবং মুসলিম লীগ ঘোষণা করে যে, তাঁদের অনুপস্থিতিতে গণপরিষদ যে শাসনতন্ত্র রচনা করবে তা সংখ্যাধিক্য মুসলিম প্রদেশগুলো কিছুতেই স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম লীগ এই সময় মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র গণপরিষদ এবং স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে।

(৫) উপসংহার :

ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অক্ষুণ্ণভাবে গ্রহণ করলেও জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করে ভারতের রাজনৈতিক অখণ্ডতা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না।

কারণ ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। মুসলিম লীগ তার পূর্বেই বিভিন্নস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে। মুসলিম লীগ প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে যে, পাকিস্তান গঠনের দাবি স্বীকৃত না হলে রক্তের নদী প্রবাহিত হবে। ফলে কংগ্রেসের নেতৃবর্গের সদিচ্ছা থাকলেও মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ, মুসলিম লীগের কার্যকলাপের ফলে সমগ্র ভারতে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং আইন-শৃঙ্খলারও যথেষ্ট অবনতি হয়। ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে দেশ শাসন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে, "The Interim Government was in a state of paralysis" এইরূপ অবস্থায় মুসলিম লীগের দাবি অগ্রাহ্য করে ভারতের রাজনৈতিক অখণ্ডতা বজায় রাখায় কোন ক্ষমতাই জাতীয় কংগ্রেসের ছিল না।

Q 34 Discuss briefly the gradual development of the concept of Pakistan.

Ans. পাকিস্তান গঠনের চিন্তাধারার স্রষ্টারূপে স্যার মোহম্মদ ইকবালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করেন যে, "...the formation of aconsolidated North-West India Muslim State appears to me to be the final destiny of Muslims at least of North-West India". তবে স্যার মোহম্মদ ইকবাল কখনই সার্বভৌম, স্বতন্ত্র স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন নি। Mr Coupland-এর মতে মোহম্মদ ইকবাল ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং এই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র তার অন্তর্ভুক্ত মণ্ডলী রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত ক্ষমতা ভোগ করার অধিকার লাভ করবে। তা ছাড়া, পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রথম উদ্গাতা স্যার মোহম্মদ ইকবাল হলেও, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পাকিস্তানের সৃষ্টি ব্রিটিশ সরকার, হিন্দু সম্প্রদায় এবং ক্রমশঃ মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের পক্ষেও ক্ষতিকারক হবে। এই সম্পর্কে তিনি Mr Edward Thompson-কে বলেন, "... the Pakistan plan would be disastrous to the British Government, disastrous the Hindu community and disastrous to the Muslim community".

কিন্তু মোহম্মদ ইকবালের আদর্শের দ্বারা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন মুসলিম ছাত্র অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। রহমৎ আলী নামে জনৈক ছাত্রনেতা তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে রহমৎ আলী ভারতীয় মুসলিমদের একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে বর্ণনা করেন এবং পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, বালুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান গঠনের সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেন। রহমৎ আলী হায়দরাবাদে ওসমানীস্তান এবং বাংলাদেশ ও আসাম নিয়ে বঙ্গ-ই-ইসলাম নামে আরও দুটি মুসলিম

রাষ্ট্র ভারতে গঠন করার পরিকল্পনা করেন। রহমৎ আলী ধর্মীয় ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের আদর্শের কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন, কিন্তু তাঁর এই চিন্তাধারা মুসলিম জনসাধারণ অথবা তাদের নেতৃবর্গের উপর কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে স্যার জাফরুল্লা খান রহমৎ আলীর এই পরিকল্পনাকে অদ্ভুত ও অবাস্তব বলে বর্ণনা করেন। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম লীগও পাকিস্তান সৃষ্টির পরিকল্পনার প্রতি কোনরূপ সমর্থন জানায় নি। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ সর্বপ্রথম ভারত বিভাগের দাবি পেশ করেন। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে দুটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে বর্ণনা করেন।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে জিন্নাহ্ সভাপতির ভাষণে বলেন যে, মুসলিমগণ একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, যে কোন সংজ্ঞা অনুসারেই তারা একটি স্বতন্ত্রজাতি। এই ভাষণে তিনি আরও বলেন যে, "এই উপমহাদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপনে আগ্রহী হলে ভারতের প্রধান প্রধান জাতিগুলোকে স্বতন্ত্রজাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের উচিত ভারতকে বিভাগ করা। নতুন গঠিত রাষ্ট্রগুলো পরস্পর বিরোধী হয়ে ওঠারও কোন কারণ নেই। অপরদিকে, এইরূপ রাষ্ট্র গঠিত হলে বিভিন্ন জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরস্পরের উপর কর্তৃক স্থাপনের বাসনাও চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং বিভিন্ন প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হবে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রীতির ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হবে। তা ছাড়া, এইরূপ নীতি গৃহীত হলে মুসলিম-ভারত ও হিন্দু-ভারতের মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য হবে এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার সুষ্ঠভাবে রক্ষিত হবে।"

এই ভাষণেই তিনি বলেন যে হিন্দু ও মুসলমান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি জাতি। সুতরাং তাদের নিয়ে একটি অখণ্ড জাতি বা জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। "They (Hindus and Muslims) are not religious in the strict sense of the word, but are in fact, quite different distinct social orders and it is a dream that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality, and this misconception of the Indian nation has gone far beyond the limits and is the cause of most of our troubles and will lead India to destruction if we fail to revise our nations in time. The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs and literatures. They neither inter-marry nor inter-dine and indeed they belong to two different civilisations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their aspects on life and of life different. It is quite clear that Hindus and Musalmans derive their inspirations from different sources of history. They have different epics,

their heroes are different, and different episodes. Very often the hero of one is foe of the other and likewise their victories and defeats overlap. To yoke together two such nations under a single state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built up for Government of such a state.

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবে মোটামুটিভাবে বলা হয় যে, যে সকল পরস্পর সংলগ্ন অঞ্চলে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকল অঞ্চলগুলো নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা উচিত এবং এই রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান। এই প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম, সংস্কৃত প্রভৃতি রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হবে এবং এই প্রস্তাবে আরও আশা প্রকাশ করা হয় যে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতেও সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্যও যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
"Resolved that it is considered view of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principles, namely that geographical contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern Zones in India should be grouped to constitute "Independent States" in which the constituent units shall be autonomous and sovereign."

"This adequate effective and mandatory safeguards should be specifically provided in this constitution for minority in these units and in these regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them, and in other parts of India where the Musalmans are in a minority, adequate, effective and mandatory safeguards shall be specially provided in the constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights in consultation with them"

Q. 35 Examine the circumstances that helped Jinnah in his demand for partition in the forties of the present century.

Ans. (১) **ভূমিকা :**

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতের রাজনীতিতে মুসলিম লীগ ও তার নেতা মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্-র গুরুত্ব খুবই সামান্য ছিল। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসনবিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে ভারতের ১১টি প্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত মোট ৪৮২টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১০টি আসন অধিকার করে। বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্-র মনে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ভাগ্যপরিবর্তন দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের সহিত ব্রিটিশ সরকারের মতবিরোধিতা দেখা দিলে বিভিন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্যগণ পদত্যাগ করেন। ফলে সমগ্র ভারতে এক রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং মুসলিম লীগের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার সুযোগ উপস্থিত হয়। এই সময় মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের দিনটি প্রতিবছর মুসলিমদের 'পরিত্রাণ-দিবস' (Deliverance day) রূপে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রবর্তনের পর থেকেই মিস্টার জিন্নাহ্ দাবি করেন যে ভারতের মুসলমানগণ নিছক একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়। তাদের সহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্ববিষয়ে এতই পার্থক্য যে, মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য করা উচিত। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ দাবি করে যে, যে সকল পরস্পর সংলগ্ন অঞ্চলে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেইসব অঞ্চলগুলো নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করে দেওয়া উচিত এবং ঐ রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান। এই লাহোর অধিবেশনেই সভাপতির ভাষণে মিস্টার জিন্নাহ্ বলেন, "They (Hindus and Muslims) are not religious in the strict sense of the word, but are in fact quite different distinct social orders, and it is a dream that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality.....The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs and literature....To yoke together two such nations under a single state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built up for the government of such a state".

(২) **পাকিস্তানের দাবি :**

মিস্টার জিন্নাহ্ পাকিস্তান গঠনের পক্ষে নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করেন। ১৯৪০

খ্রীস্টাব্দে চৌধুরী রহমত আলি প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে আসাম ও হায়দ্রাবাদ দাবি করেন। মুসলিম লীগের লাহোরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে (১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ) পাকিস্তান গঠনের জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। তবে এই প্রস্তাবে নির্দিষ্টভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। এই প্রস্তাবে, 'ধর্ম', 'ধর্মীয়', 'অঞ্চল', 'স্থান', 'আঞ্চলিক সামঞ্জস্য বিধান', প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হলেও—এই সব শব্দের অর্থ কোথাও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয় নি। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ক্যাবিনেট মিশনের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তাতে দুটি মুসলিম প্রদেশকে একটি মণ্ডলীতে পরিণত করার জন্য দাবি জানানো হয়।

(৩) ক্রিপস্ মিশন ও সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা :

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ক্রিপসের প্রস্তাবে বলা হয় যে, ইচ্ছা করলে ভারতের যে কোন অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে। এই প্রস্তাব মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকে প্রত্যক্ষভাবে জোরদার করে তোলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস ক্রিপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু এই ক্রিপসের প্রস্তাব মুসলিম লীগের নেতৃবর্গের মধ্যে যে নতুন আশার সঞ্চার করে তা ধীরে ধীরে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতার অন্যতম প্রত্যক্ষ ফল জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালিত ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলন। এই আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং মিস্টার জিন্নাহ্ ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন বলে আখ্যা দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, এটা শুধুমাত্র ব্রিটিশদের ভারত থেকে বিতাড়িত নয়, মুসলিমদের উপর চিরদিনের জন্য কর্তৃত্ব করার জন্য এই আন্দোলন শুরু করা হয়। সুতরাং মুসলিম লীগ মুসলমান সম্প্রদায়কে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করে এবং ব্রিটিশ সরকারকে ভারত পরিত্যাগ করে যাওয়ার পূর্বেই ভারত বিভক্তিকরণের জন্য অনুরোধ জানায়। চক্রবর্তী রাজাগোপালচারী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের জন্য একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করেন এবং এই প্রস্তাবে পাকিস্তান গঠন সহ মুসলিম লীগের অধিকাংশ দাবিই স্বীকৃত হয়। কিন্তু মিস্টার জিন্নাহ্ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। হিন্দু ও মুসলিমদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল সিমলায় একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু লর্ড ওয়াভেলের এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। মিস্টার জিন্নাহ্ এই সম্মেলনে দাবি করেন যে, গভর্নর জেনারেলের মন্ত্রিপরিষদের সমস্ত মুসলিম সদস্যই মুসলিম লীগের দ্বারা মনোনীত হবেন।

(৪) ১৯৪৫-১৯৪৬ সালের নির্বাচন :

১৯৪৫-৪৬ খ্রীস্টাব্দের অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস প্রায় প্রতিটি প্রদেশেই অ-মুসলমানদের সাধারণ আসন প্রায় সমস্তই অধিকার করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গরিষ্ঠ-সংখ্যক মুসলিমদের সংরক্ষিত আসন এবং যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার

ও আসামের বেশ কিছু সংরক্ষিত আসন কংগ্রেসের অধিকারে আসে। মুসলিম লীগ একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ অন্যান্য সকল প্রদেশেই গরিষ্ঠ-সংখ্যক সংরক্ষিত আসন অধিকার করে।

(৫) মুসলিম লীগের আশাভঙ্গ ও প্রতিক্রিয়া :

ক্যাবিনেট মিশন মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করতে অস্বীকার করে। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংরক্ষিত ৭৮টি আসনের মধ্যে ৭৩টি আসন লাভ করে। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের বাঞ্ছিত পাকিস্তান স্বীকৃত না হলে তারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ারও ভীতি প্রদর্শন করেন। ১৬ই আগস্ট কলকাতায় মুসলমানগণ অতর্কিতে হিন্দুদের আক্রমণ করে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে। কয়েক সপ্তাহ পরে নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় মুসলমান নিরাপরাধ হিন্দুদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে। তখন বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং বোম্বাইতে হিন্দুরাও ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমান হত্যায় প্রবৃত্ত হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর জাতীয় কংগ্রেস পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে। মুসলিম লীগ এই সরকারে প্রথমে যোগ দিতে অস্বীকৃত হয়। তবে কয়েক সপ্তাহ পরে সরকারের সহযোগিতার পরিবর্তে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উপায় হিসাবে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করে। কিন্তু মুসলিম লীগ নেহেরুর নেতৃত্ব ও যৌথ দায়িত্ব অস্বীকার করে। অপরদিকে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিলেও মুসলিম লীগ গণপরিষদে যোগ দিতে অস্বীকার করে। একটি মণ্ডলীর মধ্যের কোন প্রদেশের বের হয়ে আসার অধিকার সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে নতুন করে মতদ্বৈধতা ঘটে। উভয় দলের মধ্যে এই সম্পর্কে লণ্ডনে ব্রিটিশ সরকারের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগের ব্যাখ্যাই সমর্থন করে। ভারতের রাজনৈতিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে সম্মত হলেও মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। কংগ্রেস তখন মুসলিম লীগের সদস্যদের অনুপস্থিতিতেই গণপরিষদের কার্য চালিয়ে যেতে সংকল্প করে এবং ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই সময় মুসলিম লীগ ঘোষণা করে যে, তাদের অনুপস্থিতিতে গণপরিষদ যে শাসনতন্ত্র রচনা করবে মুসলমান সংখ্যাধিক্য অঞ্চলগুলো কিছুতেই তা স্বীকার করবে না, তাদের স্বতন্ত্র গণপরিষদ চাই, যা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করে।

(৬) ভারত বিভাজন :

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ভারতের রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এই জটিল অবস্থার মধ্যে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তারা ভারতের শাসন দায়িত্ব ত্যাগ করবে। এই ঘোষণায় আরও বলা হয় যে, এই সময়ে যদি ভারতের রাজনৈতিক

দলগুলো ঐক্যমতে উপনীত হতে না পারে তা হলে ব্রিটিশ সরকার কাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবে তা তারা নিজেরাই স্থির করবে। ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবের ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। ইতিমধ্যে লর্ড ওয়াভেলের পরিবর্তে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হয়। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে মার্চ তিনি দিল্লীতে এসে উপস্থিত হন। দিল্লীতে এসে তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন এবং এই আলাপ-আলোচনায় পাকিস্তান সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী বলেই স্থির হয়। সুতরাং তিনি ৩রা জুন বাংলাদেশ, আসাম ও পাঞ্জাব বিভাগসহ ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এই সকল পরিস্থিতি ও পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ সরকার "ভারত স্বাধীনতা আইন রচনা করে। ১৯৪৭ সালে ৪ঠা জুলাই এই.বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় এবং ১৮ই জুলাই পার্লামেন্টে তা অনুমোদিত হয়ে রাজস্বাক্ষর লাভ করে আইনে পরিণত হয়। এই আইনে বলা হয় যে, ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট থেকে ভারতবর্ষে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে।

(৭) ভারত বিভাগের কারণ :

প্রথমতঃ, বহুদিন ধরেই ধীরে ধীরে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব গড়ে ওঠে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের সৃষ্টিই তার শেষ পরিণতি। ওয়াহাবী আন্দোলনের সময় থেকেই মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপাদানে গঠিত মুসলিম লীগ ভারতের জাতীয় ঐক্যের উপর আঘাত দিতে শুরু করে। আলীগড় আন্দোলনের সময় সর্বপ্রথম দ্বিজাতিতত্ত্বের মতবাদ শক্তি সঞ্চয় করে। মুসলিম লীগ গঠনের পর এই মতবাদ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়তঃ,শাসকদের অনুসৃত বিভেদমূলক নীতি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কাল্পনিক পার্থক্যকে বাস্তব পার্থক্যে পরিণত করে। ব্রিটিশ শাসকগণ প্রথম থেকে ভারতকে বহু-জাতির দেশ ও বহু ধর্মের দেশরূপে ঘোষণা করে। সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিরূপে জাতীয় কংগ্রেসের দাবিকেও তারা কখনও স্বীকার করে নি। আলীগড় আন্দোলনের সময় থেকেই তারা মুসলিমদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করতে শুরু করে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা পদ্ধতি এই নীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

তৃতীয়তঃ, জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার ফলে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চল্লিশের দশকে মুসলিম লীগ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার সুযোগ লাভ করে। জাতীয় কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বাংলাদেশের কংগ্রেস শক্তিশালী মুসলিম রাজনৈতিক দল কৃষক প্রজা দলের সহিত সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। ফলে কৃষক প্রজা দল মুসলিম লীগের সহিত যোগ দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে পাঞ্জাবেও কংগ্রেস অনুরূপ ভুল করে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় কংগ্রেস কখনই খুব সক্রিয়ভাবে সাধারণ মুসলমানদের নিজেদের দলে আনয়ন করা অথবা জাতীয় চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে নি। তাদের এই নীতির জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মুসলিম লীগের হস্তগত হয়। মুষ্টিমেয় জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতার উপর আস্থা স্থাপন করা

কংগ্রেসের অন্যতম মারাত্মক ভুল। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করাও জাতীয় কংগ্রেসের আর একটি ভুল সিদ্ধান্ত। বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মিস্টার জিন্নাহ্ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিস্তারের সুযোগ লাভ করেন। পাকিস্তানের দাবি উত্থাপনের জন্যও তিনি এই সময় বিশেষ সুযোগ লাভ করেন। ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিদ্বেষের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের হিন্দুগণও দেশ বিভাগের পক্ষপাতী হয়ে ওঠে।

চতুর্থতঃ, ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী দুর্বল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠন করে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলই অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই মিস্টার জিন্নাহ্ ঘোষণা করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসনে মুসলিমদের রাজনৈতিক অধিকারের নিরাপত্তা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং এইরূপ পরিস্থিতির হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় ভারত বিভাগ এবং মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন। ব্রিটিশ সরকারও ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করেই ভারত বিভাগের ব্যবস্থা করে। Professor Percival Spear-এর মতে "... partition may be regarded in principle, it was perhaps necessary in the larger interest's of the country."

Q. 36. Write a critical note on the Home Rule Movement

Ans. (১) **ভূমিকা :**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে : (১) লক্ষ্ণৌ চুক্তি অনুসারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় ; (২) কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের অবসান হয় ; এবং (৩) অ্যানি বেসান্ত ও বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে পরিচালিত দুটি স্বতন্ত্র ধারায় গঠিত হোমরুল আন্দোলন নৈরাশ্যের দ্বারা আক্রান্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে পুনরায় প্রাণবন্ত ও গতিশীল করে তোলে।

(২) **অ্যানি বেসান্তের হোমরুল লীগ :**

সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাব্রতীরূপে পরিচিতা অ্যানি বেসান্ত জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃত্বের মাধ্যমে ভারতীয়গণ বিশেষ কোন ক্ষমতা লাভ করতে সমর্থ হবে না এ কথা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়ে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হন। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতকে একটি স্বায়ত্ত শাসিত দেশে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য ঘোষণা করেন। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'কমন উইল' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তারপর তিনি আয়ারল্যাণ্ডের হোমরুল লীগের অনুকরণে ভারতে একটি হোমরুল লীগ স্থাপন করার চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু অ্যানি বেসান্ত ব্রিটিশ শাসকদের শত্রু ছিলেন

না। তিনি নিদ্রামগ্ন ভারতীয়দের জাগ্রত করে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে, "I am an Indian Tom Tom, walking up all the sleepers so that they may wake and work for their motherland." অ্যানি বেসান্তের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের থেকে চরমপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করে চরমপন্থী নরমপন্থীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে জাতীয় কংগ্রেসের সংহতি ও শক্তি বৃদ্ধি করা। রাজনৈতিক সংস্কারের দিকে তিনি শাসনতন্ত্রের প্রতিটি স্তরে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "In political reform, we aim at the building up of complete self-government from village councils, through District and Municipal Boards and Provincial Legislative Assemblies to a National Parliament, equal to its powers to the Legislative Bodies of the Self-Governing colonies, by whatever name they may be called ; also at the direct representation of India in the Imperial Parliament when that body shall contain representative of the self-governing states of the Empire"

অ্যানি বেসান্ত ঘোষণা করেন যে, স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার ; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের সেবা অথবা ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতি তাদের আনুগত্যের পুরস্কার হিসাবে তারা স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দাবি করতে সম্মত নয়। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, "India does not chaffer with the blood of her sons and the proud tears of her daughters in exchange for so much liberty, so much right India claims the right as a national to justice among the peoples of the Empire. India asked this before the war, India asks for it during the war, India will ask for it after the war but not as a reward but as a right does she ask for it." প্রকৃতপক্ষে অ্যানি বেসান্ত হোমরুল প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠনের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতাদের মনঃপূত না হওয়ায় বেসান্ত নিজের দায়িত্বে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হোমরুল লীগ নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। অল্পকালের মধ্যেই বোম্বাই, কানপুর, এলাহাবাদ, বারানসী ও মাদ্রাজে এই সংস্থার শাখা স্থাপিত হয়। 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি ভারতের সর্বত্র হোমরুলের আদর্শ প্রচার করতে শুরু করেন। অ্যানি বেসান্তের ক্ষুরধার বক্তৃতা ও সংগঠনী প্রতিভা ভারতবাসীর মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং হোমরুল আন্দোলনের জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

(৩) তিলকের প্রতিষ্ঠিত হোমরুল আন্দোলন ঃ

অনুরূপভাবে ভারতে হোমরুল আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিলক ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের জাতীয়তাবাদী কর্মীদের এক সমাবেশ

আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতীয় হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। হোমরুল আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তিলক 'মারাঠা' ও 'কেশরী' এই পত্রিকা দুটিতে এই আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করতে শুরু করেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিক্রমা করে তিনি জনগণকে এই সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তিলকের প্রচেষ্টায় হোমরুল আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে অপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তিলক ও বেসান্তের প্রচেষ্টা অল্পদিনের মধ্যেই সাফল্য লাভ করে। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দুটি হোমরুল লীগের সদস্যসংখ্যা ষাট হাজারে পরিণত হয়। এতদিন পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস শুধুমাত্র শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু হোমরুল আন্দোলনের প্রভাব গ্রামাঞ্চলেও সম্প্রসারিত হয়। ছাত্র, যুবক, সাধারণ সরকারী কর্মচারী, এমন কি, গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষও এই আন্দোলনের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়। ফলে জাতীয় আন্দোলনের পরিধি বিস্তৃত হয়।

(৪) সরকারী প্রতিক্রিয়া ঃ

হোমরুল আন্দোলনের জনপ্রিয়তায় সরকার বিচলিত হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ তিলক ও বেসান্তের জনপ্রিয়তা ও জনগণের উপর তাঁদের প্রভাব সরকারী কর্তৃপক্ষকে দারুণ ভাবে চিন্তিত করে তোলে। এমন কি, সরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাবও চিন্তা করতে শুরু করে। অপরদিকে হোমরুল আন্দোলনের প্রভাব হ্রাস করার জন্য সরকার দমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। আন্দোলন দমনের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে মাদ্রাজ সরকার অ্যানি বেসান্তকে অন্তরীণ করেন। সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়। গান্ধীজী, মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্, আগা খান প্রভৃতি নেতৃবর্গও সরকারী এই নীতির প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অ্যানি বেসান্তকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের প্রতিও সরকারের দৃষ্টি পড়ে। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিশ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়। তিলক জরিমানা দিতে অস্বীকার করে কারাগারে বন্দী হতে সম্মত হন। তিলকের প্রতি সরকারের কঠোর নীতি সর্বত্র ঘৃণার সঞ্চার করে এবং তিলকের জনপ্রিয়তা অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পায়।

(৫) জাতীয় কংগ্রেস ও হোমরুল আন্দোলন ঃ

হোমরুল আন্দোলনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় রাজনীতিতে নরমপন্থী নেতৃত্বে এক দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। কারণ ইতিমধ্যেই হোমরুল আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে অ্যানি বেসান্ত সভানেত্রীর পদে নির্বাচিত হন। সভানেত্রীর ভাষণে অ্যানি বেসান্ত ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টে অবিলম্বে ভারতের স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি বিল আনয়নের দাবি জানান।

(৬) অন্যান্য দেশে এই আন্দোলনের প্রভাব :

হোমরুল আন্দোলনের প্রভাব শুধুমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ও মাদ্রাজ হোমরুল লীগের সভাপতি স্যার সুব্রহ্মণিয়ম আয়ার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসনের নিকট এক পত্রে ভারতের অসহনীয় অবস্থার কথা ব্যক্ত করেন এবং গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শ ভারতে প্রয়োগ করার জন্য অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে তিলকের চেষ্টায় আমেরিকান সান ফ্রান্সিসকো শহরে হোমরুল লীগের একটি শাখা স্থাপিত হয়। লণ্ডনেও হোমরুল লীগের শাখা গঠিত হয়। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি সংস্থাও ভারতে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন জানায়।

(৭) আন্দোলনের গুরুত্ব :

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে হোমরুল লীগের গুরুত্ব যথেষ্ট। প্রথমতঃ, হোমরুল আন্দোলন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই আন্দোলনে নরমপন্থী রাজনীতির অন্তঃসার শূন্যতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে সর্বভারতীয় জনমত গঠনের প্রচেষ্টা ব্রিটিশ সরকারকেও উদ্বিগ্ন করে তোলে এবং সেইজন্যই ভারত সচিব মণ্টেগু ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে আগস্ট ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে ঘোষণা করেন, "ব্রিটিশ-ভারতের অন্তর্ভুক্ত থেকে ভারতবাসী যাতে প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করতে পারে এবং ক্রমশঃ স্বায়ত্ত শাসনের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে এরূপ নীতিই গ্রহণ করবে।"

দ্বিতীয়তঃ, হোমরুল আন্দোলনের মাধ্যমে বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। হোমরুল আন্দোলনের মাধ্যমে তিলক তাঁর অসামান্য নেতৃত্ব, সাংগঠনিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে সমর্থ হন। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি একদিকে কংগ্রেসের উপর তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং নরমপন্থী নেতৃত্বের অসারত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হন; অপরদিকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলনের প্রসার ঘটিয়ে তিনি প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন।

তৃতীয়তঃ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধীযুগের পূর্বাভাস সূচনা করাই হোমরুল আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব। হোমরুল আন্দোলনের পথ অনুসরণ করেই গান্ধীজী পরবর্তীকালের গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন। হোমরুল আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বর্ণের জনগণের মধ্যে সংগ্রামী চেতনার সঞ্চার করে। যে সকল অঞ্চল ও শ্রেণী এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাঙ্গণে এখন থেকে তাদের আগমন শুরু হয়। এক কথায় হোমরুল আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রাক্তন গণ্ডী অতিক্রম করে জনগণের আন্দোলনে পরিণত হয় এবং ভারতের সমস্ত অঞ্চলকে একই আন্দোলনের সূত্রে গ্রথিত করতে সমর্থ হয়। সেই সূত্র অবলম্বন করেই গান্ধীজী গণ-আন্দোলন গঠন করার সুযোগ লাভ করেন।

(৮) উপসংহার :

হোমরুল আন্দোলন সীমিত অর্থে গণ-আন্দোলনে পরিণত হলেও এই আন্দোলনের মধ্যে কোন নতুনত্ব ছিল না অথবা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার দ্বারাও এই আন্দোলন উদ্বুদ্ধ ছিল না। ফলে আন্দোলনের গতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ভাবেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। অপরদিকে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতের শাসন-পদ্ধতির সংস্কারের জন্য মণ্টেগুর ঘোষণা জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তির মনেই নতুন আশার সঞ্চার করে এবং তাঁরা আন্দোলন-বিমুখ হয়ে ওঠেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মণ্টেগু-চেমসফোর্ড আইন ভারতের নেতৃবর্গের আশাভঙ্গের কারণরূপে দেখা দিলেও অনেকে নতুন পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। অপরদিকে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর ফলে হোমরুল আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পায় এবং ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাব, অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হওয়ার ফলে হোমরুল আন্দোলনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়ে পড়ে।

Q. 37. Discuss the growth and development of terrorism in Indian politics from the early nineties of the 19th century to the second decade of the 20th century.

Ans. (১) ভূমিকা :

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনা প্রসার লাভ করে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হয়। ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে ভারতের মুক্তির জন্য গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লবীদল যে সমস্ত বৈপ্লবিক তৎপরতা গড়ে তুলেছিল তা সাধারণভাবে সশস্ত্র বিপ্লব বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলন গুপ্তহত্যা বা সন্ত্রাসের মাধ্যমে পরিচালিত হত বলে ব্রিটিশ শাসকবর্গ এই আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনরূপে চিহ্নিত করেন। ভ্যালেণ্টাইন্ শিরল তাঁর 'ইণ্ডিয়ান আনরেস্ট' গ্রন্থে এই বিদ্রোহকে 'ভারতীয় বিদ্রোহ' না বলে 'হিন্দু বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করেন। তিনি মনে করেন যে, ব্রিটিশ জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে হিন্দুদের তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকেই সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব ঘটে। তবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের আরও কয়েকটি কারণ যুক্তিসঙ্গতভাবেই নির্দেশ করা যায়। গভর্নর-জেনারেলের কার্যনির্বাহক পরিষদের স্বরাষ্ট্র সদস্য রেজিনাল্ড ক্যাডক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেন যে, শাসনব্যবস্থায় বৈষম্য এবং অর্থ নৈতিক দুর্দশার ফলে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই বিপ্লবী আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতি এবং জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যর্থতা উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে প্রসারিত করে। রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ) জাপানের অভাবনীয় জয়লাভ ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে

উদ্দীপ্ত করে তোলে। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-নীতি (১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ) সন্ত্রাসবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে। তবে সমগ্র ভারতে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। এই আন্দোলন মহারাষ্ট্র, বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে।

(২) মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলন :

ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে মহারাষ্ট্রে। মহারাষ্ট্রে বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে সর্বপ্রথম একটি গোপন বিপ্লবী সংঘ গঠন করেন। শিক্ষিত সমাজ ফাদকের আদর্শ সমর্থন না করলেও নির্বাচিত ও অবহেলিত রামোজি সম্প্রদায় ফাদকের আদর্শ গ্রহণ করে এবং এই সম্প্রদায়ের লোকজন নিয়ে তিনি একটি গোপন সমিতি গঠন করেন। ফাদকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করে অনুগামীদের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে নির্দেশ দেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল ডাক ও রেল চলাচল বিপর্যস্ত করা, এবং জেলখানা ভেঙ্গে কয়েদীদের মুক্ত করে নিজ দলভুক্ত করা। ইতিমধ্যে অর্থের জন্য ফাদকে বাধ্য হয়ে রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু করেন। কিন্তু রামোজি সম্প্রদায়ের অর্থের লোলুপতার জন্য ফাদকের সকল্প সাফল্য লাভ করতে অসমর্থ হয় এবং তিনি তাদের সংশ্রব ত্যাগ করেন। পরে তিনি ইসমাইল খান রোহিলী নামক একজন আফগান সর্দারের সহযোগিতায় পুনরায় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি ব্রিটিশ সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন এবং ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি বন্দী হন এবং বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। যদিও ফাদকের বৈপ্লবিক প্রয়াস ব্যর্থ হয় কিন্তু তাঁর নির্দেশিত বৈপ্লবিক আদর্শ ব্যর্থ হয় নি। তিনি যে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ নির্দেশ করেন তা পরবর্তীকালে ভারতের সর্বত্র প্রসারিত হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে ফাদকে-কে ভারতের বিপ্লববাদের জনক বলা যায়। ফাদকের আদর্শ ও আত্মত্যাগ খুবই প্রশংসনীয়। ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁর রোজনামচায়ও তিনি লেখেন, "শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায় ও জাগরণে আমার একমাত্র চিন্তা ব্রিটিশদের ধ্বংস সাধন।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মহারাষ্ট্রে পুনরায় বিপ্লবী প্রচেষ্টা সক্রিয় হয়ে ওঠে। 'গণপতি' ও 'শিবাজী' উৎসবের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আদর্শ প্রচারিত হতে থাকে। জনগণের মনে বিপ্লবী চেতনা সঞ্চারের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। তিনি 'গণপতি পুজা' ও 'শিবাজী উৎসবকে' জাতীয় ও রাজনৈতিক উৎসবে পরিণত করেন। তাঁর 'মারাঠা' ও 'কেশরী' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত মারাঠা যুবকদের মনে বিদ্রোহী মনোভাব গড়ে তোলেন। এই সময় মহারাষ্ট্রে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিলক সরকারকে খাজনা না দেওয়ার আন্দোলন শুরু করেন। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিলে সরকারী নীতির প্রতিবাদে দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামে দুভাই পুণের ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার র‍্যাণ্ড এবং অপর

একজন সামরিক কর্মচারীকে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তিলককে অভিযুক্ত করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলে সমগ্র দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়।'

মহারাষ্ট্রের 'বালসমাজ' ও 'আর্যবান্ধব সমাজ' ও বিপ্লবী আদর্শে গড়ে ওঠে। পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় ও ভাই পরমানন্দ, মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক এবং বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গেও ঐ প্রতিষ্ঠান দুটির যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিছুদিন পরে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে আর একটি বিপ্লবী সংস্থা গড়ে ওঠে। বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকার ইতালির বিপ্লবীনেতা ম্যাৎসিনির 'ইয়ং ইতালি'র অনুকরণে 'অভিনব ভারত' নামে এই সংস্থাটি স্থাপন করেন। সাধারণতঃ কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এই সংস্থা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এই সংস্থার সদস্যগণ সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে। বিনায়ক দামোদর সাভারকারের ভাই গণেশ দামোদর সাভারকার নাসিকে অনুরূপভাবে বিপ্লবের বীজ উপ্ত করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার গণেশ দামোদর সাভারকারকে কারারুদ্ধ করলে সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামীগণ ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার জ্যাকসনকে হত্যা করে। তা ছাড়া, সাভারকারের সহযোগী মদনলাল ধিংড়া ইংলণ্ডে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে স্যার কার্জন উইলিকে হত্যা করেন। এই সকল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে লণ্ডনে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বিনায়ক দামোদর সাভারকার গ্রেপ্তার হন। বিচারের জন্য তাঁকে ভারতে পাঠাবার সময় তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পলায়ন করেন। কিন্তু পুনরায় তাঁকে বন্দী করা হয় এবং বিচারে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

(৩) বাংলাদেশে বিপ্লবী কার্যকলাপ :

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা মহারাষ্ট্রে হলেও এই আন্দোলন বাংলাদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপকতা লাভ করে। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই বাংলাদেশে গুপ্ত সমিতি গঠনের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। নবগোপাল মিত্রের নেতৃত্বে হিন্দু মেলা সংগঠন ও ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে সঞ্জীবনী সভা যুব সম্প্রদায়কে নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনাও যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন চেতনার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। ফলে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় তিনটি ও মেদিনীপুরে একটি গুপ্তসমিতি গঠিত হয়। এইসব সমিতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল অনুশীলন সমিতি। অনুশীলন সমিতির নামের সঙ্গে এই সংস্থার সভাপতি ব্যারিস্টার পি. মিত্রের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকলেও ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে মার্চ সতীশচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টার ফলেই বাস্তব রূপ গ্রহণ করে এবং শরীর চর্চার সংস্থারূপে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের অনুকরণে এই সমিতির নামকরণ করা হয়। কিছুদিন পরে 'যুগান্তর' নামে একটি দল গঠিত হয়। ইতিমধ্যে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে তরুণ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে কলকাতায় পাঠান এবং তিনি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রায় সকল জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গেই অনুশীলন সমিতির

সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ক্রমশঃ কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এই সমিতির শাখা গড়ে ওঠে এবং কলকাতায় সমিতির প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়।

তবে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে অনুশীলন সমিতি ও বাংলাদেশের অন্যান্য সমিতিগুলো শরীর চর্চা, লাঠিখেলা প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত ছিল এবং সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত ছিল না। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হলে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন নতুন রূপ গ্রহণ করে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের বিপ্লবীরা প্রথম নিখিলবঙ্গ সম্মেলন আহ্বান করেন এবং এই সম্মেলনের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীদের মধ্যে সংহতি দৃঢ়তর হয় তবে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক তৎপরতা প্রকাশ্য ও গোপন এই দুটি খাতে প্রবাহিত হয়। একটি গোষ্ঠী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে আন্দোলন পরিচালনার পক্ষপাতী ছিল। অপর দলটি ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র বিকল করার উদ্দেশ্যে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে-সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পথ অবলম্বন করে। হিংসাত্মক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। জনগণের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ভবানী মন্দির নামক একটি গল্প প্রকাশ করেন। অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দেমাতরম্' এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকাও এই বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরে বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে বিপ্লবী সঙ্ঘগুলো 'রাজনৈতিক ডাকাতি' শুরু করে।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দেই বাংলার বিপ্লবীদল সর্বপ্রথম গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই সময় তারা 'পূর্ববঙ্গ ও আসামের' লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি মাণিকতলার মুরারীপুকুর অঞ্চলে বোমা প্রস্তুত করার কারখানা নির্মাণ করেন এবং তাঁরা ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করে শাসনযন্ত্র বিকল করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। অত্যাচারী প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড তাঁদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হন। ব্রিটিশ সরকার কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে মজঃফরপুরে বদলি করে। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামক দু'জন তরুণ বিপ্লবীর উপর কিংসফোর্ডকে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁদের নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি নামে দুজন নিরপরাধ মহিলা মারা যান। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য প্রফুল্ল চাকী নিজের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। অপরদিকে মুরারী-পুকুরের বিপ্লবীদের আস্তানায় হানা দিয়ে পুলিশ অরবিন্দ ঘোষ সহ ছিয়াত্তিজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে এবং আসামীদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত আলিপুরের বোমার মামলা শুরু হয়। এই সময় নরেন গোঁসাই নামক একজন দুর্বলচিত্ত বিপ্লবী পুলিশের নিকট অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করায় ঐ মামলার অপর দুই আসামী কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু—নরেন

গোঁসাইকে জেলের মধ্যেই গুলি করে হত্যা করেন। ফলে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসুর ফাঁসি হয়। আলিপুর বোমার মামলার ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচেষ্টায় অরবিন্দ ঘোষ খালাস পেলেও অপরাপর আসামীদের অনেকেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

আলিপুর বোমার মামলার পর বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কিছু পরিমাণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সক্রিয় রাজনীতি থেকে অরবিন্দের বিদায় গ্রহণ, সরকারের কঠোর দমন-নীতি এবং অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যায়। তা ছাড়া, এইসব বিপ্লববাদের প্রকৃতিগত পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথম দিকে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা হলেও পরে এই সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। বিপ্লবী কর্মপন্থা সংক্রান্ত ব্যাপারেও পরিবর্তন ঘটে এবং বিক্ষিপ্তভাবে বোমা নিক্ষেপের পরিবর্তে সার্থক বিপ্লবের জন্য কৃষক, শ্রমিক ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সভা গঠনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং বৈদেশিক সাহায্যের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের কর্মসূচী তৈরি করা হয়। তা সত্ত্বেও ১৯০৮ থেকে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিপ্লবীগণ প্রায় ৬৪ জন সরকারী কর্মচারীকে হত্যা বা হত্যা করার চেষ্টা করে। তার মধ্যে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলার ছোটলাট ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা, পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে হত্যা, ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা, ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ অফিসার সামসুল আলমের প্রাণনাশ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৪) পাঞ্জাবে বিপ্লবী আন্দোলন ঃ

বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে পাঞ্জাবেও বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রসার লাভ করে। তবে পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক তৎপরতার মূলে আর্য সমাজের প্রভাবও যথেষ্ট কার্যকরী ছিল। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবের সাহারাণপুরে প্রবাসী বাঙ্গালী জে. এম চট্টোপাধ্যায় ও অপর কয়েকজন যুবক প্রথমে একটি গোপন সমিতি গঠন করেন। হরদয়াল, অজিত সিংহ, আম্বাপ্রসাদ এই সমিতিতে যোগ দেন। হরদয়ালের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে বিপ্লববাদ বিশেষ প্রসারলাভ করে। লালা লাজপত রায়ও বিপ্লবীদের নানাভাবে সাহায্য করেন। পাঞ্জাবের বিপ্লবীরাও বাংলার বিপ্লবীদের মতো অস্ত্র সংগ্রহ ও বোমা নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতির চাপে পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা তেমন সাফল্য লাভ করতে পরে নি। লালা লাজপত রায় ও অজিত সিংহের কারাদণ্ড হলে পাঞ্জাবে বিপ্লব আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে অজিত সিংহ জেল থেকে মুক্তিলাভ করে 'ভারত মাতা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজদ্রোহ মূলক প্রচার ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হন। ইতিমধ্যে হরদয়াল লাহোরে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ছাত্রদিগকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ শিক্ষা দিতে শুরু করেন। কিছুদিন পরে অজিত সিংহ ও হরদয়াল উভয়ই ভারত ত্যাগ

করলে রাসবিহারী বসু পাঞ্জাব তথা উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন।

উত্তর ভারতে বিপ্লবী কার্যকলাপে রাসবিহারী বসুর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে রাসবিহারী বসুর সহকর্মী বসন্ত বিশ্বাস দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রার উপর বোমা নিক্ষেপ করেন। পুলিশ রাসবিহারীকে এই কাজের জন্য সন্দেহ করলে তিনি বেনারসে আশ্রয় নিয়ে বৈপ্লবিক সংগঠন তৈরি করার চেষ্টা করেন। পরে তিনি আমেরিকায় গঠিত বিপ্লবী গদরপার্টির সহায়তায় ভারতের সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লবের বাণী প্রচার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই বিপ্লবের প্রচেষ্টার কথা পুলিশ বিভাগ জানতে পেরে বহু ব্যক্তিকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করে। কিন্তু রাসবিহারী বসু পুলিশী তৎপরতা ব্যর্থ করে জাপানে পলায়ন করতে সক্ষম হন।

(৫) সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির অবসানের কারণ :

বিপ্লবী আন্দোলনের অবসানের মূলে সরকারী দমন নীতির সক্রিয় ভূমিকা ছিল এ কথা সত্য, তবে এই আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল কর্মপদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অন্যান্য সাংগঠনিক দুর্বলতা। বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দুর্বলতা ছিল যে এই আন্দোলনে মূলতঃ অংশ গ্রহণ করত ছাত্রসমাজ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরা। শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী এই বিপ্লববাদী তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত না হওয়ার ফলে বিপ্লববাদের শিকড় কখনও গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পায় নি। তা ছাড়া, হিন্দুধর্ম ভিত্তিক কর্মপন্থা থাকার ফলে মুসলমান সম্প্রদায় এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে যায়। তবে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতো কিছু মুসলিম নেতা ও বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী গতিধারার সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন এবং 'আলহিলাল' পত্রিকার মাধ্যমে জনমানসে বিপ্লবী চেতনা সঞ্চার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য অর্জন করে নি। তা ছাড়া, বৈপ্লবিক আন্দোলনের অপর একটি ত্রুটি হল আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ। বিপ্লবের পন্থা নিয়ে মতভেদ থাকার ফলে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সুসংবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। প্রমথনাথ মিত্র, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্লবীগণ গণ-সংযোগের পক্ষপাতী ছিলেন, অপরদিকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পুলিন দাস প্রমুখ নেতৃবর্গ হত্যা ও সন্ত্রাসের উপর বেশি জোর দেন। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ বিপ্লবীই সন্ত্রাসবাদের পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ তাঁরা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্য যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং ধীর স্থির ভাবে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁদের এই নীতির ফলে এবং জনসংযোগের অভাবের জন্য ব্যাপক বৈপ্লবিক আন্দোলনের কোন ভিত্তি গড়ে ওঠে নি। এই দুর্বলতাই বৈপ্লবিক আন্দোলনের অবসান ত্বরান্বিত করে তোলে।

Q. 38 Give a brief account of the revolutionary activities of the Indians outside India.

Ans. (১) ভূমিকা :

ভারতের বিপ্লবীগণ বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা থেকেই ভারতের বাইরে বিভিন্ন

পাশ্চাত্য দেশে বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিদেশী শক্তির সাহায্য লাভ। এই প্রয়াসের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ দমন-নীতির গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে বিদেশ থেকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ পরিচালনা করা।

(২) ইংলণ্ডে বৈপ্লবিক প্রয়াস ঃ

বিদেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা। তিনি ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন এবং 'ইণ্ডিয়ান সোশ্যালিস্ট' নামে একটি মসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়া হাউস' লণ্ডনে প্রবাসী ভারতীয়দের প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার প্রধান সহযোগী ছিলেন সর্দার সিং রানা। 'বন্দেমাতরম', 'ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম অফ ওয়ার' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে সর্দার সিং রানা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'ইণ্ডিয়া হাউস' ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ স্মরণসভার আয়োজন করে এবং অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানও উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করে। প্রখ্যাত মারাঠা বিপ্লবী দামোদর বিনায়ক সভারকারও এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ইতালির বিপ্লবী নেতা ম্যাৎসিনির জীবনীগ্রন্থ ও ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। ইতিমধ্যে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে মদনলাল ধিংড়া নামক একজন ভারতীয় বিপ্লবী স্যার কার্জন উইলিকে হত্যা করে ইংলণ্ডে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন এবং এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে পুলিশ সাভারকারকে গ্রেপ্তার করে। ইংলণ্ডে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন মাদাম ভিকাইজি রুস্তমজি কামা। মাদাম কামাকে 'ভারতীয় বিপ্লববাদের জননী' বলা হয়। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে জার্মানীর স্টুটগার্ট শহরে তিনি সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং মাঝখানে বন্দেমাতরম লেখা একটি তিনরঙা পতাকার নীচে বক্তৃতা দেন। এই পতাকার রঙ ছিল লাল, সবুজ ও হলুদ। এই পতাকাই ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা নামে পরিচিত। মাদাম কামা ব্রিটেনে ভারতীয় তরুণ সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটি' গঠন করেন। ব্রিটিশ দমন নীতি থেকে তিনি রেহাই পাওয়ার জন্য প্যারিসে চলে যান এবং সেখান থেকে বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেন। এদিকে ব্রিটিশ সরকার সাভারকারকে বন্দী করার পর ব্রিটেনে বিপ্লবী প্রচেষ্টা অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়ে এবং বিপ্লবীরা আত্মরক্ষার জন্য ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রে বিপ্লবী প্রয়াস ঃ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীগণ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তারকনাথ দাস ও মোহন সিং বাঘনা এই ব্যাপারে পথিকৃৎ ছিলেন। তারকনাথ দাসের প্রচেষ্টায় ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ' স্থাপিত হয়। তবে লালা হরদয়াল যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত হলে আমেরিকায় ভারতীয়দের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় ছাত্র ও শ্রমিকগণ গদর পার্টি গঠন

করেন। গদর শব্দটির অর্থ বিদ্রোহ। গদর পার্টি যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় প্রবাসী ভারতীয়দের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি ছিল। গদর পার্টির মুখপত্র ছিল 'গদর' নামে একটি সংবাদপত্র। গদর পার্টির কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার সচেতন ছিল। কিন্তু সরকারের নানাপ্রকার বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও এক বিরাট সংখ্যক বিপ্লবী আমেরিকা থেকে ভারতে আসতে সমর্থ হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গদর পার্টির সমর্থনে উত্তর ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

(৪) জার্মানীতে বৈপ্লবিক প্রয়াস :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতের মুক্তির জন্য ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবনী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীগণ বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং যুদ্ধ সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মান সরকার ভারতীয়দের এই আবেদন অগ্রাহ্য করেন। পরে ব্রিটিশ সরকারকে দুর্বল করে তোলার জন্য জার্মান সরকার ভারতীয়দের সাহায্য দানে প্রস্তুত হয়। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে লালা হরদয়াল ইয়োরোপে চলে এলে জার্মানীতে বৈপ্লবিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ বরতুল্লা, মনসুর, ধীরেন্দ্র সরকার প্রভৃতি বিপ্লবীগণ বৈপ্লবিক প্রয়াসকে সুসংহত করার জন্য বার্লিন কমিটি গঠন করেন। জার্মানীতে বসবাসকারী ভারতীয়দের অনেকেই এই বৈপ্লবিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন এবং নিঃশর্তভাবে জার্মানীর সাহায্য লাভ করে নিজেদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

(৫) উপসংহার :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রয়াসের প্রথম অধ্যায়ের চরম পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। এই সময় ঢাকা থেকে লাহোর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাসবিহারী বসুর নির্দেশনায় এক সশস্ত্র সামরিক অভ্যুত্থানের উদ্যোগ দেখা যায়। অন্যদিকে ভারতের বাইরে গদর পার্টি ও অন্যান্য প্রবাসী বিপ্লবীদের দ্বারা জার্মানীর সহায়তায় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের প্রচেষ্টা পরিচালিত হয়। জার্মানীর সহায়তায় এম. এস. ম্যাভরিক জাহাজে অস্ত্র আনয়ন করে যে সশস্ত্র সংঘর্ষের পরিকল্পনা গৃহীত হয় তাও ফলপ্রসূ হয় নি। তা ছাড়া, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ইন্দ-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলা আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো শহরে শুরু হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 'নিরপেক্ষতা আইন' ভঙ্গের অভিযোগে বিপ্লবীরা অভিযুক্ত হন। আসামীদের মধ্যে ভারতীয় বিপ্লবীগণ ছাড়াও জার্মান সরকারের অনেক পদস্থ কর্মচারী কনসাল প্রভৃতি ছিলেন। এই মামলায় মোট আসামীর সংখ্যা ছিল ১০৫ জন। ব্রিটিশ সরকারের চাপে বিপ্লবীগণ সহজেই গ্রেপ্তার হন এবং তাঁদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ আপাতকালের জন্য বন্ধ হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার একটি চমকপ্রদ ঘটনা হল 'কোমগাতামারু' জাহাজের গতিবিধি। কানাডায় প্রবাসী ভারতীয়দের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত

হওয়ায় কানাডায় প্রবাসী বহু সংখ্যক শিখ এই জাহাজে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর কলকাতার কাছে বজবজে তাঁরা অবতরণ করেন। কিন্তু এই শিখদের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হলে তাঁরা সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ফলে সরকারী সৈন্যদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সংঘর্ষে ১৮ জন শিখ নিহত হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনা ভারতীয়দের মনে তীব্র বিদ্বেষের সৃষ্টি করে।

প্রবাসে ভারতীয়দের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ইতিহাসে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। 'বার্লিন কমিটির' অনেকেই এই সময় সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ, বরকতুল্লা প্রভৃতির সহিত রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে মহেন্দ্র-প্রতাপ ও বরকতুল্লার পরিচালনায় ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে কাবুলে একটি অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে রাশিয়ার সহযোগিতায় কাবুল থেকে তাসখন্দে এই বিপ্লবী সমিতি স্থানান্তরিত হয়। বুখারা, সমরখন্দ, বাকু প্রভৃতি স্থানেও এই বিপ্লবী সমিতির শাখা স্থাপিত হয়।

Q. 39. Discuss the role of Swarajya Party in Bengal Politics in the 1920

Ans (১) ভূমিকা :

কয়েকটি বিশেষ কারণে স্বরাজ্যদল গঠিত হয়। গান্ধীজী কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ও তাঁর কারাদণ্ডের ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচীর অভাব দেখা দেয়। গান্ধীজী কর্তৃক অকস্মাৎ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলে অনেকের মনেই প্রচণ্ড অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, এন. সি. কেলকার প্রমুখ নেতৃবর্গ গান্ধীজীর নীতিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন পরি-চালিত হওয়ার ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলে তা বিনষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য নতুন একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতনের ফলে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবর্গের অনেকেই আইন সভায় প্রবেশ করে সরকারী কাজকর্মে বাধাদান ও নতুন আইন বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে বিরোধিতা করার পক্ষপাতী ছিলেন। তা ছাড়া, জাতীয় কংগ্রেস ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ভারত আইন অনুসারে নির্বাচন বর্জন করার ফলে সুযোগ সন্ধানী বহু ব্যক্তি আইন সভায় প্রবেশ করার সুযোগ পায়। আইন সভা থেকে তাদের বিতাড়িত করার জন্যও জাতীয় নেতৃবর্গের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

কারান্তরালে বাস করার সময় চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য দল গঠন করার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করেন। ১৯২২ সালের অগাস্ট মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গয়ার কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি ১৯১৯ সালে মণ্ট ফোর্ড শাসন সংস্কার অনুসারে আইন সভাগুলোতে প্রবেশ করে সরকারি নীতির বিরোধিতা করার প্রস্তাব আনেন। তিনি বলেন যে, ভিতরে বাধা দিয়ে মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারের অসারতা প্রমাণ করতে হবে। গান্ধীজী তখনও কারারুদ্ধ ছিলেন। সেজন্য গান্ধীজীর অনুগামীরা চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং আইন সভায় প্রবেশের প্রস্তাব কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করে না। চিত্তরঞ্জন তখন প্রস্তাবের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের স্বরাজ্যদল গঠন করেন। স্বরাজ্যদলের মুখপাত্র হিসাবে প্রথমে ফরওয়ার্ড ও পরে লিবার্টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে স্বরাজ্যদলের সমর্থকগণ এই মর্মে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করার সুযোগ পান,—"···Such Congressmen as have no religious or other conscientious objections against entering the legislatures at liberty to stand as candidates and to exercise their right of voting at the forthcoming elections." বেলগামের কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মহাত্মা গান্ধী। তিনিও স্বরাজ্যদলের কর্মসূচীর প্রতি মৌন-সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

(২) স্বরাজ্যদলের কর্মসূচী ও প্রভাব :

জাতীয় কংগ্রেস ও স্বরাজ্যদলের মধ্যে কর্মপন্থার পার্থক্য থাকলেও উদ্দেশ্য একই ছিল। উভয় দলই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বরাজ অথবা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দাবি করে। কর্মপন্থা হিসাবে জাতীয় কংগ্রেস আলাপ-আলোচনার পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে কিন্তু স্বরাজ্যদল সরকারী কাজে বাধা প্রদান করে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিল। প্রকৃতপক্ষে "Obstruction was the Key note of the Swarajist creed ....They wanted to put up resistance to the obstruction placed in their path to Swaraj by beaurocratic Government"

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে স্বরাজ্যদল আশাতীত সাফল্য লাভ করে। বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রদেশের স্বরাজ্য দলের বিরোধিতায় সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিরোধীদলের নেতা মতিলাল নেহেরু নতুন সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গোল টেবিল বৈঠক ডাকার প্রস্তাব আনেন এবং সে প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হয়। কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে স্বরাজ্য দলের বিরোধিতায় মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারের অসারতা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার ভারতের জন্য নতুন সংবিধানের ক্ষেত্র প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(৩) বাংলাদেশ ও স্বরাজ্যদল :

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে বাংলাদেশে স্বরাজ্যদল অপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারের সমর্থক উদারপন্থী নেতৃবর্গকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে স্বরাজ্য দলের প্রার্থীগণ আইনসভায় প্রবেশ করার সুযোগ পান। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এস আর দাস প্রমুখ প্রবীণ নেতৃবর্গের নির্বাচনে পরাজয় নিঃসন্দেহে স্বরাজ্যদলের জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। বাংলাদেশের আইন সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে অসমর্থ হলেও স্বরাজ্য দল আইন সভায় বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যও স্বরাজ্যদল সচেষ্ট হয়। বাংলার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য স্বরাজ্য দল ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর মুসলিম নেতাদের সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের অধিকার সম্পর্কিত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তি বেঙ্গল-প্যাক্ট নামে পরিচিত।

(৪) আইন সভায় স্বরাজ্যদলের কার্যাবলী :

আইন সভায় প্রবেশ করেই স্বরাজ্যদল সংবিধান সংশোধনের দাবি করে। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে স্বরাজ্যদলের চেষ্টায় বাংলাদেশের তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারের ফলে প্রবর্তিত দ্বৈত শাসন প্রথার তাঁরা তীব্র সমালোচনা করেন এবং এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে তাঁরা বর্ণনা করেন। স্বরাজ্যদলের বিরোধিতায় সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স আইন বিধিবদ্ধ করেন এবং আইনের বলে স্বরাজ্যদলের সদস্য সুভাষচন্দ্র বসু, সন্তোষ মিত্র প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার করে। স্বরাজ্যদল এই অর্ডিন্যান্সের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং 'বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট' বিলেরও তীব্র সমালোচনা করেন। স্বরাজ্যদলের বিরোধিতায় সরকারী কাজ-কর্ম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে বাংলাদেশের গভর্নর লর্ড লিটন স্বরাজ্যদলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশকে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি গভর্নরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং স্বরাজ্যদলের সদস্য বহির্ভূত গোষ্ঠিকে নিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি জে. এম. সেনগুপ্ত আইন সভায় "১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী ধৃত সমস্ত রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে"—এই মর্মে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং শেষপর্যন্ত প্রস্তাবের পক্ষে ৭৬টি ভোট এবং প্রস্তাবের বিপক্ষে ৪৫টি ভোট পড়ে। আর একটি প্রস্তাব অনুযায়ী সমস্ত নির্যাতনমূলক আইন বাতিল এবং সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি করা হয়। আইনসভায় নির্দলীয় হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের সহযোগিতায় স্বরাজ্যদল বিভিন্ন প্রকার অর্থ মঞ্জুরের বিল, এমন কি, মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা প্রভৃতি সংক্রান্ত বিলের আলোচনার সময় মন্ত্রীসভাকে পরাজিত করে। তা ছাড়া, স্বরাজ্যদল আরও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য একটি বেসরকারী প্রস্তাব পাশ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে সরকার পক্ষ কয়েকজন বিরোধী পক্ষের সদস্যকে নিজের দলে আনতে সমর্থ হয়। তথাপি মন্ত্রীদের বেতন সংক্রান্ত বিল দু'বার আইনসভা কর্তৃক

পরিত্যক্ত হয় এবং মন্ত্রীপরিষদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে গভর্নর স্বয়ং কয়েকটি হস্তান্তরিত বিভাগের শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

(৫) আইন সভার বাইরে স্বরাজ্যদলের কার্যাবলী :

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের জাতীয় কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বরাজ্যদলের সদস্যগণ আইনসভা বর্জন করেন। আইনসভায় অংশ গ্রহণ সম্পর্কে গান্ধীজী ও স্বরাজ্যদলের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধিতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ স্বরাজ্যদলের নেতৃবর্গের সহিত গান্ধীজীর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ২রা মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ফরিদপুর অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস গঠনের দাবির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ফলে স্বরাজ্য দলের অনেক সদস্যের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করার পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সরকার কঠোর নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে গান্ধীজীর সহিত স্বরাজ্যদলের কোন কোন বিষয়ে মতৈক্য দেখা দেয় এবং স্বরাজ্যদলের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় জাতীয় কংগ্রেস তাদের অনেক নীতিই গ্রহণ করে। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের অনেক প্রার্থীই পরাজিত হয়। বাংলাদেশ ও মাদ্রাজে কেবলমাত্র তাঁরা বিপুল সংখ্যায় নির্বাচিত হন। বাংলাদেশে স্বরাজ্য দলের রাজনৈতিক চাপে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ১৯২৬ সালের নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে এবং মুসলিম সদস্যদের সমর্থনে মন্ত্রীসভা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

(৬) স্বরাজ্য দলের অবসান :

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে স্বরাজ্যদলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর ফলে স্বরাজ্য দলের অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে গান্ধীজীর বিরোধিতা করার মতো নেতা তিনি ব্যতীত স্বরাজ্যদলে আর কেউ ছিলেন না। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারের সহিত অসহযোগিতার মনোভাব দূর হওয়া এবং সক্রিয়ভাবে সরকারের সহিত সহযোগিতা করার নীতি জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হলে স্বরাজ্য দলের আন্দোলনের মধ্যে ভাঙ্গন শুরু হয়। অপরদিকে সরকারের কঠোর নীতি এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার ফলেও স্বরাজ্যদল নানারূপ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

(৭) স্বরাজ্য দলের মূল্যায়ন :

অল্পদিনের ব্যবধানে স্বরাজ্যদলের উত্থান ও পতন হলেও—বাংলাদেশ তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মন্ত্রী-পরিষদের উপর এই দল অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সমর্থ হয়। অপরদিকে মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরতে এই দলের সদস্যগণ সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। আইন

সভার সদস্য হিসাবে এই সংস্কারের অসারত্ব তাঁরা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। তা ছাড়া, সংসদীয় রীতি-নীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্বও তাঁরা দাবি করতে পারেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সংগঠনের সঙ্গে বিভিন্ন জেলার সংগঠনের গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তাঁরা একান্তভাবে চেষ্টা করেন। তাঁদের আন্দোলন ও সাংগঠনিক যোগাযোগই পরবর্তীকালে আইন-অমান্য আন্দোলনের পটভূমি রচনা করে। স্বরাজ্যদলের কার্যাবলী মূল্যায়ন সম্পর্কে H. N. Brasilford এর মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়, "To my thinking the tactics of obstruction was justified for they convinced even the British Government, that the system of dyarchy was unworkable."

Q. 40. Narrate the salient features of the Simon Commission. What was India's reaction to it ?

Ans. (১) ভূমিকা :

আইনসভায় প্রবেশ করে স্বরাজ্যদল মন্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারের অসারতা প্রমাণ করেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিরোধী দলের নেতা মতিলাল নেহরু ভারতের নতুন সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গোলটেবিল বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়ে যে যে প্রস্তাব আনেন তা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মন্ট-ফোর্ড সংস্কারের দোষ ত্রুটি ব্রিটিশ সরকারও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে মন্ট-ফোর্ড সংস্কারে অনুমোদিত সময়ের দু বছর পূর্বেই ভারতের সাংবিধানিক সংস্কার পুনর্বিবেচনা করতে সম্মত হয়। তবে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক পরিবর্তনই সম্ভবতঃ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ভারতের সংবিধান সংস্কারের প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে একটি কমিশন গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড বার্কেন হেড রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার নিকট কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। ইংলণ্ডের পরবর্তী সধারণ নির্বাচনে উদারপন্থী দলের ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনায় ভীত হয়ে লর্ড বার্কেন হেড এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—কারণ উদারপন্থী দলের হাতে কমিশন গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করতে তিনি অসম্মত ছিলেন। তা ছাড়া, ক্ষমতা বিভাজনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে স্বরাজ্য দলের প্রভাব হ্রাসের চেষ্টাও এই কমিশন গঠনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইতিমধ্যে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে লর্ড আরউইন ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হলে কমিশন গঠনের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

(২) গঠন :

সাতজন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন সাইমন এবং সভাপতির নাম অনুসারে এই কমিশনের নামকরণ করা হয় 'সাইমন কমিশন'। এই কমিশনের সমস্ত সদস্যই ছিলেন ইংরেজ এবং কোন ভারতবাসী এই কমিশনে স্থান লাভ না করার জন্য ভরতীয় নেতৃবর্গ এই কমিশন বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কোন

ভারতবাসীকে এই কমিশনের সদস্য রূপে গ্রহণ না করার সপক্ষে ব্রিটিশ সরকার এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করে যে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কার প্রণেতাগণ এই সমস্ত কমিশনের সদস্যপদ পার্লামেন্টের সভ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারের কোন শর্তেই সুস্পষ্ট এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয় নি। তা ছাড়া, সে সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অন্ততঃ দুজন ভারতীয় সদস্যও ছিলেন। সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ হাউস অফ লর্ডসের এবং শাপুরজি সাখাতওয়ালা হাউস অফ কমন্সের সদস্য ছিলেন। লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ ভারতের বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্কারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবেও জড়িত ছিলেন। তাঁর মূল্যবান্ উপস্থিতিতে কমিশন যথেষ্ট উপকৃত হওয়ার সুযোগ পেত। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের রক্ষণশীল সরকার কোন ভারতীয়কে কমিশনের সদস্যরূপে গ্রহণ করার বিরোধী ছিল। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের এই কমিশন বর্জন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে Dr. A B. Keith মন্তব্য করেন যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এই সিদ্ধান্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল। কারণ, "only a body external to India could properly decide whether the country was fit for a further step towards the goal of self government or not. As India was not independent, she could not investigate her own case."

(৩) দায়িত্ব ঃ

ভারতবাসী দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য কতখানি প্রস্তুত, দায়িত্বশীল সরকার গঠনের পরিবেশ কতদূর অনুকূল এবং কি ধরনের শাসনতন্ত্রের পক্ষে ভারতের সব ধরনের জনমত ও স্বার্থ সন্তুষ্ট করা সম্ভব তা পর্যালোচনার দায়িত্ব সাইমন কমিশনের উপর ন্যস্ত করা হয়। তা ছাড়া, প্রচলিত শাসনপদ্ধতির কার্যকারিতা, শিক্ষা বিস্তার ও ব্রিটিশ-ভারতের প্রতিনিধিমূলক সংস্কার কার্যকলাপ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার দায়িত্বও এই কমিশনের উপর অর্পণ করা হয়। কিন্তু কমিশন কার্যভার গ্রহণ করার পরই ব্রিটিশ শাসিত ভারতের সহিত ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে স্থির করতে অসমর্থ হওয়ায় সংবিধান সংস্কারের প্রশ্ন আরও জটিল হয়ে ওঠে। যদিও পরে সরকারের অনুমতিক্রমে কমিশন ব্রিটিশ শাসিত ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধেও বিচার-বিবেচনা করার সুযোগ লাভ করে।

(৪) কমিশনের রিপোর্ট ঃ

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক পার্সিভাল স্পিয়ারের মতে—কমিশনের রিপোর্ট সাংবিধানিক দলিল হিসাবে অপূর্ব কিন্তু চরম রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পরিচায়ক। কমিশন প্রতিটি প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য সুপারিশ করে। এমন কি, কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী পুলিশ ও বিচার বিভাগের দায়িত্বও ভারতীয়দের হাতে ন্যস্ত করার জন্য অনুমোদন করা হয়। নির্বাচক-মণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক আইনসভা গঠনের প্রস্তাবও রিপোর্টে স্থান লাভ করে। কিন্তু কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ব্রিটিশ শাসকদের একাধিপত্য

অক্ষুণ্ণ রাখার প্রস্তাব করে। ব্রিটিশ-ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের জন্যও রিপোর্টে কয়েকটি নতুন নীতি সুপারিশ করা হয়।

জাতীয় কংগ্রেস এই কমিশনের রিপোর্ট ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি-বিরোধী বলে ঘোষণা করে। অপর দিকে কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করার পূর্বে ব্রিটিশ সরকার ও দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্য স্যার জন সাইমন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে অনুরোধ করেন। ইংলণ্ডের সরকার অনুরোধ রক্ষা করতে স্বীকৃত হয়। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর লর্ড আরউইন ঘোষণা করেন যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস লাভ করাই ভারতীয়দের সংবিধান সংক্রান্ত আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর এই উদ্দেশ্যে লণ্ডনে একটি গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করা প্রয়োজন। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা লর্ড আরউইনের প্রস্তাবও সমর্থন করে।

(৫) ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া :

সাইমন কমিশনের সদস্যবৃন্দ যে দিন এদেশে এসে পৌছান সেদিন ভারতের সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। কমিশনের সদস্যবৃন্দ যেখানে যান সেখানেই কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শন করে এবং 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনি দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। একটি কমিটি তৈরী করে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যদের কমিশনের সহিত সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়, কিন্তু তাঁরা সরকারের এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। সাইমন কমিশন বর্জনের দাবি জানাতে গিয়ে বহু কংগ্রেস কর্মী গ্রেপ্তার ও নির্যাতিত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার-নির্যাতন কমিশনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ দমন করতে ব্যর্থ হয়।

কোন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ না করায় জাতীয় কংগ্রেস প্রথম থেকেই এই কমিশনের বিরোধিতা করে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এই কমিশনের সহিত সহযোগিতা করতে অস্বীকৃত হয়। কমিশনের প্রশ্নে মুসলিম লীগ ঐক্যমত হতে ব্যর্থ হয়। স্যার মোহম্মদ সফির নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একদল সদস্য লাহোরে সম্মিলিত হয়ে কমিশন বর্জন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অপর একটি দল মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে কলকাতায় একটি সম্মেলন আহ্বান করেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করে সাইমন কমিশন বর্জন করতে সম্মত হয়।

কমিশনের প্রতি বিক্ষোভ দেখা দিলে ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড মন্তব্য করেন যে সংবিধানের প্রশ্নে ভারতীয়গণ একমত হতে অসমর্থ বলেই কমিশনে তাঁদের গ্রহণ করা হয় নি। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের এই দাবির অসারতা প্রমাণ করার জন্য জাতীয় কংগ্রেস সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করে। সংবিধানের খসড়া তৈরীর জন্য কমিটিও নিযুক্ত হয়। এই কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন মতিলাল নেহেরু ও জওহরলাল নেহেরু। ফলে এই কমিটির রিপোর্ট 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে পরিচিত। এই কমিটির মুখ্য নির্দেশক

মণ্ডলী এবং মুসলিম গরিষ্ঠ এলাকায় মুসলিমদের আসন সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করে নেহেরু রিপোর্ট সম্পর্কে মুসলিম নেতৃবর্গ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। আজাদ, আনসারী, কিচলু প্রমুখ জাতীয় কংগ্রেসের মুসলিম নেতাগণ নেহেরু রিপোর্ট সমর্থন করেন। কিন্তু মোহম্মদ আলি, সাফি, জিন্নাহ্ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নেহেরু রিপোর্ট স্বচ্ছন্দভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনের পক্ষে জিন্নাহ্ তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দ দফা ঘোষণা করেন। কিন্তু মুসলিম নেতাদের অনেকেই জিন্নাহ্‌র এই ঘোষণা অনুসরণ করতে অসম্মত হন।

সাইমন কমিশন ও কমিশনের রিপোর্ট জাতীয়তাবাদী ও সাংবিধানিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। এই কমিশনই জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু রূপে পরিণত হয়। সংবিধান সংস্কারের জন্য বিভিন্ন দল বিভিন্ন প্রকার প্রস্তাব করে, ফলে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে। তবে দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সাইমন কমিশন মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারের অনুমোদিত দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রস্তাব দ্রুত কার্যকরী করার জন্য সুপারিশ করে। ফলে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রস্তুত করার জন্য ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে নভেম্বর মাসে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। তবে ব্রিটিশ সরকারের নীতির সমর্থকগণ এই বৈঠকে যোগ দেন। ইতিমধ্যে ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বানে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় এবং আন্দোলন স্থগিত হওয়ার পূর্বে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে জাতীয় কংগ্রেস যোগ দিতে সম্মত হয়। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও গোলটেবিল বৈঠকের আলাপ-আলোচনার উপর নির্ভর করেই ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত আইন সম্পর্কে ডক্টর পার্সিভাল স্পিয়ার মন্তব্য করেন, "... the last major constructive achievement of the British in India."

Q. 41. Discuss the political programme of the Congress during the first twenty years of its history.

Ans. (১) **জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন (১৮৮৫ খৃস্টাব্দ) :**

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখে বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কলকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৭২ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন এবং কয়েকজন পদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীও এই সম্মেলনের প্রস্তাব রচনায় সাহায্য করেন। সভাপতির ভাষণে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় ঐক্যের মনোভাব গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান। The eradication by direct friendly personal intercourse of all possible race, creed or provincial prejudices amongst all lover of the country, and the fuller development and consolidation

of those sentiments of national unity that took their origin in our beloved Lord Ripon's ever memorable reign. কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলনে সব বক্তাই ইংলণ্ডেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়-বিচারের উপর আস্থা স্থাপন করেন। এই অধিবেশনে ছ'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়, যথা—(১) ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করা ; (২) ভারত সচিবের পরামর্শসভা বাতিল করা ; (৩ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবের আইনসভা গঠন করা ; (৪) আইন সভার সদস্যদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং বাজেট সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন ও আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ দান ; (৫) সামরিক খাতে ব্যয় সঙ্কোচন এবং সামরিক বিভাগে নিয়োগের ব্যাপারে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ; এবং (৬) ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের জন্য একই সঙ্গে ইংলণ্ড ও ভারতে পরীক্ষা গ্রহণের এবং পরীক্ষার্থীদের নিম্নতম বয়ঃবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

(২) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পর্বের সংকট (১৮৮৬-১৮৯০)

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ভারতের প্রায় প্রতিটি অঞ্চল থেকেই প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। আইনসভার সম্প্রসারণ, সিভিল সার্ভিসে যোগদানের সুযোগ বৃদ্ধি ব্যতীতও এই অধিবেশনে ভারতের জনসাধারণের শোচনীয় দারিদ্র্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজ শহরে জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন বসে। স্যার সৈয়দ আহমদের সনির্বন্ধ অনুরোধে মুসলিম প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে অসম্মত হয় এবং ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন মুসলমান সম্প্রদায়ের এইরূপ আচরণের কথা সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সচিবকে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মাদ্রাজ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা বদর-উদ্-দিন তায়েবজি এবং এই সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল ৬০৭। সভাপতির ভাষণে তায়েবজি জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের জন্য মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানান, ফলে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে মুসলিম প্রতিনিধিদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

ইতিমধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে ভারতের ব্রিটিশ শাসকগণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। লর্ড ডাফরিন প্রথমদিকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং কংগ্রেসের দাবির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভার সম্প্রসারণের জন্য ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করেন। এই সুপারিশের ফলেই ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। পরে জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে সেন্ট অ্যাণ্ড সান্ধ্যভোজ বক্তৃতায় জাতীয় কংগ্রেসকে 'মুষ্টিমেয় জনসাধারণের' প্রতিনিধি বলে সমালোচনা করেন। অপরদিকে জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার এ. ও. হিউম

'An old Man's Hope' শিরোনামা সম্বলিত একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে ব্রিটিশের বিরাগভাজন হন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ সরকার বারবার কংগ্রেসের দাবি উপেক্ষা করায় তিনি ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ইংলণ্ডের অধিবাসীদের নিকট ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্র্যের কথা জানানোই ছিল এই ইস্তাহারের প্রধান উদ্দেশ্য। "Ah men! well read and happy! Do you at all realize the dull misery of these countless myriads? From their birth to their deaths, how many rays of sunshine think you chequer their 'gloom shrouded paths'? Toil, toil, toil; hunger, hunger, hunger; sickness, suffering, sorrow, these alas, alas, alas are the key-notes of their short and sad existence." হিউমের চেষ্টায় ইংলণ্ডের পত্র-পত্রিকায়ও ভারতের দারিদ্র্য ও দুর্দশার কথা প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মিস্টার হিউম এলাহাবাদে একটি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের ফল সম্পর্কে অনুষ্ঠিত কুআলোচনা করায় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার এ. কলভিন হিউমকে সতর্ক করার জন্য একখানি পত্র পাঠান। হিউমও এই চিঠির যথাযথ উত্তর দেন। কিন্তু হিউম-কলভিন বিরোধের ফলে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে এলাহাবাদে প্রস্তাবিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিংহের বদান্যতার ফলে এলাহাবাদেই জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে এবং মিস্টার জ্যাণ্ড্রু ইয়ুল এই অধিবেশনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের সদস্য স্যার চার্লস ব্রাডল এই সভায় যোগ দেন এবং সভাপতিত্ব করেন স্যার উইলিয়ম ওয়েড্‌ ডারবার্ন। ব্রাড্‌ল'র বক্তৃতায় ভারতীয় প্রতিনিধিগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁর একটি উক্তি চিরদিনের জন্য দেশপ্রেমিকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে—"Born of the people, tousted by the people, I will die for the people."

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্যার ফিরোজশাহ মেহতা। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেসকে আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকৃতি দেয় এবং প্রগতিশীল উদার নৈতিকদলের মুখপাত্র রূপে বর্ণনা করে।

(৩) জাতীয় কংগ্রেসের উত্তরোত্তর প্রভাব বৃদ্ধি (১৮৯০-১৯০৪):

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই ধীরে ধীরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে তখনও এই সংস্থার প্রথম যুগের অনুসৃত আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্দোলন পদ্ধতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু প্রথম যুগের বাধা-বিপত্তি ও নানারূপ বিরূপ সমালোচনার বিরুদ্ধে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হওয়ার ফলেই জাতীয় কংগ্রেস ভারত ও ইংলণ্ডের শত্রু এবং মিত্র উভয় পক্ষের কাছ থেকেই প্রশংসা অর্জন করে

এবং ভারতের জাতীয় জীবনের একটি নতুন শক্তি রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ লাভ করে।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয় এবং জাতীয় কংগ্রেসের দাবি আংশিকভাবে মেনে নিয়ে আইনসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার জাতীয় কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। ফলে জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনসমূহে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের শাসন-সংস্কারের পূর্ণরূপায়ণ ও অধিকতর শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য দাবি উত্থাপন করা হয়।

ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের হাউস অফ কমন্স-এর সদস্য দাদাভাই নওরোজী ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। জাহাজ থেকে বোম্বাই বন্দরে দাদাভাই নওরোজীর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রভারতে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। অধিবেশনের সময় অমৃতসরের শিখদের পবিত্র স্বর্ণমন্দিরেও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সভাপতির ভাষণে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের সহানুভূতির কথা দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে এবং ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে পুণেতে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের হাউস অফ্ কমন্সেও প্রতিনিধি পাঠাবার দাবি উত্থাপন করে। এই অধিবেশনে অপর একটি প্রস্তাবে আইন সভার ভারতীয় সদস্যদের দ্বারা মনোনীত ব্যক্তিদের ভারত সচিবের পরামর্শ সভায় এবং গভর্নর জেনারেল ও বোম্বাই এবং মাদ্রাজের গভর্নরের কার্যনির্বাহী পরিষদে গ্রহণের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করা হয়।

অপর দিকে ব্রিটিশের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্যও জাতীয় কংগ্রেস কয়েকটি দাবি বারবার পেশ করতে শুরু করে। এই সব দাবির মধ্যে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথক-করণ, জুরী পদ্ধতির প্রচলন, পুলিশ বিভাগের সংস্কার সাধন, লবণ-কর ও আয়কর হ্রাস, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আরও ব্যাপক প্রবর্তন, সামরিক বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচন এবং যুগপৎভাবে ভারতে ও ইংলণ্ডের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতিই ছিল প্রধান। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে শুরু করে। এই সময়কার জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেন, "The Congress guarded the interest of India like a vigilant watch-dog, and never failed to record its emphatic protest sgainst any measure likely to adversely affect the interest of India". এমন কি ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ম্যাঞ্চেস্টারের বয়ন শিল্পের স্বার্থে ভারতীয় বয়নশিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলোর উপর আবগারী শুল্ক ধার্য করলে জাতীয় কংগ্রেস সরকারী এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ করে। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গের

প্রধান উদ্দেশ্য হলেও, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি তাঁরা কোনভাবেই উদাসীন ছিলেন না।

(৪) উপসংহার :

জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসের প্রথম দুটি দশকে এই প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিই বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করত। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত নেতাই ছিলেন এই দুটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা ও বৃদ্ধির দিকে তাঁদের বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। পূর্বসূরী ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মতো জাতীয় কংগ্রেসেও ছিল প্রধানতঃ মধ্যবিত্তদের প্রতিষ্ঠান। ভারতের রাজনৈতিক চেতনার তখন মাত্র শৈশবকাল। ফলে পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই রাজনৈতিক চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল। শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়কে এই আন্দোলনের সহিত যুক্ত করার মতো সময় তখনও উপস্থিত হয় নি।

কিন্তু শুধুমাত্র শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনে লিপ্ত হত এরূপ মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। শ্রেণীস্বার্থের বাইরেও বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের কথাও এই সংস্থা প্রথম থেকেই চিন্তা করতে শুরু করে। আয়কর হ্রাসের দাবি জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই এই সংস্থার পক্ষ থেকে লবণ-কর হ্রাসের দাবি করা হয়। ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্যের কথা বিস্মৃত হওয়া জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গের পক্ষে কখনও সম্ভব হয় নি। এই সংস্থার দ্বিতীয় অধিবেশনেই সভাপতির ভাষণে ডি. ই. ওয়াচা বলেন যে ভারতের চল্লিশ লক্ষ লোক মাত্র একবেলা খেয়ে জীবন কাটায়—এমন কি, অনেকের পক্ষে সব সময় এক বেলারও খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে অনেক সময় তাঁরা বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করেন। জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষা করে জাতীয় কংগ্রেস কখনই বিশেষ কোন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করে নি।

MODERN INDIA

PART—I

(1858—1905)

Q. 1. Discuss the character of the Sepoy Mutiny.

Ans. (১) প্রকৃতি :

সিপাহি বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম থেকেই ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। সাধারণভাবে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে দুটি মত প্রাধান্য লাভ করে। স্যার জন লরেন্সের মতে সেনাবাহিনীর অসন্তোষই এই বিদ্রোহের উৎস এবং চর্বি মিশ্রিত বন্দুকের টোটাই এই বিদ্রোহের মূল কারণ। বিদ্রোহের প্রারম্ভে কোন ষড়যন্ত্র বা সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু পরে স্বার্থান্বেষী বহু ব্যক্তি বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার ফলে সিপাহিদের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। স্যার জন সীলিও মনে করেন যে নেতৃত্ববিহীন, জনসাধারণের সমর্থনহীন দেশপ্রেমরহিত স্বার্থপর সিপাহিরাই এই বিদ্রোহের পরিচালক।

কিন্তু জেনারেল আউট রামের মতে হিন্দুদের অসন্তোষ মূলধন করে ষড়যন্ত্রকারী মুসলিম সম্প্রদায় এই বিদ্রোহ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে। কিন্তু জনগণের সমর্থন লাভের ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে তৈরি হওয়ার পূর্বেই চর্বি মিশ্রিত বন্দুকের টোটা বিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করে। ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের লেখায় জেনারেল আউট-রামের মতই সমর্থিত হয়। সাভারকার সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম-রূপে বর্ণনা করেন। অশোক মেহতার মতে সিপাহিরাই এই বিদ্রোহের উদ্যোক্তা এবং ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত অত্যাচার তারাই প্রধানতঃ সহ্য করতে বাধ্য হলেও, বিদ্রোহীদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ না থাকলে বিভিন্ন স্থানে এত দ্রুত বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ত না। বিশেষতঃ এই বিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠে তা প্রকৃত পক্ষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিচয় বহন করে। এমন কি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার জন্য মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ গোহত্যা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। রাজপুতনার রাজাদের কাছে পত্র লিখে ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করার জন্য তিনি তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সুস্পষ্ট-ভাবে তাঁদের জানিয়ে দেন যে এদেশ থেকে ব্রিটিশ শক্তি বিতাড়িত হলে সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত যেকোন ব্যক্তির উপর ভারতের শাসন দায়িত্ব অর্পণ করতে তিনি প্রস্তুত। হিন্দু নেতৃবর্গও বাদশাহের এই প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত হন। নানাসাহেব মোগল বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করেন। শিখ সৈন্যগণও বিদ্রোহের প্রথমদিকে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ব্রিটিশ কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হওয়ার পরই তারা ইংরেজদের পক্ষে

যোগদান করে। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিপাহি বিদ্রোহকে সীমিতভাবে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য জাতীয় আন্দোলন বলা যেতে পারে।

(২) বিদ্রোহের নেতৃবর্গের স্বরূপ:

তবে বিভিন্ন কারণে সিপাহি বিদ্রোহের পটভূমিকা প্রস্তুত হয় বলে এই ঘটনার প্রকৃতি নির্ণয় করা খুবই দুষ্কর। ঐতিহাসিক টম্পসন ও গ্যারাট মনে করেন যে **"The Mutiny may be considered either as a military revolt, or as a bid for recovery of their property and privileges by dispossessed princes and landlords, or as an attempt to restore the Mughal empire, or as a peasants' war."** সাধারণভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যাদের স্বার্থে সবচাইতে প্রচণ্ড আঘাত লাগে তারাই এই বিদ্রোহের প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মোগল সম্রাট, দেশীয় নৃপতি বর্গ ও ভূস্বামীগণ এবং কৃষক সম্প্রদায় এই বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই উপরি-উক্ত ব্যক্তিরা এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেন। কিন্তু কোন সুসংগঠিত প্রচেষ্টার ফলে এই বিদ্রোহ গড়ে ওঠেনি। নানা কার্যকারণের সংমিশ্রণে এই বিদ্রোহের উৎপত্তি এবং নানা শাখা-প্রশাখায় তার বিস্তৃতি। অথচ সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধতা এই বিদ্রোহের ভিত্তি ছিল না। এই বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারীগণ কোন না কোন ব্যক্তিগত কারণে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ ছিল—কেউ ছিলেন রাজ্যচ্যুত, কেউ ছিলেন বৃত্তি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত আবার কেউ কেউ ছিলেন জাতিনাশ বা ধর্মনাশের ভয়ে আতঙ্কিত। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রায় একজনও বিদ্রোহীদের সমর্থন করেন নি।

অপরদিকে পাতিয়ালা ও কয়েকটি রাজ্য সক্রিয়ভাবে ইংরেজদের সহায়তা করে। তাছাড়া নামমাত্র মোগল বাদশাহকে দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা মুসলমান-দের মধ্যেও বিশেষ কোন উৎসাহের সৃষ্টি করতে পারেনি। তালুকদারের মধ্যে একমাত্র অযোধ্যার তালুকদারগণই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে, তবে তারাও সংগঠিতভাবে অংশ গ্রহণ করার কোন চেষ্টা করে নি। নর্মদার দক্ষিণে সর্বত্র এবং নর্মদার উত্তরে অধিকাংশ অঞ্চলেই সাধারণ শাসন ব্যবস্থা কায়েম ছিল। নিয়মিত শাসন ব্যবস্থা সর্বত্র ধ্বসে পড়ার ঘটনা কোথাও ঘটেনি। উভয় পক্ষের যুদ্ধরত লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কমই ছিল এবং বিদ্রোহ ঘোষিত হওয়ার চার মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ইহা দমন করা সম্ভব হয়। এই বিদ্রোহ প্রকৃত জাতীয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করলে মাত্র চারমাসের মধ্যে তা দমন করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে কখনও সম্ভব হত না। তা ছাড়া এই বিদ্রোহ পরিচালনায় ভারতীয় নেতৃবর্গ যে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে পূর্ব পরিকল্পিত ও সুবিবেচিত কোন কর্মসূচি গ্রহণ না করেই বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

(৩) আধুনিক মতামত:

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন সিপাহি বিদ্রোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে কয়েকটি সুচিন্তিত

মতামত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে বিদ্রোহের পরিকল্পনা, ষড়যন্ত্র ও প্রচার বহু পূর্বেই শুরু হয়। 'চাপাটি' বিতরণের কাহিনীই তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সিপাহিরা এই বিদ্রোহের সূত্রপাত করলেও ধীরে ধীরে সংক্রামক ব্যাধির মতো তা অন্যান্য শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বিদ্রোহী সৈন্যদলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরাই বিনা প্রতিবাদে যোগ দেয়। নানাসাহেবের অন্যতম বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন আজিম-উল্লা-খান, বাহাদুর খানের প্রধান অনুচর ছিল শোভারাম এবং ঝাঁসির রাণীর শক্তির প্রধান উৎস ছিল আফগান প্রতিরক্ষা বাহিনী।

অযোধ্যা ও শাহাবাদ ছাড়া অন্য কোথাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না এবং এই বিদ্রোহ জাতীয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে নি। কিন্তু সেজন্য ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহকে কেবলমাত্র সিপাহিদের বিদ্রোহ বলে আখ্যা দেওয়াও সমীচীন নয়। মীরাটের বিদ্রোহীরা দিল্লীর বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করলে বিদ্রোহ রাজনৈতিক বিপ্লবের রূপ নেয় এবং বহু ভূস্বামী এবং সাধারণ লোক বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করে বাদশাহের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হয়। ধর্মীয় কারণে যে বিদ্রোহের প্রথম সূচনা, ঘটনাচক্রে সে বিদ্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়। **"What began as a fight for religion ended as a war of independence, for there is not the slightest doubt that the rebels wanted to get rid of the alien Government and restore the old order of which the King of Delhi was the rightful representative."** প্রকৃতপক্ষে অযোধ্যার বিভিন্ন স্থানে এই বিদ্রোহ পুরোপুরি জাতীয় সংগ্রামে পরিণত হয়। বিদেশী শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে শাসিতদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ এই বিদ্রোহের মূল কারণ। ধর্মোন্মাদনা এই বিদ্বেষকে আরও বাড়িয়ে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই পরাধীন জাতি তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে। ভারতবাসীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু যেহেতু ভারতে একমাত্র সিপাহিরাই সশস্ত্র, সুতরাং তারাই এই বিদ্রোহে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পায়। সিপাহিদের বিদ্রোহ শুরু হলে ভারত থেকে বিদেশীদের বিতাড়িত করার জন্য অনেকেই তাদের সঙ্গে যোগদান করে।

কিন্তু ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সিপাহি বিদ্রোহকে কোন ক্রমেই জাতীয় আন্দোলন-রূপে গ্রহণ করতে সম্মত নন। সমসাময়িক তথ্য বিশ্লেষণ করে তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই বিদ্রোহের প্রত্যেক নেতাই নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। জাতীয়তা বোধের দ্বারা তাঁরা কেউই উদ্বুদ্ধ ছিলেন না। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেও কোন সম্প্রীতি ছিল না। বাহাদুর শাহ আন্তরিকভাবে বিদ্রোহীদের সমর্থন করেন নি। ঝাঁসীর রাণী বিদ্রোহের প্রথমদিকে বিদ্রোহীদের প্রতি কোনভাবেই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না। পরে বাধ্য হয়ে তিনি বিদ্রোহে যোগ দেন। হিন্দুগণ পেশোয়া নানাসাহেব এবং মুসলমানগণ বাহাদুরশাহকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করতে চেষ্টা করে। মুসলমান নবাবগণ বিদ্রোহের সময়ও হিন্দু প্রজাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন নি। ফলে এই বিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে নি।

ডক্টর মজুমদারের মতে ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ও আক্রোশ ছিল। তথাপি বিদ্রোহের সময় মুসলমানগণ বহু হিন্দুকে হত্যা করে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য একজন সিপাহিও প্রাণ বিসর্জন দিতে রাজি ছিল না। কিন্তু পরে ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহ দমন করতে শুরু করলে প্রাণ বাঁচানোর জন্যই সিপাহিরা প্রাণপণে যুদ্ধ করতে শুরু করে।

(৪) উপসংহার :

সিপাহি বিদ্রোহ সিপাহি দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত হলেও এই বিদ্রোহের গুরুত্ব অপরিসীম। বহু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচার ও অবিচারের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এই বিদ্রোহের ইন্ধন যোগায়। বিদ্রোহের পর ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। **"The rebellion of 1857 was more than a Sepoy Mutiny, was an erruption of the social volcano where many pent up force found vent. After the erruption, the whole social topography had changed. The scars of the rebellion remained deep and shining."** অপরদিকে জাতীয়তাবাদ শব্দটি সিপাহি বিদ্রোহের সময় ভারতের নেতৃবর্গের কাছে একেবারেই অপরিচিত ছিল। আসমুদ্র হিমাচলে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অত্যন্ত সীমিত অর্থে এই আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন বলা গেলেও এই আন্দোলনের গুরুত্ব সাধারণ লোকের কাছে খুবই কম। অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থ পুনরুদ্ধার করাই ছিল এই আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য। সংগঠনহীন কৃষকগণ কোথাও কোথাও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেও কোথাও তারা আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান লাভ করে নি। কিন্তু পরবর্তীকালের ভারতের ইতিহাসে এই বিদ্রোহের গুরুত্ব ও প্রভাব বিচার-বিবেচনা করলে সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতের জাতীয়তাবাদের উৎপত্তির প্রথম সুদৃঢ় পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। সিপাহি ত্রুটিবিচ্যুতির কথা বিস্মৃত হয়ে তার ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবাসী স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়। এই প্রসঙ্গে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য যথার্থই তাৎপর্যপূর্ণ—**"The true significance of 1857 lies in the inspiration which its memory afforded to later freedom movements and for such inspirational purposes, it matters nothing that the sordid and unhappy facts have become shrouded in a fog of pious makebelieves".**

Q. 2. Do you think that the aftermath of the revolt of 1857 was a conservative reaction in British policy ?

Ans. (১) ভূমিকা :

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ রূপে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের সামাজিক ও অন্যান্য সংস্কার প্রবর্তনের প্রচেষ্টাকে চিহ্নিত করা

হয়। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ ও হিন্দু সমাজের অন্যান্য সংস্কার রক্ষণশীল হিন্দুদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। সমুদ্রপাড়ি দিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্যদের বিদেশে প্রেরণের যে নীতি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে তাও হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র বিরোধী বলে বিবেচিত হত। খ্রীস্টধর্ম প্রচারের চেষ্টাকে প্রথম থেকেই হিন্দুগণ খুব অপছন্দ করত। লর্ড ডালহৌসীর আমলের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বিশেষতঃ স্বত্ব বিলোপ আইন অনুসারে দত্তক পুত্র গ্রহণের প্রতি বাধা-নিষেধ আরোপ করায় অনেক হিন্দুদের মনে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রচলন এবং অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যাদিও ইংরেজ শাসকদের সৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বলে বিবেচিত হয়নি। উপরিউক্ত-বিষয়গুলো সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণরূপে গণ্য না হলেও বিদ্রোহ সংগঠনে তাদের প্রভাব অনস্বীকার্য। ফলে বিদ্রোহ দমিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার ভারতে সামাজিক সংস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের কার্যকলাপ সরকারীভাবে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায়ও বলা হয় যে, **"We know and respect the feelings of attachment with which the Natives of India regard the land inherited by them from their ancestors and we desire to protect them in all rights connected therewith subject to the equitable demands of the state and we will do that generally in framing and administering the law, due regard be paid to the ancient rights, usages and customs of India."**

(২) ব্রিটিশ শাসকদের মনোভাব :

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি গভীর সন্দেহের চোখে দেখত। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার সিপাহি বিদ্রোহের পূর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদর্শন করতেন তা পরিত্যাগ করতে তাঁরা বাধ্য হন। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের স্যার উইলিয়াম ওয়েডবার্ন এবং মিস্টার হিউম স্পষ্টভাবে এই অভিমতের কথা প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে ওয়েডবার্ন বলেন, **"……many entirely disapprove of any efforts to cultivate the native mind, many condemn as unconditionally, a merely secular education".** এমনকি শ্বেতকায় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে অথবা বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী পাঠাবার জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ করতেও নিষেধ করা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে ব্রিটিশ রাজকর্মচারীগণ ভারতবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে এবং সহানুভূতিহীন হয়ে জাতিগত বৈষম্য বজায় রেখে এবং বিদ্রোহের সামান্যতম আভাস পেলে তাকে কঠোরভাবে দমন করে শাসনতন্ত্র পরিচালনা করার নীতি গ্রহণ করেন। ভারতবাসীদের সঙ্গে কোন প্রকার মেলামেশা করার বা যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনও তাঁরা উপলব্ধি করেন নি। সিপাহি-বিদ্রোহের পর থেকে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুরতি-

ক্রম্য ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। এমনকি সিপাহি বিদ্রোহের অবসানের পর ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য ভাবধারা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন করতে শুরু করলে ইংরেজ সরকার এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনপ্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করতে অসম্মত হয়। এমনকি ইংরেজ ঐতিহাসিক-গণ শিক্ষিত ভারতীয়দের এই প্রচেষ্টাকে দারুণ সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন এবং তাদের সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক **Malleson** তাঁর **The India Mutiny of 1857** নামক গ্রন্থে লেখেন, **"Concession to noisy agitation on the part of the ruling power would place the lives, the fortunes, the interests of the loyal classes of India at the mercy of the noisist, most corrupt and most despised race in India.**

(৩) মুসলিমদের প্রতি নীতি ঃ

সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অনুসৃত নীতি তাদের অনুদার মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় মুসলিম সৈন্যগণ বিদ্রোহে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস করে ভারতে পুনরায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। শেষ মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে তারা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজগণ মুসলমানদের অত্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং তাঁদের সম্পর্কে একটি অসহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেন। তাঁদের এই নীতির ফলে মুসলিম সমাজের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষী এক মনোভাবের সৃষ্টি হয় এবং বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পরও বহুদিন পর্যন্ত মুসলিমগণ ইংরেজশাসকদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ পায়নি।

(৪) স্বার্থপ্রণোদিত শাসন ঃ

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ও লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সমাজ থেকে নানা-প্রকার কুসংস্কার ও যুক্তিহীন প্রথা দূর করার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়, সিপাহি বিদ্রোহের পর তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় থেকে শাসক গোষ্ঠী-শাসিতদের মঙ্গল ও উন্নতির কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থেই শাসনতন্ত্র পরিচালনা করতে শুরু করে। এই সম্পর্কে **William Jennings Bryan** বলেন, **"The trouble is that England aquired India for England's advantage, not for India's, and that she holds India for England's benefit not for India's. She administers India with an eye to England's interests, not India's, and she passes judgement upon every question as a judge would be permitted to decide his own case."** সিপাহি বিদ্রোহের পর ইংলণ্ড নিজের স্বার্থেই সংরক্ষণশীল নীতি অনুসরণ করে ভারতের উপর তার আধিপত্য সুনিশ্চিত করে তোলার চেষ্টা করে।

(৫) উপসংহার ঃ

ঐতিহাসিক Percival Spear সিপাহি বিদ্রোহোত্তর যুগের ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, **"The Mutiny crisis necessarily brought to a halt the programme of social and material improvement which Dalhousie had pursued so energetically."** কিন্তু তিনি মনে করেন যে সাময়িকভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সম্পর্কে অনুদার, রক্ষণশীল ও সংকীর্ণ নীতি অনুসরণ করলেও অল্পদিন পরেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সম্পর্কে এই মনোভাব পরিবর্তন করে এবং John Bright ব্রিটিশ শাসনকে যে······hundred years of crime against the docile natives of India" বলে বর্ণনা করেন তা ঠিক নয়। কারণ ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি ভারতীয়দের সম্পর্কে নীচ ধারণা পোষণ করলেও, অনেকেই আবার ভারতবাসীর নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির কথা চিন্তা করতেন। সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তীকালেও ইংরাজ রাজকর্মচারীদের কার্যকলাপের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের 'উডের ডেসপ্যাচ' অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কোথাও কোন বাধার সৃষ্টি করা হয়নি। সিপাহি বিদ্রোহের সময়ই কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পরই বিভিন্নস্থানে নতুন নতুন কলেজ স্থাপিত হতে শুরু করে এবং সরকার এই সব কলেজের প্রতি অনুদান মঞ্জুর করতে খুব আপত্তি করেনি। জনহিতকর কার্যকলাপও বন্ধ হয়নি এবং বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই—ভারতের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন রেলপথ নির্মিত হয় এবং ভারতের সর্বত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। রেলপথ নির্মাণের ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেলেও যোগাযোগ ব্যবস্থাব উন্নতির ফলে ভারতের অন্তর্বাণিজ্য উন্নতিলাভের সুযোগ পায় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের পথ উন্মুক্ত হয়। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্যও ব্রিটিশ সরকার নতুন আইন বিধিবদ্ধ করে তার উদার নীতির পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে উত্তর প্রদেশ, আজমীর এবং পাঞ্জাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য একটি নীতি নির্ধারণ করে এবং পরবর্তীকালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের উদ্ভবের প্রাথমিক কার্যগুলো লর্ড ক্যানিং-এর চেষ্টায়ই সম্পন্ন হয়। অপরদিকে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার অনুযায়ী ভারতীয়দের জন্য যে নতুন আইন সঙ্কলনের ব্যবস্থা হয় তার ফলেই ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত আইন-বিধি এবং পরবর্তী বছরে ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত আইন-বিধি সরকারীভাবে কার্যকরী হয়। এই আইন সংকলনের ফলে ভারতের বিচার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সুতরাং ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ভারতবাসীদের সম্পর্কে অনুসৃত ব্রিটিশ সরকারের নীতি সম্পর্কে বলা যায় যে বিশেষ কোন সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্কারের

উপর গুরুত্ব আরোপ করে অথবা তা দূর করার জন্য সচেষ্ট না হয়ে ব্রিটিশ সরকার সাধারণভাবে ভারতীয় জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং পুরাতন ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে। তাছাড়া প্রাক্-বিদ্রোহের যুগে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকে কার্যকরী করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সমর্থন গ্রহণ করতে কিন্তু বিদ্রোহোত্তর যুগে ভারতীয়দের সাহায্যব্যতীত এককভাবেই ব্রিটিশ সরকার তাদের নীতি কার্যকরী করার ব্যবস্থা করে।

Q. 3. Discuss briefly the results of the Sepoy Mutiny.

Ans. (১) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান :

বিদ্রোহীদের কর্মপন্থা, যোগাযোগ ও সংহতির অভাব, সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব ও নেতৃত্বের সংঘর্ষ, বিদ্রোহীদের সাংগঠনিক ও সামরিক ভুল এবং সর্বোপরি বিটিশ কূট-কৌশল ও ব্রিটিশ সেনাপতিদের সামরিক দক্ষতার ফলে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ বিফল হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহ বিফলতায় পর্যবসিত হলেও এই বিদ্রোহের ফলেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসকদের প্রচেষ্টায় ভারতের শাসন ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়। এই বিদ্রোহের ফলে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্পষ্টই বুঝতে পারে যে, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হস্তে এত বড় একটি সাম্রাজ্যের শাসনভার ছেড়ে দেওয়া কোন মতেই নিরাপদ নয়। এই কারণে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে অবসান ঘটিয়ে এই সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের অধীনে স্থাপন করা হয়। ভারতের শাসনের উন্নতির জন্য একটি আইন পাস করে ভারতের শাসনভার একজন সেক্রেটারী ও পনর জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কাউন্সিলের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। এই সংস্থানটি ইংলণ্ডে স্থাপিত হয় এবং ইংলণ্ডের মহারানীর পক্ষে ভারতের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব এই কাউন্সিল ও সেক্রেটারীর হস্তে ন্যস্ত করা হয়। ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক মহারানীর প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের গভর্নর জেনারেল বা ভাইসরয় প্রতিনিধি নিযুক্ত হন।

(২) স্বত্ব বিলোপ নীতি পরিত্যক্ত :

গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং নতুন ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হন। ১৮৫৮ সালে ১লা নভেম্বর প্রচুর জাঁক-জমক ও আড়ম্বরের মধ্যে তিনি মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এই ঘোষণাপত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রিটিশ সরকার ভারতের দেশীয় রাজ্যসম্পর্কে তাদের নীতি পরিবর্তন করে। অধীনতামূলক বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে অধীনতামূলক ঐক্যের নীতি গৃহীত হয়। ব্রিটিশের স্বার্থের সহিত তাদের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করাই ছিল এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। অভিজাত ও রাজন্যবর্গের মধ্যে যাঁরা ইংরেজদের বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করেন তাঁদের সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা ও নানাভাবে পুরস্কৃত করা হয়। নিজাম, সিন্ধিয়া, জয়পুররাজ, উদয়পুর

রাজ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ এইরূপ সম্মান লাভ করেন। সিন্ধিয়াকে আরও ভূখণ্ড দান করা হয় এবং তাঁর রাজ্যের আয়তন আরও বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসীর দ্বারা অধিকৃত কয়েকটি জেলা নিজামকে প্রত্যর্পণ করা হয়।

মহারানীর ঘোষণা দ্বারা লর্ড ডালহৌসী প্রবর্তিত স্বত্ব-বিলোপ নীতিও পরিত্যক্ত হয়। ঘোষণায় স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে আর রাজ্য বিস্তার করবে না। দেশীয় নৃপতিদের মনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি যে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল তা দূরীকরণের জন্যই এই কথার উল্লেখ করা হয়। তা ছাড়া, দেশীয় রাজগণের উত্তরাধিকার তাঁদের নিজ নিজ আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে এবং দত্তক পুত্র গ্রহণেও তাঁদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে বলে এই ঘোষণায় বলা হয়। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ক্যানিং প্রত্যেক হিন্দু রাজাকে অপুত্রক হলে দত্তক পুত্র গ্রহণের ক্ষমতা দিয়ে সনদ প্রদান করেন। মুসলমান রাজাদের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রচলিত বিধি ও রীতি অনুযায়ী উত্তরাধিকার ঘটবে বলে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। এইভাবে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যগ্রাস নীতি আনুষ্ঠানিকভাবে পরিহার করা হলেও দেশীয় রাজাদের তাদের রাজ্যের সুশাসনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকতে বলা হয়।

(৩) শাসন ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ নীতি :

ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অধিকতর অংশদানের নীতিও গৃহীত হয়। ভারতের ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় এবং ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রকার যোগাযোগ ছিল না বলেই ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে এই বিদ্রোহ ঘটে—এই কথা স্মরণ করে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি প্রবর্তিত হয়।

(৪) ১৮৬১ খৃস্টাব্দের কাউন্সিল অ্যাক্ট :

১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজ ও বোম্বাই-কাউন্সিলের আইন প্রবর্তনের ক্ষমতা কলকাতা কাউন্সিলের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু বিদ্রোহের পর এই কেন্দ্রীয়করণ নীতি পরিত্যক্ত হয়। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট পাস পরে বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীনে কোন প্রদেশ গঠন করা হলে সেখানে কাউন্সিল স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে পার্লিয়ামেন্টের বিধির দ্বারা ভারতের নতুন আইনসভা সৃষ্ট হয়। শাসন পরিষদের সভ্যগণ ভারতের নতুন আইনসভার সদস্য পদ লাভ করেন এবং আরও বার জন অতিরিক্ত সদস্য এই সভায় যোগদানের সুযোগ পান। এই বারজনের মধ্যে অর্ধেক ছিলেন সরকারী কর্মচারী এবং অর্ধেক বেসরকারী ব্যক্তি বর্গ।

(৫) সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ নীতির প্রয়োগ :

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ শাসকবর্গের মধ্যে ভীতি ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তা দূর করার জন্য এবং ভারতের ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ নীতির প্রচলন করতে সচেষ্ট হন। সেই সময় হতেই

সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণের চেষ্টা শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং ইংরেজ শাসকগণ হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতির সুযোগে নিজের স্বার্থ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। বিদ্রোহের সময় মুসলমানগণ বিদ্রোহীদের প্রতি খুব সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে এমনকি দক্ষিণ-ভারতে বিদ্রোহ প্রবলাকারে না হলেও ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে সেখানে বহুবার ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র দেখা দেয়। বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা অংশগ্রহণ করলেও বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার পর মুসলমানদেরই বেশি নির্যাতন সহ্য করতে হয় এবং মুসলমান সমাজের বহু নেতারই নির্বাসন অথবা প্রাণদণ্ড হয়। এইসব মুসলমান নেতাদের মধ্যে ঝাঝর, বল্লভগড়, ফারুকনগর, ফারুকাবাদ প্রভৃতি স্থানের নবাব সাহেবদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর একমাত্র দিল্লীতেই ২৪ জন মোগল রাজবংশের সন্তানদের ফাঁসি হয়। মুসলমানদের প্রতিই ব্রিটিশ শাসকগণ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং মুসলমানদের বিষয় সম্পত্তিও যথেষ্টভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়। মুসলমান সমাজের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির ফলে ভারতের মুসলিম সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র দিল্লীর অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলিমদের এই বিপর্যয় ভারতের পক্ষেও খুব ক্ষতিকারক হয়। Mr. C. F. Andrews এর মতে, "It is not difficult to trace the fatal havoc to budding cultural life which one year of Mutiny brought. Decay immediately overtook the revival of learning from Delhi from which it never recovered." ব্রিটিশ সরকারের বিভেদ নীতি অনুসরণ এবং মুসলমান সমাজের প্রতি নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের পূর্বেকার সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের অবসান ঘটে এবং তার পরিবর্তে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধানও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রকার ঐক্য স্থাপনের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

(৬) বৃটিশ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি :

ভারতীয় সিপাহীদের সংখ্যার অনুপাতে অতি নগন্য সংখ্যার ব্রিটিশ সৈনিক রাখার বিপদ বুঝতে পেরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরও বহু ব্রিটিশ সৈন্য ভারতে আনয়ন করে ভবিষ্যতে সিপাহী বিদ্রোহের পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা করে। তাছাড়া সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী কালে যাবতীয় দায়িত্বমূলককার্যে কেবলমাত্র ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগের নীতি অনুসৃত হতে শুরু করে। দেশীয় গোলন্দাজ বাহিনীকে ইয়োরোপীয় বাহিনীর সহিত যুক্ত করা হয়। এই সময় থেকেই ব্রিটিশ শাক্ত ভারতীয় সামরিকবাহিনী পুনর্গঠনের জন্য কয়েকটি নতুন নীতি গ্রহণ করে। "The lessons taught by the Mutiny have led to the maintenance of two great principles, of retaining in the country an irresistable force of British troops and keeping the artiliery in hands of the Europeans. দেশীয় সিপাহিদের সংখ্যা হ্রাস এবং ইয়োরোপীয়

সৈন্যদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে দেশরক্ষা খাতে ভারতের ব্যয় বৃদ্ধি শুরু হয় এবং সামরিক বিভাগের অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য ভারতবাসীদের উপর নতুন নতুন করের বোঝা চাপানো হয়। সামরিক বিভাগের উচ্চপদে এবং সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে একমাত্র ইংরেজদেরই নিযুক্ত করা হয়। এই সম্পর্কে Sir Richard Temple মন্তব্য করেন যে, **At every large military stations in the empire, there are enough European to hold their own even in the event of a mutiny."** তাছাড়া ভারতের উচ্চবর্ণের লোকদের সামরিক বাহিনীতে গ্রহণ করা নীতিগতভাবেই বন্ধ করা হয়। বিদ্রোহের পর বাংলায় একটি নতুন বাহিনী গঠন করা হয়—এই বাহিনীতে দু-একজন ব্যতীত বাকি সকল পলটনই শিখ, পাঠান, গুর্খা প্রভৃতি জাতি দ্বারা গঠিত হয়। পূর্বিয়া নামে পরিচিত পূর্বভারতের অধিবাসীদের সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করা প্রায় নিষিদ্ধ হয়। বিদ্রোহের পরবর্তীকালে পুলিশবাহিনীরও সংস্কার ও পুনর্গঠন করা হয়। মাদ্রাজ পুলিসের প্রধান কর্মকর্তা মিস্টার ডব্লিউ রবিনসন-এর উপর এই কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ভারতীয় নৌবাহিনী বিলুপ্ত করে উপকূল রক্ষা করা এবং সন্নিহিত সাগরে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব রাজকীয় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর উপর অর্পণ করা হয়।

(৭) বিচার বিভাগের সংস্কার :

সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পূর্বেই লর্ড ব্যাবিংটন মেকলের দ্বারা পেনাল কোড প্রণয়ন শুরু হয়। সিপাহি বিদ্রোহের পর তা প্রধান বিচারপতি স্যার কর্নেল পীককের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়ে আইনে পরিণত হয়। যথেষ্ট বিচার এবং শাস্তির হাত থেকে নতুন বিচার ব্যবস্থা ও নতুন আইন জনসাধারণকে বহুল পরিমাণে রক্ষা করে। ফৌজদারী বিচারের পদ্ধতি পরিবর্তন করে এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট করে কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর প্রণীত হয়।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট এক আইনের সাহায্যে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই তিনটি প্রেসিডেন্সীতে তিনটি হাইকোর্ট স্থাপন করে। সুপ্রীমকোর্ট ও সদর আদালতের মধ্যেকার পার্থক্য রহিত হয় এবং এই দুই আদালতের বিচার ক্ষমতা হাইকোর্টে কেন্দ্রীভূত হয়। স্থির হয় যে হাইকোর্টের বিচারপতিদের মোট সংখ্যার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ থাকবেন ইংরেজ ব্যারিস্টার এবং আর এক তৃতীয়াংশ থাকবেন বিচার কার্যের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সিভিল সারভেণ্ট। তাঁরা স্থান থেকে স্থানান্তরে যেয়ে নিম্ন আদালত থেকে আনীত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার আপীলের বিচার করবেন। যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতের ব্যবহারজীবিগণও বিচারপতি পদলাভ করার অধিকার পান। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দেই সিভিল সার্ভিস বিধি প্রণয়ন করে অনেকগুলো পদ ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

(৮) সংস্কার নীতি পরিত্যাগ ও সরকারী নীতির পরিবর্তন :

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহের কারণগুলোর মধ্যে ব্রিটিশ শাসনাধীনে সতীদাহ প্রথা

দমন, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি সংস্কার কার্যকরী করা অন্যতম কারণরূপে দেখা দেয়। এই কথা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সংস্কার কার্যাদি গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে শুরু করে। অপরদিকে সিপাহিদের সশস্ত্র বিদ্রোহের পশ্চাতে আর একটি সংঘর্ষও বিদ্যমান—ভারতীয় সংরক্ষণশীলতার সহিত ইয়োরোপীয় উদারনীতির সংঘর্ষ। সিপাহি বিদ্রোহের ফলে ভারতীয় সংরক্ষণশীলতার কাছে আপাতকালের জন্য পশ্চিমী উদার নীতি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী-কালে ব্রিটিশ সরকার তাদের পূর্বতন উদারনীতি পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে সংরক্ষণ-শীল ও নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ভারতবাসীদের সহিত ব্যবহার সম্পর্কেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নতুন নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব হলেও, সিপাহি বিদ্রোহের ক্ষতচিহ্ন দূরীকরণ হয়নি। ভারতীয়দের জাতীয় জীবনেই এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয় এবং শাসক ও শাসিতদের মধ্যে আর কোনদিনই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। বরঞ্চ ধীরে ধীরে উভয়ের পার্থক্য আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শাসক ও শাসিতদের মধ্যে যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় উভয় পক্ষের আন্তরিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও তা দূর করা সম্ভব ছিলনা। ভারতীয়দের মনে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের একান্ত অনুগত কর্মচারীদেরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা ইংরেজদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। সিপাহি বিদ্রোহের ফলে ইংরেজদের সহিত ভারতীয়দের স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

(৯) উপসংহার :

স্যার লেপেল গ্রিফিন-এর মতে, "perhaps a more fortunate occurence than the mutiny of 1857 never occured in India." তিনি মনে করেন যে এই বিদ্রোহের ফলে ভারতের আকাশে দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত মেঘ চিরতরে অপসারিত হয় এবং শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সহজে ও বিনা আয়াসে জয় করে এবং নিরুপদ্রবে শাসন করে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অলসতা ও আত্মতৃপ্তির সৃষ্টি হয়। সিপাহি বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ সৈন্যগণ আত্মতৃপ্তি ও অলসতা দূর করে আবার প্রমাণ করতে সমর্থ হয় যে সহস্র বাধা বিপদ অতিক্রম করে এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়ে সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব। সিপাহি বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজ বাহিনী পৃথিবীর কাছে আবার তাদের রণনিপুণতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। ফলে নতুন কর্মোদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে ইংরেজগণ ভারতের উপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। অপরদিকে ঐতিহাসিক মিস্টার কটন মনে করেন যে, সিপাহি বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শাসকদের নিকট একটি অর্থপূর্ণ সতর্কবাণী। শাসক-শাসিতদের প্রভেদ বিস্মৃত হয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সমাজে পরিবর্তনের যে চেষ্টা করে তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা ছিলনা। ফলে অনেক সময়ই তারা শাসিতদের মনোভাবের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে

নিজেদের মতামত ও আদর্শ তাদের উপর আরোপ করার চেষ্টা করত। এই ভ্রান্ত নীতি পরিত্যাগ করা ব্রিটিশ শাসকদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। সম্ভবতঃ এই সতর্কবাণীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সিপাহি বিদ্রোহোত্তর যুগে ইংরেজ সরকার গভীরভাবে চিন্তা করেই প্রতিটি সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুত হয়। তবে সিপাহি বিদ্রোহের পূর্বেই ব্রিটিশ শাসকদের উদার নীতির ফলে শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে যে নতুন চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়, সিপাহি বিদ্রোহ অথবা সিপাহি বিদ্রোহোত্তর যুগের ব্রিটিশ নীতি তাদের কার্যকলাপ স্তিমিত করে তুলতে সমর্থ হয় নি।

Q. 4. "Mohemmedans took only a partical share in the Mutiny". Elucidate the statement with reference to the rising of 1857.

Or, "It is not more Mussalman than Hindu". Elucidate the statement with reference to Muslim involvement in the Mutiny of 1857.

Or, Discuss the Muslim involvement in the Sepoy Mutiny.

Ans. (১) পটভূমি—রাজনৈতিক ও ধর্মীয় :

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। যদিও আনুগত্যহীনতা ও বিরক্তির স্ফুলিঙ্গ প্রথমে হিন্দু সিপাহিদের মনেই প্রজ্বলিত হয়েছিল। তবু এই আন্দোলনের প্রসার ঘটিয়েছিল মুসলমানেরা, পরিচালনারও ভার নিয়েছিল তারা। ধর্মীয় দুর্দশার বোঝা তাদের পথ দেখিয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষমতায় উত্তরণের। ব্রিটিশের মতে—মুসলমানদের গুপ্ত চক্রান্তই এই বিদ্রোহকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে রূপান্তরিত করেছিল। ব্রিটিশদের অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মুসলমানেরা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ক্ষতিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না।

বিদ্রোহী মুসলমানেরা তাই স্বপ্ন দেখেছিল মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের। তাই তারা বাহাদুর শাহকে গ্রহণ করল 'প্রতীক' রূপে তাদের ব্রিটিশ বিরোধী অভিযানকে দৃঢ় করে তুলতে। ১৮৫৬ সালে অযোধ্যাকে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে সংযোজন মুসলমানদের উত্তেজিত ও ব্রিটিশ বিরোধী করে তুলেছিল। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রিটিশ শাসন ছিল মুসলমানদের কাছে বিধর্মীয় শাসন।

(২) দিল্লী :

এই বিদ্রোহের মূলে মুসলমানদের সক্রিয় অংশ ছিল—তার অনেক প্রমাণও পাওয়া যায়। দেশী অশ্বারোহী বাহিনীর নিম্নপদস্থ অধিকাংশ আরোহীই ছিলেন মুসলমান। তাঁরা কুচ্‌কাওয়াজ করে মীরাট থেকে দিল্লী এসে উপস্থিত হল বাহাদুর শাহকে তাঁদের বিদ্রোহের নেতার পদে অভিষিক্ত করতে। বাহাদুর শাহ ইউরোপীয়দের একেবারেই সুনজরে দেখতেন না—কারণ তারা তাঁর কর্মচারীবর্গ ও ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে দিতে চেষ্টা করে। তিনি সম্রাট রূপে ঘোষিত হয়েই প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন মিরজা মোগল নামে এক মোগল শাহজাদা। দিল্লী ও তার আশে-পাশের জায়গীর-

দারদের সম্রাটের রাজসভায় ডাকা হল। এইসব জায়গীরদারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রহমান খান, আহম্মদ খান ও জিয়া-উদ্-দিন আহম্মদ। মোগল সম্রাটের নামে একটি ঘোষণাও প্রচারিত হল। এই ঘোষণায় বলা হয় "নিজের ধর্মকে যাঁরা রক্ষা করতে চান তাঁরা যেন সকলেই সৈন্যদলে যোগ দেন।"

(৩) অযোধ্যা ঃ

অযোধ্যার ঘটনাবলী এই বিদ্রোহে মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সাক্ষ্য দেয়। অযোধ্যার নির্বাসিত রাজার নাবালক পুত্র বিরজিস কাদিরকে কেন্দ্র করে সিপাহিরা একত্রে সমাবেশ রচনা করেন। মুসলমানদের বিদ্রোহের কেন্দ্র ছেড়ে না যাওয়ার জন্য আগ্রার চীফ কমিশনার ফ্রেজার কর্তৃক হুঁসিয়ারী জ্ঞাপন করা হয়। বেগম হজরত মহল ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাঁর পুত্রের সহযোগী হওয়ার জন্য বিদ্রোহীদের আহ্বান করেন।

(৪) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গ্রামাঞ্চল ঃ

গ্রামাঞ্চলের ঘটনাগুলিও বিদ্রোহে মুসলমানদের প্রকৃতি ও আচরণের পরিচয় দেয়। আলিগড়ে তন্তুবায়দের মতো নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরাও জেহাদের ধ্বনি তোলে। খিয়া মহম্মদ খাঁ নামে একটি লোক আলিগড়ে নিজেকে বাহাদুর শাহের সুবাদার বলে দাবি করে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ কর্তৃক রোহিলাখণ্ড অধিকারের ফলে সেখানকার মুসলমানরা ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়। খান বাহাদুর খাঁ বাহাদুর শাহের পক্ষ থেকে নবাব—নাজিম উপাধি গ্রহণ করলেন এবং মুবারক শাহকে বদাউনের শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করলেন। এলাহাবাদে অত্যাচারিত অভিজাত মুসলমানেরা এবং শহরবাসী মুসলমানেরা ঐক্যবদ্ধ হল। সম্রাটের নামে তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন মৌলভী লিয়াকৎ আলি।

(৫) ধর্মীয় শক্তি ঃ

মুসলিম ধর্মের নেতৃস্থানীয় লোকেরাও এই বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। ফৈজাবাদের মৌলভী আহম্মদ আল্লা শাহ ১৮৫৮ সালে ক্যাম্পবেলের বাহিনী অযোধ্যা জয় করতে গেলে সেই বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেন। মুজাফ্ফর নগরের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন মৌলানা রহমৎ উল্লা। ওয়াহাবিদের সন্দেহের চোখে দেখা হত এবং পাটনাতে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে টংক থেকে একজন মুসলমান সেনাপতি আসেন—তারই নেতৃত্বে মুসলমান সৈন্যেরা দিল্লী আক্রমণের সময় বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন।

মুসলিম উইলায়াতিয়া ও গুজরাটের দখলদারেরা বিরূপতা ও বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বরোদার দোহাদ দুর্গের মুসলিম বিদ্রোহ সৈন্যদের মধ্যে দেখা দেয়। কিছু পরে সুরে আর একটি বিদ্রোহ দেখা দেয়—যার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুস্তাফা খাঁ। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব ক্যাম্পবেল-এর বর্ণনায় স্থান পায়।

(৬) মুসলমানদের অসহযোগের ঘটনা :

একথা উল্লেখযোগ্য যে মুসলমানেরা বিদ্রোহের সূত্রপাতের সময় কোন উত্তম দেখান নি। মূল সিপাহি বিদ্রোহ হিন্দু সিপাহিদের দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়েছিল। অসামরিক অভ্যুত্থান বেশীর ভাগ জায়গাতেই হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত, জাতিগত, শ্রেণীগত ও আঞ্চলিক বিভেদ মুসলমানদের পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম ও রামপুর, করনাল, মুরাদাবাদ এবং ঢাকার নবাবদের মতো অভিজাত শ্রেণী ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্যই রক্ষা করেছিলেন। আবার অপরদিকে ফারাক্কাবাদ ও ডাণ্ডার নবাবেরা বিদ্রোহে যোগ দেন। মুসলিম রাজকর্মচারীরাও অনুরূপভাবে বিভক্ত ছিলেন। আলিগড় ও রোহিলাখন্দে তাদের বেশীর ভাগই বিদ্রোহে যোগ দেন। কিন্তু সৈয়দ আহম্মদ খাঁ তখন (বিজনোরে সদর আমিন রূপে নিযুক্ত ছিলেন) তিনি ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতাই করার চেষ্টা করেন। এমনকি পাটনাতে, যেখানে মুসলমানদের আনুগত্যহীনতার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল,সেখানে টেলরের প্রধান সাহায্যকারী হয়েছিলেন মুসলমানরা। এঁদের মধ্যে ছিলেন মৌলা বক্স, শাহ কবীর, রমজান আলি এবং উলিয়াৎ খাঁ। বাংলার মুসলমানরা ব্রিটিশ শাসনে আর্থিক ও অন্যান্য দুর্দশা ভোগ করিলেও বিদ্রোহী কোনও মনোভাব প্রকাশ করেননি। পাঞ্জাবে মুসলমানরা সীমান্তের মুসলমান উপজাতিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দিল্লীর নিকট ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। এই মুসলমান সেনাদল রেইকী প্রমুখ ব্রিটিশ রাজপুরুষদের আস্থা ও প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

(৭) স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের মত :

ঘটনাগুলির একটা মোটামুটি সুসম ও প্রামাণিক বিবরণ ক্যাম্পবেল কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। তাঁর মতে—এই বিদ্রোহ মূলতঃ ছিল হিন্দুস্থানী বিদ্রোহ। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রভাবশালী হিন্দু ও মুসলিমদের দ্বারাই এটা পরিচালিত হয়েছিল। তাই একে ধর্মীয় বিদ্রোহ না বলে অভিজাত সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ বলাই সঙ্গত। সাধারণ মুসলমানরা এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। এই বিবরণে প্রদর্শিত হয়েছে যে বিহার ও বেনারসের মুসলমানরা ও জমিদারেরা বিদ্রোহে যোগ দেন নি। প্রকৃত নিষ্ঠাবান ও গোঁড়া মুসলমানরাও দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—বাংলার ফরাজি ও মালাবারের মোপলাহরা বিদ্রোহী হয় নি। প্রধান প্রধান মুসলিম ঈশ্বরতত্ত্ববেত্তারাও সক্রিয় সহানুভূতি দেখান নি। এমনকি বিদ্রোহের প্রধান কর্মকেন্দ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও সাধারণ মুসলমানরা সরকারের অনুগত ছিলেন। কিন্তু এ কথাও ক্যাম্পবেল কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে যে বিদ্রোহী রাজকর্মচারীদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের। কিন্তু বাহাদুর শাহের বিদ্রোহে জড়িত হওয়া কোনক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কারণ তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা মীরাট থেকে ব্যবহৃত হয়েছিলেন।

(৮) ক্যানিংয়ের মত :

মূলতঃ হিন্দুদের দ্বারাই এই উত্থান সংঘটিত হয়েছিল—এই মত ক্যানিং কর্তৃক

একেবারেই স্বীকৃত হয়নি। বোর্ড অফ কণ্টোলের সভাপতি ভারমন স্মিথের কাছে প্রেরিত পত্রে এই তথ্য পাওয়া যায় যে হিন্দু আন্দোলন দিয়ে আরম্ভ হলেও স্থানীয় অসন্তোষের সঞ্চয়ের জন্যই ক্রমে ক্রমে মুসলমানেরাও এসে যোগদান করেছিল "**It was not more Mussalman than Hindoo**"—পত্রাংশে ক্যানিং এরূপ উক্তি করেন। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ মুসলমানদের দ্বারা গঠিত ছিল ও বহুলাংশে তারাই এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী।

(৯) বাউরিং কর্তৃক পরিমাণ ও মূল্য নির্ণয় :

১৮৫৯ সালে বাউরিং কর্তৃক রচিত একটি ঘটনা ও মূল্য নির্ণায়ক বিবরণী ক্যানিংয়ের নিকট প্রদত্ত হয়। মুসলমানেরাই বিদ্রোহের প্রধান পরিচালক ছিল এরূপ মত এই বিবরণীতে অস্বীকার করা হয়। একথা স্বীকৃত হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন অংশের মুসলমানেরা সরকারের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন না। এই ধারণাও স্বীকৃত হয় যে মুসলমানেরা ব্রিটিশ শাসনের চেয়ে মুসলমান শাসনই পছন্দ করবে। যাই হোক, এ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল না যে মুসলমানেরা এই বিদ্রোহে আংশিক দায়িত্ব নিয়েছিল এবং তাও বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার পরে। বাউরিং-এর মতে ব্যারার্কপুরে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে মুসলিমদের সহযোগিতার কোন নিদর্শন নেই। এমনকি দিল্লী দখলও আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল, পূর্ব-পরিকল্পিত কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দিল্লীর জনসাধারণ ও সিপাহিরা মীরাট থেকে বিদ্রোহী সৈন্যদের আগমনের জন্যও প্রস্তুত ছিল না। বাংলার মুসলমানদের নিষ্ক্রিয়তা ও পাঞ্জাবী মুসলিমদের সক্রিয় আনুগত্য বাউরিং তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেন। এ ছাড়া এইসব ঘটনা বাউরিং-এর প্রশংসা অর্জন করতেও সমর্থ হয় প্রধান প্রধান মুসলমান নবাবদের মধ্যে যাঁরা আনুগত্য দিয়ে সরকারের সেবা করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম, মুর্শিদাবাদের নবাব ও রামপুরের নবাব। পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিদ্রোহের নায়কত্ব নিয়ে ছিলেন নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা —অভিজাত মুসলমানেরা নয়। পরবর্তীকালে স্যার সৈয়দ আহমেদ মুসলমানদের একটি পুরুষানুক্রমে অনুগত সম্প্রদায় বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন।

Q. 4. "After 1857 the heavy hand of the British fell more upon the Muslims than on the Hindns." Do you agree ? Substantiate your answer with special reference to the British treatment of Muslims after 1857.

Ans. (১) মুসলমানদের প্রতি নির্মম আচরণ :

জহরলাল নেহেরু লিখেছেন, "১৮৫৭ সালের পরে ব্রিটিশের অত্যাচার হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের উপরই বেশী হয়েছিল।" শ্রেণী হিসাবে মুসলমানদের উপর ব্রিটিশের তীব্র শত্রুতা সক্রিয় হয়েছিল একথা রাসেল ও ক্যাম্পবেলের দ্বারাও উল্লেখিত হয়েছে। ১৮৫৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ কর্তৃক দিল্লী অধিকারের পর স্থানীয় মুসলমানেরা নির্মম

প্রতিহিংসার শিকার হয়েছিলেন। গালিব তখনকার দিল্লীর বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—'রক্তের বিশাল সমুদ্র'। বিচারের পর বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়েছিল। তিনজন মোগল রাজপুত্র হবসন কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং অন্যান্য চব্বিশজন রাজপুত্র বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। দিল্লীর বুদ্ধিশালী সম্প্রদায় প্রতিহিংসার সম্মুখীন হলেন। দিহলাউই লিখেছেন—ইংরেজ সৈন্য নির্বিচারে গুলি চালাতে কসুর করে নি। বিখ্যাত লেখক পাঞ্জাকুশ, মৌলভী সাভাই ও তার দুই পুত্রকে গ্রেপ্তার করে গুলি করে মারা হয়। দিল্লীর নাগরিকেরা দিল্লীতে ফিরবার সময় জরিমানা দিতে বাধ্য হলেন। মুসলমানদের দিতে হল তাদের স্থাবর সম্পত্তির শতকরা পঁচিশ অংশ মূল্য।

(২) ক্যানিংয়ের নির্যাতন :

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোন ভারতের গভর্নর জেনারেলকে সমস্ত মুসলমান অট্টালিকা পুড়িয়ে দেবার নির্দেশ দেন। বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি ভারনন স্মিথের দ্বারা ব্রিটেনে মুসলমান-বিরোধী প্রবল উত্তেজনার দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়। কিন্তু কয়েকজন প্রধান নীতি-নির্ধারক দ্বারা এই ব্যাপক উত্তেজনা সমর্থিত হল না। এই উত্তেজনার বিরুদ্ধে ক্যানিংয়ের সর্তক মনোযোগ নিয়োজিত ছিল। দিল্লী ও অন্যান্য স্থানের নৃশংস ঘটনাগুলি স্থানীয় ব্রিটিশ রাজপুরুষদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছিল। উত্তর ভারতে মুসলমানেরা আর্থিক দিক থেকে দমিত হলেও এবং মানসিক বল হারালেও তারা একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার গোষ্ঠীরূপে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়। ক্যানিংয়ের মতে এই বিদ্রোহ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ব্যাপার। তার ভয় হয়েছিল যে, ধর্মীয় দিক থেকে এই উৎকট স্বাদেশিকতার নীতি তিক্ততাকে স্থায়ী করতে পারে এবং ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে পর্যন্ত দুর্বল করে দিতে পারে। দিল্লীর অধিবাসীরা বিদ্রোহে যোগ দেন নি তাই দিল্লী ধ্বংসের পরিকল্পনা ক্যানিং কর্তৃক পরিত্যক্ত হল। ক্যানিংয়ের দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের পার্থক্যও নির্দিষ্ট করা হয়।

(৩) ব্রিটিশের সাধারণ নীতি :

প্রথমে ব্রিটিশের বিপরীত মতাদি সম্বলিত মনোভাবকে মুসলমানদের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল। ক্রমে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি উদ্ভূত হল। এই নীতি হ'ল মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে এবং শুধু মাত্র ধর্মের কারণে তাদের উপর রাজনৈতিক নির্যাতন করা হবে না। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের একান্ত বাধ্য ও অনুগত থাকতে হবে। বিনা ক্ষতিপূরণে তাদের কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে না। সর্বোপরি সরকারী কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের বাদ দেওয়া হবে না। অর্থাৎ শর্তাধীনে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত এবং মঙ্গলজনক হতে পারে—এইটাই ক্যানিংয়ের দ্বারা সুস্পষ্টিকৃত হল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এই সময় স্থির হয় যে, মুসলমানেরা কোন

রাজনৈতিক বা ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টায় যোগ দিতে পারবে না আর ব্রিটিশ শাসনকে তারা অবশ্যম্ভাবী ও স্থায়ীরূপে মেনে নিতে বাধ্য হবে।

(৪) সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা :

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের একাদশ আইন বিদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের বিধান দিয়েছিল। বিদ্রোহকে যারা উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল, ঐ বৎসরেরই ষোড়শ আইন—তাদের উপরেও এই শাস্তিগুলিকে বলবৎ করে। জেলাগুলিতে সামরিক আইন ঘোষিত ও জোরদার করা হয়। স্পেশাল কমিশনারদের সংক্ষেপে বিচারকার্য সমাধা করে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮৫৮ সালের মধ্যেই বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অবস্থা স্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্য করে।

(৫) ক্যানিংয়ের নীতি কার্যে প্রয়োগ :

ব্রিটিশের সরকারের তদানীন্তন সরকারী নথিপত্র থেকে এরূপ ধারণা করা যায় যে, মুসলমানদের পৃথক করে শাস্তি না দেওয়ার নীতি বলবৎ করা হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সমস্ত মুসলমানই সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের কবলে পড়েন নি। অবশ্য কেউ হয়ে পড়েছিলেন দরিদ্র, অনেকে হারিয়েছিলেন সামাজিক মর্যাদা, আবার কেউ বেরিয়ে এসেছিলেন অধিকতর উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি নিয়ে। সৈয়দ আহমদের মতো অনুগত মুসলমানেরা রীতিমত লাভবান হয়েছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে অযোধ্যায় রাজপরিবারভুক্ত লোকদের আবার ভাতা প্রদান অব্যাহত রাখা ক্যানিং কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত হয়েছিল। বাহাদুর শাহের পরিবারের জীবিত ব্যক্তিদের প্রদান করা হয়েছিল অনুরূপ ভাতা। আবার রাজনৈতিক আনুগত্যহীনতার কারণে অনেক মুসলিম পরিবারের ভাতা বন্ধও হয়েছিল। গোরক্ষপুরে হিন্দুরা দুর্দশা ভোগ করেছিলেন সবচাইতে বেশী আবার বেরিলীতে মুসলমানেরা সম্পত্তি হারিয়ে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। বিজনোর, মোরাদাবাদ, বাদাউন প্রভৃতি এলাকায় মুসলমানদের ভাতা হারানোর সংখ্যা ছিল অধিক। আলিগড়ে এই ধরনের শাস্তি হিন্দু ও মুসলমানদের ভাগে প্রায় সমান সমানই পড়েছিল।

(৬) জায়গীরদারেরা :

জায়গীরদারের প্রতি প্রায় একই ধরনের ব্যবহার করা হয়েছিল। দাদরির নবাবের জায়গীর কেড়ে নেওয়া হয়েছিল আর তাঁকে দেওয়া হয়েছিল একটি মাসিক ভাতা। আতাউল্লা খাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত তাঁর জায়গীর ছিল কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বিদ্রোহী পুত্রকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। যাই হোক, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মুসলমানদের মুষ্টিমেয় অংশই ছিলেন এই বৃত্তি ও জায়গীরের অধিকারী।

(৭) বাজেয়াপ্তকরণের রীতি :

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণের ধরন দেখে মনে হয়—এটা মুসলমানদের একটা ধর্মীয় সম্প্রদায় রূপে ধরে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নি। শাস্তি দেওয়ার কারণ ছিল আনুগত্যহীনতা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—মীরাট ছিল হিন্দু অসন্তোষের একটি কেন্দ্র।

তাই সেখানে হিন্দুদের সম্পত্তিই বেশীর ভাগ বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। অপরদিকে, রোহিলাখন্দে ৩১৫টি বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা মুসলমান সম্পর্কিত আর হিন্দু সম্পর্কিত ঘটনা মাত্র ৬টি। শিকারপুরে মুসলমানেরা দুর্ভোগ ভুগেছিলেন আর ঝান্সী ও জব্বলপুরে ভুগেছিলেন হিন্দুরা। পরবর্তীকালে যখন কতকগুলি বাজেয়াপ্তকরণ বাতিল হয়ে গেল, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই উপকৃত হলেন। বেনারসে ৬৯ জন মুসলমানের ও ১৬জন হিন্দুর হৃত সম্পত্তি মুক্ত হয়েছিল।

(৮) বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পুনর্বণ্টন :

বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি আনুগত্য সম্পন্ন হিন্দু ও মুসলমানদের দেওয়া হয়েছিল অথবা নীলামে বিক্রয় করা হয়েছিল। এই বিতরণের সময়ও বিচারের মাপকাঠি হয়েছিল রাজনৈতিক আনুগত্য, ধর্মীয় সংস্কার নয়। ফতেপুরে ১৩টি বাজেয়াপ্ত মুসলমান সম্পত্তির ১০টি অন্য মুসলমানদের হাতে দেওয়া হয়েছিল। এমন কি, মুসলমানদের আনুগত্যহীনতার কেন্দ্র বিজনোর, বেরিলী ও বাদাউনে কয়েকজন মুসলমান বিদ্রোহী হিন্দুদের সম্পত্তি পেয়েছিলেন। নবাব জান-ফিসান-খাঁ ও রামপুরের নবাবের মতো অনুগত মুসলমানেরা কিছু বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালের জরিপ রিপোর্টে দেখতে পাওয়া যায় যে বিদ্রোহের পরে যে নীলামে বিক্রয় হয়েছিল তাতে মুসলমানদের অংশ নিতে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এই রিপোর্টগুলি থেকে মুসলমানক্রীত সম্পত্তিগুলির পরিমাণ করা যায় না। এ কথাও মনে রাখতে হবে—সামান্য কিছু অভিজাত মুসলমানকে বাদ দিলে সাধারণ মুসলমানেরা সবসময়ই গরীব ছিল। এই সিদ্ধান্তেও পৌঁছানো যায় যে, এমন কোনো সরকারী নীতি ছিল না যার দ্বারা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মুসলমান ভূ-স্বামীদের পৃথকভাবে ধরে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত করণের ফলে মুসলমানদের লাভ ও ক্ষতি দুই-ই হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ জুড়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মুসলমানেরা একটি প্রধান-জমি-দখলকারী সম্প্রদায়রূপেই ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—আলিগড়ে সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলমান জমিদারেরা তাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হন। আগ্রাতে হিন্দু ঠাকুরেরা যে ক্ষতির পরিমাণ বহন করেছিলেন তা মুসলমানদের চেয়ে ঢের বেশী।

(৯) অনুগত মুসলমানেরা :

১৮৫৭ সালের পরে ঐতিহ্যে অতি শ্রদ্ধাবান ও জ্ঞানপ্রসারে বাধাদানকারী ব্যক্তিরা হয়তো তাঁদের ব্রিটিশবিরোধী কার্যকলাপ ও গতিপ্রকৃতির জন্য যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। কিন্তু যেসব মুসলমানদের ব্রিটিশ রাজ্যের সঙ্গে বন্ধন ছিল এবং আরও সহযোগিতা করার জন্য যারা উন্মুখ ছিল তারা পুরস্কৃত হয়েছিল। এমন কি, ১৮৫৭ সালের আগেও মুসলমান জমির মালিকদের মধ্যে অনেকে ব্রিটিশ রাজপুরুষদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চেয়েছিল। ১৮৫৭ সালের পরে এই ধরনের অনুগত মুসলমানেরা ব্রিটিশ রাজ্যের সঙ্গে একই উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। স্যার সৈয়দ আহম্মদই ছিলেন এই অনুগত শ্রেণীর মধ্যে সর্বপ্রধান। এই প্রকৃতির ব্রিটিশ-সমর্থক ও ভবিষ্যৎদর্শী মুসলমানের সংখ্যা খুব কম

ছিল না। এদের মধ্যে সৈয়দ আহমদ খাঁ, মহম্মদ আলি খাঁ, ইনায়াতউল্লা ও ইমদাদ আলির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা ছিল পশ্চিমী শিক্ষার অনুরাগী—ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এঁরা কাজ করেছিলেন এই রকম 'আধুনিক' মুসলমানদের কথা বাদ দিলেও, পাঠানদের মতো আরও কতকগুলি মুসলমান গোষ্ঠী যাদের পরিচয় অপেক্ষাকৃত নির্দোষ ছিল তারাও সরকারের সুব্যবহারই পেয়েছিল।

(১০) সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা :

সর্বসমেত পর্যালোচনা করে দেখলে দেখা যাবে কিছু প্রাচীন মুসলমান পরিবার সামাজিক প্রাধান্য ও আর্থিক সঙ্গতি হারিয়েছিলেন। ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা স্পষ্টতই অপর্যাপ্ত ছিল। তবুও মুসলমানেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হন নি। জমির স্বার্থে জড়িত মুসলমানেরা তাদের অবস্থার উন্নতি করতে লাগলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বাহিরে বসবাসকারী মুসলমানেরা কোনো রকম শাস্তিভোগ কারন নি। জমি প্রদান করে ও চাষবাসের সুবিধা করে দিয়ে পাঞ্জাবী মুসলমানদের উৎসাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু বাঙালী মুসলমানেরা দরিদ্রই থেকে গেল।

(১১) ব্রিটিশ সাধারণের মনোভাব :

ক্যানিং কর্তৃক বিচক্ষণ ও বাস্তবধর্মী নীতি পালন সত্ত্বেও মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ মনোভাব বিরোধিতাপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। অবশ্য অনুগতদের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল। যাই হোক, মুসলমানদের একটি বিক্ষোভকারী জনসমষ্টি মনে করে, বিদ্রোহের সময় যে ঘৃণা দেখা দিয়েছিল তার দ্বারা দূষিত হয়ে ব্রিটিশ শক্তির মনে একটি ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই ভীতি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিল। অপর দিকে ব্রিটিশের দ্বারা ওয়াহাবিদের দমনও সমানভাবে চলছিল। মুসলমানেরা ব্রিটিশের দিকে তাকিয়ে শত্রুতা ছাড়া আর কিছু দেখছিল না। পরে একটু একটু করে শাসক রাজপুরুষেরা বুঝতে পেরেছিল মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রয়োজন। ব্রিটিশদের এই নতুন মনোভাবের কথা হান্টারও উল্লেখ করেন। তা ছাড়া, এই মনোভাব সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল একটি নূতন মুসলিম আন্দোলনের সঙ্গে, যার উদ্যোক্তা ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ ও তাঁর অনুগামীরা।

Q. 6. What were the objectives of the Wahabi Movement ? What were its contributions to Indian history ?

Ans. (১) ভূমিকা :

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ধর্মসংস্কারের আন্দোলন রূপে ওয়াহাবি আন্দোলন ভারতে দেখা দেয় এবং ভারতের মুসলিম সমাজের নিকট এই আন্দোলন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হিন্দুগণ ইসলাম বিরোধী বহু রীতি-নীতি ও ধ্যান-ধারণা মুসলিম সমাজে প্রবর্তন করার চেষ্টা করে। পয়গম্বরের আমলে আরবদেশে প্রচলিত অনাড়ম্বর ধর্মাচরণ এবং সরল সমাজ ব্যবস্থা পুণঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ওয়াহাবির সর্বশক্তি-

প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিল। পবিত্র ইসলাম ধর্মের নীতি থেকে সামান্য বিচ্যুতিও তারা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের এই আন্দোলন প্রথমে শুধুমাত্র ধর্মসংস্কারের আন্দোলন হিসাবে সংগঠিত হলেও অনতিবিলম্বে তা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করে এবং ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রায় বেরিলির সৈয়দ আহমেদ (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে) পাঞ্জাব থেকে শিখ এবং বাংলাদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে মুসলিম শাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। সৈয়দ আহমেদ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বেকার দিল্লীর বিখ্যাত ইসলাম ধর্ম প্রচারক সন্ত ওয়ালিউল্লার পুত্র আবদুল আজিজের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। কিন্তু ওয়াহাবি নামক সম্প্রদায়ের স্রষ্টা নেজদের আবদুল ওয়াহাবের মতবাদের তুলনায় ওয়ালিউল্লার প্রচারিত ইসলাম ধর্মমত আরও ব্যাপক, সমৃদ্ধ এবং নমনীয় ছিল। তাঁর ধর্মমতে সুফীবাদের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ওয়ালিউল্লার ধর্মমতে শুধুমাত্র সুন্নীদের স্থান ছিল তা নয়, ওয়াহাবিদের মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী বিভিন্ন ইমামদের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানরা নির্বিবাদে তাঁর ধর্মমত অনুসরণ করার সুযোগ পেত। কিন্তু আরবের ওয়াহাবিদের মতবাদের সঙ্গে একটি স্থানে ওয়ালিউল্লার মতাদর্শের খুব সাদৃশ্য ছিল। 'পবিত্র ইসলাম ধর্ম পুনরায় উদ্ধার ও কার্যকরী করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজকে পুনরায় শক্তিশালী করে তুলতে হবে।'

এই সময় ভারতের মুসলান সমাজের চরমতম দুরবস্থা দেখা দেয়। রাজনৈতিক ব্যাপারে এই দুরবস্থা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। পাঞ্জাবে শিখশক্তি এবং বাংলাদেশে ইংরেজদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ভারতে হিন্দুশক্তির পুনরুত্থান ঘটে। সুতরাং ইসলামের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন দুটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হয়—সমাজের আভ্যন্তরীণ ধ্বংসের কারণ এবং দুর্নীতি নির্মূল করা এবং বিধর্মী শাসকদের অগ্রগতি রুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন হলে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। সৈয়দ আহমেদ সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে পুনরুত্থানের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রথমে শিখ এবং পরে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।

সৈয়দ আহমেদ ভারতবর্ষকে দার-উল-হারব অর্থাৎ বিধর্মীদের দেশ বলে অভিহিত করেন এবং তাকে দার-উল-ইসলামে অর্থাৎ বিশ্বাসীদের দেশে পরিনত করার চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর মতে সমস্ত সৎ মুসলমানদের কর্তব্য অমুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাদ অর্থাৎ পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা করা অথবা মুসলমান শাসিত কোন দেশে গিয়ে বাস করা। সুতরাং তিনি উপরিউক্ত দুটি মতের মধ্যে প্রথমটিকেই কার্যকরী করার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ শিখ ও ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ভারতে পুনরায় দার-উল-ইসলাম স্থাপন করার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন।

(২) ধর্মীয় অবদান এবং বৃটিশদের উপর তার প্রতিক্রিয়া :

যদিও উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকেই ওয়াহাবি আন্দোলন কার্যত বিনষ্ট হয়েছিল তবু এর কয়েকটি মূল চিন্তাধারা পরবর্তীকালের মুসলিমদের প্রভাবিত করেছিল আর পরবর্তীকালের ইতিহাসে বিস্তার করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ওয়াহাবিদের উপদেশগুলি ছিল এইরূপ—(১) অন্যধর্মে বিশ্বাসীদের দ্বারা শাসিত দেশে মুসলমানেরা বাস করবে না। (২) তাদের কর্তব্য হবে এমন একটি দেশে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাকে বলা যাবে দার-উল ইসলাম ; (৩) দেশকে বিধর্মীর শাসন থেকে তারা মুক্ত করবে। এইভাবেই তখন পরবর্তীকালের দেশ-বিভাগ আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়েছিল। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল আলিগড় আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন, সমস্ত মুসলমান ধর্মীদের আন্দোলন এবং পরিশেষে পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রদূত। এই আন্দোলন ব্রিটিশ-বিরোধী অনুভূতির ক্ষেত্রকে উর্বর করে তুলেছিল—যার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গিয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহে। সৈয়দ আহমদ ও দুদু মিঞার সমর্থকেরা যুদ্ধে রত ছিল এই উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে তাদের আঘাতে ব্রিটিশের রাজনৈতিক কৌশল নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই আঘাতের ফল হয় গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এর দ্বারা ব্রিটিশের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, মুসলমানেরা মূলতঃ ধর্মান্ধ ও আপোস মীমাংসার দ্বারা আয়ত্তে আনার বাইরে। একমাত্র সুদৃঢ়তা ও মিষ্ট ব্যবহারের মধ্যে সুসংহতি আনতে পারলে তাদের আয়ত্তে রাখা যেতে পারে। ব্রিটিশকে এই সিদ্ধান্তই নিতে হয়েচিল। এটাও তাদের উপলব্ধি হয়েছিল যে অভিজাত, নির্দিষ্ট পেশাধারী, শহরবাসী ও ভবিষৎদর্শী মুসলমানদের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই ধরনের রক্ষণশীল প্রতিরোধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যেতে পারে। সুতরাং তারা মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ঐক্যনাশক নীতিরই আশ্রয় নিয়েছিল। ১৮৫৭ সালের আগের এবং তার অব্যবহিত পরেও সমগ্র মুসলিম সমাজের প্রতি ব্রিটিশের মনোভাব শুভেচ্ছামূলক ছিল না। অংশগ্রহণকারী ওয়াহাবি আন্দোলন আর সিপাহী বিদ্রোহে অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে মুসলমানদের। এই ঘটনাপ্রবাহের ফলেই বিদেশী শাসক মুসলমানদের এক বিদ্রোহী সম্প্রদায় ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে নি।

(৩) মুসলমান ও বৃটিশের পরিবর্তিত চিন্তাধারা ঃ

কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণী স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ-বিরোধী উত্তেজনাকে হিন্দু-বিদ্বেষে রূপান্তরিত করল। স্যার সৈয়দ এই তত্ত্ব প্রচার করতে লাগলেন যে, ওয়াহাবিরা ছিলেন শিখ-বিরোধী ব্রিটিশ-বিরোধী নয়। তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন যে, ওয়াহাবি আন্দোলন সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। তিনি আরও বললেন—বিধর্মী শাসক যদি তাঁদের ধর্মে কোন হস্তক্ষেপ না করে, তবে মুসলমানদের কর্তব্য সেই শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। এই বিপরীত ধারায় চিন্তা অগ্রসর হওয়ার ফলে ওয়াহাবি আন্দোলন আলিগড় আন্দোলনকে ডেকে আনল। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল ব্রিটিশ-শাসনকে প্রতিরোধ করা নয় —বরং সেই শাসনের প্রতি আনুগত্য দেখানো, তার সঙ্গে সহযোগিতা করা। ব্রিটিশ-বিরোধী অনুভূতি তাই হিন্দু-বিদ্বেষী মনোভাবে রূপান্তরিত হল। মুসলমানদের মনে এই আনুগত্যের জাগরণ ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মনে সন্তোষজনক সাড়া জাগিয়ে তুলল।৮

হাণ্টার কর্তৃক যুক্তি প্রদর্শিত হল—ওয়াহাবির আন্দোলনের মধ্যে নিহিত ব্রিটিশ বিরোধিতা যদি বিনষ্ট হয়ে থাকে তবে সরকারেরও উচিত মুসলমানদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। মুসলমানেরা খুবই ভদ্র ও সু-স্বভাব সম্পন্ন বলে ক্যাম্পবেল কর্তৃক বর্ণিত হলেন। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের বক্তব্য হল "আমাদের ভারতীয় দুনিয়ার মুসলমানেরা দুটি শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর একটি।"

(৪) **সমগ্র ইসলাম সম্প্রদায়ঃ**

ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল আরবে। এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। বিধর্মীদের দ্বারা শাসিত দেশ (দার উল্-হারব) ভারতবর্ষ থেকে মুসলমানদের অন্য কোনো মুসলিম রাজ্যে চলে যাওয়ার প্রস্তাবও ছিল এই আন্দোলনে। এখানেই আমরা লক্ষ্য করতে পারি—সমগ্র মুসলমান ধর্মাবলম্বী-দের সমন্বয়ের সূচনা। আশীর দশকের গোড়ার দিকে জামালউদ্দিন আল-আফগানের ভারত সফর এই সমন্বয়ের প্রবণতাকে সুদৃঢ় করে তুলেছিল।

(৫) **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফলঃ**

হার্ডির মতে ওয়াহাবিদের সংস্কার আন্দোলন (ঘটনার দিক থেকে পরিপূর্ণ রূপ লাভ না করলেও) ধীরে ধীরে ভারতীয় মুসলমান সমাজকে একদল ধর্মবিশ্বাসী গোষ্ঠী থেকে একটি রাজনৈতিক সংঘে রূপান্তরিত করল। তাদের মধ্যে দেখা দিল সম্মিলিত ভাবে কিছু করার ইচ্ছা। সৈয়দ আহমদ মোগলদের পুনরুদ্ধার চান নি, তিনি চেয়েছিলেন ভারতের সীমান্তে পূর্বকালীন মুসলমান সমাজের একটি নিদর্শন তৈরী করতে। তাঁর বাণী প্রাক্-শিল্পভিত্তিক নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজকে আকৃষ্ট করেছিল। এই সমাজের মধ্যে ছিলেন ক্ষুদ্রভূস্বামী, শিক্ষক, দোকানদার, কারিগর ও ক্ষুদ্র সরকারী কর্মচারী। বিংশ শতাব্দীতে রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ এই শ্রেণীর মানুষগুলির জন্যই সম্ভব হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য হল এই যে, ওয়াহাবি আন্দোলন ক্ষয়িষ্ণু মোগল সংস্কৃতির উপর তীব্র আঘাত হেনেছিল।

Q. 7. Account for the failure of the Wahabi movement.

Ans. (১) **বিচার ও দমনমূলক নীতিঃ**

ভারতের ইতিহাসে ওয়াহাবি আন্দোলনের ব্যাপ্তি ১৮২০ থেকে ১৮৭০—এই পঞ্চাশ বছর জুড়ে। নিঃসন্দেহে বলা যায়—এ আন্দোলন শাসকদের মনে প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার করেছিল, আর তারা তাই গ্রহণ করেছিল দমননীতি। ব্রিটিশের পাঞ্জাব অধিকার—ঐ এলাকায় ওয়াহাবিদের কার্যকলাপকে পঙ্গু করে দিল। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) আগে ও পরে অনেকবার অভিযান পরিচালিত হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে। ১৮৬৩ সালে আম্বেয়ালার গিরিপথে ব্রিটিশ বাহিনী নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হল। অনতিবিলম্বে ওয়াহাবিদের দ্বারা পরিচালিত উপজাতিদের সংগঠনও ভেঙে গেল। রাজ্যান্তরে পাঁচটি বড় বিচার অনুষ্ঠিত হল। বেশ কিছু সংখ্যক ওয়াহাবি পেল মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও কঠিন কারাদণ্ড। বিচারগুলির মধ্যে ১৮৬৪ সালে আম্বালায় ও ১৮৬৫ সালে পাটনায়

অনুষ্ঠিত বিচার দুটিকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলা চলে। এই বিচার ও শাস্তি দিয়ে ওয়াহাবিদের দমন করা যায় নি, ব্রিটিশ বিরোধী অভিযান তাদের অব্যাহতই ছিল। ১৮৭০ সালে আবার বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল মালদায় ও রাজমহলে।

(২) আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ:

মেয়ো কর্তৃক এক চাতুর্যপূর্ণ কৌশল গৃহীত হল। তার উপলব্ধি হল—একদল ধর্মশাস্ত্রবিৎ ব্রিটিশ অধিকৃত রাজগুলিকে যদি দার-উল-হারব্ বলেন তবে অপর একটি দলকে সংগ্রহ করা যাবে যারা বলবেন রাজ্যগুলি দার-উল-ইসলাম আর সেখানে জিহাদ বা ধর্ম-যুদ্ধ হবে পাপ। স্বভাবতঃই তখন কেউ আর ভারতবর্ষকে দার-উল-হারব আখ্যা দিয়ে প্রকাশ্যে এগিয়ে আসবেন না, কারণ সে ক্ষেত্রে তিনি হবেন ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের চক্ষে সন্দেহের পাত্র।

নিষ্ঠাবান ও অর্ধ-নিষ্ঠাবান ধর্মবিদেরা নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন। তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, ওয়াহাবিদের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল ও বিপথগামী। হার্ডির মতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অতি সামান্য অংশই ওয়াহাবিদের সঙ্গে যোগ রেখেছিল বা অর্থ দিয়েছিল। ধর্মসংস্কারকেরা আদর্শের দিক থেকে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিলেন। উলিয়াৎ আলির কোরানের ব্যাখ্যা করমৎ আলির ব্যাখ্যা থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

(৩) কায়েমী স্বার্থসম্পদের বিরোধিতা:

অতএব বোঝা যায় ওয়াহাবি আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ এই আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল। হাণ্টারের মতে, হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই সম্পদশালী ব্যক্তিদের কাছে ওয়াহাবিরা ছিল মূর্তিমান ভীতিস্বরূপ। দরিদ্র মুসলমান মোল্লা যার হয়তো সামান্য জমি ছিল মসজিদের সঙ্গে, সেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল গোঁড়াপন্থীদের দাবী মিটাতে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যেমন অভিজাত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত চার্চ-এর সপক্ষে থেকে পিউরিটানদের (গোঁড়াপন্থীদের) বিরোধিতা করেছিল, তেমনি ভূস্বামী সম্প্রদায় ও ধর্মযাজক সম্প্রদায় একজোট হয়েছিলেন ধর্মের স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, ওয়াহাবি আন্দোলন কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছিল আর রাজ্যে প্রশাসন ব্যবস্থাকেই বা কতদূর ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পেরেছিল। ওয়াহাবিরা ডাম্পিয়ার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে নিম্নশ্রেণীর লোকদের নিয়ে গঠিত যুদ্ধরত সম্প্রদায় বলে। স্বভাবতঃই এই ধরনের একটি গোষ্ঠী উচ্চমধ্যবিত্ত ভূস্বামীদের মন ক্রোধ, ঘৃণা ও অস্বস্তিতে ভরে দিয়েছিল। এই সম্পর্কে হাণ্টার বলেন, **"...The presence of wahabis in a district in a standing menace to all classes...possessed of property or vested interests."** অবস্থাপন্ন মুসলমানগণ, প্রত্যেক মোল্লা-মৌলভি, দরগার তত্ত্বাবধায়ক কয়েক বিঘা ভূসম্পত্তি সহ মসজিদের খাদিম প্রভৃতি সকলেই ওয়াহাবি আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা শুরু করেন এবং এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেন।

(৪) নৈতিক অবনতি :

ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রবাদ বা সমতাবাদে কতদূর বিশ্বাসী ছিলেন তা বলা কঠিন। সৈয়দ আহমদের পরবর্তী নেতারা আত্মিক সংস্কারের উৎসাহ উদ্দীপনা পরিত্যাগ করেছিলেন। কিছু ঐহিক প্রয়োজন মিটানোতেই তাঁদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। একনিষ্ঠ ওয়াহাবিরাও তাঁদের নেতাদের কর্মপদ্ধতিতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

(৫) হতাশা ও নৈরাশ্যের সঞ্চার :

বাংলার অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের কেউ বা এই দুঃসাহসিক ওয়াহাবি আন্দোলনকে মনে মনে সশ্রদ্ধ সমর্থন জানিয়েছিলেন, কেউ বা দেখিয়েছিলেন ঔদাসীন্য। পরবর্তীকালে তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, এই দীর্ঘকালীন বিদ্রোহ তাঁদের সর্বনাশ সুসম্পন্ন করেছে। কার্যতঃ তাঁরা বিদেশী শাসকদের আস্থা হারিয়েছেন, সরকারী চাকরিগুলি একাদিক্রমে হিন্দুদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছে। এই বৈষম্য বাংলাদেশে তীব্র আকার ধারণ করেছিল তার একটি প্রধান কারণ হল যে, ফার্সি ভাষা আর সরকারী ভাষা ছিল না। তা ছাড়া, বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভূস্বামীদের উপর ওয়াহাবি নেতৃবর্গের অধীনে কৃষকগণ জমি দখলের আন্দোলন শুরু করলে উভয় ধর্মাবলম্বী জমিদার শ্রেণীই বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ব্রিটিশ সরকারও এই ব্যাপারে জমিদারদের সাহায্য করতে কুণ্ঠিত ছিল না। অপর দিকে ওয়াহাবি আন্দোলন মুসলমান সম্প্রদায়কে ব্রিটিশ প্রভুদের চোখে বিরাগভাজন করে তুলেছিল। বাংলাদেশে কিছু হিন্দু জমিদার তিতুমিরের বিরুদ্ধে মুসলমান জমিদারদের সঙ্গে একই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন।

(৬) বিভেদ নীতির দ্বারা শাসন :

একটু একটু করে মুসলমানেরা হিন্দুদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠতে লাগল— হিন্দুরাও আর মুসলমানদের বন্ধু বলে মেনে নিতে পারল না। প্রথম দিকে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি এই বিরাগ উভয় সম্প্রদায়ে অভিজাত এবং সরকারী চাকরীর উপর নির্ভরশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ ক্ষেত্রে বলা চলে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ঘটনাই ছিল বিভেদ সৃষ্টির কাহিনী, বিভেদ-সৃষ্টি নীতির দ্বারা শাসন পরিচালনের দৃষ্টান্ত। প্রথমে শিখদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্রিটিশেরা পরোক্ষে ওয়াহাবিদের উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু সেই শিখশক্তি অপসারিত হল— ব্রিটিশেরা সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াল।

(৭) নেতৃবর্গের অদূরদর্শিতা :

ওয়াহাবি আন্দোলনের ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ নেতৃবর্গের অদূরদর্শিতা। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁরা কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন নি। তবে এই সময় তাদের এই নিষ্ক্রিয়তার কয়েকটি কারণও উল্লেখ করা যায়। ওয়াহাবি দলের নেতা মোহম্মদ হাসিন এবং আমাতুল্লা তখন কারান্তরালে অন্তরীণ ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র সিতানার সঙ্গে

অন্যান্য স্থানের যোগসূত্র ছিন্ন হয়। ব্রিটিশের পক্ষ থেকে সিন্ধুনদের তীরবর্তী দুর্গগুলোতে কঠোর প্রহরারও ব্যবস্থা করা হয়। ফলে সিতানা ও পাটনা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে এ কথা ঠিক যে, ওয়াহাবিরা চর্বি মিশ্রিত কার্তুজের কাহিনীর উদ্ভাবক না হলেও এই গুজব প্রচারে তারাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে পাটনা, হায়দ্রাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ওয়াহাবিরা বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। জয়পুর, ভুপাল, হান্সি, হিসার প্রভৃতি স্থান থেকে কিছু সংখ্যক ওয়াহাবি দিল্লীর বিদ্রোহে অংশ নিলেও সমষ্টিগতভাবে তারা এই বিদ্রোহ থেকে দূরে থাকার নীতি গ্রহণ করে। ওয়াহাবি ও সিপাহিদের সমন্বয় সাধিত হলে নিঃসন্দেহে ওয়াহাবি আন্দোলন একটি নতুন খাতে প্রবাহিত হত।

(৮) মুসলিম সমাজের বিরোধ ঃ

মির্জা গোলাম আহম্মদের নেতৃত্বে আহম্মদিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার ফলে ওয়াহাবিদের প্রভাব ও আধিপত্য বাধা প্রাপ্ত হতে শুরু করে। পাঞ্জাবের কাদিয়ানে প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করে মির্জা গোলাম আহম্মদ তাঁর নতুন ধর্মীয় চিন্তা প্রচার করতে শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর অসংখ্য ভক্ত নতুন ধর্মমত প্রচারের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ভারতে ও ভারতের বাইরে অনেক স্থানে, এমন কি, ইংলণ্ডেও তাঁর ধর্মমতের প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কিন্তু পরে মির্জা গোলাম আহম্মদ ধর্ম প্রবর্তকের ভূমিকা গ্রহণ করার চেষ্টা করলে বৃহত্তর মুসলমান সমাজ তাঁকে ও তাঁর অনুচরদের ইসলাম বিরোধী বলে ঘোষণা করে। কিন্তু সেজন্য তাঁর প্রভাব বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নি।

কিন্তু মির্জা গোলাম আহম্মদ ও ভক্তদের অপেক্ষা ওয়াহাবি আন্দোলনের অধিকতর ক্ষতি সাধন করেন স্যার সৈয়দ আহমেদ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সৈয়দ আহমেদ রক্ষণশীল প্রাচ্য সংস্কৃতির ও বলপূর্বক অনুপ্রবেশকারী পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের কাজে প্রকৃত যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী সর্বপ্রকার দুর্নীতির উর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করতে সমর্থ ছিলেন বলে স্যার সৈয়দ আহমেদ জনসাধারণের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজেদের স্বার্থেই ব্রিটিশ শাসন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। তিনি আরও মনে করেন যে, ধর্মসহিষ্ণুতা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রভৃতির জন্য ব্রিটিশ শাসনকে দার-উল-ইসলাম অর্থাৎ শান্তির রাজ্য মনে করা উচিত। তিনি আরও মনে করতেন যে, ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ীই ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং এই শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। তা না হলে ধীরে ধীরে তারা হিন্দুদের নিকট সকল বিষয়ে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হবে। মুসলমান সমাজকে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণেও উৎসাহিত করেন। তাঁর এই মতামত উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানের তথাকথিত প্রগতিশীল মুসলমানদের নিকট জনপ্রিয়তা অর্জন করায় ওয়াহাবি আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ে।

(৯) ব্রিটিশদের দমন নীতি :

ওয়াহাবিদের প্রধান কর্মকেন্দ্র সিতানা ব্রিটিশ শাসকদের চক্ষুঃশূল হয়ে ওঠে। সুতরাং তারা ওয়াহাবি আন্দোলন চিরদিনের জন্য দমন করার উদ্দেশ্যে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ওয়াহাবি কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য গোপন অনেক কেন্দ্র সংগঠিত করা হয়। বিভিন্ন স্থানে বন্দী ওয়াহাবিদের কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মরক্ষার জন্য ওয়াহাবিরাও ধর্মমত প্রচারের জন্য নতুন ভাষা এবং নতুন উপায় গ্রহণ করে। সিতানা, আগ্রা, পাটনা, রাজমহাল, বগুড়া, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে বহু মামলা রুজু করা হয়। অপরাধী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তিও দেওয়া হয়। ব্রিটিশ শক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে ওয়াহাবি আন্দোলন দমন করা সম্ভব হয়। সোয়তে অঞ্চলের পার্বত্য জাতিদের সহায়তায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওয়াহাবিদের বোনাস্থির অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব হয়। যদিও পরে ওয়াহাবিরা কোথাও কোথাও পার্বত্য উপজাতিদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৮৬৫, ১৮৮৮ ও ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের সামরিক অভিযানের বিরোধিতা করে। তথাপি যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদের মৃত্যুবরণ ছাড়া আর কোন সাফল্য তাদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয় নি। ভারতের পূর্বাঞ্চলেও ওয়াহাবিরা একদিকে জনসমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়ে এবং অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারের সতর্কতার ফলে তাদের সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করতে অসমর্থ হয়ে ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়।

Q. 8. Critically analyse the character of the Wahabi movement. "Starting originally under a semi-religious impulse, the Wahabi movement fast gained a political orientation." Elucidate.

Ans. (১) ধর্মীয় পটভূমি :

ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে নৈতিক অবনতির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ স্বরূপ ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। 'পবিত্র' ইসলাম ধর্ম থেকে যে কোন প্রকার বিচ্যুতি সম্পর্কে এই আন্দোলন ছিল বিরুদ্ধবাদী এবং গোঁড়া মনোভাবাপন্ন। এর নামকরণ হয়েছিল এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা আবদুল ওয়াহাব-এর (১৭০৩-১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দ) নামানুসারে। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে আরবের অন্তর্গত নেজদ্ নামক স্থানে এর সূচনা করেন। এই আন্দোলনের কতকগুলি ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ছিল :—

(১) এর প্রকৃতি ছিল উগ্ররূপে বিদেশী-বিরোধিতা। আরবে এই আন্দোলন ছিল তুর্কীবিরোধী এবং ভারতের ক্ষেত্রে ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী। (২) এ আন্দোলনে প্রাচীন মুসলিম ধর্মগুরুদের আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দাবি করা হয়, যার বিশেষত্ব ছিল আচার-ব্যবহারের সরলতা এবং পবিত্র জীবন যাপন। (৩) অনেক প্রচলিত ধর্মীয় উপাখ্যান ও ধর্মীয় উৎসব ওয়াহাবিপন্থীরা বর্জন করেছিল, কারণ তাদের মতে ঐ সব অনুষ্ঠানের মধ্যে মাধ্যমে পৌত্তলিকতার প্রসারের আশঙ্কা দেখা দেয়। (৪) নাস্তিকতা ধ্বংস করে চরম আত্মস্বার্থত্যাগের মাধ্যমে তাদের ধর্মনীতিকে প্রচার করাই ছিল ওয়াহাবিপন্থীদের ঐকান্তিক ও গোঁড়া উদ্দেশ্য। (৫) ইমামের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল।

(৬) ওয়াহাবি মতাবলম্বীরা জনৈক মাহ্‌দির অস্তিত্বে বিশ্বাস করত—যিনি শেষ বিচারের দিনে আবির্ভূত হবেন। সেদিন মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলের এক চূড়ান্ত সংগ্রাম হবে আর তার পরিণামে আন্তরিক শুভ বিশ্বাসেরই জয় হবে। (৭) তাদের মতবাদ প্রচারের সুবিধার জন্যে ওয়াহাবিপন্থীরা পার্থিব শাসক সম্প্রদায়ের সাহচর্য সহানুভূতি কামনা করেছিল।

(২) সৈয়দ আহমদের কর্মসূচী ও কার্যকলাপ ঃ

ভারতে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬—১৮৩১)। তাঁর বাসস্থান ছিল উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলী। একজন ধর্মপ্রচারকরূপে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল; ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যেসব অনাচার প্রবেশ করেছিল সেগুলিকেই তিনি ভারতে ইসলাম ধর্মের অবনতির জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি মক্কা অভিমুখে তীর্থযাত্রায় বের হন এবং ওয়াহাবি মতাবলম্বীদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি নিজেকে একজন ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও নিজ উদ্দেশ্য সাধনে একাগ্রতার ফলস্বরূপ শীঘ্রই তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে পেশোয়ার সীমান্ত থেকে বাংলার ব-দ্বীপ পর্যন্ত তাঁর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কলকাতা ও পাটনাসহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন আর এই ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি প্রভূত লোকবল ও অর্থসংগ্রহে সমর্থ হন।

ওয়াহাবিপন্থীরা ভেবেছিলেন যে, মুসলমান সম্প্রদায় যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত না করতে পারে তবে ইসলামধর্মের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে না। সে কারণে একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ ক্ষয়-পচন নিবারণের জন্য সমাজ ও ধর্মসংক্রান্ত দুর্নীতির মূলোৎপাটন প্রয়োজন ছিল, অপরদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে নাস্তিক শাসকদের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামের প্রয়োজনীতাও উপলব্ধি করা হয়। সৈয়দ আহমদ ভারতবর্ষকে দার-উল-হারব (শত্রু বা বিধর্মীদের দেশ) বলে অভিহিত করেছিলেন এবং তাকে দার-উল-ইসলাম এ (বিশ্বাসীদের দেশ) রূপান্তরিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে, সমস্ত সৎ মুসলমানের কর্তব্য অ-মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' (পবিত্র যুদ্ধ) ঘোষণা করা, অথবা মুসলমান-শাসিত কোন দেশে গিয়ে বাস করা। তাঁর লক্ষ্য ছিল পাঞ্জাবের শিখ রাজ্যে এবং বাংলা ও উত্তর ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। তিনি তাঁর অনুচরবৃন্দসহ সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে তিনি শিখদের কাছ থেকে পেশোয়ার জয় করতে সমর্থ হন, কিন্তু ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনি শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন এবং অবশেষে শের সিং-এর হাতে মৃত্যুবরণ করেন।

(৩) আন্দোলনের অগ্রগতি ঃ

সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পরেও এই আন্দোলন অব্যাহত থাকে। পাটনা ছিল ওয়াহাবিপন্থীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র। সৈয়দ আহমদের বাণী একদিকে কাবুল থেকে

ঢাকা এবং অপরদিকে বোম্বাই থেকে হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছিল। ওয়াহাবি-পন্থীরা তাঁদের ধর্মীয় চাঁদা আদায়ের একটি নিয়মিত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক মনোভাব প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলাগুলিতে স্থায়ী সংগঠন গড়ে তুলেছিল। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর ওয়াহাবীপন্থীরা কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছিল। ব্রিটিশ শাসকদের অনেকগুলি ব্যয়বহুল সীমান্ত-সংঘর্ষে লিপ্ত হতে তারা বাধ্য করিয়েছিল। বিচারকালে কয়েকজন ওয়াহাবীপন্থীকে কঠোর সাজা দেওয়ার ফলশ্রুতিস্বরূপ বাংলার প্রধান বিচারপতি জনৈক মুসলমান ঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন (১৮৭১)। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মেয়ো আন্দামানে শের আলি নামক একজন ওয়াহাবিপন্থী দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর হাতে নিহত হলেন। সিতানা ছিল ওয়াহাবিপন্থীদের একটি প্রধান কর্মকেন্দ্র। এমন আশংকা প্রকাশ করা হয় যে, যদি আফগান বা রুশদের সাথে যুদ্ধ বাধে, তবে ওয়াহাবিপন্থী ও তাদের সহযোগী জাতিরা হয়ত ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারবে।

(৪) প্রকৃতি :

প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করার পর ঐতিহাসিকরা এই আন্দোলনের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কতিপয় লেখক এই আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারূপে গণ্য করা কর্তব্য মনে করেন। তাঁদের যুক্তি হল—ওয়াহাবিপন্থীরা ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ কল্পে এক সুপরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল। ভারতের স্বাধীনতাই ছিল তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এ ছাড়া এই আন্দোলন এক অখিল ভারতীয় রূপ ধারণ করেছিল। পেশোয়ার থেকে ঢাকা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে, এমন কি, মাদ্রাজ ও দাক্ষিণাত্যেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ভিন্ন রূপ মত পোষণ করেন। তিনি লিখেছেন—"এর সুদূরপ্রসারী চরিত্র এবং ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চারক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও ওয়াহাবি আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনরূপে গণ্য করা যায় না। এটি ছিল মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত, মুসলিমদের জন্য এক মুসলিম আন্দোলন। হিন্দুরা সম্প্রদায়গতভাবে এই আন্দোলন থেকে নিজেদের পৃথক করে রেখেছিল। এমন কি, একটি হিন্দুও এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নি। ওয়াহাবিপন্থীরা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অর্জন তাদের সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল না—তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। "The Wahibis were undoubtedly inspired by the motive of freeing India of the British rule, but their struggle was not for securing freedom for India but for the re-establishment of Muslim supremacy." অপরদিকে বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং তামিলনাড়ুতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারতে এই আন্দোলনের তীব্রতা

এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে, স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার বিক্রি করেও আন্দোলনের তহবিলে অর্থ দান করেন। ওয়াহাবিরা শিখদের প্রতি বিরোধিতা ত্যাগ করলে হিন্দুরাও এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। তথাপি ব্রিটিশদের বিতাড়নের জন্য এই সর্বাধিক সুবিস্তৃত ও সুসংগঠিত আন্দোলনকেও সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামরূপে গণ্য করা যায় না।

(৫) মিশ্র-আন্দোলন:

এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, অন্ততঃ প্রাথমিক অধ্যায়ে ধর্মীয় ধারণাগুলিই ছিল ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল ভিত্তি। হার্ডির মতে, মুঘল-অধিকারের পুনরুদ্ধার সৈয়দ আহমদের লক্ষ্য ছিল না, বরং তিনি চেয়েছিলেন আদি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধাঁচে ভারতের সীমান্তগুলিতে কিছু রাজ্য গড়ে তুলতে। তিনি ভেবেছিলেন—এর ফলে একদিন মুসলমানেরা ঈশ্বরের জন্য ভারত জয়ে উৎসাহী হবে। যাই হোক, ক্রমশঃ এই আন্দোলন একটা অর্থ নৈতিক রূপ পরিগ্রহ করল। বিশেষভাবে বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে এর যথার্থতা অনুভব করা যায়, সেখানে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এমন কি, মসজিদ-সংলগ্ন সামান্য কয়েক একর জমির অধিকারী মৌলবিরাও রেহাই পান নি। হাণ্টারের মতে—"ওয়াহাবিরা ছিল ধারণা ও বিশ্বাসের দিক থেকে এ্যানাব্যাপটিস্ট ও ফিফথ মনার্কি গোষ্ঠীর মতো আর রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিল সাম্যবাদী ও উগ্র প্রজাতন্ত্রীদের মতো।" সকল শ্রেণীর সম্পত্তির অধিকারী ও কায়েমী স্বার্থের অধিকারীদের কাছে ওয়াহাবিরা ছিল মূর্তিমান বিভীষিকা। ডেম্পিয়ারের বর্ণনানুযায়ী ওয়াহাবিরা ছিল ৮০,০০০ মানুষের একটি গোষ্ঠী যারা সমাজের নিম্ন শ্রেণী থেকে উঠে এসে নিজেদের মধ্যে পূর্ণসাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সৈয়দ আহমদের বাণী মুসলিম সমাজের নিম্ন শ্রেণী, প্রাক্-শিল্প ভিত্তিক সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র ভূস্বামী, মোল্লা, শিক্ষক, ক্ষুদ্র দোকানদার, সামান্য কর্মচারী, কারিগর প্রভৃতি সকলের মনেই সাড়া জাগিয়েছিল। সুতরাং কায়েমী স্বার্থ যাদের দখলে, হিন্দু ও মুসলিম নির্বিচারে তারা যে ওয়াহাবিপন্থীদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হবে—এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

(৬) উপসংহার:

এই আন্দোলনের প্রকৃতি যে মূলতঃ ব্রিটিশ-বিরোধী বা বিদেশী-বিরোধী ছিল তা অস্বীকার করা চলে না, তবে একে ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলা হলে সম্ভবত অতিরঞ্জন হবে। হাণ্টার কর্তৃক এই আন্দোলনকে বিদ্রোহরূপে বর্ণনা ও ঘাতকের হাতে বিচারপতি নরম্যানের মৃত্যু সরকারকে এই আন্দোলনের বিপজ্জনক রাজনৈতিক অর্থ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে স্যার সৈয়দ আহমদ সরকারের প্রতি মুসলিমদের আনুগত্য প্রচারে ব্যাগ্র হয়ে এই তত্ত্ব উপস্থিত করলেন যে, ওয়াহাবিরা ছিল শিখ-বিরোধী ব্রিটিশ-বিরোধী নয়। তাঁর মতে—ওয়াহাবি মতবাদ

জনগণকে আকৃষ্ট করে নি। বিধর্মী শাসক ইসলাম ধর্মে হস্তক্ষেপ না করলে মুসলমান প্রজাদের আনুগত্য পাবেন। যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনকে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের সংমিশ্রণ বলা চলে। হার্ডির মতে—"ভারতীয় মুসলমানেরা ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে একত্রিত হয়ে ক্রমশঃ একটি রাজনৈতিক সত্তার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। একই সময়ে বাংলায় দুদু মিঞা ও তিতুমিরের ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যকলাপ, সাম্প্রদায়িক ছদ্মবেশ ধারণ করা সত্ত্বেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংগ্রামের সম্ভাবনা আনয়ন করতে সমর্থ হয়।

Q. 8. Discuss the organisation of the Wahabi movement with special reference to its characteristics.

Ans. (১) ভূমিকা :

সিপাহি বিদ্রোহের তুলনায় ওয়াহাবি আন্দোলন অনেক বেশি পরিকল্পিত, সংগঠিত এবং সুসংবদ্ধ ছিল। যে গোপনীয়তা রক্ষা করে আন্দোলনকারীরা তাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করত এবং প্রতিটি সদস্য যে ভাবে পরস্পরের মধ্যে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলত তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ছিল। ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রধান সংগঠক সৈয়দ আহমেদ বিলায়েৎখান, এনায়েৎ আলি, মোহম্মদ হোসেন এবং ফারুৎ হোসেন নামে চার ব্যক্তিকে খলিফা বা ধর্মীয় প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেন। তাঁদের কাজ ছিল সৈয়দ আহমেদের নামে অনুগামীদের নাম তালিকাভুক্ত করা এবং প্রস্তাবিত জেহাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করা। ধর্ম প্রচারকের উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তারা দেশের সর্বত্র ঘরে ঘরে বিধর্মী ইংরেজদের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সংগঠনের কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাঁরা প্রতিটি প্রদেশ ও প্রতিটি জেলায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ আহমেদের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর পাটনা ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইয়াহিয়া আলি পাটনার প্রধান মৌলভীর পদ লাভ করেন। আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আমাদুল্লা আন্দোলন পরিচালনার পূর্ণক্ষমতা লাভ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন ইয়াহিয়া আলি, আবদুল রহিম; আবদুল গফুর এবং ইলাহি বক্স। প্রতি শুক্রবারে নামাজের পর কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন শুরু হত এবং সেখানে জেহাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা করা ও সিত্তানার কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হত। বিভিন্ন স্থান থেকে আসা নানারূপ পত্রাদি পাঠ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শও দেওয়া হত। প্রত্যেকটি জেলায়ও একটি করে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয় এবং সেখানে স্থায়ী প্রচারক নিযুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মাঝে মাঝে ভ্রমণশীল ধর্ম প্রচারকদের আগমনে তাদের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পেত এবং তাদের প্রভাবে পাটনার সংগঠন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করত। বিভিন্ন জেলার

প্রচারকদের মধ্যে দক্ষিণ বঙ্গের মিয়াজান, মোহম্মদ ইব্রাহিম, পাটনার ইয়াহিয়া আলি, আবদুল রহিম, ইলাহি বক্স, থানেশ্বর ও আম্বালার মোহম্মদ জাফর, হোসেন, মোহম্মদ শফি, সিতানার আবদুল্লা, ফৈয়াজ আলি, মোহম্মদ আহসান প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব ব্যক্তিদের জীবনে গ্রেফতার, মৃত্যু অথবা অন্য কোন অনিবার্য বিপদ দেখা দিলে তাদের কার্যভার গ্রহণের জন্য উপযুক্ত উত্তরাধিকারীদের নামও স্থির করা হয়। পাটনার সাদিক পাড়ার ওয়াহাবি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল প্রকৃতপক্ষে একটি বিরাট পান্থশালায় পরিণত হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে তরুন বয়স্ক শিক্ষার্থীরা সেখানে এসে উপস্থিত হত এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা সমাপনের পর তাদের সিতানায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হত। অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের শিক্ষার্থীদের পাটনায় আরও কিছু দিন রেখে এবং নানা বিষয়ে আরও পারদর্শী করে ওয়াহাবি আন্দোলনের আদর্শ প্রচারের জন্য বিভিন্ন জেলায় পাঠান হত।

(২) সাংগঠনিক ব্যবস্থা :

শিক্ষাকেন্দ্র পাটনা থেকে দু'হাজার মাইল দূরে ভারতের সীমান্তের বাইরে সিতানায় তরুণ বয়স্ক বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রেরণ করার ব্যবস্থা খুব সহজ কাজ না হলেও দক্ষ প্রশাসক ইয়াহিয়া আলি অতিশয় যোগ্যতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করতেন। পাটনা থেকে সিতানা যাওয়ার পথের পাশে তিনি বহু সংখ্যক সরাইখানা ও বিশ্রাম-কক্ষের ব্যবস্থা করেন। এইসব স্থানে ওয়াহাবি দলের সদস্যগণের জন্য আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। তাদের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও আরামের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্যও অনেক পরিচারক নিযুক্ত ছিল। পথিপার্শ্বের এই সব সংস্থার পরিচালনার দায়িত্ব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর অর্পণ করা হত। তারা একদিকে ছিল নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বস্ত অপরদিকে ছিল ওয়াহাবি। তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল ধার্মিকতায় নিঃস্বার্থভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া। সাধারণত কোন মসজিদের সঙ্গে তারা নিজেদের যুক্ত করে নিয়ে তরুণদের শিক্ষাদান ও নতুন ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য আত্মোৎসর্গ করত। ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রথম দিকের পরিচালকগণ এই ধর্ম প্রচারকদের কার্যকলাপের প্রতি খুব উৎসাহ প্রদর্শন করতেন এবং তাদের অনুগামীদের দ্বারা নতুন নতুন স্থায়ী বসতি স্থাপনের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। ফলে গ্রাম-বাংলায় ইসলামপুরের মতো নতুন অনেক বসতির পত্তন ঘটে। জেলার সংস্থাগুলো পাটনার কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা এবং নতুন নতুন লোক সংগ্রহ করার জন্যও তারা সর্বদা ব্যস্ত থাকত। সাধারণত ধার্মিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ খুব তেজস্বিতার সঙ্গেই বিদ্রোহের বাণী প্রচার করতেন। জেহাদের জন্য জনসাধারণকে নিয়মিত চাঁদা দিতে তাঁরা উদ্বুদ্ধ করতেন এবং সংগৃহীত অর্থ, জিনিসপত্র প্রভৃতি পাটনা কেন্দ্রে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করতেন। পাটনা থেকে এই সব অর্থ ও জিনিসপত্র আবার সীমান্তের কেন্দ্র সিতানায় প্রেরিত হত। মুসলমানদের অবশ্য দেয় জাকাৎ ছাড়াও ওয়াহাবিরা তাদের অনুগামীদের উপর অন্যান্য কয়েকটি কর ধার্য করতেন। সকল প্রকার উৎপন্ন দ্রব্যের থেকে

প্রতি মনের উপর একসের পরিমাণ উসর নামে একটি কর আদায় করা হত। প্রতি পরিবারের দৈনন্দিন মোট খাদ্যশস্য থেকে মাথা প্রতি এক মুষ্টি করে খাদ্যশস্য আলাদা করে রাখা হত এবং প্রতি শুক্রবার তা গ্রামের মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক মোল্লার নিকট জমা দেওয়ার রীতি ছিল। এইরূপ কর আদায়ের পদ্ধতি মুঠিয়া নামে পরিচিত ছিল। প্রতি সপ্তাহের সংগৃহীত খাদ্যশস্য বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ জেহাদের তহবিলে সঞ্চিত হত। মসজিদে বসবাসকারী ব্যক্তিদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য স্বেচ্ছায় প্রদত্ত অর্থ ও খাদ্য-দ্রব্য ফিরতা নামে পরিচিত ছিল। কুরবানি বা চামড়া অর্থাৎ বকর ইদে বলি প্রদত্ত পশুদের চামড়া বিক্রয় লব্ধ অর্থ ও জেহাদ তহবিলে জমা পড়ত। পরবর্তীকালে অর্থের অভাব পূরণ করার জন্য ওয়াহাবিদের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থও গ্রহণ করার নীতির প্রচলন হয়। ওয়াহাবি সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তির কর্তব্য ছিল বিধর্মী ইংরেজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা। স্থানীয় ওয়াহাবি কমিটির সভাপতি সরাইখানা ও বিশ্রামকক্ষের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। প্রয়োজন হলে স্থানীয় মসজিদগুলোতে তারা যাতে নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে সে জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হত এবং সমস্ত মসজিদের আয়তন অবস্থান প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা হত। এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নামের তালিকাও প্রস্তুত করা হত। সিতানার পথে যাত্রা করার সময় প্রত্যেক ব্যক্তিই ওয়াহাবি আন্দোলনের সমর্থকদের নাম তালিকা মুখস্থ করে নেওয়ার চেষ্টা করত। পাটনা, বেনারস, কানপুর, দিল্লী, থানেশ্বর, আম্বালা, অমৃতসর, ঝিলাম, রাওয়ালপিণ্ডি, আটক, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

সিতানার তরুণ বয়স্ক কর্মীদের আবদুল্লার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা কর হত। সেখান থেকে শিক্ষানবিসদের যোগ্যতা অনুসারে ব্রিটিশ-ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহী মতামত প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হত। নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার জন্য তারা বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করত। সাধারণতঃ, পুলিশবাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াবার জন্য তারা কসাই, পুস্তক বিক্রেতা, দর্জি, ছোটখাট দোকানদার প্রভৃতির কাজ করত। সিতানে অবস্থান কালে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করত এবং বিধর্মী ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অনুপ্রাণিত হওয়ার বিভিন্ন প্রকার সমবেত সঙ্গীত চর্চা করত। ১৩০ জন তরুণ কর্মীকে নিয়ে একটি জমায়েত তৈরি হত এবং একজন জমাদার প্রতিটি জমায়েতের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করত।

(৩) বাংলাদেশের সংগঠন :

পাটনার কেন্দ্রীয় সংস্থা ব্যতীত ওয়াহাবিদের গ্রামবাংলার প্রতিটি স্থানে একটি করে সংস্থা স্থাপিত হয়। উইলিয়াম হান্টার এইসব ধর্মপ্রচারকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁরাই ছিলেন সবচাইতে ধার্মিক ও নিঃস্বার্থ-

পর। গ্রামাঞ্চলের প্রধান ব্যক্তি বা মণ্ডলকে অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তিকে ওয়াহাবি সম্প্রদায়-ভুক্ত করা সম্ভব হলে কর আদায়ের সকল বাধাই অতিক্রম করা সহজ হয়ে উঠত। আর তা না হলে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি যুগ্ম আর্থিক সংস্থা গঠিত হত এবং কর আদায়ের দায়িত্ব একজন প্রধান কর আদায়কারীর উপর অর্পণ করা হত। প্রধান কর আদায়-কারী তার অধীনস্থ এলাকার প্রতিটি গ্রামের জন্য পৃথক পৃথক কর আদায়কারী নিযুক্ত করত, তাদের হিসাব-পত্র পরীক্ষানিরীক্ষা করে আদায়ীকৃত অর্থ জেলার দপ্তরে প্রেরণ করত। ছোট ছোট গ্রামে একজন আদায়কারী থাকলেও বড় এবং লোকবহুল গ্রামে 'দীন কা সরদার' সহ বহু সংখ্যক আদায়কারী নিযুক্ত হত। দীন কা সরদার অর্থাৎ মসজিদের প্রধান মৌলবী নামাজ পরিচালনা করতেন এবং কর আদায়ের প্রধান দায়িত্ব পালন করতেন। 'দুনিয়াকা সরদার' অর্থাৎ প্রধান সংগঠক ওয়াহাবি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। 'ডাক কা সরদার' অর্থাৎ সংবাদ আদান-প্রদানের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি চিঠি-পত্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এবং আদায়ীকৃত অর্থ যথোপযুক্ত স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করতেন।

(৪) সাংগঠনিক উৎকর্ষতা ঃ

বাংলাদেশের রফিক মণ্ডল ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে কর আদায়ের এরূপ সুসংহত সর্বপ্রথম প্রচলন করেন। মালদা জেলার সর্বত্র ছাড়াও রফিক মণ্ডলের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে মুর্শিদাবাদ ও রাজসাহী জেলার অধিকাংশই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি আদায়ীকৃত অর্থের একচতুর্থাংশ তাঁর বেতন হিসাবে গ্রহণ করতেন। তিনি বছরে প্রায় বিশ হাজার টাকা আদায় করতেন এবং তাঁর প্রাপ্য অংশ বাদ দিয়ে বাকি অংশের সিংহভাগ সিতানায় এবং অবশিষ্ট অংশ পাটনার দপ্তরে প্রেরণ করতেন। সাধারণত প্রতি বছর নিয়মিতভাবে সিতানায় অর্থ প্রেরিত হত না। দু-তিন বারে সঞ্চিত অর্থ একসঙ্গে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে এবং আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ বেশি হলে যে কোন সময়ই অর্থ পাঠিয়ে দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়।

সাধারণতঃ হুণ্ডির মাধ্যমেই অর্থ প্রেরণের রীতি প্রচলিত ছিল। পাটনায় আবদুল গফুর ও ইলাহী বক্স এই বিষয়ে খুব দক্ষ ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন বিশ্বস্ত লোকের সহায়তায় দিল্লী ও আম্বালায় হুণ্ডি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। সিতানার কেন্দ্র সেখান থেকে নগদ অর্থ লাভ করত। অনেক সময় স্বর্ণ মোহরের মাধ্যমেও অর্থ প্রেরণ করা হত। দক্ষিণবঙ্গ থেকে, বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিয়মিত ভাবে অর্থ ও কর্মী সুদূর সিতানায় প্রেরিত হওয়ার ব্যবস্থা সুচারু রূপে সম্পাদিত হত। দক্ষিণবঙ্গ থেকে পাটনা স্থল বা নৌ-পথে, পাটনা থেকে রেল যোগে দিল্লী বা আম্বালা, সেখান থেকে মৌলা বক্সের মাধ্যমে লাহোর, লাহোর থেকে আবদুল করিম নবী বক্স প্রভৃতির মাধ্যমে রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে পেশোয়ার এবং পেশোয়ার থেকে আহমেদ আলির

মাধ্যমে সিতানায় পৌঁছে যেত। প্রায় দু'হাজার মাইল নিরাপদে অতিক্রম করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ওয়াহাবিরা যে সমর্থ ছিল তা পদ্ধতির সাফল্যের মধ্যেই প্রমাণিত হয়। ত্রুটিহীন ভাবে এই পদ্ধতি পরিচালনা ও সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করার পদ্ধতি নিঃসন্দেহে এই আন্দোলনের সাফল্য ও দীর্ঘ স্থায়িত্বের অন্যতম প্রধান কারণরূপে বিবেচিত হতে পারে। দ্বীপান্তরিত ওয়াহাবি নেতৃদ্বয় আহমেদ উল্লা ও এনায়েৎ আলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আবদুল গণির পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরে গমন এবং সেখান থেকে নিরাপদে প্রত্যাবর্তনও ওয়াহাবি আন্দোলনের অপূর্ব সংগঠন ও পরিকল্পনা প্রশংসনীয় কৃতিত্বের সাক্ষর বহন করে।

(৫) আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য বিচার :

ওয়াহাবি আন্দোলন প্রথম পর্বে অবিমিশ্র ধর্মীয় আন্দোলনরূপে দেখা দেয়। তা ছাড়া, এই আন্দোলন মুসলিম সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে—অর্থাৎ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মীয় আন্দোলনরূপে দেখা দেওয়ার ফলে জনসাধারণের খুব বেশি সমর্থন লাভ করা ওয়াহাবিদের সম্ভব হয় নি। বিশেষত ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহমেদের মৃত্যুর ফলে এই আন্দোলনের স্রোত অনেক স্তিমিত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে আন্দোলনের গতি পরিবর্তিত হলেও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করার ফলেই এই আন্দোলনের পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর হয়। বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত জেলা পুলিশ সুপার-ইনটেনডেন্ট মিস্টার রেইলি মন্তব্য করেন যে, মালদা ও বাখরগঞ্জ জেলার মতো স্থানসমূহে যেখানে কৃষকদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে সঙ্গতি সম্পন্ন এবং ধর্মোন্মাদনায় তারা সময় ব্যয় করতে পারে এই আন্দোলন সেইরূপ স্থানেই রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার পরই ওয়াহাবি আন্দোলন সাধারণ মুসলমানদের সহানুভূতি এবং সক্রিয় সমর্থন লাভ করে। বিভিন্ন প্রদেশে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের সময় আন্দোলনের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। আন্দোলনের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মুসলমান সমাজের সকল শ্রেণীর লোক দেখা যায়। উচ্চশ্রেণীর মোল্লা-মৌলবী, বিত্তশালী ব্যবসায়ী, সৈনিক, ধর্মপ্রচারক থেকে শুরু করে কসাই, সাধারণ কেরানী, কৃষক প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি সকলেই এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সমগ্র মুসলিম সমাজই এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। ওয়াহাবি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ মুসলমান সমাজের প্রচণ্ড সহানুভূতি থাকার জন্যই তাদের ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটন করা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আত্মগোপন করারও অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। সেজন্য মিস্টার রেইলি মন্তব্য করেন যে,ওয়াহাবিদের প্রতি সাধারণ মুসলমানগণ এত বেশি শ্রদ্ধা পোষণ করত যে, তাদের নাশকতা মূলক কার্যকলাপ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। যে সামান্য সংখ্যক মুসলমানগণ ওয়াহাবি আন্দোলন-

কারীদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে তাদের সমাজে একঘরে করে রাখা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হাসমৎ খানের প্রতিনিধি আবদুল্লার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নতুন কোন কর্মের সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত সে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে, কারণ সে সুনিশ্চিত ভাবে জানত যে, হাসমৎ খানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে পূর্বের কর্মস্থল থেকে সে অবশ্যই বরখাস্ত হবে। পাটনার হাকিম আহম্মদ আলি সরকারের কাছ থেকে পুলিশ সাব-ইনসপেক্টরের চাকরীর প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরই ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত হয়। প্রকৃতপক্ষে ওয়াহাবিদের জনপ্রিয়তা এত গভীর ছিল যে, সরকার শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বিক্রয় করতে অসমর্থ হয়।

হিন্দুরা এই আন্দোলনের প্রতি কোন ক্রমেই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না। বিশেষত আন্দোলনের প্রথম পর্বে শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হলে হিন্দুদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ওয়াহাবিরা হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নিন্দাবাদ শুরু করলে হিন্দুরা তাদের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে ওয়াহাবিদের প্রচারের ফলে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিখ রাজ্যের পতনের পর ওয়াহাবি আন্দোলন ধীরে ধীরে রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী হয়ে উঠলে হিন্দুরা তাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে পড়ে। এমন কি, ওয়াহাবি আন্দোলনের সমর্থক কয়েকজন হিন্দুকেও অন্তরীণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেও ওয়াহাবিরা কখনও হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নি।

ওয়াহাবি আন্দোলন কোথাও কোথাও শ্রেণী সংঘর্ষের রূপ গ্রহণ করে। তার প্রধান দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ। সেখানে বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে। উইলিয়াম হান্টার মন্তব্য করেন, "The presence of Wahabis in a district is a standing menace to all classes···possessed of property or vested interests." অবস্থাপন্ন মুসলমান এবং কয়েক বিঘা জমির মালিক মসজিদের মোল্লারাও তাদের কাজের তীব্র সমালোচনা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে। তা ছাড়া বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মধ্যেই ওয়াহাবি আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না। দক্ষিণ ভারতেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এবং সেখানকার নারীরা অলঙ্কার বিক্রি করে এই আন্দোলনের জন্য অর্থ সাহায্য করেন।

কিন্তু ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে, এই অন্দোলনে প্রসার এবং অদম্য উৎসাহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেও জাতীয় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য লাভ করে নি। এই আন্দোলন ছিল মুসলমানদের, তাদের দ্বারাই পরিচালিত এবং তাদের স্বার্থে প্রণোদিত। শ্রেণী হিসাবে হিন্দুরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। কেবলমাত্র কোথাও কোথাও ব্যক্তিগতভাবে দু-একজন হিন্দু নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ভারতের বিরাট এক অঞ্চলে

এই আন্দোলন পরিচালিত হলেও হিন্দু সমাজের একজনও এই আন্দোলনে কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে নি। নিঃসন্দেহে ওয়াহাবিরা ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের এই স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ভারতের জন্য ছিল না, ছিল মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের জন্য। সুতরাং এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও সাংগঠনিক শক্তি থাকলেও তা জাতির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের বৈশিষ্ট্য লাভ করে নি।

Q. 9. Give an account of the Farazi Movement. Can you trace its influence in later history of Bengal ?

Ans. (১) ভূমিকা :

ভারতের ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের পর থেকেই সর্বস্তরের মুসলমানগণ এক ব্যাপক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার ফলে মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর প্রায় কোন প্রকারই লাভ হয় নি। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ফলেও মুসলমান সমাজের অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পায়। ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে এবং দেশীয় শিল্পের ক্রমশঃ বিলুপ্তির ফলে মুসলমান বণিক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় জীবিকাচ্যুত হয়ে দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ভারতের অধিবাসীর মোট সংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ ছিল মুসলমান ধর্মাবলম্বী, ইংরেজদের শাসন প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এই বিরাট সংখ্যক লোক এক অভূতপূর্ব সমস্যায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। তারা ইংরেজি শিক্ষা ও প্রশাসনের কাছ থেকে নিজেদের দূরে রাখার চেষ্টা করে। অপরদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনা ও চেতনার সঞ্চার হয়। মুসলমানদের ধর্মভিত্তিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে ইংরেজদের ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থায় হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা দেয় ও তাদের প্রতিভা স্ফুরণের পথ প্রশস্ত হয়। নবজাগরণের পথও প্রস্তুত হয়। অপরদিকে মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে একটি অনগ্রসর সমাজে পরিণত হতে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ব্রিটিশ শাসন ও ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

(২) ওয়াহাবি আন্দোলন :

একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরোক্ষ প্রভাবে এবং অপরদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় তা ব্রিটিশ শাসনের সমর্থকে পরিণত হয়। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসক ও তাদের সমর্থক হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের মনে ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয়। দিল্লীর শাহ ওয়ালি উল্লাহ (১৭০৩-১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে) ইসলাম ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। শাহ ওয়ালি উল্লাহ যে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন তা তাঁর

পুত্র শাহ আবদুল আজিজের নেতৃত্বে অব্যাহত থাকে। কিন্তু রায়বেরিলির সৈয়দ আহমেদ ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। সাধারণ পরিবারের সন্তান সৈয়দ আহমেদ (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ) প্রথম জীবনে পিণ্ডারি নেতা আমীর খানের অধীনে সৈনিকের কাজ করতেন। কিন্তু শাহ ওয়ালি উল্লাহ্‌র পুত্র আবদুল আজিজের প্রভাবে তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে নতুন ভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন। সম্ভবত হজ করার উদ্দেশ্যে তিনি মক্কায় যেয়ে আরবের আবদুল ওয়াহাবের শিষ্যদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ওয়াহাবি আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। তবে আধুনিক কালের অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, আরবের আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বাধীনভাবেই তিনি তাঁর আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে সিতানায় ও বিহারের পাটনায় ওয়াহাবিদের দুটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পাঞ্জাবের শিখ শক্তি এবং পূর্বভারতের ব্রিটিশ শক্তি ধ্বংস করে ভারতে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। দার-উল-হারবের পরিবর্তে দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা দৃঢ়সংকল্প হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে শিখ শক্তির পতন শুরু হলে তাঁরা ইংরেজদের প্রধান শত্রুরূপে পরিগণিত করেন এবং তাদের শাসন-ভিত্তি দুর্বল করে দেওয়ার সক্রিয়ভাবে চেষ্টা শুরু করে। পাটনার ওয়াহাবি নেতৃদ্বয় বিলায়েত আলি এবং এনায়েত আলি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সামগ্রিক যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

(৩) ফরাজি আন্দোলন:

পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ফরাজি আন্দোলন এই সময় বাংলাদেশের কিছু অংশে, বিশেষত পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে দেখা দেয়। ফরিদপুরের আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন শরিয়ৎ উল্লা। ওয়াহাবি আন্দোলনের বাস্তব রূপ গ্রহণের বহু পূর্বেই ফরাজি আন্দোলন দেখা দিলেও ওয়াহাবি আন্দোলনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ছিল এবং পরবর্তীকালে এই দুটি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা একযোগে কাজ করে ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করে।

শরিয়ৎ উল্লা মুসলিম ধর্মের মধ্যে যেসব কুসংস্কার এবং দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করেছিল তা দূর করে পবিত্র ইসলাম ধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু তিনি একাজ করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তিনি ব্রিটিশ শাসিত ভারতকে দার-উল-হারব অর্থাৎ বিধর্মীদের দেশ বলে ঘোষণা করেন এবং বিধর্মীদের দেশে জুম্মা ও উৎসবের দিনের নামাজ পালন অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেন। ধার্মিক ও আদর্শ জীবন যাপনের জন্য শরিয়ৎ উল্লা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিতে পরিণত হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই জমিদারদের দ্বারা নির্যাতিত বিক্ষুব্ধ কৃষক ও কুটির শিল্পে ধ্বংসের ফলে জীবিকাচ্যুত শ্রমজীবীর অনেকেই তাঁর অনুরক্ত ভক্তে পরিণত হয়। তবে পার্থিব সুখসাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে নিরাসক্ত ও উদাসীন বাঙ্গালী কৃষকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করাই ছিল শরিয়ৎ উল্লার প্রধান কৃতিত্ব।

শরিয়ৎ উল্লার পুত্র মোহম্মদ মুসিন (১৮১৯-১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ) দুদু মিঞা নামেই বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার অপেক্ষা অনেক বেশি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার মতবাদ ছাড়াও নিজস্ব চিন্তাধারা প্রচারের জন্য একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। সাংগঠনিক কাজেও তিনি খুব দক্ষতার পরিচয় দেন। বাহাদুরপুরে প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে পূর্ববঙ্গকে তিনি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি বিভাগে একজন করে খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এইসব খলিফাদের কাজ ছিল ফরাজি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করা, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা এবং এই সংস্থার কার্যকলাপকে আরও বিস্তৃত করে তোলার জন্য নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করা। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের অত্যাচার এবং বেআইনী কর আদায় বন্ধ করার জন্য কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করা। তবে ফরাজিরা ইংরেজদের বিতাড়িত করে ভারতে মুসলিম শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট ছিল বলেও অনেকে মনে করেন। দুদু মিঞা ইসলাম সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত করার ভীতি প্রদর্শন করে কৃষকদের তাঁর দলভুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করার ব্যবস্থা করেন। বিচার ব্যবস্থাও ছিল খুব সরল এবং তাঁকে উপেক্ষা করে কোন হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীস্টান বিচারের জন্য মুন্সেফের আদালতে উপস্থিত হলে তিনি তাদের শাস্তি প্রদান করতেন। জমিদারদের বে-আইনীভাবে রাজস্ব ধার্য করার নীতির তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বরই সমস্ত জমির মালিক সুতরাং জমির উপর কর ধার্য করার ক্ষমতা কেউ ভোগ করে না। দুদু মিঞার প্রচারের ফলে সাধারণ কৃষকরা ধীরে ধীরে সৈয়দ আহমেদের মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শরিয়ৎ উল্লা ভারতকে দার-উল-হারব বা বিধর্মীদের দেশ বলে ঘোষণা করেলেও তাঁর জীবিত কালে তাঁর ভক্তদের সঙ্গে জমিদার ও ইংরেজদের সংঘর্ষ দেখা দেয় নি। কিন্তু দুদু মিঞার কার্যকলাপে শঙ্কিত হয়ে জমিদার ও নীলকরেরা তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে লুঠতরাজের অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হন; ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে হত্যার অপরাধে তাঁকে দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়; ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে তঁরে বিরুদ্ধে বিনানুমতিতে প্রবেশ এবং বে-আইনীভাবে লোক জমায়েতের অপরাধে মামলা করা হয় এবং ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে অপহরণ ও লুণ্ঠনের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু দুদু মিঞার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষী-সাবুদ সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে পড়ায় প্রতিবারই তিনি সকল অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত জমিদারদের পুনঃ পুনঃ অভিযোগের ফলে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর জেলে রাজবন্দী হিসাবে রাখা হয়। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাহাদুর পুরে মারা যান।

(৪) তিতুমীর:

দুদু মিঞার প্রায় সমকালীন বারাসতের নিকটবর্তী চাঁদপুরের নাসির আলি ওয়াহাবি

আন্দোলনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপন করতে শুরু করেন। নাসির আলি তিতুমীর বা তিতু মিঞা নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। সম্ভবত মক্কায় সৈয়দ আহমেদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তিনি ওয়াহাবি আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। সাধারণত নদীয়া ও যশোর জেলার তাঁতি এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে তিতুমীরের প্রভাব গভীরভাবে দেখা দেয়। কিন্তু তাঁর সংস্কার আন্দোলন হানাফি সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষক ও জমিদারদের মনে ভীতির সৃষ্টি করে এবং তারা এই আন্দোলনের বিরোধিতা শুরু করে। কিন্তু ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে পরিস্থিতির অকস্মাৎ অবনতি ঘটে। কৃষ্ণ রায় নামে জনৈক জমিদার ওয়াহাবি মতে বিশ্বাসী কৃষকদের উপর মাথা প্রতি আড়াই টাকা করে অতিরিক্ত কর ধার্য করেন এবং পুর্ণা নামক একটি গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে তা আদায়ও করেন। ফলে পার্শ্ববর্তী সরফরাজপুর গ্রামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয় এবং তিতুমীরের অনুগামীদের সঙ্গে জমিদারদের প্রকাশ্য সংঘর্ষ শুরু হয়। তিতুমীর ২৪ পরগণা জেলার নারিকেলবেড়িয়াতে এক বিরাট বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন এবং প্রায় পাঁচশ জন ওয়াহাবি সেখানে উপস্থিত হয়ে জেহাদ ঘোষণা করে। সশস্ত্র ওয়াহাবিরা পুর্ণা গ্রামে উপস্থিত হয়ে একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে হত্যা করে এবং দুটো গরুকে জবাই দিয়ে হিন্দুদের মন্দিরে গোরক্ত ছড়িয়ে দেয়। তারা দোকানপাট লুণ্ঠন করে এবং এই আন্দোলনে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক মুসলমানদের নানাভাবে উপহাস করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তারা হিন্দুদের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মের উপর প্রচণ্ড আঘাত করে। তারা ঘোষণা করে মুসলিমদের ক্ষমতাচ্যুতকারী ইংরেজদের শাসনের অবসান ঘটেছে। অন্যান্য গ্রামেও মোল্লা-মৌলবীদের নেতৃত্বে অনুরূপ লুঠ-তরাজ শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে ২৪ পরগণা, নদীয়া, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় তাদের অবাধ অত্যাচার অব্যাহত থাকে। বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য কলকাতা থেকে কর্নেল আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়। কিন্তু গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা ইংরেজ সৈন্যদের প্রচুর ক্ষতিসাধন ও পরাজিত করতে সমর্থ হয়। হুগলির বাণিজ্য কুঠির পরিচালক ইংরেজ কুঠিয়ালকে বন্দী করে বিদ্রোহীরা তাঁকে জিম্মিতে পরিণত করে এবং বিদ্রোহীদের স্বার্থে নীল চাষ করতে নির্দেশ দেয়। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও জমিদারদের তাদের প্রাধান্য স্বীকার করার জন্য নির্দেশ দেয় এবং তাদের যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র সরবরাহ করার আবেদন জানায়। নারিকেলবেড়িয়া থেকে বিদ্রোহীদের যাত্রা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার গোলন্দাজ সৈন্যসহ একটি সামরিক বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। বিদ্রোহীরা অসমসাহসিকতার সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তিতুমীর যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রধান সাহায্যকারী গোলাম রসুল তিনশ পঞ্চাশ জন অনুগামী-সহ বন্দী হয়। বিচারে গোলাম রসুলের ফাঁসি হয় এবং তাঁর একশ চল্লিশ জন সহচর বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগ করে।

(৫) উপসংহার :

তিতুমীর ও দুদু মিঞার আন্দোলন সাফল্যলাভ করে নি। কিন্তু তাঁদের আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে একটি স্থায়ী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। একদিকে ব্রিটিশ শাসক, অপরদিকে হিন্দু ভূস্বামীদের অত্যাচারে জর্জরিত মুসলমান কৃষকগণ উভয়ের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু শক্তিশালী ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সহজসাধ্য নয় বলে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশের মুসলমান কৃষক সমাজ সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তারা হিন্দু জমিদারদের শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ফলে ফরাজি আন্দোলন অর্থ নৈতিক কারণে ধর্মীয় আবরণের অন্তরালে প্রথম সূচিত হলেও পরবর্তীকালে তা রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করতে শুরু করে। বিদেশী শাসক ইংরেজদের পরিবর্তে দেশী শোষক হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ও অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিন্দু ধর্মের প্রতি বিষোদ্গার এবং হিন্দু জমিদারদের প্রতি অসন্তোষের ফলে তারা হিন্দু সমাজ থেকেও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগ গ্রহণ করেই পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়ে নিজেদের শাসন অধিকারকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের সময় বাংলাদেশের মুসলমানগণ প্রত্যক্ষভাবে কোন অংশগ্রহণ না করলেও তারা পুনরায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, ১৮১৮ থেকে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে আলোড়িত হয়। এই সব আন্দোলন গ্রামবাংলার মুসলমানদের এক নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তবে এই নতুন চিন্তার প্রকৃতি ছিল প্রধানত ধর্মীয়। অ-ইসলামী রীতি-নীতি পরিত্যাগ করে বাংলায় ইসলামের পবিত্রতা উদ্ধার করার জন্যই এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। কিন্তু এই ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি যুক্ত হওয়ার ফলে এই আন্দোলন সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতির একটি মিশ্র আন্দোলনে পরিণত হয়। কৃষির ক্ষেত্রে এই আন্দোলন জমিদার ও ইয়োরোপীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করে। ফরাজিরা জমিদার ও তালুকদারের দ্বারা কৃষকদের নিকট থেকে অতিরিক্ত ও বেআইনী কর আদায় করার চেষ্টাতেও বাধা দেয়। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে : "জমির মালিক ঈশ্বর। তিনিই তা জনসাধারণকে দান করেন। সুতরাং জমির উপর কর ধার্য করা বে-আইনী। জমি তাদেরই যারা জমি চাষ করে।" ফরাজিরা কৃষকদের এ কথাও বলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যখন জমির উপর থেকে সমস্ত রকম খাজনা আদায়ই বন্ধ হবে। এই ভাবে ফরাজিরা জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে। কিন্তু যে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে ইংরেজ শক্তি বাংলাদেশে প্রাধান্য স্থাপন করতে সক্ষম হয় তার কোন যথার্থ বিশ্লেষণ ফরাজিরা এবং ওয়াহাবি নেতৃবৃন্দ করতে পারেন নি। এই জন্য এই

আন্দোলনকে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ বলা গেলেও কোন সমাধানের উপায় বলা চলে না। তবুও এ কথা অনস্বীকার্য যে ওয়াহাবি ফরাজি তত্ত্বেই জমির উপর কৃষকের মালিকানার প্রশ্নটি মূর্ত হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালের 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই আন্দোলনের মধ্যে তার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়।

Q. 10. Briefly review the development of the new ideas in Muslim society of Bengal in the nineteenth century.

Ans. (১) ভূমিকা :

১৮১৮ থেকে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে আলোড়িত হয়। এই আন্দোলনসমূহ গ্রামবাংলায় মুসলমানদের এক নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। এই আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল প্রধানত ধর্মীয়—কারণ অ-ইসলামী রীতিনীতি পরিত্যাগ করে বাংলার ইসলামকে বিশুদ্ধ করাই ছিল এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। তবে এই আন্দোলন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের অপেক্ষা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রধান সংগঠক সৈয়দ আহমেদের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক পিটার হার্ডি বলেন যে, 'His message appealed not to the higher but to the humbler strata of Muslim society in India, to the "lower-middle classes of pre-industrial society, to petty land holders, country town *mullahs*, to teachers, book-sellers, shop-keeper, minor officials and skilled artisans." বাংলাদেশের ফরাজি আন্দোলনের প্রকৃতিগত ভাবে ওয়াহাবি আন্দোলনের সঙ্গে কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। বাংলাদেশেও কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরাই তুতু মিঞা ও তিতুমীরের প্রধান সমর্থকে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত ফরাজি আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা যুক্ত করে একটি মিশ্র অন্দোলনের রূপ গ্রহণ করলেও তা অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের নিকট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি।

(২) নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব :

তা ছাড়া, এই সব ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের আন্দোলনসমূহ ব্রিটিশ বিরোধী চরিত্র অর্জন করলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সেগুলোর প্রভাব মুসলিম সমাজে হ্রাস পাওয়ার বিশেষ কয়েকটি কারণ দেখা যায়। ইতিমধ্যে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করে মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করা ও তাদের উন্নতি সাধন করা অসম্ভব। সেজন্য নবাব আমির আলি খান বাহাদুর (১৮০৭-১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দ) আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ) এবং সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ) বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের এই তিন নেতা ব্রিটিশ শাসনের কাঠামোর মধ্যে শিক্ষা-সংস্কারের মাধ্যমে মুসলমান সমাজের উন্নতি ও শক্তি

বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা শুরু করেন। তাঁরা এই বিষয়টির প্রতি শিক্ষিত মুসলমান সমাজের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে আবদুল লতিফ কর্তৃক ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার আঞ্জুমান-ই-ইসলামি, ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে নবাব আমির আলি প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েশন, ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে আবদুল লতিফের প্রতিষ্ঠিত মহমেডান লিটারেরি সোসাইটি অফ ক্যালকাটা, ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ আমির আলি প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল মহমেডান এ্যাসোসিয়েশন অফ ক্যালকাটা প্রভৃতি উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। এই সব প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা। এই যুগের বাঙ্গালী মুসলিম লেখকরা খুব তিক্ততার সঙ্গে বারবার অভিযোগ করেন যে অলস প্রকৃতির মুসলমান জমিদাররা সবসময়ই জমিদারী পরিচালনার জন্য হিন্দু কর্মচারীদের উপর নির্ভর করে থাকেন। ফলে মুসলিম জমিদারদের বেশি সংখ্যকই আর্থিক অনটন দূর করতে অসমর্থ। তা ছাড়া, ইচ্ছা করলে হিন্দু কর্মচারীরা এই সব জমিদারদের তাদের জমিদারী থেকে বঞ্চিত করতে পারে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, এই সব বুদ্ধিজীবি লেখকগণ জমিদারদের দুর্দশা দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেও মুসলমান কৃষকদের দুর্গতি ও চরম দারিদ্র্যের মূল কারণ ইংরেজ শাসকদের কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিন্দুমাত্র সমালোচনা করেন নি। অপরদিকে মুসলিম কৃষকদের অবস্থার উন্নতি সাধনের কোন উপায় সম্পর্কেও তাঁরা আলোচনা করেন নি।

(৩) বুদ্ধিজীবিদের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। কয়েকজন মুসলমান বুদ্ধিজীবি দ্বিধাহীন ভাবে কৃষকদের উপর জমিদারদের নিপীড়ণের প্রতিবাদ করেন। বিখ্যাত লেখক মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি 'জমিদার দর্পণ' নাটকে কৃষকদের উপরে জমিদারদের অত্যাচারের চিত্র অঙ্কিত করেন। ১৮৭২-১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের পাবনার কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকায় তিনি এই নাটক রচনা করেন। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে এই নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সন্দেহাতীত ভাবে মীর মশাররফ হোসেন প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং নিপীড়িত জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। কিন্তু লেখক নিজে ছিলেন জমিদার বংশের সন্তান, সুতরাং শ্রেণী সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতার উর্দ্ধে স্থান গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। নিপীড়িত জনগণের প্রতি তাঁর গভীর সমবেদনা নাটকের প্রতিছত্রে প্রকাশ পেলেও কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভ এবং ব্রিটিশ শাসন ও ইংরেজদের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধার মনোভাব তিনি কখনও গোপন করতে পারেন নি। তাঁর চরিত্রের এই পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারার প্রতিফলনের ফলে জমিদার দর্পণ নাটকের চিরন্তন আবেদন অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়।

মুসলিম সমাজের আর একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন সৈয়দ আমির আলি। তিনি কোনক্রমেই ব্রিটিশদের প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু তিনি কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করেন। তবে সে ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ কোন অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করেন নি। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই তাঁর ধর্মের অনুসরণকারী বলে তিনি বাংলার কৃষকদের পক্ষ গ্রহণ করেন। তাঁর এই ধর্মীয় মনোভাব বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের টেনান্সি বিল সংক্রান্ত বিতর্কের সময়। গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে এই সময় তিনি এই বিষয়ে একটি বিবৃতি দেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের হিন্দু জমিদারগণ। কিন্তু তিনি মুসলমান জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে একটি কথাও উল্লেখ করেন নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সৈয়দ আমির আলি বাংলাদেশের ভূমি সমস্যা বিশ্লেষণ করেন কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণ ছিল ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আচ্ছন্ন। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের কৃষকদের সমস্যা আলোচনা করার নীতি তিনি গ্রহণ করেন নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলি প্রতিষ্ঠিত মহমেডান লিটারেরি সোসাইটি এবং ন্যাশনাল মহমেডান এ্যাসোসিয়েশন-এর বহু শাখা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে, এমন কি গ্রামাঞ্চলেও, স্থাপিত হয়। এইসব শাখার মধ্যে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ঢাকায় মহমেডান ফ্রেণ্ডস এ্যাসোসিয়েশন, ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মহমেডান ইউনিয়ন, ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে মালদায় প্রতিষ্ঠিত মালদা মহমেডান অ্যাসো-সিয়েশন. ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে পাবনায় প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব সংস্থা ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কারের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আবদুল লতিফ এবং সৈয়দ আমির আলি উভয়ই ছিলেন ব্রিটিশ শাসনের পক্ষপাতী এবং জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আবদুল লতিফের মৃত্যুর পর সৈয়দ আমির আলির প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা সুদূর লক্ষ্ণৌ, লাহোর, করাচি প্রভৃতি স্থানে স্থাপিত হয়। আবদুল লতিফ এবং আমির আলির অনুগামীরা তাঁদের মত ও পথই অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। পরে দিলওয়ার হোসেন আহমেদ মির্জা (১৮৪০-১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ) আমির আলি প্রতিষ্ঠিত সংস্থার সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। দিলওয়ার হোসেন ইংরেজিতে অনেক প্রবন্ধ রচনা করে মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করলেও ভূমি ও কৃষক সমস্যার উপর তিনি কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। সবম্ভবতঃ ব্রিটিশ শাসকদের প্রবর্তিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা আলোচনা করে তিনি সরকারের বিরাগভাজন হওয়া পছন্দ করেন নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন পণ্ডিত রেয়াজ-উদ্-দিন আহমদ মাশহাদি (১৮১৯-১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ) তিনি ব্রিটিশ শাসন বিরোধী ছিলেন কিন্তু তাঁর রচানায় সাধারণ মুসলমান ও কৃষক সমাজের কথা খুব সামান্যই স্থান পায়।

(৪) উপসংহার :

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে মনে করা যায় যে, বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের মতোই তাঁরাও প্রধানত শিক্ষা সংস্কার ও জমিদারীতে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানদের বিকাশ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমান-দের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করাই ছিল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং নিম্নশ্রেণীর মুসলমান কৃষকদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাবের প্রকাশ দেখা দিলেও তার গভীরতা নিঃসন্দেহে খুব কম ছিল। ফলে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানদের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক স্বার্থ স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। গরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলমান কৃষক সংখ্যালঘু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই শিক্ষিত, বিত্তশালী, রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সলমানগণ অবহেলিত বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শুরু করেন।

Q. 11. What role did the British Government play to quell the Wahabi Movement and to sow the seeds of seperatism between the Hindus and the Muslims ?

Ans. (১) ভূমিকা :

ওয়াহাবি আন্দোলন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকারকে কয়েকটি অর্থ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে ওয়াহাবিরা সাফল্যের সঙ্গে কয়েকটি নাশকতা-মূলক ষড়যন্ত্র সংগঠন করতে সমর্থ হয় এবং ব্রিটিশ সরকার প্রতিবারই ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয় এবং আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা রুজু করে সন্দেহ-জনক ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য মামলা করা হয় এবং বহু সংখ্যক মুসলমানকে প্রাণদণ্ড, দ্বীপান্তর, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রভৃতি শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই অপরাধী বলে সাব্যস্ত ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড মকুব হয় এবং তার পরিবর্তে তাদের দ্বীপান্ত-রিত করার ব্যবস্থা করা হয়। ব্রিটিশ সরকার প্রকৃতপক্ষে প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে দ্বীপান্তর করার ব্যবস্থা নীতিগতভাবে স্থির করে। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে ওয়াহাবিদের বিচারের সময় মুসলিম জনমত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং বাংলাদেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জন প্যাক্সটন নরম্যান তাঁর আদালতের চৌহদ্দির মধ্যেই একজন মুসলিমের ছুরি-কাঘাতে নিহত হন। ওয়াহাবিদের প্রতি তিনি কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করতেন বলেই তাঁর বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দেই ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো আন্দামান পরিদর্শনের সময় শের আলি নামক জনৈক ওয়াহাবি রাজবন্দীর দ্বারা নৃশংসভাবে নিহত হন।

(২) লর্ড মেয়োর নীতি :

ওয়াহাবি রাজবন্দী শের আলির হস্তে লর্ড মেয়ো নিহত হলেও তিনি মৃত্যুর পূর্বেই এই আন্দোলন ধ্বংস করার চাতুর্যপূর্ণ কৌশল সাফল্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে সমর্থ হন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে অনবরত চেষ্টা করেও ওয়াহাবিরা ব্রিটিশ অধিকৃত দার-উল-হারব (বিধর্মীদের দেশ) ভারতকে দার-উল-ইসলাম (বিশ্বাসীদের দেশ)-এ পরিণত করতে না পারলেও তাদের অবিচল বিশ্বাস বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয় নি এবং তাদের অনুগামীদের মধ্যেও হতাশার সৃষ্টি হয় নি। তা ছাড়া, সৈন্য ও অস্ত্রবলে ব্রিটিশ সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বিদ্রোহীদের প্রকাশ্য সংঘর্ষে পরাজিত ও দমন করতে সমর্থ হলেও স্থানীয় অধিবাসীরা ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে নি, এমন কি, তাদের বিক্ষোভ শান্ত করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার এইরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সশস্ত্র সংঘর্ষের পথ পরিত্যাগ করে কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হয়। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ যদি অনবরত প্রচার করেন যে, ব্রিটিশ অধিকৃত ভারত দার-উল-হারবের নমান্তর মাত্র তাহলে ধর্মভীরু মুসলমানগণ বিধর্মীদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা তাদের পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচনা করবে। সুতরাং লর্ড মেয়ো স্থির করেন যে, একদল মুসলিম শাস্ত্রবিদ ব্রিটিশ ভারতকে দার-উল-হারব বলে অভিহিত করলেও ভেদ নীতি প্রয়োগ করে তিনি অপর একদল মুসলিম শাস্ত্রবিদ্ সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন, যাঁরা ব্রিটিশ শাসনকে দার-উল-ইসলাম রূপে বর্ণনা করে এই শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করাকে অন্যায় বলে ঘোষণা করবেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছানুসারেই ব্রিটিশ ভারত দার-উল-হারব অথবা দার-উল-ইসলাম এই সম্পর্কে ভারতের সর্বত্র আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু প্রকাশ্যে কোন মুসলিম শাস্ত্রবিদ্ই ব্রিটিশ ভারতকে দার-উল-হারব রূপে আখ্যা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ তা হলে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী রূপে চিহ্নিত হবেন এবং পরিণামে তাঁর কারাবাস বা অন্য কোন শাস্তি অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দিবে। ফলে গোঁড়া মুসলিম পণ্ডিতরাও ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ ভারতের প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াহাবিদের ব্যাখ্যা ভ্রান্ত এবং তাঁরা নতুন করে ব্রিটিশ ভারতের প্রকৃতি নির্ণয় করতে শুরু করেন। এমন কি, এই সম্পর্কে মক্কার কয়েকজন বিখ্যাত মুফতির কাছ থেকেও সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করা হয়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানান যে, "যতদিন পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নীতি পালনে বাধার সৃষ্টি করা হয় না ততদিন পর্যন্ত সেই রাষ্ট্র বা শাসনব্যবস্থাকে দার-উল-হারব বলা যুক্তিযুক্ত নয়।" উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানের মুসলিম শাস্ত্রবিদ্দের সঙ্গে ভাগলপুর বিভাগের কমিশনারের ব্যক্তিগত সচিব সাক্ষাৎ করে তাঁদের কাছ থেকে এই সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বলেন যে, ভারতে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা খ্রীস্টানদের দ্বারা কোনভাবেই নষ্ট হয় নি। সুতরাং যে দেশে মুসলিমরা নিরাপদে বসবাস ও ধর্মাচরণ করতে পারে তাকে কখনই দার-উল-হারব বলা উচিত নয়। ইতিমধ্যে শিক্ষিত

মুসলিমদের মনোভাবের পরিবর্তনের অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নীতি গ্রহণের প্রাক্কালেই ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে নবাব্ আবদুল লতিফ কলকাতায় মহমেডান লিটারেরি সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ব্যক্তি-গত ভাবেও তিনি ওয়হাবি আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। নবাব আবদুল লতিফের প্রতিষ্ঠিত সংস্থা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সমর্থক ছিল এবং সরকারের স্বার্থ বিবেচনা করে ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার নীতি গ্রহণ করে।

(৩) দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন:

স্যার সৈয়দ আহমেদও ব্রিটিশ ভারতের প্রকৃতি নির্ণয়ের আলোচনা অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল 'প.ইওনীয়ার' পত্রিকায় তাঁর একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকে অন্যায় বলে বর্ণনা করেন। "Mohammedans, be they dwellers in Darul-Harb or Darul Islam, are prohibitted from rebellion against a Government which interferes in no way with the free worship of their religion." এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভাইসরয় লর্ড মেয়ো তাঁর ওয়াহাবি আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার নীতি গ্রহণ করার পূর্বেই স্যার সৈয়দ আহমেদের মতো মুসলিম সমাজের লব্ধ প্রতিষ্ঠ অনেক ব্যক্তিই ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত ছিলেন। তাঁরা মুসলিম জনগণকে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা শুরু করেন। যে সব মুসলিম নেতৃবর্গ ব্যক্তিগত জীবনের বিপদ উপেক্ষা এবং মুসলিম শাস্ত্রবিদদের দ্বারা নিন্দিত হওয়ার আশঙ্কা স্বেচ্ছায় অবহেলা করে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সরকারকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করেন এবং ওয়াহাবি আন্দোলনের সময়ও এই সাহায্য অব্যাহত রাখেন, স্যার সৈয়দ আহমেদ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বহু মুসলমান স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই সময় ব্রিটিশ সরকারের সৈন্য বিভাগে যোগদান করে এবং সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি অব্যাহত রাখার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়। তাদের মধ্যে অনেকে আবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহের সময় হিন্দুদের মতো অনেক মুসলমানও ইংরেজদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয় এবং অনেকে গুপ্তচর হিসাবেও কাজ করে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী এবং ঐতিহাসিকগণ এই বিদ্রোহের জন্য মূলত মুসলিম সমাজকে দায়ী সাব্যস্ত করে—কারণ তাঁদের ধারণা হয় যে, বিদ্রোহের মাধ্যমে ইংরেজদের শাসন উচ্ছেদ করা সম্ভব হলে শিখ ও মারাঠাদের পরিবর্তে মুসলিম-গণই ভারত শাসনের অধিকার পুনরায় লাভ করতে সমর্থ হত। বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতবাসীদের সৌহার্দ্য অর্জন করার প্রচেষ্টা এবং সরকারী চাকরীর ব্যাপারে সকল ভারতবাসীর জন্য অবাধ ও সমদর্শিতার নীতি সম্পর্কে মহারানীর ঘোষণা সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিবর্তন সাধন করতে সমর্থ হলেও ওয়াহাবি আন্দোলনের জন্য ব্রিটিশ সরকার মুসলিমদের সম্পর্কে কঠোর নীতি গ্রহণ করতে

বাধা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। সুতরাং বাংলাদেশের মুসলিমদের সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভেদ নীতি অনুসরণ করার পাক্ষপাতী ছিল। সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র রূপে উত্তর প্রদেশ পরিগণিত হলেও সেখানে ওয়াহাবিদের আধিপত্য খুবই সীমিত ছিল এবং সেখানকার মুসলমানরা সরকারী চাকরীতে উল্লেখযোগ্য ভাবে যোগ দেওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ মুসলমানই ছিল ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে সন্দেহজনক বাক্তি অথবা ওয়াহাবি সম্প্রদায়ভুক্ত বিদ্রোহী, সুতরাং তাদের পক্ষে সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

(৩) বাংলাদেশের অবস্থা :

বাংলাদেশের মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায় এতদিন পর্যন্ত ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন অথবা নিরাসক্ত নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী ওয়াহাবি আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা কঠোরভাবে দমিত হওয়ার পর তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, এই আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে তাঁদের ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ সরকারও তাঁদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। এবং বিদেশী সরকার কোনক্রমেই তাঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে সম্মত নয়। বিশেষত অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন দেখেও তাঁরা বিব্রত হয়ে পড়েন কারণ ইতিমধ্যে হিন্দুরা সরকারী চাকরী প্রায় একচেটিয়াভাবে অধিকার করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ থেকে উত্তর প্রদেশের দূরত্ব কম নয় এবং সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে বাংলাদেশের মুসলমানদের কোন প্রত্যক্ষ ধারণা ছিল না। উত্তর প্রদেশে হিন্দুদের পরিবর্তে ফার্সি ও উর্দুতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানগণ ইংরেজি ভাষা না জানলেও বিচার বিভাগে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেতে শুরু করেন। সরকারীভাবে বাংলাদেশ সম্পর্কে উত্তর প্রদেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নীতি গ্রহণের দুটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরাজি গৃহীত হওয়ার পরে ফার্সি ভাষার পঠন-পাঠন বাংলাদেশে প্রায় বন্ধ হয়ে যায় বললেই চলে। দ্বিতীয়ত, ওয়াহাবি আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বিদ্বেষ। এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পর বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমান সমাজের মধ্যে যুগপৎ অনুতাপ ও ক্ষোভ দেখা দেয়। মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে এই সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। এই সব আলোচনার একদিকে অধিক সংখ্যক সরকারী চাকরী প্রাপ্তির জন্য হিন্দুদের প্রতি তাদের ঈর্ষা এবং অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্য-মূলক নীতির বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভের কথা প্রকাশ্যভাবে স্থান লাভ করে।

১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই কলকাতার ফার্সি পত্রিকা দূরবীণে মুসলিম মনোভাব এইভাবে প্রকাশিত হয়, **"All sorts of employment, great and small, are being gradually snatched away from the Mohemmedans, and bestowed on men of other races, particularly the Hindus. The**

Government is bound to look upon all classes of its subjects with an equal eye, yet the time has now come when it publicly singles out the Mohemmedans in its Gezettes for exclusion from official posts." Recently when several vacancies ocurred in the office of the Sundarbanas Commissioner, that official, in advertising them in the Government gezette, stated that the appointments would be given to none but Hindus. In short, the Mohemmedans have not sunk so low, that even when qualified for Government employment, they are sedtiously kept out of it by Government notification. Nobody takes any notice of their helpless condition, and the higher authorities do not design even to acknowledge their existence." এই আলোচনা থেকে ব্রিটিশ সরকারের মুসলমানদের প্রতি গৃহীত নীতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

মুসলমানদের তৎকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে পূর্ববর্তীকালের অবস্থার তুলনা করেও অনেকে ব্রিটিশ সরকারের বিভেদ নীতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেন। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমান এককভাবে হিন্দু ও খ্রীস্টানদের সমসংখ্যক সরকারী পদ অধিকার করার সুযোগ পেত। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইংরেজি সরকারী ভাষারূপে গৃহীত হওয়ার পরও ইংরেজি ভাষায় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের অভাবের জন্যই অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি এবং মুসলমানগণ তাদের অধিকার বজায় রাখতে সমর্থ হন। আইন আদালতই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রায় একচেটিয়া কেন্দ্র। কিন্তু ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৮৫২ থেকে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নতুন ২৪০ জন আইনজীবি আদালতে যোগ দেন। তার মধ্যে ২৩৯ জনই ছিলেন হিন্দু এবং মাত্র একজন মুসলমান। সরকারী দপ্তরগুলোতে কদাচিৎ কোন মুসলমান কর্মচারী দেখা যেত।

তবে এরূপ অবস্থার জন্য মুসলমান সমাজেরও দায়িত্ব কম ছিল না। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাদের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবই সরকারী চাকরী ও নতুন নতুন পেশা থেকে তাদের বঞ্চিত করে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিও তাদের কোন আগ্রহ ছিলনা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন কলেজেই একটিও মুসলমান ছাত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেই বছরে দেখা যায় যে লাইসেন্স প্রাপ্ত ১০৪ জন চিকিৎসকের মধ্যে ৯৮ জন হিন্দু, ৫ জন খ্রীস্টান এবং ১ জন মাত্র মুসলমান। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে সে বছরে চারজন উপাধি প্রাপ্ত চিকিৎসকের মধ্যে ৩ জন হিন্দু ও একজন মুসলমান। লর্ড মেয়ো কর্তৃক মুসলমানদের সম্পর্কে বিভেদ নীতি গ্রহণ না করার ঘোষনা প্রকাশের পরও বহু বছর পর্যন্ত সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে মুসলমানগণ ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে শুরু করেন। শিক্ষাদীক্ষার

ব্যাপারেও তারা ক্রমেই অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েন। এমন কি ওয়াহাবি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর এবং ব্রিটিশ-সমর্থক মুসলমান নেতৃবর্গ কর্তৃক বারবার তাঁদের সমধর্মীদের প্রতি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আবেদন করা সত্ত্বেও গোঁড়া মৌলবীগণ সাধারণ মুসলমানদের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ ছিলেন। তাঁরা ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তে শরিয়তী আইন ও কাজীর বিচার ব্যবস্থা, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিবর্তে সনাতন তাবিজ, হাকিম ও জারাহ্ ব্যবস্থা; ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র; কোরাণকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা; ইংরেজির পরিবর্তে ফার্সি ভাষার পুনঃ প্রবর্তন; পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিবর্তে ধর্মশাস্ত্রকেন্দ্রিক পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলনের জন্য সংগঠিতভাবে প্রচার শুরু করেন। উদারপন্থী মুসলমানগণ অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেও মুসলিম সমাজের উপর থেকে প্রাচীন পন্থী মৌলবীদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে পারেননি।

(৫) হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া:

প্রকৃতপক্ষে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ছশ বছর মুসলিম শাসনের অধীনে থাকার ফলে হিন্দুরা আশ্চর্যজনকভাবে যে কোন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করার যোগ্যতা অর্জন করেন। মুসলিম শাসনকালে তাঁরা শুধুমাত্র উর্দু ও ফার্সি অধিগত করেননি, এই দুটি ভাষায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্যও অর্জন করেন। মুসলিমদের শাসনকালে রাজস্ব বিভাগের উপর হিন্দুদের প্রভাবই বজায় ছিল এবং তাঁরা শাসকদের ভাষা শিক্ষা করে চাকরীতে উন্নতি করার চেষ্টা শুরু করেন। উর্দু বা ফার্সি ভাষা শিক্ষা করার সময় স্বধর্ম বিরোধী কোন কাজ তাঁরা লিপ্ত হয়ে পড়েছেন এরূপ চিন্তাধারা কখনও তাঁদের মনে স্থান পায়নি। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌গণও তাঁদের মুসলিমদের ভাষা শিক্ষার বা তাঁদের অধীনে চাকরীর উপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বদেশে বা বিদেশে, আক্রমণ, বিজেতা বা শাসক যাই হোন না কেন মুসলমানগণ কখনও তাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রা পরিবর্তনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনকালে যখন এইরূপ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে ভারতীয় মৌলবীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সর্বপ্রথম প্রয়োজন বলে অনুভূত হতে শুরু করে।

(৬) উপসংহার:

ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা থেকে শুরু করে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতের মুসলিম সমাজের মধ্যে কয়েকটি ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের ফলে হিন্দুদের সম্পর্কে মুসলমানগণ ঈর্ষা পোষণ করতে শুরু করেন এবং হিন্দুদের পক্ষে মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার অসম্ভব হয়ে ওঠে। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমানের মধ্যে কোন বিরোধ ও ঈর্ষা ছিলনা। এই বিরোধ ও ঈর্ষা উভয় ধর্মাবলম্বীদের অভিজাত সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যারা জীবিকার জন্য সরকারের দয়া দাক্ষিণ্য ও সরকারী চাকরীর উপর নির্ভর করত। কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে এই স্বল্প সংখ্যক অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সর্বভারতীয় রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এই সময় থেকে সরকারী চাকরী ও আইনসভায় আসন বণ্টনে মুসলিমদের ন্যায্য অংশের পরিমানের দাবি নিয়েই হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবর্গের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়, ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে দেশ-বিভাগের মধ্যে তার প্রকৃত পরিসমাপ্তি ঘটে।

Q. 12. Trace the development of Muslim political ideas and organisations prior to 1885.

Ans. (১) ভূমিকা :

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, "ভারতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রবর্তিত হলে সবচেয়ে বিশিষ্ট ফল উদ্ভূত হয়েছিল—আধুনিক রাজনৈতিক ধারণাগুলির জন্ম। এগুলির মধ্যে পড়ে—জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তা, স্বদেশপ্রেম, রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি। আধুনিক যুগে পশ্চিমীদেশে এই ধারণাগুলি সাধারণতঃ প্রচলিত আছে।" পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আত্মভূত করার ব্যাপারে বাংলাদেশই উদ্যম দেখিয়েছিল, তাই ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে রাজনৈতিক অধিকার দাবী করার বিষয়ে সে অগ্রণী হবে এটাই স্বাভাবিক। রামমোহন রায় ও ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে মুক্তির নব আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বাংলাদেশে দুটি রাজনৈতিক সংঘ ছিল। এদের একটি 'ল্যাণ্ড হোল্ডার সোসাইটি', অপরটি 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'। ১৮৫১ সালে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' প্রতিষ্ঠিত হয়—শুরু থেকেই এর ছিল সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী। শেষের এই প্রতিষ্ঠানটি অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা গঠিত হলেও এবং এর দৃষ্টিভঙ্গী সংরক্ষণশীল হলেও এর দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা গৃহীত হয়েছিল। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন'-এর একটি শাখারূপে 'মাদ্রাজ ন্যাশনাল এসোসিয়েসনে'র শুরু। ১৮৫২ সালে স্থাপিত হয় 'বম্বে এসোসিয়েসন'।

(২) বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারণা ও সংগঠন ১৮৫৮-৮৫ :

উনবিং শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতীয়দের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা শাসন-সংস্কার ও নিজেদের জন্য উন্নতমানের কর্মসংস্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তা সম্প্রসারিত হয়ে রাজনৈতিক সংস্কারে পৌঁছেছিল। অর্থাৎ ভারতীয়েরা চেয়েছিল জাতির পরিষৎগুলিতে (কাউন্সিল) তাদের মতাদি প্রকাশের অধিকার। এই থেকেই প্রকৃতপক্ষে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

১৮৬৭ সালে ডব্লু. সি. ব্যানার্জি, যিনি ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন—ভারতে একটি প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত এ্যাসেম্ব্লী ও একটি সিনেট স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ১৮৭৩ সালে আনন্দমোহন বসু, যিনি ভবিষ্যৎকালের কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি ছিলেন—ভারতে ক্রমশঃ প্রতিনিধিমূলক সরকার প্রবর্তনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন—১৮৭৪ সালে কৃষ্ণদাস পাল বলেছিলেন ভারতে 'হোম রুল' প্রবর্তনের কথা।

১৮৭৫ সালে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে একটি নতুন সভা স্থাপিত হয়। যার স্থান দখল করে নেয় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' ১৮৭৬ সালে। এর নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তিনি এটিকে সর্বভারতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বাংলাদেশে যে সব ভারতীয় নেতা আছেন তাঁদের মনে সংযুক্ত ভারতের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে স্থান অধিকার রয়েছে।"

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই লণ্ডন-এ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রতিযোগীদের বয়ঃসীমা ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৯ বছর করার বিষয়টি কর্মসূচীতে গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় প্রার্থীদের পক্ষে এই বয়ঃসীমার ব্যাপারটি বাধাস্বরূপ ছিল, সে দিক দিয়ে এটি ছিল একটি জাতীয় প্রশ্ন। দুটি দাবী উপস্থাপিত হয়েছিল—বয়ঃসীমাকে বাড়িয়ে ২২ বছর করতে হবে আর লণ্ডনে পরীক্ষা গ্রহণের সময় ভারতেও এক বা একাধিক কেন্দ্রে পরীক্ষাগ্রহণ করতে হবে। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হলেন। তাঁর কাজ ছিল—"সকলকে একই দুর্দশার চেতনার মাধ্যমে আর একই সংকল্প গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করা।" ১৮৭৭ ও ৭৮ সালে তিনি উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন আর তাঁর প্রাণোদ্দীপক বক্তৃতা দিয়ে 'ভারত-চেতনা' জাগিয়ে তুলেছিলেন যে চেতনা ছিল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও প্রদেশের যোগফলের অনেক উর্ধ্বে।" এইভাবেই পরস্পরের সহযোগিতায় পরিকল্পিত রাজনৈতিক কর্মশক্তির উত্থান হয়েছিল। হেনরী কটন কর্তৃক লিখিত হল—"পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বাঙালীবাবুরা এখন জনমত নিয়ন্ত্রণ করেছে, বৃদ্ধিশীল (বাড়ন্ত) ছেলেমেয়েরা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নামে আগ্রহে-উদ্যমে ভরে উঠছে এটা যেমন ঘটছে মুলতানে তেমনি ঘটছে ঢাকায়।"

১৮৭৮ সালে লর্ড লিটনের 'ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট'—'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনকে' একেবারে পুরোভাগে নিয়ে এল। তারপরে দেখা দিল সরকারের আরও কতকগুলি জঘন্য ব্যবস্থা গ্রহণ—যেমন 'আর্মস এ্যাক্ট', 'লাইসেন্স এ্যাক্ট'। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন এই আইনগুলির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলল। 'ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্টের বিরুদ্ধে আবেদন পত্র গ্ল্যাডস্টোনের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি গ্ল্যাডস্টোনের দ্বারা হাউস অফ কমন্সে উপস্থাপিত হয়েছিল।

১৮৭৯ সালে লালমোহন ঘোষ ইংলণ্ডে প্রেরিত হলেন। তাঁর কাজ ছিল—'সিভিল সার্ভিস' প্রসঙ্গে পার্লামেণ্টে প্রেরিত স্মারকলিপি সম্বন্ধে ব্রিটিশ জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলা। এর ফলে প্রবর্তিত হল 'স্ট্যাটিউটরি সিভিল সার্ভিস'।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান আরও কতকগুলি বিষয়ের উপর জনসাধারণের মনঃসংযোগ ঘটিয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল আফগান যুদ্ধের ব্যয় ও ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থে তুলাজাত দ্রব্যের উপর আমদানী-শুল্ক হ্রাস।

শাসন-সংক্রান্ত বিষয়গুলি ছাড়াও—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রবর্তনের বিষয়েও উৎসাহী হয়েছিল। ১৮৮০ সালে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। প্রতিনিধিমূলক সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে পেরে—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন এই দাবী নিয়ে বিক্ষোভ সৃষ্টি করল যে লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যান ও সভ্যদের মনোনীত না করে নির্বাচিত করতে হবে। ইলবার্ট বিলের সম্পর্কে বিক্ষোভে এসোসিয়েসন একটি প্রধান অংশ নিয়েছিল। জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা এর দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল।

১৮৮৩ সালে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' নামে একটি সর্ব-ভারতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের উদ্দেশ্যগুলি যথার্থই জাতীয় ছিল—শ্রেণীগত বা অঞ্চলগত ছিল না। সকলের জন্য রাজনৈতিক কার্য-কলাপের একই কর্মসূচী এই অধিবেশন নির্ণয় করতে চেয়েছিল। ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৮৮৫ সালে। প্রথম বারের চেয়ে এইবারে এই অধিবেশন বেশী প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল। এইবারের অধিবেশনের আহ্বায়ক ছিল—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ও সেণ্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েসন। যে বিষয়গুলি অলোচিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল—লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের পুনর্গঠন, সিভিল সার্ভিস, বিচার-বিভাগীয় ও শাসনমূলক ক্রিয়াকলাপের পৃথকীকরণ, আর্মস এ্যাক্ট বাতিল প্রভৃতি।

'ন্যাশনাল কনফারেন্স'এর দ্বিতীয় অধিবেশন যখন কলকাতাতে হচ্ছিল ভারতের কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হচ্ছিল তখন বোম্বাইতে। দুটি সংগঠনই একই ধরনের বিষয় আলোচনা করেছিল—একই দুর্দশার কথা ও আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত করেছিল।

(৩) বোম্বাই ও মাদ্রাজে রাজনৈতিক ধারণা ও সংগঠন, ১৮৫৮-৮৫ :

বোম্বাইতে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা ছিলেন—কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলং, ফিরোজশাহ মেহতা ও বদরুদ্দিন ত্যাবজি। আর মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের দৃষ্টি ছিল সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলির দিকে।

পুরানো 'বম্বে এসোসিয়েসন' কার্যতঃ উঠে গিয়েছিল। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বম্বে প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েসন'—কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এও চাপা পড়ে যায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তির ফলে।

'পুণা সার্বজনিক সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ সালে। এটাই ছিল মহারাষ্ট্রবাসীদের বহু-পরিচিত রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের মাধ্যম।

১৮৮৪ সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মহাজন সভা'। সাধারণ বিষয়গুলির দিকেই এর আগ্রহ বেশি ছিল যেমন,—লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের পুনর্গঠন, বিচার-বিভাগীয় কাজে ও রাজস্ব বিভাগের কাজের পৃথকীকরণ প্রভৃতি।

(৪) মধ্যবিত্তের প্রভাব বা কর্তৃত্ব ঃ

অনেকেরই মত যে ১৮৮৫-সালের পূর্ববর্তী কালের রাজনৈতিক সংগঠনগুলি মধ্যবিত্তদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। এই সংগঠনগুলি উচ্চতর শ্রেণী ও মধ্যবিত্তদেরই সুযোগ-সুবিধার কথা দাবি ও বিবেচনা করত। এ কথা বহুলাংশেই সত্য। আগেই বলা হয়েছে, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' অভিজাতদের নিয়েই গঠিত ছিল—কার্যকলাপের দিক দিয়েও ছিল সংরক্ষণশীল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে—'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' মধ্যবিত্তদের জনহিতকর চেতনাকে প্রকাশ করেছিল আর বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান প্রতিনিধিদের কাছে তাদের কেন্দ্র-স্বরূপ হয়েছিল। 'পুণা সার্বজনিক সভাতে, ছিল—সরদার, জায়গীরদার, ইনামদার, সওয়াকর আর আমীর ওমরাহের ঠিক নীচের ধাপের লোক। এরাই ছিল মহারাষ্ট্রবাসীদের প্রতিনিধি। ভারতবর্ষে তখন রাজনৈতিক চেতনার শৈশব। পশ্চিমী ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ক্ষুদ্র শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই তাই এই চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল। চাষী সম্প্রদায়কে রাজনীতিতে প্রবেশ করানোর তখনও সময় হয় নি।

(৫) মুসলমানদের উপর প্রবল চাপ ঃ

ডক্টর ফ্রন্‌সিস্‌ রবিনসনের মতে—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পশ্চিমাংসের জেলাগুলিতে মুসলমান জমিদারেরা তাঁদের জায়গাগুলি বেনিয়া ও ক্ষত্রী কুসীদজীবী ও ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন। তবে, পূর্বাংশের জেলাগুলিতে অধিকাংশ মুসলমান জমিদাররাই তাঁদের সম্পত্তি রক্ষা করতে পেরেছিলেন। শাসনমূলক ও বিচার বিভাগীয় পদগুলির ভারতীয়-করণ সম্পর্কে কংগ্রেসের কর্মসূচীতে যে প্রচেষ্টা ছিল তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন —জমির মালিক, মুসলমান আনইজীবী ও ক্ষুদ্র ভূস্বামীরা। সম্ভবতঃ উপরিউক্ত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই এটা সম্ভব হয়েছিল। যাই হোক অভিজাত মুসলমানেরা যে সুখ-সুবিধাগুলি ভোগ করছিলেন তার প্রতি স্থানীয় ভীতি প্রদর্শন প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ১৮৮০ সালে। ভারতীয় মুসলমানেরা সমপ্রকৃতি বা একরূপ ছিলেন না। বোম্বইয়ের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের দৃষ্টি ছিল ভবিষ্যতের দিকে, কিন্তু তাঁদের কোন শক্ত রাজনৈতিক বনিয়াদ ছিল না। বাংলাদেশে শহরবাসী ও শিক্ষিত মুসলমান এবং গ্রাম্য ও অশিক্ষিত চাষীর মধ্যে ছিল প্রচণ্ড ব্যবধান। পাঞ্জাবে মুসলমানদের হিন্দু ও শিখদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল আর মুসলমানদের ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক কার্যকলাপও সেখানে দানা বেঁধে ওঠেনি। সমস্ত এলাকাগুলিতে মুসলমানেরা সৈয়দের তত্ত্বটিই বিশ্বাস করেছিলেন। তারা ধরে নিয়েছিলেন—মুসলমান-কর্মপ্রার্থীরা যদি কোন সুযোগ সুবিধা পায়—তবে ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকেই পাবে, কংগ্রেসের কাছ থেকে নয়; সুতরাং ব্রিটিশ রাজকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে।

(৬) ব্রিটিশ মনোভাব ঃ

ব্রিটিশ রাজের অনুগত রাজপুরুষদের ও মুসলমানদের জন্য এই ধরনের কিছু করার ইচ্ছাই ছিল। লর্ড ডাফরিনের উক্তি—"সাম্রাজ্যিক সরকারের গর্ব ও বাসনা শুধুমাত্র

এই যে, ভারতে মহারাণীর প্রজাদের প্রত্যেকটি শ্রেণী ও বিভাগের জন্য পক্ষপাতশূন্য হয়ে জীবনধারণের ব্যবস্থাদি সম্পাদন করা।" ডাফরিনের মতে—'মুসলমানেরা ছিলেন রাষ্ট্রের রাজনীতিবিদবর্গের মধ্যে একটি অংশ।" ১৮৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে "ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন" ডাফরিনের এই আশ্বাসবাণী পেয়েছিল যে উন্নতি ও অগ্রগতি-তে যারা পিছিয়ে আছে তাদের প্রতি রয়েছে ডাফরিনের চূড়ান্ত কর্মতৎপর সহানুভূতি। ১৮৮৭ সালে ক্রসের কাছে লিখিত ডাফরিনের পত্র থেকে পাওয়া যায় যে মুসলমানদের কংগ্রেস পরিহার "সম্পূর্ণভাবে তাঁদের নিজেদের বিচক্ষণ মতামতের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল—রাজকর্মচারীদের দ্বারা তাদের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করা হয় নি।" মুসলমানদের কংগ্রেস-বিরোধিতা ডাফরিনের 'ম্যাকিয়াভেলীয় কৌশলের'-দ্বারা সৃষ্টি একথা ডাফরিনের দ্বারা অস্বীকৃত হয়। 'জাতি-বিদ্বেষকে প্ররোচনা দিয়ে' ভারত শাসন করার নীতি ১৮৮৮ সালে ডাফরিনের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

(৭) উপসংহার:

প্রকৃতপক্ষে, হিন্দু-মুসলিম বিভেদ অধিকতর স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করছিল। ডাফরিন এবং কোলভিনের মতো উর্দ্ধতম রাজকর্মচারীদের দ্বারা কংগ্রেসের ছিদ্রান্বেষণ ও মুসলমানদের সমর্থন দুই-ই সাধিত হচ্ছিল। 'অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুদের' সংগঠন—কংগ্রেস ডাফরিনের দ্বারা প্রকাশ্যে এই দুর্নামে চিহ্নিত হল। সরকারের তরফ থেকে এই দরদী মনোভাব পেয়ে—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, বাংলা, বোম্বাই ও পাঞ্জাবের উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা স্বতন্ত্র হওয়ার পথ ধরে তাদের জনহিতকর ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করার সুযোগ পেল। সংঘ, সভা, সংকল্প-গ্রহণ, পুস্তক-প্রকাশন—এ ছাড়া জনহিতকর কাজের। অন্যান্য পদ্ধতিও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল।

Q. 13. To what extent was British Indian policy responsible for the growth of communalism in India between 1870 and 1905?

Ans. (১) হিন্দুদের পুনরুজ্জীবন:

১৮৭০ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার ক্রমবৃদ্ধি দুটি কারণে ঘটেছিল। একদিকে ছিল আভ্যন্তরীণ পরস্পর বিরোধিতা, অপরদিকে ছিল ব্রিটিশের সুচতুর নীতি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে ভারতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মাঝেই ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন ঘটছিল। বেদ যে অভ্রান্ত এ কথা দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩) প্রতিষ্ঠা করছিলেন। হিন্দু ধর্মের যে সর্বজনীন বিশ্বাসের উপর ভিত্তি এ কথা দেখাতে চেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। স্থাপিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন। ১৮৮১ ও ১৮৯১ সালের আদম সুমারী রিপোর্টে উল্লিখিত হ'ল—হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিন্দুদের পুনরুজ্জীবন এবং ওয়াহাবি ও অন্যান্যদের দ্বারা প্রচারিত পরিচালিত মুসলিম পুনরুজ্জীবন যুগপৎভাবে চলেছিল।

(২) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা:

গো-রক্ষার বিষয়টি ব্যাপক আবেগ ও উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। ১৮৮২ সালে

দয়ানন্দের দ্বারা গোরক্ষিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৩ সালে গো-হত্যা-বিরোধী দাঙ্গা হয় লাহোর, আম্বালা, ফিরোজপুর ও দিল্লীতে। লুধিয়ানা ও দিল্লীতে দাঙ্গা হয় ১৮৮৬ সালে। বোম্বাইতে (১৮৯৩ সালে) একটি ব্যাপক দাঙ্গায় কয়েক শত লোক হত ও আহত হয়। গো-হত্যা নিয়ে যাতে কোনো প্ররোচনা সৃষ্ট না হয় সে বিষয়ে সরকার সতর্ক ছিল। কংগ্রেস যে এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার কোন সুবিধা গ্রহণ করছে না—এ কথা পাঞ্জাবের লেফটন্যান্ট গভর্নর কিলপ্যাট্রিকের দ্বারা অনুভূত হয়েছিল। গোহত্যা বিষয়টিকে কাজে লাগানোর জন্য আর্য সমাজ পাঞ্জাবের রাজকর্মচারীদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিলেন। যাই হোক, উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানেরা এই সাম্প্রদায়িক গোলমাল থামিয়ে দিতেই ইচ্ছুক ছিলেন।

(৩) হিন্দু ও মুসলিম উপকথা :

বোম্বাইতে মারাঠা তেজস্বিতার এক আলোড়নের মধ্য দিয়ে হিন্দু পুনরুজ্জীবন প্রকাশ পেয়েছিল। মারাঠা উপাখ্যানগুলিকে আবার প্রচলিত করা হয়েছিল, আর রানাডে ও রাজওয়াদের মতো পণ্ডিতেরা মারাঠার অতীত গৌরবকে তুলে ধরেছিলেন। শিবাজী ও গণপতির গভীর নিষ্ঠাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন টিলক। বিপরীত দিকে, মুসলমানদের শিক্ষা সম্মেলন আওরঙ্গজেবের নীতি সংরক্ষণের চেষ্টা করেছিল। উত্তর প্রদেশে উর্দুভাষাকে কেন্দ্র করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দেখা দিয়েছিল। হিন্দুরা চেয়েছিলেন হিন্দী ভাষাকে আরও বেশী প্রাধান্য দেওয়া হোক, কিন্তু মুসলমানেরা যাতে অসন্তুষ্ট না হয় সেজন্য ব্রটিশ রাজকর্মচারীদের দ্বারা উর্দুভাষাই রক্ষিত হল। পাঞ্জাবে ব্রিটিশের দ্বারা উর্দু ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল।

(৪) উর্দু ও হিন্দী :

১৯০০ সালে উত্তর প্রদেশের লেফট্যান্ট-গভর্নর স্যার এ্যান্টনি ম্যাক-ডোনেল কর্তৃক এই অনুমতি প্রদত্ত হয়েছিল যে আদালতের প্রতিবিধান ব্যবস্থার কাগজ-পত্রে ইচ্ছানুসারে দেবনাগরী হস্তাক্ষর ব্যবহৃত হতে পারবে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মুসলমানদের প্ররোচিত করল। 'উর্দু রক্ষা সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা আলিগড়ের ভিকর-উল-মুলক ছিলেন এই প্রতিবাদের পরিচালক। উত্তর প্রদেশ থেকে ম্যাক-ডোনেলের প্রস্থানের পরে—১৯০৩ সালে মহসিন-উল্-মুলক মুসলমানদের শিক্ষা সম্মেলনের সম্পূরক (সাপ্লিমেণ্টারী) রূপে উর্দুর জন্য একটি সমিতি সংগঠিত করেন। উপরিউক্ত ঘটনাগুলি হিন্দুদের আধিপত্য সম্পর্কে মুসলমানদের মনে ভীতির উদ্রেক করে। ১৮৯১ সালে হিন্দী সংবাদপত্র ছিল চব্বিশটি, এর আনুমানিক প্রচার-সংখ্যা ছিল ৮০০০। সেখানে ৬৮টি উর্দু সংবাদপত্রের প্রচার-সংখ্যা ছিল ১৬০০০-এরও উপরে। ১৯১১ সালের মধ্যেই এ অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে উর্দুর অবস্থা নিতান্ত হীন হয়ে যায়।

(৫) হিন্দু-মুসলিম বিভেদ :

যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের কিছুটা অগ্রগতি এসেছিল—তবু হিন্দুদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ বেড়েই গিয়েছিল। ডঃ রবিনসনের মতে ১৮৮৪-৮৫ সাল এবং ১৯০৭-৮

সালের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে মুসলমানদের অধিকৃত আসন সংখ্যা কমে গিয়ে হিন্দুদের আসন সংখ্যা প্রায় ছয় শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। রবিনসনের লেখায় পাওয়া যায় যে ১৮৮০ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে অতিরিক্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ মুসলমানেরা দারুণ দুর্দশা ভোগ করেছিল। শহরবাসী হিন্দু ব্যবসায়ীরা তাদের মতো দুর্ভোগ পোহায় নি। ১৮৮৭ সালে উত্তর প্রদেশের প্রাদেশিক সরকারী চাকরীতে এবং বিচার-বিভাগের পদগুলিতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৪৫%। কিন্তু ১৯১৩ সালে এই অনুপাত হ্রাস পেয়ে হয়ে যায় ২৫%। ঠিক একই সময়ের মধ্যে শাসনমূলক কাজে মুসলমানদের অনুপাত ৮% কমে গিয়েছিল। আইন ব্যবসায়েও দলে দলে হিন্দুদের যোগ দেওয়ার ফলে মুসলমানদের হঠে আসতে হচ্ছিল।

(৬) মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা:

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে ইতিহাস, কৃষ্টি ও অর্থনীতির সমন্বয়ে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছিল। বৈদিক চিন্তাধারায় পুষ্ট হয়ে হিন্দু ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন হিন্দুরা। মোগল শাসন তাঁদের চোখে ছিল বিধর্মীর অত্যাচার। অন্যদিকে মুসলমানেরা মোগল গৌরবের কথাই ভেবে চলেছিলেন। একটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব সংস্কারের মধ্যে সুদৃঢ় হয়ে স্থান দখল করেছিল। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বৈষম্য এই বিভেদকে সুপ্রসারিত করেছিল। মুসলমানেরা অনুভব করেছিলেন—শিক্ষা ক্ষেত্রে ও কর্ম ক্ষেত্রে তাঁরা হিন্দুদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছেন। তাই তাঁরা হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখেছিলেন। পুনরুজ্জীবনকারী ওয়াহাবি আন্দোলনের দ্বারা ও ভবিষ্যৎ-দর্শী আলিগড় আন্দোলনের দ্বারা এই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়েছিল। স্যার সৈয়দ আহমেদ ইতিপূর্বেই কংগ্রেসকে হিন্দু সংগঠন বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং মুসলমানদের এর থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন।

(৭) ব্রিটিশ নীতি:

এই অবস্থায়—অনেক কিছুই ব্রিটিশ শাসকদের উপর নির্ভর করছিল। মুসলমানেরা আশা করেছিলেন হিন্দু-আধিপত্যের হাত থেকে শাসকেরা তাঁদের রক্ষা করবে ও সাহায্য করবে। মুসলমানদের আনুগত্য দেখে শাসকেরা যে খুশী হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য, শাসকেরা যে দুই সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতশূন্য এ কথা ঘোষণা করতে তারা ত্রুটি রাখেনি। ১৮৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে লর্ড ডাফরিনের দ্বারা উপরি উক্ত নীতি ব্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু ডাফরিনের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপিত হয়েছিল তাদের জন্য যারা উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে। ১৮৮৭ সালে তার দ্বারা এই দাবী উপস্থাপিত হয়েছিল যে মুসলমানদের কংগ্রেস বর্জন তাদের নিজেদের বিচক্ষণ মতের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়েছিল—রাজকর্মচারীদের দ্বারা এর জন্য কোন চাপ সৃষ্ট হয়নি। 'র‍্যাডিকাল প্রেসের উগ্র শাখা'র অভিযোগের উত্তরে ডাফরিনের দ্বারা এই উত্তর প্রদত্ত হয়েছিল যে তার 'ম্যাকিয়াভেলীয় চাতুর্যের' সঙ্গে মুসলমানদের কংগ্রেসকে বাধাদানের কোন সম্পর্ক নেই। ১৮৮৮ সালের মার্চ মাসে—

প্রজাদের মধ্যে শ্রেণী-বিদ্বেষ বর্ধিত করে ভারতকে শাসন করার চিন্তা তার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিল।

(৮) মুসলিমদের সমর্থন ও পৃথক-করণের মনোভাব :

শুধুমাত্র শাসনের জন্য হলেও ডাফরিনের দ্বারা এই বিভাজন কিন্তু কার্যতঃ গৃহীত হয়েছিল। ১৮৮০ সালের মধ্যেই ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা মুসলমানদের একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠীরূপে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। পাঞ্জাব ও অন্যান্য জায়গায় মুসলমানদের সংগঠিত হতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। ১৮৬১ সালেই স্যার চার্লস উডের দ্বারা উক্ত হয়েছিল যে 'আমাদের বিভিন্ন জাতির জন্যে আইন প্রণয়ন করতে হবে—যাদের ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ ও প্রথা বিভিন্ন'। কোলভিন ও হাণ্টারের মতো উচ্চপদস্থ অসামরিক রাজকর্মচারীদের দ্বারা মুসলমানদের প্রতি ন্যায়-ব্যবহারের দাবী উত্থাপিত হয়েছিল। ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাদেশিক কাউন্সিল নিয়ে ডাফরিনের কমিটি ধর্মের এই বিভেদকে স্পষ্ট করে তুলেছিল আর এই পার্থক্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে মনোনয়নের অনুমোদন করেছিল। 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্টে'র সংশোধন বিলের উপর বক্তৃতায় লর্ড কার্জন কর্তৃক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পার্থক্যের কথা বিবৃত হয়েছিল। লর্ড ক্রসের আইন (১৮৯২) সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর নীতি গ্রহণ করেছিল। কাউন্সিলের এলাকা ও সংখ্যার চেয়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করবে—এটাই ছিল লর্ড ল্যান্সডাউনের বাসনা।

(৯) সিদ্ধান্ত :

শিক্ষিত মুসলমানেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশেরা তাদের ভারতের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠীরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে। ভাইসরয়ের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে, শিক্ষা ও পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে কাজ করার জন্য মুসলমানেরা মনোনীত হয়েছিলেন। তবু ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের অনুযোগ ছিল—রাজনৈতিক দাঁড়ি পাল্লায় ভারসাম্য রাখার জন্য তাদের হিন্দুদের বিপরীত দিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অপরদিকে হিন্দুদের দ্বারা অনুভূত হচ্ছিল তাদের সংখ্যাধিক্য ও গুণগত প্রাধান্য শাসকের দ্বারা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হচ্ছে। ১৯০১ সালে পাঞ্জাব সরকার 'সিভিল সার্ভিসের' শতকরা তিরিশ ভাগ নিয়োগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করে। লর্ড রিপণ কর্তৃক স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রবর্তন সাম্প্রদায়িক বিবাদের সৃষ্টি করে। অমৃতসর, মুলতান ও লাহোরে সরকার সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রবর্তন করে। ১৯০১ সালের 'পাঞ্জাব ল্যাণ্ড এ্যালিনেসন এ্যাক্ট' মুসলমানদের অনুকূলে। মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যই লর্ড কার্জন কর্তৃক 'বঙ্গবিভাগ' (১৯০৫) পরিকল্পিত হয়েছিল। এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ নীতি সাম্প্রদায়িক বিভেদকে বর্ধিত করার ইন্ধন জুগিয়েছিল।

Q. 14. Examine the importance of the career of Sir Syed Ahmed in the history of muslim politics in India.

Ans. (১) প্রসিদ্ধি লাভ :

স্যার সৈয়দ আহমেদ ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের ২০ বছর "তাঁকে কেন্দ্র করেই মুসলিম রাজনীতি আবর্তিত হয়েছিল"। তাঁর কর্ম জীবনের শুরু হয়েছিল উত্তর প্রদেশে সরকারী কর্মকর্তারূপে। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের সময় তিনি বৃটিশের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের প্রতি একান্ত অনুগত ছিলেন এবং ইউরোপীয়দের প্রাণরক্ষা করেছিলেন। এই কর্মপন্থাই ১৮৫৭ সালের পরে তাঁকে প্রসিদ্ধি দিয়েছিল—এবং তাঁর বাকি জীবন তিনি নিজের সম্প্রদায়ের সেবাতেই নিয়োজিত করেছিলেন।

মুসলমানদের তখন দরকার ছিল একটি শক্তিশালী সংগঠনকারী নেতার। তারা তখন সব সুবিধা হারিয়ে বসেছে—কারণ তারা ছিল ইংরেজী শিক্ষা এবং পশ্চিমী সংস্কৃতির বিরোধী। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ তাদের ব্রিটিশের চোখে সন্দেহভাজন করে তুলেছিল। কারণ, ব্রিটিশেরা ভেবেছিল এটা মোগল শাসন পুনরুদ্ধারের জন্য মুসলিমদের উত্থান। ফলে মুসলমানেরা হয়েছিল অবিশ্বাসের পাত্র ও দমনের শিকার। মুসলমান সমাজের উপর ওয়াহাবিদের প্রভাব অতিরঞ্জিত করে তোলা হয়েছিল।

(২) বৃটিশ শাসনকে গ্রহণ :

মুসলমানেরা একটি অনুগত সম্প্রদায় এবং তাঁরা ব্রিটিশ শাসনকে আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। ব্রিটিশ শাসকদের মনে এই প্রত্যয় সৃষ্টি করার জন্য স্যার সৈয়দ আহমেদের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকটা অতিবাহিত হয়। ১৮৫৮ সালে তিনি 'দি কজেজ অফ দি ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট' নামে একখানি বই লেখেন। এই বইতে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে 'বিদ্রোহ' ছিল প্রকৃতপক্ষে এক হিন্দু উদ্যোগ—যাতে মুসলমানেরা বৃটিশ সরকারের অভিপ্রায় না জেনে যোগ দিয়েছিল। ১৮৬০ সালে লিখিত 'দি লয়্যাল মহামেডানস্ অফ ইণ্ডিয়া' নামে আর একখানি বইয়ে তিনি যুক্তি দেখালেন যে ওয়াহাবিরা ছিলেন শিখ-বিরোধী—বৃটিশ-বিরোধী নয়। তাঁরা নিষ্ঠাবান মুসলমানদের ঘৃণার পাত্র ছিলেন এবং সীমান্তের উপজাতিদের বর্বর দুষ্কার্যের জন্য তাঁদের দায়ী করা যায় না। স্যার সৈয়দ ইংরেজী-শিক্ষা প্রসারের অনুরাগী ছিলেন এবং প্রচার পত্রের দ্বারা ব্রিটিশের মুসলমান-বিরোধী ধারণাগুলোর পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। 'মহামেডান সোশ্যাল রিফর্মার' নামে একটি পত্রিকা তিনি বের করেছিলেন—এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসকের সম্মুখে ইসলামের একটি নবতর ও অপেক্ষাকৃত শান্ত প্রতিচ্ছবি স্থাপিত করা।

এই প্রচেষ্টার ফলে প্রচুর লাভ দেখা দিল ; ব্রিটিশ শাসকেরা মুসলমানদের প্রতি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করল। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্' নামে হান্টারের সুপরিচিত বইখানিতে এক নতুন নীতির আবির্ভাব দেখা যায়। এই

প্রভাবশালী বৃটিশ রাজপুরুষের দ্বারা এই নীতি উদ্ভাবিত হল যে মুসলমানদের ক্ষোভগুলি দূরীভূত করে তাদের সরকারের চারপাশে সমবেত করা হোক। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তাদের বিপদের দীর্ঘস্থায়ী উৎসরূপে আর ফেলে রাখা যায় না। যেহেতু হিন্দুরা রাজনীতির ক্ষেত্রে আগে থেকেই অসুবিধাজনক কথাবার্তা বলছিল সেজন্য ব্রিটিশ সরকার বিভেদের দ্বারা শাসনের (দিভিদে এত্ ইম্পিরা) নীতি গ্রহণ করল এবং মুসলমানদের স্বদলে আনবে স্থির করল।

(৩) ইংরেজি শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা :

স্যার সৈয়দ আহমেদ বুঝেছিলেন যে শুধুমাত্র সরকারী সমর্থনেই তাঁর সম্প্রদায় নিজেকে শক্তিশালী করতে পারবে না; একে নিজেকেও চেষ্টা করতে হবে নিজের বল বাড়াতে এবং তা পারা যাবে ইংরেজী শিক্ষা ও পশ্চিমী সংস্কৃতি গ্রহণের দ্বারা। তিনি মুসলমানদের বোঝালেন যে পবিত্র কোরাণে এমন কিছু নেই যেটা এই শিক্ষা গ্রহণের পথে বাধা হতে পারে এবং এই শিক্ষাই হল অগ্রগতির ভিত্তি। ১৮৬৪ সালে গাজীপুরে তিনি একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। তিনি প্রয়োজনীয় ইংরেজী বইগুলির উর্দু অনুবাদে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং তার জন্য সায়েন্টিফিক সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন।

১৮৬৯ সালে তিনি ইংলণ্ড পরিভ্রমণে যান এবং সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ হন। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের অনুসরণে ভারতে মুসলমানদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা সেখানেই তিনি চিন্তা করেন। ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৮৭৭ সালে আলিগড় মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড লিটন কর্তৃক এর ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং প্রিন্সিপাল বেকের সাংগঠনিক ক্ষমতার দ্বারা কলেজের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। ব্রিটিশ শাসক ও মুসলমান 'সম্প্রদায়ের মিলনের প্রতীক' রূপে এই কলেজটি বর্ণিত হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে মুসলমান ছাত্রেরা আলিগড় এসে যোগদান করেছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পশ্চিমী শিক্ষা বিস্তারে কলেজটির অবদান অনেকখানি। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে কলেজটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। কলেজটির প্রভাব শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না—রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপের কেন্দ্রও হয়ে উঠেছিল এটা। এই চিন্তা ও কার্যক্রম সমবেতভাবে 'আলিগড় আন্দোলনে'র রূপ নিয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও স্যার সৈয়দ আহমেদ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পথও স্থির করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলন উল্লেখযোগ্য সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিল কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষ বেকের কাছ থেকে।

(৪) রাজনৈতিক মতামত :

হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে স্যার সৈয়দ আহমেদ পরস্পর-বিরোধী কথা বলেছেন। যেমন, ১৮৮৪ সালে তিনি বলেছিলেন ধর্মের দিক থেকে হিন্দু ও মুসলমান পৃথক হলেও একই দেশবাসীরূপে তারা এক ও অভিন্ন জাতি। কিন্তু ১৮৫৮ সালে এই

দুটি সম্প্রদায়কে তিনি পরম শত্রুভাবাপন্ন জাতি বলে বর্ণনা করেছিলেন। ১৮৮৩ সালে তিনি বলেছিলেন বহুপ্রকার জাতীয়তার কথা এবং ভারতের একটি মাত্র জেলাতেও তা থাকতে পারে এও উল্লেখ করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে দুটি পৃথক জাতিরূপে আখ্যা দিয়েছিলেন। এই পৃথকীকরণই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মসূচীর ভিত্তি ছিল।

স্যার সৈয়দ প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বা বিধানের বিরোধী ছিলেন—বিশেষ করে নির্বাচন প্রণালীর। তাঁর প্রথম যুক্তি ছিল যে এক্ষেত্রে হিন্দুরা মুসলমানদের স্বার্থকে সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত করে দেবে। তিনি বলেছিলেন 'উভয়েই সমান থাকতে পারে এরকম আশা—অসম্ভব ও অচিন্ত্যনীয়কেই চাওয়া।'

সুতরাং স্যার সৈয়দ ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তার ধারণা ও কর্মসূচীকে সমর্থন করলেন না। কংগ্রেস-বিরোধী কর্মসূচীর সৃষ্টি ও প্রচারে প্রধান অংশ গৃহীত হয় অধ্যক্ষ বেকের দ্বারা। তিনি স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতীয় আন্দোলনকে 'শৃগাল ও কাকের চিৎকার' বলে অভিহিত করেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ একই, উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারার দ্বারা উদ্বুদ্ধ নয় বলে ভারতে বল পূর্বক শাসন করার জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারকে পরামর্শ দেন। ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হল 'মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েসন অফ আপার ইণ্ডিয়া'। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় করা এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা।

অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ও কার্যতঃ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও তৃতীয় সভাপতি বদরুদ্দিন তায়েবজির আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্যার সৈয়দ আহমেদ কংগ্রেসের প্রতি তাঁর বিরোধীতা পরিত্যাগ করলেন না। তিনি বললেন দুটি জাতিকে নিয়ে একটি জাতীয় কংগ্রেস হতে পারে না। হিন্দুদের সার্বভৌম কর্তৃত্বের কথা চিন্তা করে ভীত হলেন তিনি, বললেন—কংগ্রেসের চরম লক্ষ্য হল দেশ শাসন করা, এবং যদিও ভারতের সমস্ত জনগণের পক্ষ থেকেই এই লক্ষ্যে পৌছাতে চাওয়া হচ্ছে, তবু মুসলমানদের অবস্থা হবে অসহায়, যেহেতু তারা সংখ্যালঘু। তিনি অধিকাংশ মুসলমানকে কংগ্রেস থেকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর কংগ্রেস-বিরোধী ধারণাগুলি প্রচারিত হত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। তাদের মধ্যে ছিল 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েসন' এবং বার্ষিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন।

(৫) উপসংহার :

ভারত স্বাধীনতা লাভ করুক বা পরাধীন থাক সে সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আহমেদ রাজনৈতিক ভাবে উদাসীন ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে ভারতীয়দের হাতে বেশি ক্ষমতা দেওয়া হলে তা হিন্দুরাই ভোগ করবে এবং মুসলমানদের অসুবিধা বৃদ্ধি পাবে। তিনি সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে গরিষ্ঠ সংখ্যক হিন্দুর হাতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ভাগ্য ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি মুসলমানদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে নিষেধ করেন এবং এই ব্যাপারে তিনি অনেকাংশে সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হন।

ইংরেজ সরকারকেও তিনি এই সম্পর্কে আশ্বাস দেন যে খুব কম সংখ্যক মুসলমানই কংগ্রেসে যোগ দিতে সম্মত হবে। তাঁর প্রচেষ্টায় আলিগড় মুসলিম সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলমান ছাত্রগণ আলিগড়ে এসে সমবেত হতে শুরু করেন। ইংরেজ আমলাতন্ত্রও এই ব্যাপারে মুসলমানদের উৎসাহ দেয়। হিন্দু সমাজ থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার কৃতিত্ব স্যার সৈয়দ আহমেদের প্রাপ্য। হয়ত ইংরেজ শাসকদের নির্দেশেই তিনি এই স্বতন্ত্রকরণের নীতির প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তবে একথা ঠিক যে তাঁর নীতি খুব সাফল্য অর্জন করে এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করে তোলে। স্যার সৈয়দ আহমেদ যে তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের মস্ত উপকারক ছিলেন এটা সন্দেহাতীত। তিনি পশ্চিমী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সমাজের প্রবেশ ঘটিয়েছিলেন, দৃষ্টিভঙ্গীর আধুনিকীকরণও হয়েছিল কিছুটা তাঁর দ্বারা। সর্বোপরি সম্প্রদায়ের নেতাদের তিনি করেছিলেন রাজনীতি-সচেতন। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে—ভারতীয় ইতিহাসের বৃহত্তর পরিধিতে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মাবলী এই উপ-মহাদেশের পক্ষে ধ্বংসাত্মক হয়েছে। 'দুই জাতি তত্ত্বে'র উপস্থাপক তিনি। এই তত্ত্বই ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ ঘটিয়েছিল। তাঁর জীবনের একটি মাত্রই উদ্দেশ্য ছিল যে কোন বাধাকে উপেক্ষা করে মুসলমানদের সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং এই বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহে সাফল্য অর্জন করেন।

Q. 15. Give a critical assessment of the Aligarh movement.

Ans. (১) স্যার সৈয়দ আহমেদ :

'আলিগড় আন্দোলন' এই নামটি বলতে বোঝায় সেই রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কার্যাবলী যার কেন্দ্রস্থল ছিল আলিগড়ে। ১৮৭৭ সালে স্যার সৈয়দ আহমেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 'মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ'। পরবর্তী বিশ বৎসর কাল "তাঁকে কেন্দ্র করেই মুসলিম রাজনীতি আবর্তিত হয়েছিল'। 'আলিগড় আন্দোলনের' উদ্যোগ তিনিই করেছিলেন, কর্মপন্থাও স্থির করে দিয়েছিলেন, কিন্তু এই আন্দোলন আলিগড় কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষ বেকের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিল।

(২) রাজনৈতিক মতবাদ :

সৈয়দ আহমেদের রাজনৈতিক কার্যকাপের দুটি মূল উদ্দেশ্য ছিল—একদিক মুসলমান সমাজের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টিকরা ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং অপরদিকে হিন্দু প্রভাবিত জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করা। কংগ্রেসের প্রভাব থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে রাখা। এই ভাবে তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতি ও তাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী-এই দ্বিজাতি তত্ত্বের বীজ বপন করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় যে সৈয়দ আহমেদ তাঁর কর্মজীবনের প্রথম দিকে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার কথা ব্যক্ত করেন এবং দুটি সম্প্রদায়কে দুটি

'চোখের সঙ্গে' তুলনা করেন। কিন্তু ক্রমশ তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বথেকেই তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক সুবিধাদানের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি মন্তব্য করেন যে, "সংখ্যা গরিষ্ঠ দল সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দিবে।" তাই কংগ্রেসের প্রচারিত ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্যার সৈয়দ আহমেদের মনঃপুত হয়নি। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে জাতীয় কংগ্রেস ভারতের সকল সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হতে পারে না। তাই কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা ও তার কার্যকালাপে মুসলমানদের অংশ গ্রহণের তিনি বিরোধিতা করেন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁর প্রসিদ্ধ লক্ষ্ণৌ ভাষণ কংগ্রেস বিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভাষণে সৈয়দ আহমেদ তিনটি বিষয়ের উপর তার বক্তব্য পেশ করেন : (১) ভারতে দুটি ভিন্ন জাতি বসবাস করে ; (২) স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠা হলে তা মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে এবং (৩) নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্যই মুসলমানদের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি নির্ভরশীল হতে হবে।

যদিও স্যার সৈয়দ আহমেদের কংগ্রেসের বিরোধিতা সম্পর্কে অনেকে মনে করেন যে, তিনি এই ব্যাপারে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী ও আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিওডোর বেকের দ্বারা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্নর অকল্যাণ্ড কলভিনের দ্বারা প্রভাবিত হন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কারণ, আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্বেই স্যার সৈয়দ আহমেদ হিন্দু মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের বিরোধিতা শুরু করেন। তিনি ওয়াহাবি আন্দোলনেরও বিরোধিতা করে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ ও শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে পরামর্শ দেন। এই সময় থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে সৈয়দ আহমেদের আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দেও তিনি প্রতিনিধিত্ব মূলক শাসনব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। তবে আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতার রাজনীতি একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত শক্তিতে পরিণত হয় থিওডোর বেক এই কলেজের অধ্যক্ষ রূপে কার্যভার গ্রহণ করলে সৈয়দ আহমেদের বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি আরও সম্প্রসারিত হয়।

(৩) ব্রিটিশের নীতি :

আলিগড় আন্দোলন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করার জন্য ব্রিটিশ সরকারও আগ্রহী ছিল। প্রথমত, ওয়াহাবি আন্দোলন ও ফরাজি আন্দোলনের মতো ধর্মীয় আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মুসলমান সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করার মতো একটি সংস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ধর্মীয় উন্মাদনা যাতে ব্রিটিশ বিরোধী না হয়ে হিন্দু বিরোধী হয়ে ওঠে সেদিকে তাদের লক্ষ্য ছিল সুতরাং স্যার সৈয়দ আহমেদের মাধ্যমে তারা এই কাজ অতিশয় নৈপুণ্যের সঙ্গে করতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত ব্রিটিশ শাসকগণ তাদের শাসন ব্যবস্থাকে স্থায়ী করে তোলার জন্য বিভেদপন্থী রাজনীতি অনুসরণ করার পক্ষপাতী

ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ব্রিটিশ শাসকগণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের বিভিন্ন স্বার্থ, গোষ্ঠী ও জাতির ভিত্তিতে বিভক্ত করার চেষ্টা করে। সামরিক ও বেসামরিক উভয় দিকেই নিয়োগের ক্ষেত্রে এই বিভাজন নীতি গৃহীত হয়। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইর গভর্নর এলফিনস্টোন হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কে 'বিভাজন ও শাসন' নীতি গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে হাণ্টারের রচনায় মুসলমান সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য সরকারী আনুকূল্য প্রয়োগের কথা বলা হয়। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমানদের এই সংস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য তাদের প্রতি তোষণ নীতি গ্রহণ করে। ভারত সচিব লর্ড ক্রস ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে ডাফরিনকে জানান যে, "ভারতীয়দের ধর্মগত বিভেদ আমাদের পক্ষে লাভজনক হবে।" লর্ড ডাফরিনও মুসলমান সম্প্রদায়ের কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবকে স্বাগত জানান। সুতরাং দেখা যায় যে আলিগড় কলেজ থেকে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতি ও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের নীতি উভয়ের পরিপূরক ছিল।

(৪) বেকের ভূমিকা :

আলিগড় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ বেক। ষোলো বৎসর এই পদটি তার দ্বারা অধিকৃত ছিল। বেককে মুসলমানদের 'বিশ্বস্ত বন্ধু' বলা চলে—তাদের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিল বেকের প্রচেষ্টা। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের বিশ্বাস—সৈয়দ আহমেদের জাতীয়তা-বিরোধী, হিন্দু-বিরোধী কংগ্রেস-বিরোধী নীতির জন্য বেকের পরামর্শই সম্পূর্ণ দায়ী। সম্ভবতঃ এটি একটি অতিরঞ্জিত মত। স্যার সৈয়দ আহমেদ বেকের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে উভয়েরই প্রধান ভাবনা-চিন্তাগুলি একই দিকে পরিচালিত হয়েছিল।

'ইনস্টিটিউট গেজেট' নামে একটি পত্রিকা স্যার-সৈয়দ আহমেদের তরফ থেকে বেকের দ্বারা সম্পাদিত হত। এই পত্রিকাটি ছিল আলিগড় কলেজের সাহিত্য-সংক্রান্ত অঙ্গ। বেকের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা প্রচারের মাধ্যম হয়েছিল এই পত্রিকা। উপরে উল্লিখিত 'মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স এসোসিয়েসনে'র প্রতিষ্ঠাতেও বেকের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৮৯৫ সালে লণ্ডনে বেকের বক্তৃতায় এই তত্ত্ব পরিবেশিত হয় যে মুসলমানেরা এমন শাসন প্রণালী কিছুতেই গ্রহণ করবে না যার দ্বারা হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠতা তাদের উপর কর্তৃক করতে পারে। ইনস্টিটিউট গেজেট বাঙালীরা বেকের দ্বারা তিরস্কৃত হলেন। মৃত্যুর পরে বেককে 'সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করায় ব্যাপৃত এক ইংরেজ' বলে বর্ণিত করা হয়।

(৫) সৈয়দ আহমেদ ও বেকের পরে :

১৮৯৮ সালে সৈয়দ আহমেদ মারা যান, বেকের মৃত্যু হয় আরো এক বছর পরে। কিন্তু 'আলিগড় আন্দোলনে'র দুই যুগ্ম-উদ্ভাবক অপসারিত হলেও আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েনি। কারণ এর ভিত্তি ছিল সুদৃঢ়রূপে প্রোথিত। নবাব মহসীন-উল-মূল্‌ক্ আলি-

গড় কলেজের সম্পাদক হলেন। বেকের পরে প্রিন্সিপালের পদ পূর্ণ হয় মরিসনের দ্বারা এবং তারপরে আর্চবোল্ডের দ্বারা। এরা দুজনেই বেকের উপযুক্ত ছাত্র।

বর্তমান শতকের একেবারে প্রথমদিকেই 'আলিগড় আন্দোলনে'র জন্ম হয়। ১৯০৬ সালেই ইহা বড় রকমের একটি রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করে, মুসলমানদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের দাবী স্বীকৃতি পায়। আগা খাঁর নেতৃত্বে প্রতিনিধিবর্গ লর্ড মিণ্টোর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান এবং মিণ্টোর নিকট একটি আবেদনপত্রও পেশ করেন। এই প্রতিনিধিবর্গের সংগঠিত করার কাজে ও আবেদন পত্রটির রচনার ব্যাপারে আর্চবোল্ডের একটি প্রধান সক্রিয় অংশ ছিল। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের দাবীর ভাইসরয়ের স্বীকৃতি প্রাপ্তি—পূর্বাহ্নেই বন্দোবস্ত করা ছিল। দুটি সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকারীভাবে পৃথকীকরণ এইভাবেই সঙ্ঘটিত হয়েছিল। এর যৌক্তিক চরম পরিণতি ঘটেছিল ১৯৪৭ সালে।

(৬) উপসংহার :

'আলিগড় আন্দোলন'কে স্বতন্ত্রকরণের আন্দোলন এই আখ্যা দিয়ে সোজাসুজি নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু মুসলিম দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করে দেখলে এই আন্দোলন অপেক্ষাকৃত উন্নত অভিমত পাওয়ার উপযুক্ত। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, এই ঘটনা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আলিগড় আন্দোলন মুসলমানদের কাছে যা ছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে রেনেসাঁ আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও হিন্দুদের কাছে তাই ছিল। এ আন্দোলনকে মুসলমান সম্প্রদায়কে বিদ্রোহের পরবর্তীকালে যে হতাশা ঘিরে রেখেছিল তা' থেকে উদ্ধার করেছিল—মধ্যবর্তী যুগ থেকে আধুনিক যুগে নিয়ে এসেছিল মুসলমান সমাজকে। রাজা রামমোহন রায় হিন্দুদের জন্যে যা করেছিলেন এই আন্দোলনের গঠনকারী সৈয়দ আহমেদও তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের জন্য তাই-ই করেছিলেন। তিনি মুসলিমদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন—"ফলপ্রসূভাবে রাজনীতিতে যোগদানের আগে মুসলমানদের শিক্ষার দিক দিয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতেই হবে। তাঁর নীতির প্রবণতা ও নীট ফল ছিল দুটি বৃহৎ সমাজের মধ্যবর্তী ফাটলকে প্রসারিত করে দেওয়া, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তবে সম্ভবতঃ এ কথা বললে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল হবে যে তিনি যতখানি মুসলমানের সমর্থক ছিলেন, ততখানি হিন্দু-বিরোধী ছিলেন না।"

Q. 15. Show how the Muslims began to take 'public' and political postures during 1870-85.

Ans. (১) মুসলিম সমিতি ও সংবাদপত্র :

১৮৮১ সালের লোক গণনা রিপোর্টে পাওয়া যায়—মুসলমানদের মধ্যে তখন আত্ম-

বিশ্বাস ও আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। ভিক্টোরিয় ইংলণ্ডের উদ্দীপনার সঙ্গে যথাযথ মিল রেখে মুসলমানেরা সংবাদপত্র ও লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের ভাব-ধারণাগুলি প্রকাশ করেছিল। 'ন্যাশানাল মহামেডান এসোসিয়েসন' নামে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি ১৮৭৭ সালে আমির আলির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সভ্যেরা আত্ম-নির্ভরশীল হতে চায় নি—তারা সরকারের কাছে বিবৃতি পেশ করার পথ বেছে নিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে—শিক্ষা সম্পর্কীয় কমিশনের কাছে স্মারকলিপি (১৮৮২) দাখিল করার ফলে সরকার কর্ম-সংস্থান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান-দের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। হাণ্টারের 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' নামক বইয়ে মুসলমানদের অনগ্রসরতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা এই প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করেছিল। অমৃতসর, লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপিত হয়েছিল।

১৮৮০ সালে অনেকগুলি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল মুসলিম সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে। কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা হল—অমৃতসরের 'আঞ্জুমান-ই-ইসলাম', বেরিলীর 'আঞ্জুমান-ই-ইসলাম', লক্ষ্ণৌয়ের 'আঞ্জুমান-ই-মহাম্মদি' ও ইন্দোরের 'মহামেডান এসোসিয়েসন'। এ ছাড়া বোম্বাইতেও গরীব মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য আঞ্জুমান-ই-ইসলাম' নামে প্রতিষ্ঠানটি ছিল। তায়েবজি এর প্রতিষ্ঠাতা।

নতুন নতুন মুসলিম সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা বের হয়েছিল এবং আগের পত্র-পত্রিকাগুলির চেয়ে স্থায়ীও হয়েছিল। এ ব্যাপারে স্যার সৈয়দের "তাহজিব-অল-আখলাক-ই (১৮৭২) পথ-প্রদর্শক ছিল। মুসলমানদের মধ্যে পাঠকের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল, অবশ্য এই বৃদ্ধি সারা ভারত জুড়ে হয় নি। এই পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হবার ফলে প্রশস্ত বনিয়াদের উপর মুসলিম জনমত গড়ে উঠেছিল এবং সেই জনমত প্রাদেশিক সীমারেখার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইছিল না।

(২) মুসলমানগণ ও কংগ্রেস :

১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হ'ল—মুসলমানদের সম্মুখে উপস্থিত হল একটি জনসাধারণ-সম্পর্কীয় রাজনৈতিক বিচার্য বিষয়। কংগ্রেসে যোগদান করার প্রশ্নে মুসলমানেরা ছিলেন দ্বিধা-বিভক্ত। বোম্বাইতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মুসলমান প্রতিনিধি ছিলেন মাত্র দুই জন। অবশ্য এর মূলে ছিল সাংগঠনিক অসুবিধা। কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে ৩৩ জন মুসলমান প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমীর আলির 'ন্যাশানাল মহামেডান এসোসিয়েসন' কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করতে চাইল না। তায়েবজি ভেবেছিলেন মুসমানেরা একই দেশে বসবাসকারী সঙ্গীদের সাথে একই উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিত হবে। তাঁর মতে—মুসলমানদের অগ্রগতির আশা ছিল সম্মিলিত হয়ে কাজ করার মধ্যেই, পৃথক হয়ে উন্নতির চেষ্টার মধ্যে নয়।

তবে মুসলমানদের 'একান্ত নিজস্ব স্বার্থ-সুবিধার' কথাও স্বীকার করেছিলেন তিনি। স্যার সৈয়দের কাছে তিনি লিখেছিলেন, মুসলমানেরা যদি কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করে তবে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিচার-বিবেচনাকে নিজেদের সুবিধার্থে পরিচালিত করতে পারবে।

(৩) স্যার সৈয়দ ও তায়েবজি :

অপরদিকে, স্যার সৈয়দ কংগ্রেসকে 'হিন্দু প্রতিষ্ঠান' ব'লে কলঙ্ক-চিহ্নে চিহ্নিত করেছিলেন। 'ভারতের সাধারণ উন্নতি'র ধারণাটি তাঁর দ্বারা স্বীকৃত হয় নি। কংগ্রেস সর্ব সম্প্রদায়ের পক্ষে সমান উপকারী হবে এও তিনি বিশ্বাস করেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বকর আইনের দাবী মুসলমানদের উদ্দেশ্য-প্রয়োজনকে স্তিমিত করে দেবে। এর পরিণতি হ'ল—মুসলমানেরা চিরদিন হিন্দুদের অধীন হয়ে থাকবে। স্যার সৈয়দ কংগ্রেসকে বাঙালীর বুদ্ধিশালী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক করে ধরে নিয়েছিলেন এবং আশ্রয় খুঁজেছিলেন ব্রিটিশ-রাজের প্রতি আনুগত্যের মধ্যে। তিনি বলেছিলেন—আমরা ততদিন অপেক্ষা করব। সরকার নিশ্চয়ই আমাদের কথা শুনবে, যদি তোমরা আনুগত্যহীন বলে তাদের চোখে সন্দেহভাজন না হও।'

তায়েবজি এ কথাও বলেছিলেন—ভারতবর্ষ হল বিভিন্ন সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত এক বৃহৎ সম্প্রদায়। হিউমের সঙ্গে পত্রালাপে তিনি এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের একটা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। অধিকাংশ মুসলমানই যে কংগ্রেসে যোগদান করতে চায় না এতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এও লক্ষ্য করেছিলেন কংগ্রেসের প্রতি মনোভাব সম্পর্কে মুসলমানেরা দ্বিধা-বিভক্ত। আর তার এ সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ ছিল না যে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মুসলমানেরা কংগ্রেসের বিপক্ষেই ছিলেন।

(৪) পরবর্তী কংগ্রেস ও মুসলমানেরা :

পরবর্তীকালের জন্য মুসলমানেরা রাজনীতিতে কি ভূমিকা গ্রহণ করবে—এ নিয়ে মতভেদ চলতে লাগল। স্যার সৈয়দের কংগ্রেস-বিরোধী কার্যকলাপ সকলেই সমর্থন করেন নি। লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ জেলা থেকে ৯০ জন মুসলিম কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে (১৮৮৮) যোগদান করেছিলেন—সেখানে সব সমেত মুসলমান প্রতিনিধি ছিলেন ২৫৪ জন। বোম্বাই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ২৫৪ জন মুসলিম—তাদের মধ্যে ১২৫ জন এসেছিলেন দিল্লী ও যুক্ত প্রদেশ থেকে। আবার, উত্তরাঞ্চলের জমিদার ও চাকুরীজীবী পরিবারগুলির মধ্যে যাঁরা বয়োবৃদ্ধ তাঁরা কংগ্রেসের রাজনীতি বর্জন করলেন। একই চিত্র পাওয়া যায় বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব থেকে। সেখানে শিক্ষিত মুসলমানদের অধিকাংশই ছিলেন কংগ্রেস বিরোধী। সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে, যুক্ত

প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর কলভিন কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল ১৮৮৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে যে সব মুসলমান যোগ দিয়েছিলেন—তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ক্ষুদ্র জমি-মালিক আর পদচ্যুত নিম্নতর রাজকর্মচারী। কলভিনের মন্তব্য ছিল এই যে "মুসলমানেরা হিন্দুদের কাছে নিজেদের সংখ্যার দিক থেকে নেহাৎই তুচ্ছ মনে করে। উপস্থিত প্রয়োজনের দিক থেকে মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহের ক্ষমতাও তাদের খুবই অল্প। তাই, দু চার জনকে বাদ দিয়ে তাদের সকলেই কৃত-সঙ্কল্প যে, কাউন্সিলে কেউ অতিরিক্ত মত প্রকাশের অধিকার চাইলেই তারা তাকে বাধা দেবে। তারা শ্রেণী-চেতনার তিক্ততার দ্বারা উত্তেজিত যা এ যাবৎ পূর্ণ মাত্রায় সক্রিয় রয়েছে।"

Q. 16. Give a critical account of the growth of Muslim intelligentia in the second half of the nineteenth century.

Ans. (১) আলিগড় আন্দোলনের প্রভাব :

আলিগড় আন্দোলন ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নতুন চিন্তাধারার সৃষ্টি করে। উত্তর ভারতের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মুসলিম নেতৃবর্গ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেন। আলিগড়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার ফলে ঐস্লামিক সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় সমৃদ্ধ এক দল নতুন মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে। তাছাড়া আলিগড়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার মান অপেক্ষা শিক্ষার্থীদের চরিত্র এবং নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করত। আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমেদ বিশ্বাস করতেন যে, অশিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষে প্রকৃত অর্থে মুসলমান হওয়া অথবা ইসলাম ধর্মের নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করা সম্ভব নয়। **'How can we remain true Muslim or serve Islam, if we sink into ignorance."** এই সময়ে ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং রেলপথ ও টেলিগ্রাফের সুযোগ নিয়ে স্যার সৈয়দ আহমেদ বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিমদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁর এই নীতি খুব সাফল্য অর্জন করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানের মুসলমানদের কাছ থেকে তিনি সক্রিয় সমর্থন লাভ করতে শুরু করেন। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রচেষ্টায় অনুবাদ সমিতি গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই সমিতিই 'বিজ্ঞান সমিতিতে' পরিণত হয়। শিক্ষিত মুসলমানদের চিন্তাধারা ও মতামত প্রকাশের জন্য তিনি ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে 'আলিগড় ইনষ্টিটিউট গেজেট' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আরও কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় সমিতি গঠিত হয়। ঐস্লামিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্ত্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাই ছিল এই সমস্ত সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমেদ বার্ষিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন এবং প্রতি বছর যাতে এই সম্মেলন আহূত হয় তার জন্য তিনি নানাপ্রকার ব্যবস্থা

গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে উত্তর ভারতে মহামেডান ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়।

(২) অন্যান্য নেতৃবর্গ :

স্যার সৈয়দ আহমেদ ব্যতীত আরও অনেক মুসলিম নেতাই একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিমদের শিক্ষিত করে তোলা অপরদিকে ইংরেজদের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশের বিভিন্ন উপায় গ্রহণের জন্য চিন্তা করতে শুরু করেন। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমানদের এই সময় অর্থনৈতিক সমস্যা ও দারিদ্র্যে জর্জরিত থাকার জন্য স্থানীয় অনেক নেতাই শিক্ষা অপেক্ষাও দারিদ্র দূর করার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন।

আবদ্-অল-লতিফ (১৮২৮-১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ)—তিনি ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় মহমেডান লিটারারি এ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক সোসাইটি স্থাপন করেন। অভিজাত ও শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারের সহায়তা করাই ছিল এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতি মাসে এই সমিতির একটি করে অধিবেশন বসত এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা করার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে এই সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল কম পক্ষে পাঁচশ। আবদ্-অল-লতিফ মনে করতেন যে অনুন্নত সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত বলেই বাংলাদেশের মুসলমানগণ এত বেশি পশ্চাদ্‌পদ।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত আমীর আলি (১৮২৮-১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দ)—তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি **A critical Examination of the Life and Teachings of Islam** নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পরে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে তিনি **The spirit of Islam** নামে আর একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। আমীর আলিই ছিলেন বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান প্রতিনিধি। কৃষক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁর কোন যোগাযোগ ছিল না। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে তিনি ধর্মীয় সমস্যাগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে এক জায়গায় লিপিবদ্ধ করেন যে, "ধর্মই বাস্তব নৈতিকতা এবং ইসলাম ধর্মই সব চাইতে বাস্তব নৈতিকতা"। তাঁর মতে ইসলামের বাণী সর্বকালের সর্ব যুগের ঊর্ধ্বে। তিনি দাবি করেন যে ইসলাম ক্রমোন্নতির ধর্ম। কিন্তু তাঁর ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে এইরূপ মতবাদ সাধারণ লোক অথবা উলেমাদের নিকট বোধগম্য হয় নি। ফলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান ও প্রাচীন পন্থী মুসলমানদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

জৌনপুরের করমৎ আলি (১৮০০-১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ)—তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিমদের জেহাদ ঘোষণাকে বেআইনী বলে প্রচার করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগের সুবিধা ছিল বলে তিনি ব্রিটিশ রাজকে দার-উল-ইসলাম রূপে চিহ্নিত করেন। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন মুসলিম

আইন ব্রিটিশ্ সরকারের সমর্থন পাওয়ার জন্য তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করেন। তবে সাধারণ মুসলমানগণ আইন-সংক্রান্ত এই সব বিষয়ে আদৌ উৎসাহী ছিলেন না।

ধর্মীয় মতামতের ব্যাপারে চিরাগ আলি (১৮৪৪-১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ)—তিনি আমীর আলির চিন্তাধারা অনুসরণ করে ইসলামের আধুনিকতায় বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করেন যে, পবিত্র কোরান ঈশ্বর অনুমোদিত আইন-বিধি প্রচার করে। তাঁর মতে পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায়ও হজরত মোহম্মদের মৌলিক উপদেশাবলী প্রয়োগ করা উচিত। জেহাদ ঘোষণাকে তিনি আইন-সংক্রান্ত বিষয়রূপে বিচার না করে ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়রূপে বিচার করার জন্য নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি মনে করেন যে ব্রিটিশ শাসিত ভারত দার-উল-ইসলাম অথবা দার-উল-হারব নয়, প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের ভারত। ব্রিটিশ শাসনে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষিত হওয়ার জন্য ভারতকে মুসলিমদের নিরাপত্তার দেশ বলা যেতে পারে।

নাজির আহমেদ (১৮৩৩-১৯১২ খ্রীস্টাব্দ)—তিনি বাস্তববাদী ও বুদ্ধিমান চিন্তা নায়ক ছিলেন। তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নির্দ্ধারণের পূর্বেই ইংরেজ শাসনের স্বরূপ নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজ শাসন যদি ন্যায় ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের নিরাপত্তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারে, কেবলমাত্র তখনই ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা যেতে পারে। ব্রিটিশ শাসন ন্যায়-নীতি থেকে বিচ্যুত হলে ভারতবর্ষ দার-উল-হারবে পরিণত হবে এবং মুসলমানদের তখনই এই দেশ পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থাকতে মুসলমানদের পক্ষে কোন বাধা নেই।

পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় প্রভাবিত এই মুসলিম নেতৃবৃন্দ ব্যতীত সংরক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী উলেমাগণও ব্রিটিশ ভারতে বসবাস করা ও ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করার জন্য ফতোয়া প্রকাশ করেন। আবদ্-উল-হাইরি (১৮৪৮-১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ) মুসল-মানদের ব্রিটিশ প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। তবে বেশি সংখ্যক উলেমাই এই সম্পর্কে নীরবতা রক্ষা করার চেষ্টা করেন।

(৩) অন্যান্য মুসলিম সংগঠন :

১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের আদম সুমারীর প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায় যে, এই সময় মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং নানাভাবে আত্মপ্রকাশের জন্য তারা সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ভিক্টোরিয়া যুগের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে মুসলমানগণও সংবাদপত্র প্রকাশ ও সভা-সমিতি সংগঠন করে নিজেদের মতামত প্রচার করতে শুরু করেন। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে আমীর আলি বিখ্যাত ন্যাশনাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মনির্ভরশীলতা অপেক্ষা ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়া

ছিল এই সভার প্রধান লক্ষ্য। এই সমিতির মাধ্যমে মুসলমানগণ সরকারের নিকট বিভিন্ন প্রকার আবেদন-নিবেদন শুরু করেন। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে এই সমিতির আবেদন-ক্রমেই সরকারের শিক্ষা-কমিশন মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও চাকরীর সংস্থান সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে শুরু করেন। বিশেষতঃ মুসলমান উন্নতির অন্তরায় সম্পর্কে মিস্টার হাণ্টারের মতামত এই সমিতির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং অল্প দিনের মধ্যেই অমৃতসর, লাহোর, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে এই সমিতির শাখা স্থাপিত হয়।

১৮৮০ থেকে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই সকল সমিতির মধ্যে অমৃতসরের আঞ্জুমান-ই-ইসলাম (১৮৮৩), বেরিলির আঞ্জুমান-ই-ইসলাম, লক্ষ্ণৌর আঞ্জুমান-ই-মহম্মদী ও ইন্দোরের মহমেডান অ্যাসোসিয়েশনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বোম্বাই শহরে গরীব মুসলিমদের জন্য তায়েবজি পরিবার আঞ্জুমান-ই-ইসলাম নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত বহু পত্র-পত্রিকাও এই সময় প্রকাশিত হয়। পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে স্যার সৈয়দ আহমেদ ছিলেন মুসলমানদের পথ প্রদর্শক। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাহ্‌জিব-অল-আখলাব নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তুলনামূলকভাবে সংবাদ-পত্রের পাঠক সংখ্যাও এই সময় কিছু বৃদ্ধি পায়। সংবাদ-পত্রের সাহায্যে প্রাদেশিক গণ্ডী অতিক্রম করে মুসলিমগণ সর্ব ভারতীয় জনমত গঠনের প্রথম সুযোগ লাভ করে।

(৪) উপসংহার :

শিক্ষা বিষয়ে অগ্রগতি শুরু হলেও, ধর্ম বিশ্বাসের প্রাধান্য ও ইসলাম সম্পর্কে অভ্রান্ত চিন্তাধারা মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞান অনুশীলনের পথে দুর্লঙ্ঘনীয় বাধার সৃষ্টি করে। চিরন্তন প্রথার সমর্থক মুসলমানগণের প্রভাব তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী এবং আমীর আলির মতো পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানগণ সাধারণ লোকদের মনোভাব উপলব্ধি করতে অসমর্থ ছিলেন। তাছাড়া, ভারতের বিভিন্ন স্থানের মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। বোম্বাই-র শিক্ষিত মুসলমানরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতেন। বাংলাদেশে শিক্ষিত ও শহরের অধিবাসী মুসলমানদের সঙ্গে গ্রামের অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান ছিল। তবে এই ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও মুসলমান সমাজের আধুনিকীকরণ শুরু হয়।

Q. 17. Write a short note on the growth of Muslim Public opinion in the last quarter of the 19th century.

Ans. (১) অন্যান্য মুসলিম সংগঠন :

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের আদম শুমারীর প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায় যে, এই সময়

মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং নানাভাবে আত্মপ্রকাশের জন্য তারা সচেষ্ট হয়ে উঠে। ভিক্টোরিয়ার যুগের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে মুসলমানগণও সংবাদপত্র প্রকাশ ও সভা-সমিতি সংগঠন করে নিজেদের মতামত প্রচার করতে শুরু করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আমীর আলী বিখ্যাত ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মনির্ভরশীলতা অপেক্ষা ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়াই ছিল এই সভার প্রধান লক্ষ্য। এই সমিতির মাধ্যমে মুসলমানগণ সরকারের নিকট বিভিন্ন প্রকার আবেদন-নিবেদন শুরু করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই সমিতির আবেদন ক্রমেই সরকারের শিক্ষা কমিশন মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও চাকরির সংস্থান সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে শুরু করেন। বিশেষতঃ মুসলমান উন্নতির অন্তরায় সম্পর্কে মিস্টার হাণ্টারের মতামত এই সমিতির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই অমৃতসর, লাহোর, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে এই সমিতির শাখা স্থাপিত হয়।

১৮৮০ থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই সকল সমিতির মধ্যে অমৃতসরের আঞ্জুমান ই-ইসলাম (১৮৮৩), বেরিলির আঞ্জুমান-ই-ইসলাম, লক্ষ্ণৌর আঞ্জুমান-ই-মহম্মদী ও ইন্দোরের মহমেডান অ্যাসোসিয়েশনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বোম্বাই শহরে গরীব মুসলিমদের জন্য তায়েবজি পরিবার আঞ্জুমান-ই-ইসলাম নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত বহু পত্র-পত্রিকাও এই সময় প্রকাশিত হয়। পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে স্যার সৈয়দ আহমেদ ছিলেন মুসলমানদের পথ প্রদর্শক। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাহজিব-অল-আখলাব নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তুলনামূলকভাবে সংবাদ পত্রের পাঠক সংখ্যাও এই সময় কিছু বৃদ্ধি পায়। সংবাদ পত্রের সাহায্যে প্রাদেশিক গণ্ডী অতিক্রম করে মুসলিমগণ সর্বভারতীয় জনমত গঠনের প্রথম সুযোগ লাভ করে।

(২) কংগ্রেস ও মুসলিম সম্প্রদায় ঃ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট একটি জটিল রাজনৈতিক প্রশ্ন দেখা দেয়। কংগ্রেসে যোগদানের প্রশ্নে মুসলিম সম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। সর্বভারতীয় কোন মুসলিম সংগঠনের অভাবের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মুসলমানদের পক্ষে যোগদানের ব্যাপারে একটি বড় সমস্যা দেখা দেয় এবং মাত্র দুজন মুসলমান এই অধিবেশনে যোগ দেন। জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় এবং বত্রিশজন মুসলমান এই সভায় যোগ দিতে উপস্থিত হন। কিন্তু আমীর আলির ন্যাশনাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েশন এই সভায় যোগ দিতে অস্বীকার করে। অপরদিকে

জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তায়েবজি মনে করতেন যে, নিজেদের স্বার্থেই মুসলমানদের ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সহযোগিতা করা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ-করলেই সম্ভব হতে পারে, স্বতন্ত্র আন্দোলন বা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তা সম্ভব নয়। তবে তিনি একথাও অকপটে স্বীকার করেন যে কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমানদের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। স্যার সৈয়দ আহমেদকেও তিনি চিঠি লিখে জানান যে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিলে সুস্পষ্টভাবে নিজেদের মতামত ও সুবিধা-অসুবিধার কথা প্রকাশ করলে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার বিশেষ সুযোগের সম্ভাবনাই বেশি পাওয়া যাবে।

(৩) স্যার সৈয়দ বনাম তায়েবজি :

কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমেদ কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানরূপে বর্ণনা করেন এবং সর্বভারতীয় উন্নতির প্রচেষ্টার চিন্তাধারাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেন। তিনি বিশ্বাস করতেও অস্বীকার করেন যে জাতীয় কংগ্রেস ভারতের প্রতিটি সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য যত্নশীল। তাঁর ধারণা ছিল যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনের দাবি সরকার স্বীকার করে নিলে মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। এই নীতির ফলে মুসলমানগণ চিরকালের জন্য হিন্দুদের অধীনস্থ হয়ে থাকতে বাধ্য হবে। জাতীয় কংগ্রেসকে তিনি বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করেন এবং কংগ্রেসের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্য লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। তাঁর সমর্থকদেরও তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পরিবর্তে ব্রিটিশের প্রতি অনুগত থাকতে উপদেশ দেন। **"But we must wait for the time Government will most certainly attend to it, provided that you do not give rise to suspicion of disloyalty."**

তায়েবজি বিশ্বাস করতেন বহু সম্প্রদায় দিয়ে ভারতের সমাজ গঠিত। হিউমের সহিত পত্রালাপের সময় তিনি তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, মুসলমানদের ভারতে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। তবে জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বেশি সংখ্যক মুসলমান মতামত প্রকাশ করলে তিনি খুব দুঃখিত হন। মুসলমানগণ যে কংগ্রেসের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে তাও তায়েবজির নিকট অজানা ছিল না। বিশেষতঃ শিক্ষিত মুসলমান কংগ্রেস সম্বন্ধে যে উষ্মার ভাব প্রদর্শন করত তায়েবজি তা লক্ষ্য করে গভীর দুঃখ পান।

(৪) পরবর্তী মুসলিম সম্প্রদায় ও জাতীয় কংগ্রেস :

স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ ও আলীগড় আন্দোলন মুসলমান সমাজের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করলেও একদল মুসলমান তাদের বিরোধী ছিল। ১৮৮৮

জাতীয় কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে সর্বসমেত ২৫৪ জন মুসলিম প্রতিনিধি যোগ দেন। তাদের মধ্যে একমাত্র এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ জেলা থেকেই ৯০ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। তাছাড়া ২৫৪ জনের মধ্যে ১২৫ জনই ছিলেন দিল্লী ও উত্তর প্রদেশের মুসলমান। তবে উত্তর ভারতের ভূম্যাধিকারী মুসলিমগণ জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্ক বর্জন করার চেষ্টা করতেন। বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের শিক্ষিত মুসলমানগণও তাঁদের নীতিই অনুসরণ করে চলতেন। উত্তর প্রদেশের লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর কোলভিনের মতে ছোট ছোট জোতদার ও বরখাস্ত রাজকর্মচারীরাই মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-রূপে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেন। তাঁর ধারণা ছিল যে জাতীয় কংগ্রেসের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা অধিকারের দাবির প্রতি মুসলমানদের সমর্থন থাকলেও হিন্দুদের গরিষ্ঠ সংখ্যার নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কায় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে তাদের খুব আপত্তি ছিল। সংখ্যা লঘিষ্ঠ মুসলমানগণ চিরদিনই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপনের ভয়ে আতঙ্কিত থাকত।

(৫) মুসলমানদের অসুবিধা :

ডক্টর রবিনসনের মতে ক্ষত্রী মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কর্মকুশলতার ফলে মুসলমান ভূস্বামীগণ তাদের জমি-জমা থেকে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হতে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে তারা বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করে। সরকারী চাকরির ব্যাপারেও হিন্দুদের সহিত তাদের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব ছিল না। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁরা ছিল অত্যন্ত পশ্চাদপদ। অর্থ নৈতিক এইসব কারণে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির আরও অবনতি ঘটে। পাঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমানদের কোন কালেই সদ্ভাব ছিল না। বিশেষতঃ ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি দেখা দেয়। বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীর শতকরা নব্বুই ভাগই ছিল হিন্দু। ফলে মুসলমান কৃষকদের তাদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল। অর্থ নৈতিক এই পার্থক্যকেই কাজে লাগিয়ে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ককে আরও তিক্ত করে তোলার জন্য একদল লোক বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং হিন্দুদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই মুসলিমগণ ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতি অপূর্ব আনুগত্য প্রকাশ করতে প্রস্তুত হয়। স্যার সৈয়দ আহমেদ ও তাঁর অনুগামীরা পুরোপুরিভাবে এই সুযোগ কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন।

(৬) শাসকদের মনোভাব :

শাসিতদের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর তুলে নিজেদের শাসন স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের স্বপক্ষে আনয়ন করার চেষ্টা করে। জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রপন্থী মুসলিম শক্তি ও জনমত প্রয়োগ করাই ছিল এই সময়ের

ব্রিটিশ সরকারের প্রধান লক্ষ্য এবং এই বিষয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে বাড়তি কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে নিজেদের দলে তাদের আনতে সমর্থ হয়।

(৭) উপসংহার ঃ

স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদের মতবাদে বিশ্বাসী এবং শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট জাতীয় কংগ্রেস অস্পৃশ্যরূপে পরিগণিত হওয়ার ফলে ব্রিটিশ সরকারের যথেষ্ট লাভ হয়। অপরদিকে সংগঠনহীন শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায় বাধ্য হয়েই—নানারূপ সভা-সমিতি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে এই সব সভাসমিতিই মুসলিমদের জনমত গঠন করত এবং জনমত গঠন করতে সাহায্য করত। বিশেষতঃ জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করার জন্য এইসব সংগঠনকে ব্রিটিশ সরকার পরোক্ষভাবে সাহায্য করত এবং ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্য প্রকাশ করে এই সব সভা-সমিতি তার প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করত।

Q. 18. Write a short note on Dacca Meeting (1906).

আলীগড় আন্দোলন বিভিন্ন সংগঠন ও সভাসমিতির মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পায়। এই আন্দোলনের পূর্বে সর্বভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সংগঠন তৈরি করার চেষ্টা করা হয় নি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিশেষ কোন যোগাযোগও ছিল না। বিশেষতঃ ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাবের জন্য মুসলিম সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তা-ধারার সঙ্গে পরিচিত হতেও কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করে নি। এমনকি স্যার সৈয়দ আহমেদও কোন কেন্দ্রীয় মুসলিম সংগঠনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নি। ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়পরায়ণতা ও শাসননীতির উপর তাঁর প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল এবং তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের পরিবর্তে আনুগত্যের মাধ্যমে সুযোগ লাভের পক্ষপাতী ছিলেন। অপরদিকে আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ মিস্টার মরিসনের প্রভাবে তিনি চিরদিনই ব্রিটিশ বিদ্বেষী আন্দোলনের প্রতি বিমুখ ছিলেন। তবে স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদের পরামর্শদাতাগণ সম্পূর্ণ অন্য কারণে তাঁদের এই মতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল যে মুসলিমদেরও কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে উঠলে অল্পদিনের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসকবিরোধী হয়ে উঠবে এবং জাতীয় কংগ্রেসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করবে। বিশেষতঃ তরুণ মুসলিম নেতৃবৃন্দকে স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ অথবা মহসীন-উল-মূলকের নির্ধারিত পথ চিরদিনের জন্য অনুসরণ করবে একথা বিশ্বাস করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদিও ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদের মৃত্যুর পর মহসীন উল-মূলক আলীগড় কলেজের সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং অত্যন্ত যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে তাঁর পূর্বসূরীর নীতি অনুসরণ করেন।

ফলে স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ, মহসীন-উল-মূলক এবং তাঁদের অনুগামীদের দ্বারা পরিচালিত আলীগড় আন্দোলন কোন দিনই কেন্দ্রীয় মুসলিম সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন নি।

কিন্তু ১৯০৫-০৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতের রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। লর্ড কার্জনের আমলে বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলাদেশ তথা সর্বভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। জাতীয় কংগ্রেস এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। সুতরাং বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন ব্রিটিশ সরকার গভীরভাবে উপলব্ধি করে। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রতিবাদ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার একটি কেন্দ্রীয় মুসলিম সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। অপরদিকে এই সময় ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের সংস্কার সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার মুসলিমদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিশেষ কতগুলো সুযোগ দিতে সম্মত হয়। সুতরাং মুসলিম নেতৃবর্গও তাঁদের দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে পেশ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

ইতিমধ্যে সিমলায় আগা খানের নেতৃত্বে মুসলিম নেতৃবর্গ ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষায় ব্রিটিশ সরকারের আগ্রহ প্রকাশে সন্তুষ্ট হন। এই সাক্ষাৎকারের কিছুদিন পরেই ঢাকা শহরে মহমেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স আহূত হয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু মুসলমান প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দেন। বঙ্গভঙ্গে উদ্যোক্তা লর্ড কার্জনের অন্যতম প্রিয়পাত্র ঢাকার নবাব সলিম-উল্লা সমবেত প্রতিনিধিদের নিকট একটি কেন্দ্রীয় মুসলিম সংগঠন স্থাপনের জন্য আবেদন করেন। তাঁর মতে এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হবে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা। বিশেষতঃ তরুণ মুসলিম নেতৃবৃন্দকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব থেকে দূরে রাখার জন্যই এইরূপ একটি সংগঠনের প্রয়োজন ঢাকা সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি-গণ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। এই সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলার জন্য মুসলিম প্রতিনিধিবর্গ (১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর) সম্মত হন এবং ঐ সম্মেলনেই সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়।

Q. 17. Did Muslim separatisn develop in the United Provinces not because of Muslim backwardness but out of a threat to the "Muslim privileged elite."

Ans. (১) সরকারী চাকুরীর সমস্যা :

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকাল থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অভিজাত শ্রেণীর অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি হতে থাকে। যদিও নীতি হিসাবে ব্রিটিশ

সরকার হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সমব্যবস্থার কথার আশ্বাস দেয় তা সত্ত্বেও ওয়াহাবি আন্দোলন ও সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতি ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মন থেকে কখনও অপসারিত হয় নি। ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে ব্রিটিশ সরকারের প্রচণ্ড সন্দেহের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নরম্যান এবং ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে লর্ড মেয়োর হত্যাকাণ্ডের পর এই সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে মুসলিমদের ইংরেজ বিরোধী মনোভাব দূর করার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। লর্ড মেয়ো বহুবার এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ শাসকদের সম্পর্কে মুসলিমদের মনোভাবের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। এমন কি মুসলিম সমাজের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইংরেজ শাসকদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাও খুব বেশি সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয় নি।

(২) ভাষার সমস্যা:

কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তীকালেও উত্তর প্রদেশের মুসলিম সম্প্রদায় সরকারী চাকুরীর একটি বিশেষ অংশ অধিকার করার সুযোগ পেত। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে উত্তর-প্রদেশে তের জন হিন্দু ও ন'জন মুসলমান ডেপুটি কলেক্টর এবং ছ জন হিন্দু ও তিনজন মুসলমান অস্থায়ী ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। পরবর্তী কয়েক বছরে এই অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয় নি। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দেও একশ পঞ্চাশ মাস মাহিনার সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে পঁয়ত্রিশ শতাংশ মুসলমানগণ অধিকার করেছিলেন। এমন কি, লর্ড ক্যানিং-এর নীতি অনুসারে ব্রিটিশ স্বার্থের সঙ্গে ভারতীয় জমিদারদের স্বার্থ ঘনিষ্ঠ করার পদ্ধতি শাসনব্যবস্থায় প্রয়োগ শুরু হলেও মুসলমানদের খুব ক্ষতি হয় নি। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে আগ্রা, মীরাট রোহিলা খণ্ড, বেনারেস, আজমীর, ঝাঁসি, গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থানে প্রভাবশালী জমিদারদের মধ্য থেকে একষট্টি জন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়, তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন মুসলমান। ১৮৬২-৬৩ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ানী, রাজস্বসংক্রান্ত ও ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির জন্য চুরাশি জন তালুকদারকে অবৈতনিক সহকারী কমিশনার নিযুক্ত করা হয় তাঁদের মধ্যে চৌদ্দ জন ছিলেন মুসলমান।

উপরের পরিসংখ্যা থেকে যদিও মনে হয় যে মুসলিম সম্প্রদায় সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তীকালেও সরকারী পদে যথেষ্ট পরিমাণে নিযুক্ত হতেন তা সত্ত্বেও ডক্টর মেটকাফ-এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে উত্তর-প্রদেশের বিচার বিভাগের প্রায় শত করা বাহাত্তর ভাগ চাকুরী মুসলমানদের দখলে ছিল। কিন্তু পরে এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেয়। বিশেষতঃ, ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতার ভিত্তিতে সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হতে শুরু করলে মুসলমানগণ ক্রমশই সরকারী পদ থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করে। আবার এই সব পদে হিন্দুদের নিয়োগের ফলে তাঁদের বিরুদ্ধে মুসলমান ক্রোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পায়।

ইতিমধ্যে অষ্টাদশ শতকের সত্তরের দশকে হিন্দি বনাম উর্দু ভাষার দ্বন্দ্বের সমস্যা নিয়েও উত্তর-প্রদেশের মুসলিম সম্প্রদায় বিব্রত হয়ে পড়ে। উর্দু, পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ বিহার প্রভৃতি স্থানের সরকারী ভাষায় পরিণত হলে আরবী ও ফার্সি ভাষায় শিক্ষিত মুসলমানগণ অসুবিধার সম্মুখীন হন। উর্দু ভাষায় লিখিত পাঠ্য-পুস্তকের অভাবে মুসলমানগণ ফার্সি শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হতে থাকে। অপরদিকে প্রচুর হিন্দি বই প্রকাশিত হওয়ার ফলে হিন্দি ভাষা-ভাষী হিন্দু সম্প্রদায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দ্রুত উন্নতি লাভ করার সুযোগ পায়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই হিন্দি ভাষাভাষীগণ হিন্দিকে অতিরিক্ত আঞ্চলিক ভাষা বলে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবী করতে শুরু করেন। স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানগণ এই দাবির বিরোধিতা করেন। ফলে ভাষা সমস্যা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পথ সুগম করে। শেষ পর্যন্ত ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের সকল দাবি অগ্রাহ্য করে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য হিন্দিতেও সরকারী সকল নির্দেশ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হিন্দি ভাষা সম্পর্কে মুসলমানদের এই বিদ্বেষের মূল কারণ ব্রিটিশ সরকার সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে এবং এই সম্পর্কে লর্ড কার্জন মন্তব্য করেন, "The howls of the Mussalmans merely reprsent the spleen of a minority from whose hands are slipping away the reins of power and who clutch at any method of arbitrarily retaining them." কিন্তু সরকারী নীতিতে মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁরা নবাব মহসীন উল-মুলকের সভাপতিত্বে উর্দু ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েসন গঠন করেন। মেহদি হোসেন, ভিকর-উল-মুলক, মিঞা মোহম্মদ শাহ দিন, ফাজিফ হোসেন, মোহম্মদ সফি প্রমুখ উত্তর প্রদেশের অভিজাত মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই সংগঠনে যোগ দেন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা গঠন করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টাই পরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠনের সূচনা করে।

(৩) আলিগড়ের আন্দোলনের ফলশ্রুতি :

স্যার সৈয়দ আহমেদ-এর নেতৃত্বে আলিগড় কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই আলিগড়ে সমস্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানের অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ের মিলনের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। স্যার সৈয়দ আহমেদ ভারতের মুসলিম সমাজকে হিন্দু সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে তোলার নীতি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করেন। উত্তর প্রদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের অবিসম্বাদী নেতা হিসাবে ওয়াহাবি আন্দোলনকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করে স্যার সৈয়দ আহমেদ ব্রিটিশ সরকারের সহানুভূতি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। এই বিষয়ে তাঁর সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ সরকার তাঁর প্রচেষ্টার প্রতি সদয় দৃষ্টি দিতে শুরু করেন। আলিগড় কলেজ তাঁর প্রতিষ্ঠাতাগণ ও অধ্যক্ষদের পরিচালনায় যাতে মুসলিম একটি প্রধান শিক্ষা ও সংস্কৃতির

কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। শিক্ষার মান অপেক্ষা মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি দেওয়ার ফলে আলিগড় কলেজের ছাত্রগণ মুসলমান সমাজের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়ে পরিণত হয় এবং নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষাকেই তাঁদের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতে শুরু করেন। এই সম্পর্কে পি. হার্ডি বলেন, "What Aligarh did was to produce a class of Muslim leaders with a footing both western and Islamic Culture, at case both in British and Muslim society and endowed with a censciousness of their claims to be the aristocracy of the country as much in British as in Mughal times. Education in a residential college which imitatad the Enghish public schools of the time, with its emphasis on character, leadership prowers in games, rather than scholarship, with debating societies and old boy's associations to maintain college esprit de corps, the Aligarh students were encouraged to work for the welfare of the Muslim Community in India."

(৪) জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম জাতি :

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষতঃ, অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায় এই সংস্থা থেকে যতদূর সম্ভব নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা করে। স্যার সৈয়দ আহমেদের মতো অধিকাংশ মুসলিম নেতাই বিশ্বাস করেতেন যে জাতীয় কংগ্রেস ভারতের সকল সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হতে পারে না। সুতরাং মুসলিমদের পক্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা অথবা তার কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ সম্ভব নয়। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দেবে। তাই কংগ্রেসের প্রচারিত ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদ ও স্বায়ত্ত শাসনের দাবি মুসলমান নেতৃবর্গের পক্ষে পছন্দ করা সম্ভব হয় নি। বরং তাঁদের ধারণা হয় যে, ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাঁরা আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হবেন। এমন কি মুসলমান সমাজের শিক্ষিত ও তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিরাও যাতে কংগ্রেসের রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট না হন সে জন্য তাঁরা বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে শুরু করেন। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ আহমেদ খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ট্রানস্লেশন সোসাইটি থেকে শুরু করে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম সম্প্রদায় যতগুলো সংগঠন তৈরি করে তার মধ্যে একটিও প্রকৃত রাজনৈতিক সংস্থা ছিল না। মহামেডান এডুকেশন্যাল কংগ্রেস, মহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্স, ইউনাইটেড প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েসন, মহমেডান অ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েসন

প্রভৃতি প্রত্যেকটি সংস্থারই মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য ঐক্য গড়ে তোলা এবং এই সমাজকে হিন্দু সম্প্রদায় থেকে যতদূর সম্ভব বিচ্ছিন্ন করে রাখা। মুসলমান নেতৃবর্গ তাঁদের মনোভাব গোপন করারও কোন চেষ্টা করেন নি। প্রকাশ্যেই তাঁরা ঘোষণা করেন যে তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা, ব্রিটিশ শাসনকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য বিভিন্ন সরকারী ব্যবস্থাকে সমর্থন করা জনগণের মধ্যে আনুগত্যের মনোভাবকে পরিপুষ্ট করা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবণতাকে দূর করা।

(৫) মুসলমান সমাজের নীতি বিশ্লেষণ :

ভারতের মুসলিম সমাজকে সাধারণভাবে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তাদের মধ্যে বিদেশ থেকে আগত, সুলতানী ও মোগল যুগে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কার্যে নিযুক্ত জায়গীর তালুকের মালিক মুসলিমগণই সাধারণতঃ অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ধর্মান্তরিতা মুসলমানগণ ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর। চাষবাস, সাধারণ চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ছিল তাদের পেশা। ধর্মের দিক থেকে অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্গে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে উভয় শ্রেণীর মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যের পরিমাণই ছিল বেশি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষা প্রথম শ্রেণীর মুসলমানগণই বেশি বিপদের সম্মুখীন এবং তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। বিশেষতঃ হিন্দুগণ দ্রুত ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে সরকারী চাকরীর ব্যাপারে অনেক বেশি সুযোগ ভোগ করতে শুরু করে। ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার আধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনা দেখা দিলে মুসলমানগণও আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সুতরাং তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদ ও হিন্দুদের গৃহীত নীতির বিরোধী নীতি গ্রহণ করতে শুরু করেন প্রকৃতপক্ষে অভিজাত মুসলিমদের অধিকাংশের নিকটই ইংরেজদের শাসকগোষ্ঠী অপেক্ষা হিন্দুগণ বেশি বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হতে শুরু করে। হিন্দুদের তাঁরা জীবিকা, ভাষা ও স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চিহ্নিত করে স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করতে শুরু করে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁদের এই স্বাতন্ত্র্য বোধ এক সুনির্দিষ্ট পথে প্রভাবিত হয়ে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য ক্রমেই বৃদ্ধি করতে শুরু করে। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্রিটিশ সরকারের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সমর্থনে মুসলমানগণ অভিজাতবর্গ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের নীতি কার্যকরী করতে সমর্থ হন।

MODERN INDIA—PART II
(1906-1947)

Q. 1. Would you say that the Simla deputation of October 1906. Was engineered by the Government ? Give reasons for your answer.

Ans. (১) মহসীন-উল-মুলক ও আর্চবোল্ড

ভারত সচিব জন মর্লির পক্ষে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতির ফলে মুসলিম নেতৃবর্গের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু আলিগড় গোষ্ঠীর শিক্ষিত মুসলমানদের ধারণা হয় যে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে হিন্দুদের সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং মুসলমান সম্প্রদায় আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা অগাস্ট আলিগড় কলেজের সম্পাদক মহসীন-উল-মুলক কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ডকে একখানি চিঠি লিখে মুসলমানদের আকাঙ্খার কথা স্পষ্টভাবে জানান। এই চিঠিতে লেখা হয়, "If the new rules now to be drawn up introduce election on a more extended scale, the Mohammedans will hardly get into the Councils by election."

মহসীন-উল-মুলক যুক্ত নির্বাচন প্রথা সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর সহিত সাক্ষাৎ করে একটি আবেদন পত্র পেশ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আর্চবোল্ডের পরামর্শ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আর্চবোল্ডের অনুরোধে ভাইসরয়ের একান্ত সচিব কর্ণেল ডানলপ স্মিথের সহায়তায় মুসলিম প্রতিনিধিদের সহিত মিণ্টোর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। অগাষ্ট মাসের ১০ তারিখে মুসলিম প্রতিনিধিদের সহিত মিণ্টোর সাক্ষাতের সম্মতির কথা আর্চবোল্ড মহসীন-উল-মুলককে জানিয়ে দেন।

(২) মুসলিম প্রতিনিধিদের বক্তব্য

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা অক্টোবর গভর্নর জেনারেল মিণ্টো ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের পঁয়ত্রিশ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। একমাত্র উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের মুসলমান প্রতিনিধিই এই দলে স্থান লাভ করেন। প্রতিনিধিবর্গ লর্ড মিণ্টোর নিকট আগামী দিনের আইনসভায় যথোপযুক্ত অংশ লাভ করার দাবি জানিয়ে একখানি আবেদন পত্র পেশ করেন। তবে এই যথোপযুক্ত অংশ স্থির করার সময় মুসলমানদের সংখ্যা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ ও সাহায্যদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাঁরা এইরূপ অভিমতও প্রকাশ করেন যে বর্তমান

আইনসভায় মুসলিম প্রতিনিধিদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য অপরদিকে ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অর্থাৎ হিন্দুদের সহায়তা ছাড়া বর্তমানে কোন মুসলমানের পক্ষেই আইনসভায় প্রবেশ করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই সব প্রতিনিধিদের কোনক্রমেই প্রকৃত অর্থে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলা যায় না। মুসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় এবং হিন্দুদের স্বার্থ ও তাদের স্বার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। সুতরাং মুসলমানদের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড ও আইনসভায় স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

মুসলমান প্রতিনিধিদের এই আবেদন লিপির ভাষা ও ভাব প্রকৃতপক্ষে আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ডের; মুসলমান প্রতিনিধিদের সহিত লর্ড মিণ্টোর সাক্ষাৎকারের মূলে যেমন তেমনই, প্রতিনিধিদের আবেদন পত্র রচনাও তাঁরই কৃতিত্ব। কারণ এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে তিনি মহসীন-উল-মুলককে যে পত্র লিখেন তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করলেই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়। "The formal letter should be sent with the signatures of some representative of all Musalmans. The deputation should consist of representatives of all the provinces. The third point to be considered is the text of the address. I would here suggested that begin with a solemn assurance to loyalty. The Government's decision to take a step in this direction of self-government should be appreciated. But our apprehensions should be expressed that the principle of election, if introduced, would prove detrimental to the interest of the Muslim minority. It should respectfully be suggested that nomination or representation by religion be introduced to meet Muslim opinion. We should also say that in a country like India due weight must be given to the Zemindars. But in all these views I must be in the background. They must came from you. I can prepare for you the draft of the address or revise it. As you are aware, I know how to phrase these things in a proper language. Please remember that if we want to organise a powerful movement in the short time at our disposal, we must expedite matters."

(ও) প্রতিনিধিবর্গের সাফল্য

ভাইসরয় মিণ্টো মুসলিম প্রতিনিধিবর্গকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তাদের বক্তব্য বিবেচনা করার আশ্বাস দেন। সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিতেও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দিতেও তিনি

সম্মত হন এবং তিনি মন্তব্য করেন, "any electoral representation in India would be doomed to mischieveous failure which aimed at granting a personal enfranchisement regardless of the beliefs and traditions of the communities composing the population of this continent."

লেডী মিন্টো ভাইসরয়ের সহিত মুসলিম প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারের দিনটিকে "an epoch in Indian history" বলে বর্ণনা করেন।

মোহম্মদ আলির মতে সিমলার এই সাক্ষাৎকার মুসলিম প্রতিনিধিদের শাসকের আদেশে অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয় 'Command performance' মাত্র। কিন্তু ডক্টর হার্ডি মোহম্মদ আলির এই মত স্বীকার করতে রাজি নন। তাঁর মতে এই সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব মহসীন-উল-মুলকের পক্ষ থেকেই ভাইসরয়ের নিকট প্রথম উত্থাপিত হয়। ভাইসরয় মিন্টো ভারতসচিব মর্লিকে যে চিঠি দেন তা থেকেও জানা যায় যে এই সাক্ষাৎকারের জন্য তিনি কোন প্রকার উদ্যোগই গ্রহণ করেন নি। লক্ষ্ণৌর ডেপুটি কমিশনার হারকোর্ট বাটলার মুসলিম প্রতিনিধিবর্গ তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন নি বলে তিনি তাঁদের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি প্রতিনিধিদের স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা ও সরকারী দপ্তরে আনুপাতিক সংখ্যায় কর্মসংস্থানের দাবি পেশ করতে নিষেধ করেন। মিস্টার বাটলারের মতে মহসীন-উল-মুলক ও ইমাদ-উল-মুলকই সমস্ত বিষয়টি পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন।

তবে ডক্টর হার্ডি স্বীকার করেন যে, প্রতিনিধিবর্গ ভাইসরয়ের কাছ থেকে যে সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যবহার লাভ করবেন একথা তাদের বেশ ভালো ভাবেই জানা ছিল। তাঁর মতে শাসকের আদেশে অভিনয় অনুষ্ঠিত না হলেও টিকিট বিক্রির প্রতিশ্রুতি পূর্বে দেওয়া হয়। "If the deputation was not a command performance it was guaranteed box office success in advance". তা ছাড়া প্রতিনিধিদের সকলেই ছিলেন স্বয়ং নিযুক্ত; বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের এই প্রতিনিধি দলে স্থান দেওয়ারও কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। বাংলাদেশের অধিবাসীদের গরিষ্ঠ সংখ্যা মুসলিম ধর্মাবলম্বী হলেও একমাত্র নবাব আলি চৌধুরী বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান। পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ডেনজিল ইবেটসন সিমলা সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, "বর্তমান শিক্ষিত মুসলমানগণই ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল অংশ রূপে পরিচিত।" কিন্তু উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীদের অনেকেই এই সাক্ষাৎকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট স্যার ল্যান্সলট হেয়ার লর্ড মিন্টোকে জানান যে, সিমলা সাক্ষাৎকারেই মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষা ও অসন্তোষ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ডানলপ স্মিথ মুসলিম সম্প্রদায়ের অসন্তুষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডক্টর হার্ডি সিমলা সাক্ষাৎকারকে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক প্রয়োজন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা উত্তর প্রদেশের অভিজাত শ্রেণীর মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থের সুযোগ সন্ধানী মিলনের পরিণতি বলে বর্ণনা করেন। "Out come of a marriage of convenience between British political necessity and those of the Muslims of the United Provinces above all others". মিন্টোর মুসলিম তোষণ নীতি প্রকৃত পক্ষে সিপাহি বিদ্রোহ উত্তর যুগের ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত মুসলিম-প্রীতির চরম দৃষ্টান্ত মাত্র। অপর দিকে মুসলিম সম্প্রদায়কে কিছু অতিরিক্ত রাজনৈতিক সুযোগ দিয়ে ব্রিটিশ সরকার তাদের আনুগত্য লাভের পথ সুগম করে তোলার চেষ্টা করে।

(৪) ইংরেজদের মনোভাব

লর্ড মিন্টোর কার্যকলাপ ও চিন্তাধারা থেকে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি সংস্থা গড়ে তোলার জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরেই মনে মনে সঙ্কল্প করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন—"I have been thinking a good deal lately of a possible counterpoise to Congress aims." ডক্টর অমলেশ ত্রিপাঠির মতে আর্চবোল্ডের কাছে মহসীন-উল-মুলকের চিঠি, মিস্টার হেয়ারের হিন্দু-বিরোধী রিপোর্ট এবং বমফিল্ড ফুলারের পদত্যাগ পত্র পেশ করার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মিন্টো উৎসাহিত বোধ করেন। ভারত সচিব মর্লিও মুসলমানদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। দৃশ্যের অন্তরালে থেকে আর্চবোল্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। ডানলপ স্মিথের মাধ্যমে তিনিই মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে লর্ড মিন্টোর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। হিন্দুদের প্রাধান্য সম্পর্কে মুসলিমদের আশঙ্কার ও ত্রাসের কথা তিনিই প্রচার করেন। মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দের আবেদনপত্রও তিনিই রচনা করেন। বিলগ্রামী ও ঢাকার নবাবের সঙ্গে তিনিই যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন।

(৫) মিন্টোর মনোভাব ও উপসংহার

সিমলার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই মিন্টো প্রভাবশালী মুসলিম নেতৃবর্গের সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। যদিও মিন্টো ঘোষণা করেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করার পক্ষপাতী তিনি নন। মুসলিম প্রতিনিধিদেরও তিনি বলেন যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল প্রকার মঙ্গল সাধন করাই ব্রিটিশ সরকারের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু প্রতিনিধিবর্গের প্রধান আগা খান সিমলা সাক্ষাৎকারের পূর্বেই ভাইসরয়ের সহিত দেখা করেন এবং এই সাক্ষাৎকারের সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন। মিন্টো সরাসারভাবে মুসলিমদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার না করলেও তিনি সর্বান্তঃকরণে তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য সমর্থন করেন।

তিনি মুসলিম প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেন যে, শাসনতান্ত্রিক কোন প্রকার পুনর্গঠন সম্পাদিত হলে মুসলিমদের স্বার্থ ও অধিকার সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হবে। হিন্দুদের প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্যে তিনি মহসীন-উল-মূলককে সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবি করার জন্য গোপনে পরামর্শ দেন। তা ছাড়া আর্চবোল্ড আইনসভা প্রভৃতিতে মুসলিম সদস্যদের মনোনীত করার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু মহসীন-উল-মুলক এবং বিলগ্রামী মনোনয়নের পরিবর্তে নির্বাচন দাবি করেন। সম্ভবতঃ মিন্টোর পরামর্শেই তাঁরা আর্চবোল্ডের মত পরিত্যাগ করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার মতে সিমলা সাক্ষাৎকার ব্রিটিশ সরকারের সাজানো ব্যাপার। ডক্টর ত্রিপাঠি মনে করেন যে, এই সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে করা হলেও ব্রিটিশ রাজকর্মচারিগণ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেন। সিমলা সাক্ষাৎকারের ফলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে সংরক্ষণশীল দলের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়।

Q 2 Discuss the causes of the rise of political consciousness in India.

Ans. (১) **ভূমিকা**

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব ঘটতে থাকে। ইংরেজদের শাসনের ফলে ভারতবাসী তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও আধুনিক গণতন্ত্রসম্মত শাসন কাঠামোর পরিচয় লাভ করে। ইংরেজী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তারা ইংরেজদের রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। জনগণের স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা কিভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস কিভাবে ত্যাগ ও আন্তরিকতার দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে, ইংরেজদের ইতিহাস থেকেই ভারতবাসী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লাভ করে। শুধু ইংলণ্ডের কথাই নয়, ইংরেজী সাহিত্যের মধ্য দিয়েই শিক্ষিত ভারতবাসী ইয়োরোপের গণ-আন্দোলনের কথা—বিশেষভাবে ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী শুনতে পায়। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী, আমেরিকায় ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ থেকে তার উপনিবেশগুলোর মুক্তি অর্জনের ইতিহাসও তাদের অজ্ঞাত ছিল না। ইংরেজদের লেখার মধ্য থেকেই সারা গ্রীসদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের কাহিনী এবং ইতালির জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপনের জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী জানতে পান।

(২) **যোগাযোগের উন্নতি**

এই সময় দেশের অভ্যন্তরেও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। রেলপথ স্থাপন ও নতুন নতুন পথ ঘাট নির্মাণের ফলে দেশাভ্যন্তরের আঞ্চলিক ব্যবধান লুপ্ত হয়। আসমুদ্র হিমাচলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে প্রাদেশিক গণ্ডীর অবসান হয়। অপর দিকে অভিন্ন শাসন ও বিধিব্যবস্থার মধ্যে থেকে অর্থাৎ একই ধরনের শাসন কাঠামোর

মধ্যে শাসিত হয়ে এবং একই ধরনের আইন-কানুন মানতে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের শিক্ষিত অংশের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি জাগরূক হয়। ফলে নিজেদের দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে। ক্রমশঃই জনগণের শিক্ষিত অংশের নিকট অস্বাভাবিকরূপে বিবেচিত হতে থাকে। এই উপলব্ধিও রাজনৈতিক চেতনা উদ্ভবের অন্যতম প্রধান কারণ।

(৩) সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগে কতিপয় মনীষীর চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা জনগণের এই রাজনৈতিক চেতনা আনয়নের পথ প্রশস্ত করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা রামমোহন রায় বাংলাদেশে আধুনিক বুদ্ধি-সম্মত ও বিচার-সম্মত জীবনের ভিত্তি প্রস্তর-স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি একই সঙ্গে সমাজ ও ধর্মসংস্কারের দ্বারা প্রগতিশীল জীবন-পদ্ধতির সন্ধান করেন। সমসাময়িক বঙ্গ সমাজে তাঁর মতবাদের বিশেষ সমাদর হয় নি, কিন্তু উত্তরকালে তাঁর সংস্কারপন্থী মনোবৃত্তি প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বোম্বাই প্রদেশে দাদাভাই নৌরজী সমাজ সংস্কার এবং রাজনৈতিক প্রগতির জন্য বহুবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনিই বোম্বাই শহরে প্রথম সংবাদ পত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেরও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতি একান্তভাবে কাম্য বলে মনে করতেন। অপরদিকে কলকাতায় জমিদারদের সঙ্ঘরূপে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের স্থাপনা সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উত্তরকালের একাধিক জননায়ক এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ভবিষ্যৎ জীবনের শিক্ষানবিশী লাভ করেন। এই সময় বেঙ্গল ন্যাশানাল লীগ নামেও একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু শীঘ্রই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তার স্থান লাভ করে। বোম্বাই ও মাদ্রাজেও কিছু কিছু এইরূপ সঙ্ঘ গড়ে ওঠে। শিক্ষিত জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিস্তারে এই সকল প্রতিষ্ঠানের অবদান কিছু নগণ্য নহে।

(৪) দেশাত্মবোধের সূচনা

আইনজীবী এবং বার্ত্তাজীবীদের মধ্য দিয়েই প্রথম থেকে ভারতের শিক্ষিত জনমত অভিব্যক্ত হতে শুরু করে। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় ক্রমশঃই সমালোচনা-মূলক জনমত প্রকাশ পেতে থাকে। ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা যাতে গঠনমূলক পথে পরিচালিত হয় সেই উদ্দেশ্যে বড়লাট লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু তাঁর শাসনকালেই এদেশে বসবাসকারী ইয়োরোপীয়গণ ইলবার্ট বিল সম্পর্কে যে মনোভাব প্রদর্শন করেন তাতে লর্ড রিপনের প্রতি ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধি পেলেও ভারতের জনমত ইয়োরোপীয় শাসনের বিরুদ্ধে অত্যধিক বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর সমালোচনা আরও উগ্র হয়ে ওঠে এবং ভারতের নেতৃবৃন্দ কিছু কিছু আন্দোলন শুরু করে।

এই সময়ে প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও জননায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করে একটি প্রতিনিধিমূলক জাতীয় অধিবেশনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স নামে প্রথম এইরূপ একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার অ্যালবার্ট হলে এবং বাংলা ব্যতীত বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিগণও এই সভায় যোগদান করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আনন্দমোহন বসু। সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন যে, এই অধিবেশনে ভারতের জাতীয় পার্লিয়ামেন্টের ভিত্তি স্থাপিত হল। এই সময় প্রগতিশীল ইয়োরোপীয়দের মধ্যে অনেকে ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সমালোচনা যাতে যথাযথভাবে অভিব্যক্ত হয় এবং গঠনমূলক দিকে প্রবাহিত হয় সে সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করেন। অ্যালান হিউম ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হিউম ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত ছিলেন। জনগণের অসন্তোষ বৃদ্ধি এবং স্থানে স্থানে গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিকট বিস্তর পুলিশ রিপোর্ট প্রেরিত হয়। উত্তর প্রদেশের লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর অকল্যাণ্ড কলভিনকে লিখিত এক পত্রে হিউম জনগণের অসন্তোষের একাধিক কারণ বিশ্লেষণ করেন। কঠোর রাজস্ব ব্যবস্থা, অপমানকর অস্ত্র-আইন, আদালতে বিচারের খরচ ও অসুবিধা, পুলিশের অসাধুতা ও অত্যাচার প্রভৃতিকে তিনি জনগণের অসন্তোষের প্রধান কারণরূপে নির্ণয় করেন। ১৮৮৫ সালের প্রথম দিকে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডাফরিনের সহিত এই সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য তিনি সিমলায় গমন করেন এবং দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি বছর সমবেত করার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। ডাফরিনের সম্মতি গ্রহণ করে হিউম এইরূপ সমাবেশের আয়োজন করেন। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ৭২ জন প্রতিনিধি নিয়ে বোম্বাই শহরে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। এই সমাবেশই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামে পরিচিত হয় এবং স্থির হয় যে প্রতিবছরই জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে। ঠিক এই সময় কলকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই সভার সদস্যগণ জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি। কিছুদিন পরে জাতীয় কংগ্রেস ও ন্যাশন্যাল কনফারেন্স একীভূত হয় এবং ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতাতেই জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে প্রতিবছরই জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই সকল অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস ভারতে প্রতিনিধিমূলক নিয়মতান্ত্রিক শাসনের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন করতে শুরু করে।

Q. 3. Analyse the circumstances leading to the foundation of the Muslim League in 1906.

Ans. ভূমিকা ঃ

বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশকে মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি লাভের দাবি করে। ব্রিটিশ সরকার মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র এই দাবি স্বীকার করে নেয় এবং মুসলিম লীগের 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' মতবাদের ভিত্তিতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ All India Muslim League প্রতিষ্ঠা হওয়ার মূল কারণ তিনটি। প্রথমতঃ, ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য দাবি করার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রায় বিশ বছর যাবৎ স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদের নেতৃত্বে, দ্বিজাতি তত্ত্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূল ভিত্তি রূপে দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ, ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত নীতি divide et impera—অর্থাৎ শাসিত জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির নীতি সম্প্রদায়কে নানারূপ সুযোগ-সুবিধা দান করে তাদের শাসক গোষ্ঠির সমর্থকে পরিণত করা।

মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে দুটি বিষয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। প্রথমতঃ, গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আমলে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। মুসলমান সম্প্রদায় কার্জনের এই নীতি সমর্থন করে ও প্রজাহিতৈষী ব্যবস্থারূপে বর্ণনা করে। অপরদিকে হিন্দুসম্প্রদায় সরকারী এই নীতিকে জাতীয়তাবাদের অনিষ্টকারী বলে মনে করে। "It (the Partition of Bengal) was drive a wedge between the two communities (Hindus and Muslims) and to create a new Mohammedan province in which the Government was to be conducted on the basis of creedal differences," দ্বিতীয়তঃ, ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে সিমলা নগরে তদানীন্তন ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো স্যার আগা খান পরিচালিত মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এই স্মারকলিপিতে তাঁরা মুসলমানদিগকে চিরকাল অকিঞ্চিৎকর সংখ্যা লঘিষ্ঠের মর্যাদায় ফেলে রাখা হবে না, এই মর্মে ব্রিটিশ সরকারের নিকটে আশ্বাস ভিক্ষা করেন এবং রাজনৈতিক জীবনে মুসলমানদিগকে সংখ্যার তুলনায় যাতে অধিকতর মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করা হয় সেজন্য অনুরোধ জানান। বড়লাট মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করার আশ্বাস প্রদান করেন। এই সাক্ষাৎকারের সমস্ত বিষয়টিই সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং এই

ঘটনাকে লেডি মিণ্টো "an epoch in Indian History" বলে বর্ণনা করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময়ই লর্ড মিণ্টো মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থার কথাও স্বীকার করে নেন ; ফলে স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদের দ্বিজাতি তত্ত্ব ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে।

(২) ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ঢাকা সম্মেলন

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় সভা-সমিতির মাধ্যমে আলিগড় আন্দোলন বিস্তার ও জনপ্রিয়তা লাভের সুযোগ পায়। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ সুনিয়ন্ত্রিত-ভাবে এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। বিশেষতঃ ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়-নীতির উপর গভীর আস্থা থাকার জন্যই তিনি সংগঠিত উপায়ে আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন তাঁর ইংরেজ বন্ধু-বান্ধবগণ এবং আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ মিস্টার মরিসন। তবে স্বতন্ত্র পৃথক কারণেই তাঁরা স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদের মত সমর্থন করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন সংগঠন গড়ে উঠলে তাও অল্পদিনের মধ্যেই জাতীয় কংগ্রেসের মতো ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে উঠবে। মুসলিম সম্প্রদায় চিরদিনই যে ইংরেজদের অনুগত থাকবে সুনিশ্চিতভাবে এই মত পোষণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদের মৃত্যুর পর নবাব মহসীন-উল-মুলক আলিগড় কলেজের সম্পাদক হন। তিনিও স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদের নীতিই অনুসরণ করেন। স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ ও নবাব মহসীন-উল-মুলকের নীতির ফলেই নিখিল ভারত মুসলিম সংগঠনের কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায় নি।

কিন্তু ১৯০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দে একদল মুসলিম নেতা একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন একান্তভাবে উপলব্ধি করেন। জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সমর্থনে হিন্দু নেতৃবর্গ ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সরকারী নীতি সমর্থন ও কংগ্রেসের আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করেন। তাছাড়া এই সময় রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও আইন-পরিষদ পুনর্গঠনের প্রস্তাবও সরকারের বিবেচনাধীন ছিল, সুতরাং মুসলমানদের স্বার্থ নিরাপদ করার জন্যও একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। সিমলায় লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে আগা খানের নেতৃত্বে মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় তাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ঢাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করা হয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু মুসলিম প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। বঙ্গভঙ্গ নীতি কার্যকরী করার ব্যাপারে লর্ড কার্জনের অন্যতম প্রধান সাহায্যকারী ঢাকার নবাব সলিম-উল্লা মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে তোলার জন্য সমবেত প্রতিনিধিদের নিকট আবেদন করেন।

স্থানীয় সংগঠন অনেক সময় নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করে। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতা এবং রাজনীতিতে উৎসাহী মুসলিম তরুণদের আকর্ষণ করার জন্য মুসলমানদের পক্ষে একটি রাজনৈতিক সংগঠন করা একান্ত প্রয়োজন।".... এই সংস্থার মূল নীতিরূপে ঘোষিত হয়—

"Support, whenever possible, all measures emanating from the Government, and to protect the cause and advance the interest of our co-religionists throughout the country to controvert the growing influence of the so-called 'Indian National Congress' which has a tendency to misinterpret and subvert British rule in India, or which might lead to the deplorable situation and to enable our youngmen of education, who for want of such an association have joined the Congress, to find scope, according to their fitness and ability, for public life." এই রাজনৈতিক আদর্শ ও চিন্তাধারা সমবেত মুসলিম নেতৃবর্গের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৩০ তারিখে তাঁরা নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সংস্থার সংবিধান তৈরী করার জন্য নবাব মহসীন-উল-মুলকের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর করাচি সম্মেলনে এই সংবিধান গৃহীত হয়।

(৩) নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কর্মসূচি

নবগঠিত মুসলিম লীগের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; যথা,—(১) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলিম জনসাধারণের আনুগত্য বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা এবং ব্রিটিশ সরকারের নীতি সম্পর্কে জনসাধারণের মনে কোন প্রকার ভুল ধারণার সৃষ্টি হলে তা দূর করার চেষ্টা করা; (২) মুসলমানদের অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষা ও বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা এবং সরকারের নিকট দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা যথাযথভাবে প্রকাশ করা; এবং (৩) অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে কোন প্রকার বিদ্বেষের সৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থা করা।

মুসলিম লীগের তৃতীয় উদ্দেশ্যটি ছিল সম্পূর্ণ নেতিবাচক। কারণ মুসলিমদের রাজনৈতিক এই সংস্থাটির কর্মসূচীর মধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্য, সংহতি ও মিত্রতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার কোন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয় নি। যদিও মুসলিম লীগ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলার বিরোধী ছিল না, তথাপি হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়দের স্বার্থে প্রয়োজনীয় দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একান্ত অপরিহার্য রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের প্রতি এই সংস্থার কোন প্রকার আগ্রহ ছিল না। বিশেষতঃ জাতীয় কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতা করাই ছিল এই সংস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য;

জাতীয় কংগ্রেস এই সময় ব্রিটিশ সরকারকে দুর্বল করে তোলার জন্য বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে এবং প্রতিনিধিমূলক সরকার, একই সঙ্গে লণ্ডন ও ভারতে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবি ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করতে শুরু করে। কিন্তু মুসলিম লীগ কংগ্রেসের এই সব দাবিকে তাদের স্বার্থবিরোধী বলে বিবেচনা করতে শুরু করে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত রাখার দিকেও মুসলিমদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল, কারণ তাঁদের পক্ষে হিন্দুদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সহ্য করা একেবারেই অসহ্য ছিল। সুতরাং মুসলিম লীগের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতের সমস্ত মুসলমানই ব্রিটিশের অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীরূপে নিজেদের রক্ত ও প্রাণের বিনিময়েও ব্রিটিশ শাসন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রস্তুত হয়,—"a British army ready to shed their blood and sacrifice their lives for the British Crown." মুসলমান সম্প্রদায়ের এই মনোভাব ওয়াহাবি আন্দোলনের আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত এবং স্যার সৈয়দ আহমেদের চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি মাত্র।

(৪) উপসংহার

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, মুসলিম লীগ স্থাপন ও লর্ড মিন্টোর মুসলিম সম্প্রদায়কে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দেওয়ার ফলে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করে। "The foundation of the Muslim League and Minto's a concessions had the effect of dividing the Hindus and the Muslims in almost two hostile camps." ঐতিহাসিক গ্রিফিথের মতে মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার ফলে মুসলমানগণ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তাদের স্বার্থ হিন্দুদের স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়। মুসলিম লীগ গঠনের উপর ব্রিটিশ সরকারও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে এবং জাতীয় কংগ্রেস বিরোধী এইরূপ একটি সংস্থা গঠনের ফলে তারাও খুব উল্লাস প্রকাশ করে। মুসলিম লীগ গঠনের পর একজন রাজকর্মচারী মন্তব্য করেন, "এইরূপ একটি রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক কার্যের ফলে ভারতের ইতিহাস বহুকাল ধরে প্রভাবিত হবে। মুসলিম লীগ গঠনের ফলে ছ'কোটি বিশলক্ষ লোককে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরোধী দলের সংস্রব হতে বিচ্ছিন্ন করার সমতুল্য।" ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের এই ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়।

Q. 4. Comment on the class character of Muslim League leadership. Review the early years of the League.

Ans. (১) **মুসলিম লীগের প্রকৃতি**

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ উগ্র সাম্প্রদায়িক ও সংরক্ষণশীল সংস্থা রূপে গঠিত হয়। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আলিগড়েই প্রথম রাজনৈতিক

আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও আলিগড় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের নিষ্ক্রিয়তায় তরুন মুসলিমদের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে আলিগড় আন্দোলনের নেতৃবর্গ বয়সে প্রবীণ ও চিন্তাধারায় অত্যন্ত সংরক্ষণশীল ছিলেন। এই সব প্রবীণ ব্যক্তিদের দ্বারাই সিমলায় গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। সাধারণ মুসলমান সমাজের সঙ্গে এই সব প্রতিনিধিদের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। এই সব প্রতিনিধিগণ জমিদার, উকিল, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং জেলা ও স্থানীয় পরিষদের সদস্যদের দ্বারা একটি নির্বাচক সমিতি (electoral college) গঠন করেন। ফলে এই নির্বাচক সমিতির মধ্যে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর মুসলমানদের কোন প্রতিনিধি ছিল না এবং এই নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা উপরিউক্ত শ্রেণীসমূহের কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হওয়ার কোন সুযোগও ছিল না। তাছাড়া সিমলায় বড়লাটের সাক্ষাৎ প্রার্থীগণ মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন নি, স্বয়ং নিযুক্ত ব্যক্তিরূপেই তাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রতিনিধি দলের আটজন ছিল বিভিন্ন নবাব পরিবার অথবা তাঁদের মন্ত্রীদের মধ্য থেকে মনোনীত এবং ছ'জন ছিল জমিদার পরিবারের সন্তান। উত্তর প্রদেশের তথাকথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে মাত্র দুজন উকিল এই দলে স্থান লাভ করেন। লর্ড মিণ্টো ও তাঁর অধীনস্থ ব্রিটিশ আমলারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে প্রধানতঃ প্রাচীন পন্থী সংরক্ষণশীল মুসলমানদের জন্য আসনবৃদ্ধি করার পক্ষপাতী ছিলেন।

পরবর্তীকালে সিমলা সাক্ষাৎকারের প্রতিনিধিবর্গই ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিলভারত মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশনের অস্থায়ী কমিটিতে স্থান লাভ করেন, তথাপি প্রথম থেকেই এই কমিটির নেতৃবর্গ কয়েকটি উপদলে বিভক্ত ছিলেন। উত্তর প্রদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ বাঙ্গলার নেতৃবর্গের প্রাধান্য স্বীকার করতে কোন ক্রমেই সম্মত ছিলেন না। নিখিলভারত মুসলিম লীগের অস্থায়ী কমিটির পঞ্চান্ন জন সদস্যের মধ্যে পঁচিশ জন ছিলেন আইন-ব্যবসায়ী। সরকারী পেন্সন প্রাপ্ত ও জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মতো উগ্র অযৌক্তিকভাবে তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাছাড়া, তদানীন্তন ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান প্রভাবশালী ব্যক্তি স্যার আগা খান রাজনীতি অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিই বিশেষভাবে যত্নশীল ছিলেন। ঢাকার নবাব সলিম-উল্লা খান সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ গঠনের জন্য মুসলীম লীগের প্রথম অধিবেশনে সমবেত প্রতিনিধিদের অনুরোধ জানালেও নব গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জমিদার স্বার্থরক্ষার দিকেই তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের অন্যতম প্রধান সহায়ক ও সমর্থক। সুতরাং নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম

সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য তিনি মুসলিম লীগকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। উত্তর প্রদেশের অন্যতম প্রধান নেতা মহসীন-উল-মুলক আলিগড় আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন। চিন্তাধারায় তিনি ছিলেন স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদের অনুগত শিষ্য। ব্রিটিশ শাসকদের ন্যায়পরায়ণতার উপর তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, সুতরাং ব্রিটিশ বিরোধীনীতি গ্রহণ করা অথবা স্বাধীনভাবে মুসলিম লীগের কর্মসূচী গ্রহণ করার নীতিও সমর্থন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অভিজাত ও ব্রিটিশের প্রতি অনুরক্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ ব্যতীত সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে ক'জন লোক মুসলিম লীগের কর্মপরিষদে স্থান লাভ করেন, ইচ্ছা থাকলেও স্বাধীনভাবে তাঁদের কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করার উপায় ছিল না। সুতরাং সাধারণভাবে মুসলিম লীগের কর্মপন্থায় উচ্চশ্রেণী সম্ভূত রক্ষণশীল মুসলমানদের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

(২) লীগের কার্যাবলী

প্রথম দিকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সংগঠন খুব দুর্বল ছিল এবং তার কার্যাবলীর মধ্যে কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকা সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে নিখিলভারত মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ঐ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উত্তর প্রদেশের মুসলিম নেতা নবাব মহসীন-উল-মুলকের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে তার উপর এই সংস্থার সংবিধান প্রস্তুত করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম লীগের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন করাচী শহরে আহূত হয় এবং ২৯শে ডিসেম্বর মুসলিম লীগের সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এই সংবিধান অনুসারে মুসলিম লীগের সদস্যদের সংখ্যা অনধিক চার'শ নির্দিষ্ট করা হয়। ফলে আর্থিক ব্যাপারে এই সংস্থা প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী নবাবদের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। মহামান্য আগা খান এবং আর্কটের নবাব মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করে মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করে তোলার ব্যবস্থা করেন।

মুসলিম লীগ প্রথম থেকেই জাতীয় কংগ্রেস বিরোধী অন্দোলন শুরু করে। সরকারের বঙ্গভঙ্গ নীতিকে এই সংস্থা উগ্রভাবে সমর্থন করে এবং এই নীতি মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে বলে প্রচার করতে শুরু করে। জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলন এবং বিদেশী পণ্যবর্জন নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ নানাভাবে বিরোধিতাও করতে শুরু করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে মুসলিম লীগের একটি শাখা স্থাপিত হয়। এই শাখার প্রধান সংগঠক ছিলেন আমীর আলি। মুসলিম লীগের লণ্ডন শাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে এবং আইন পরিষদের সংস্কার সম্পর্কে ভারত সচিবের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে আলিগড়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের দ্বিতীয় অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং অপর দিকে জাতীয়

কংগ্রেস পরিচালিত স্বরাজ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে একটি নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে মর্লি-মিন্টো সংস্কার অনুযায়ী আইন পরিষদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু নির্বাচনের সময় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রচণ্ড ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম লীগ তখনও রাজনৈতিক সংগঠনের কোন বৈশিষ্ট্যই লাভ করতে সমর্থ হয়নি। বর্ধিত আকারে নবগঠিত আইন পরিষদে মুসলিম লীগের কয়েকজন সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পেলেও, ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও স্থানীয় প্রভাবে তাঁরা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পান—তাঁদের নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে মুসলিম লীগের আদৌ কৃতিত্ব দাবি করার কোন কারণ ছিল না। আইন পরিষদের ভিতরেও মুসলিম লীগ শক্তিশালী দল হিসাবে পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয় এবং বঙ্গভঙ্গ রদের (Repeal of the Partition of Bengal) সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করাও মুসলিম লীগের সদস্যদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগের সহিত পরামর্শ করারও কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি।

ঐতিহাসিক হার্ডির মতে ব্রিটিশ সরকার প্রথম দিকে মুসলিম লীগের কার্যকলাপের প্রতি অত্যন্ত উদাসীন ছিল, কারণ মুসলিম লীগের অনেক দাবি দাওয়াই ছিল ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে খুব অসুবিধাজনক এবং অনেক সময় শাসকদের স্বার্থ-বিরোধী। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের অমৃতসর অধিবেশনে নির্বাচন সমিতি গঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং বিভিন্ন স্থানে এই নীতির প্রতিবাদে সভা-সমিতি আহ্বান করে। কিন্তু লর্ড মিন্টো মুসলিম লীগের এই প্রতিবাদ সভা-সমিতির জন্য অকারণে কোন প্রকার উদ্বিগ্ন হন নি। বিশেষতঃ ভারতসচিব লর্ড মর্লিকে এই নীতির বিপক্ষে মত না দেওয়ার জন্য তিনি মুসলিম লীগের মতামতকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। অপরদিকে টাইমস পত্রিকা ও ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের কয়েকজন সদস্যের সাহায্যে লণ্ডনে অবস্থিত মুসলিম লীগের শাখা লর্ড মর্লির উপর রাজনৈতিক চাপের সৃষ্টি করে।

প্রথম দিকে রাজনৈতিক চিন্তাধারার দৈন্য ও দূরদৃষ্টির অভাবের পরিচয় দিলেও, ধীরে ধীরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগ পায় এবং তার উচ্চাশাও নানাভাবে বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় মুসলিম সম্প্রদায় স্বতন্ত্র নির্বাচন এলাকা লাভ করতে সমর্থ হয়। ফলে তাদের দাবি আরও বেড়ে যায় এবং তারপর তাঁরা কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যই সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি করে। অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনে মুসলমানগণ কোন অংশ গ্রহণ করবে না। লর্ড মিন্টো মুসলিম লীগের মনোভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে একমাত্র ব্রিটিশ অনুগত মুসলিম লীগের সদস্যদের সিমলায় এক বৈঠকে আহ্বান করেন এবং সরকারী প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য তাঁদের নিকট আবেদন জানান। লর্ড মিন্টোর পরামর্শ অনুযায়ী বিহারের আলি ইমাম ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে লক্ষ্ণৌ শহরে মুসলিম লীগের একটি অধিবেশন

আহ্বান করেন এবং সরকারী প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার জন্য লীগের সদস্যদের অনুরোধ করেন। কিন্তু আলি ইমামের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং লীগের এই সভা কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। মুসলিম লীগের আচরণে লর্ড মিন্টোও খুব ক্ষুব্ধ হন এবং ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপাত্র হিসাবে মুসলিম লীগকে স্বীকার করতে অসম্মত হন।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রথম দিকের কার্যাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর হার্ডি মন্তব্য করেন, "Before 1911 the All Indian Muslim League was an amateur theatrical company playing not in a command performance perhaps, but to an invited audience" এই সময় কেন্দ্রীয় আইন সভায় সাতাশ জন সদস্যকে নির্বাচিত করার জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর মোট সদস্যসংখ্যা ছিল চার হাজার আটশ আঠারো জন এবং তার মধ্যে এক হাজার ন'শ একজন ছিল মুসলিম। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনের ফলে ব্রিটিশ সরকার এবং সংরক্ষণশীল মুসলিম নেতৃবর্গ তরুণ ও শিক্ষিত মুসলমানদের চরমপন্থী জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য মুসলিম সংস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ পায়, কিন্তু তাঁরা তরুণ মুসলমানদের উপর মুসলিম লীগের নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যই মুসলিম লীগ প্রথম দিকে ভারতের রাজনীতিতে কোনপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে সমর্থ হয় নি।

Q. 5. Examine the nature and different forms of opposition is the Bengal Partition of 1905.

Ans. (১) **বিরোধিতা**

বঙ্গ বিভাগ যা কার্জনের দ্বারা শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয়েছিল—জাগিয়ে তুলেছিল ব্যাপক প্রতিবাদ-আন্দোলন। একজন বিচক্ষণ শাসকের কর্তব্য এই ধরনের বিক্ষোভকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা—কিন্তু জনগণের এই বিরোধিতা কার্জনকে করে তুলল আরও অদম্য। এই বিক্ষোভ কার্জনের কাছে স্বার্থপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক এই আখ্যা পেল, আর বলা হল—এটা বাগাড়ম্বর ও অলঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উকিলসভার (Bar) বিরোধিতা কার্জনের কাছে মনে হল—ঢাকায় পৃথক হাইকোর্ট গঠনের ফলে কলিকাতার হাইকোর্ট উকিলসভার কায়েমী স্বার্থের যে ক্ষতি হবে তার ভয়ে। কিন্তু যদি তাই হবে, তাহলে পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা উকিলেরা এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করতেন না। এঁদের মধ্যে ছিলেন—ঢাকার আনন্দচন্দ্র রায়, শিলচরের কামিনীকুমার চন্দ ও বরিশালের দীনবন্ধু সেন।

তার পরে আসে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির কথা। সংবাদপত্রগুলি যে বিরোধিতা জানিয়েছিল সেটা কার্জনের মতে গ্রাহক হারানোর ভয়ে। এটা সত্য হলে একমাত্র

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ক্ষেত্রেই সত্য হতে পারত, কিন্তু 'সঞ্জীবনী,' 'সন্ধ্যা', 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র মতো অন্যান্য কাগজের ক্ষেত্রে নয়। আর 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া,' 'স্টেট্স্‌ম্যান' ও ইংলিশ ম্যান' সম্বন্ধে কি বলা চলতে পারে ?

কার্জনের মতে—জমিদারেরা বিরোধিতা করেছিলেন খাজনা হারানোর ভয়ে। এটা সত্য যে মৈমনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত, পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিনাজপুরের রাজা ও ভাগ্যকুলের জানকীনাথ রায় প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের আপত্তি ছিল যতটা খাজনা হারানোর জন্য তার চেয়ে ঢের বেশী তারা 'রেভিনিউ বোর্ডে'র এক্তিয়ারের বাইরে হয়ে যাবেন বলে।

সবশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে—কার্জনের মতে, মধ্যবিত্ত হিন্দুরা বিরোধিতা করেছিলেন কর্ম-সংস্থানের সুযোগ হারানোর ভয়ে।

প্রকৃতপক্ষে, এটা ছিল নবজাত আত্মসচেতন বাঙালী জাতীয়তাবাদের অনুভূতি উনবিংশ শতাব্দীর আলোক প্রাপ্তি থেকেই এই জাতীয়তাবাদ জন্ম নিয়েছিল আর আত্মপ্রকাশ করেছিল এই বিরোধিতার মাধ্যমে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতো নেতারা শাসন-ব্যবস্থার সুবিধার জন্য রাজ্যাংশের পুনর্গঠনের বিরোধী ছিলেন না। যদি হিন্দী-ভাষী অঞ্চলকে বাদ দিয়ে একটি হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত ঘন-সন্নিবিষ্ট বাংলা-ভাষাভাষী রাজ্য গঠন করা যেত তবে সেটা অনেক ভালো হত। কিন্তু এটা হবার উপায় ছিল না। লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্য ছিল—দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করানো যার দ্বারা তারা পৃথক হয়ে যায়। আর তা হলে কংগ্রেস সৃষ্ট জাতীয়তাবাদও দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯০০ সালে লিখিত কার্জনের অভিমত ছিল—'কংগ্রেস পড়ে যাওয়ার আগে টলছে'—আমার ভারতবর্ষে অবস্থান কালে যে বড় বড় অভিলাষগুলি আছে তার মধ্যে একটি হল—কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ অবসানের জন্য সহযোগিতা করা।'

(২) বিরোধিতায় অবলম্বিত পথ

ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে প্রধান অংশ নিয়েছিলেন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। নেতা ছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ সেন ও মতিলাল ঘোষ। সহরে ও গ্রামে সর্বত্রই প্রতিবাদ প্রদর্শিত হয়েছিল। এমন কি অতি সাধারণ মানুষও অনুপ্রাণিত হয়েছিলন। এই আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করেছিল বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মধ্যে। স্বদেশী শিল্পগুলিকে প্রেরণা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। ১৯০৫ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে এই বর্জনের নীতি সমর্থিত হল। দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়—তাতে দাবী করা হ'ল এই বিভাজন প্রত্যাহারের। এই বর্জন ও প্রতিরোধকে যেমন কর্মোদ্যমের দিক থেকে নেতিবাচক ধারণা বলা চলে—তেমনি স্বদেশী ও স্বরাজ এই আন্দোলনে যা অন্তর্ভুক্ত করেছিল তাকে ইতিবাচক বলা চলে। স্বদেশী বারংবার চেষ্টা করে শিক্ষায় স্বয়ং সম্পূর্ণতা, গ্রামোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধে ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছিল। জাতীয় বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর

গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনাতে হাত দিলেন। এই গঠন ও বর্জন সমস্ত দৃষ্টিকোণ মিলে মিশে একাকার হয়ে—সব কিছু পরিব্যাপক একটি ধারনার জন্ম দিল—যার নাম স্বরাজ।

(৩) বিরোধিতার শক্তিবৃদ্ধি

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের নির্দেশনামা ঘোষিত হয়। ১৬ই অক্টোবর এই নির্দেশনামা কার্যকরী করার কথাও সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হয়। সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর সঞ্জীবনী পত্রিকার মাধ্যমে বিদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে শপথ গ্রহণ করার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান। কলকাতা ও মফঃস্বল বাংলায় এই আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া তুলতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন স্থানে বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আহ্বান করা হয় এবং জনসাধারণ বিদেশী বস্ত্র বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বাংলাদেশের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের জন্য আবেদন করেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই আগস্ট কলকাতা টাউন হলে এক বিশাল জনসভা আহুত হয় এবং বিভিন্ন বক্তা এই সভায় সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁদের বক্তব্য থেকেই তখনকার বাংলাদেশের জনসাধারণের মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি রজনীকান্ত সেন এবং অন্যান্য কবি ও গীতিকারগণ তাঁদের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ তাঁদের বক্তৃতার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। জাতীয়তাবাদী মনোভাব সৃষ্টি করার ব্যাপারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। বাংলার সন্ধ্যা, যুগান্তর, নবশক্তি, বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিপ্লবের বাণী প্রচারিত হতে থাকে। এই আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী নারীরাও যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তাঁরা সভা-সমিতিতে যোগ দেন। স্কুল-কলেজের ছাত্র সভা-সমিতির আয়োজন করে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার চেষ্টা করে। জমিদার শ্রেণীর বহু ব্যক্তিও এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং আন্দোলনকারীদের মুক্ত হস্তে অর্থদান করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন সংঘ ও সমিতি গড়ে ওঠেন। এই সব সংগঠনের মধ্যে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা পরিচালিত ব্রতীসংঘ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নেতৃত্বে গঠিত বন্দেমাতরম্ সংঘ, দক্ষিণ কলকাতার তরুণদের দ্বারা পরিচালিত সন্তান সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৪) স্বদেশী আন্দোলন ও সরকারী নীতির বিরোধিতা

স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচি ছিল বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বদেশী-পণ্য শিল্পের ব্যবহার ও প্রচার এবং জাতীয় ভাবাদর্শের উন্মেষ সাধন। ঐ সময়ই প্রথম বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারিত হয়। স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী মনীষীদের উদ্যোগে জাতীয়

মেডিক্যাল কলেজ, জাতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) গঠিত হয় এবং রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক এই সংস্থাকে এক লক্ষ টাকা দান করেন। তাছাড়া এই আন্দোলনের ফলে বহু কাপড়ের কল, জাতীয় ব্যাঙ্ক, জীবন বীমা কোম্পানী, সাবান প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রীর কল-কারখানা বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে এই সময়ই বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা স্থাপিত হয়। স্কুল কলেজের ছাত্রদের সংগঠন অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি সরকারী বাধা-নিষেধ অমান্য করতে শুরু করে। জনপ্রিয় নেতা অশ্বিনী কুমার দত্ত ও চারণ কবি মুকুন্দ দাসের নেতৃত্বে বরিশাল জেলার অধিবাসীরা এই আন্দোলনে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

বরিশালের জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন স্বদেশ-বান্ধব সমিতি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে বরিশাল শহরে প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন আবদুল রসুল। রাসবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পুলিন বিহারী দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সুবোধকুমার মল্লিক প্রমুখ তৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট নেতারা ঐ সম্মেলনে যোগ দেন। সরকারী নিষেধ-আজ্ঞা অমান্য করে ঐ সম্মেলনে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারিত হলে ইংরেজ সরকারের গোর্খা রাইফেলস্ বাহিনীর আক্রমণে এই সম্মেলন ছত্রভঙ্গ হয়। সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবর্গের সকলেই গ্রেপ্তার হন। বঙ্গদেশের গণ-আন্দোলনের উপর ইংরেজ সরকারের সেই প্রথম পুলিশি নির্যাতন। এই ঘটনার পর বাংলার চরমপন্থী আন্দোলন গুপ্ত সন্ত্রাসবাদের পথ ধরে।

(৫) সন্ত্রাসবাদ

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মীয় মনোভাব যুক্ত হয়ে পড়ে। সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী তরুণ সম্প্রদায় কালী, গীতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। সন্ত্রাসবাদ ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু ব্রিটিশ রাজকর্মচারী গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই সময় বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সমিতিও গঠিত হয়। সন্ত্রাসবাদ দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার নানাপ্রকার দমনমূলক আইন প্রণয়ন করে। স্যার অ্যাণ্ড্ ফ্রেজার ও কিংসফোর্ডকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এই বছরেই বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসু, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনেকে গ্রেপ্তার হন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র সহ ন'জন জননেতাকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করে।

(৬) মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোভাব

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সরকার

বিশেষভাবে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে আবদুল রসুল, লিয়াকৎ হোসেন, আবদুল হালিম গজনভী প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু লর্ড কার্জন একলক্ষ পাউণ্ড ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ঢাকার নবাব সলিম-উল্লাকে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আনয়ণ করতে সমর্থ হন। শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায় সাধারণভাবে সরকারী নীতির বিরোধিতা করতে প্রস্তুত ছিল না। কলকাতা বিচারালয়ের সহিত জড়িত মুসলিম আইন-ব্যবসায়ীগণ আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করতে শুরু করেন। জাতীয় কেন্দ্রীয় মুসলিম সমিতি (National Central Muhammedan Association) বঙ্গভঙ্গের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করতে সম্মত হয় নি। এমন কি ঢাকার নবাব পরিবারও বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রথম পর্বে ঐক্যমত হতে পারে নি। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীগণ হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চনা ও ধর্মীয় মনোভাব জাগ্রত করার চেষ্টা করলে মুসলিমসম্প্রদায়ের মনে বিদ্বেষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের পক্ষে বন্দেমাতরম্ ও কালীর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা সম্ভব ছিল না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হলে মুসলিম সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গভঙ্গের সরকারী নীতিকে সমর্থন করতে শুরু করে।

(৭) উপসংহার

বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্রতাই শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারকে বঙ্গবিভাগ বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে। দিল্লীর দরবারের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ভঙ্গ বঙ্গ আবার যুক্ত হয়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এমন কি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য গান্ধীজির আবির্ভাব এবং জাতীয় আন্দোলন জনগণের আন্দোলনে পরিণত হওয়ার পূর্বেই আন্দোলনের নতুন কৌশল ও নীতি উদ্ভাবন করে তাকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হয়। স্বদেশী আন্দোলন, বিদেশী পণ্য বর্জন, শান্তিপূর্ণভাবে সরকারী নীতির বিরোধিতা করা এই সব অসহযোগিতামূলক আন্দোলনের কৌশল এই সময়ই প্রথম গ্রহণ করা হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ফলে ভারতের জাতীয় আন্দোলন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আন্দোলনের পরিবর্তে জনগণের আন্দোলনে পরিণত হয়। তবে এই আন্দোলনের সময় শ্রমিক, কৃষক ও মুসলমান সম্প্রদায় কোনরূপ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে নি। তথাপি বলা যায় যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই পরবর্তীকালের বৃহত্তর ও ব্যাপক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

Q. 6. What is ment by composite and secular nationalism? Trace the growth of the concept between 1905 and 1916.

Ans. (১) **বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতের জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি**

ভারতের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বৈচিত্র্যময় ও বিভিন্ন উপাদানে গঠিত এবং ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারা সব সময়ই অত্যন্ত বিতর্কমূলক

বিষয়রূপে বিবেচিত হয়। বৈচিত্র্যময় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের মূলকথা ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও সমস্ত ভারতবাসী-ই একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই সব পার্থক্যের কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই—তথাপি এই পার্থক্য সমস্ত ভারতবাসীকে নিয়ে একটি জাতি গঠনের পথে কোনক্রমেই প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দিতে পারে না। আঞ্চলিক এবং অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, আধুনিক যুগেও সেই বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতের কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন প্রকার অধিবাসীর মধ্যে ঐক্য বা মিলনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষতঃ প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক যুগের ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক পার্থক্যের জন্য সাংস্কৃতিক ঐক্য গঠন করার ব্যাপারে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। তবে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক জগতে নয় রাজনৈতিক জগতেও বিভিন্ন সময় আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের সম্রাট অশোক এবং সমুদ্রগুপ্ত ও মধ্যযুগের ভারতের সম্রাট আকবরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। শাসনতান্ত্রিক এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে ভারতের এই সমস্ত শাসকবর্গ সমগ্র ভারতবাসীর মনে ঐক্যবোধ জাগ্রত করে তোলার চেষ্টা করেন।

(২) বৈচিত্র্যময় জাতীয়তাবাদ বনাম স্বাতন্ত্র্যবোধ

ব্রিটিশ শক্তি বহুধা বিভক্ত ভারতবর্ষের নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে এবং ধীরে ধীরে শাসনতান্ত্রিক এবং অন্যান্য উপায়ে সমগ্র ভারতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও ঐক্যবোধ স্থাপন করার ব্যবস্থা করে। বিদেশী ইংরেজ সরকার ভারতের উপর নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও ভারতবাসীর ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পার্থক্যের উপর অকারণে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করে। তাদের মূল বক্তব্য ছিল যে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষ থেকে বিদায় গ্রহণ করলে বিভেদপন্থী শক্তিসমূহ পুনরায় জাগ্রত হয়ে উঠবে এবং ভারত ও ভারতবাসী আবার নতুন বিপদের সম্মুখীন হবে। বিভেদ পন্থীর শক্তির পুনরুত্থানের ফলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাও শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আধুনিক যুগের ভারতের বৈচিত্র্যময় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের সৃষ্টির প্রথম সূচনা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাগণ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করেন এবং সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারা প্রচার করতে শুরু করেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি তাঁর ভাষণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপর

বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। "The eradication by direct friendly personal intercourse of all possible race, creed or provincial prejudices amongst all lovers of the country and the fuller development and consolidation of those sentiments of national unity..." কিন্তু ব্রিটিশ সরকার অথবা মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই জাতীয় কংগ্রেসকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীর একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ এবং অন্যান্য মুসলিম নেতৃবর্গের প্ররোচনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠ অংশই জাতীয় কংগ্রেসের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টা করে। জাতীয় কংগ্রেস থেকে মুসলিম সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি অনুসরণ করতে শুরু করলে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়, কারণ ভারতীয়দের ঐক্যবোধ ও জাতীয়তাবাদই ছিল তাদের রাজ্য শাসনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক শত্রু। বিশেষতঃ, নিজেদের স্বার্থের জন্যই ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তারা একটি জাতিরূপে স্বীকার করতেও সম্মত ছিল না। তাদের মতে পরস্পর বিরোধী আচার-ব্যবহার রীতিনীতির দ্বারা ভারতের সমাজ বহুভাগে বিভক্ত—সুতরাং ভারতের অধিবাসীরা একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়, ভারতীয়দের বহু জাতির সমষ্টি বলাই যুক্তিযুক্ত। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গের দ্বারা প্রচারিত ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে ধ্বংস করার জন্য তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের সহিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাদের মুসলিম প্রীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয় ঐক্য বোধকে সমূলে উৎপাটিত করা। অপরদিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টির ফলে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ স্থাপিত হলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পার্থক্য আরও বৃদ্ধি পায়। জাতীয় কংগ্রেস থেকে শিক্ষিত মুসলিম তরুণদের বিচ্ছিন্ন করাই ছিল মুসলিম লীগের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের মর্লি-মিন্টো সংস্কার প্রবর্তিত হয় এবং এই শাসনতান্ত্রিক সংস্কারেই সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সময় থেকেই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে।

(৩) মুসলিম সম্প্রদায় ও ভারতের জাতীয়তাবাদ

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি এবং মর্লি-মিন্টো সংস্কারের ফলে ভারতের বৈচিত্র্যময় জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মনোভাবও জাতীয়তাবাদের শক্তিবৃদ্ধির পথে অন্যতম বাধা রূপে দেখা দিতে শুরু করে। কিন্তু এইরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবর্গ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে নবাব সাদিক আলি খান লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে মর্লি-মিন্টো সংস্কারের কুফল আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "The principle of class and religious representation is a most mischievous feature of the scheme... It is not good for the Mohammedans to be taught that their

political interests are different from those of Hindus···From a Mohammedan standpoint, too, ...that principle is fraught with mischief". রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মুসলিম নেতৃবর্গ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন প্রথার ত্রুটি সম্পর্কে যে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন উপরি উক্ত মন্তব্য তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বহন করে। ঐ সম্মেলনে একজন মুসলিম বক্তা এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনীপ্রথা ভারতের জাতীয় ঐক্যের পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করবে। তাঁর মতে, "In the order that we may not succeed in our efforts to unite India in one nation, it is suggested that there must be separate Mohammedan electorates. This will promote disunion, ···but if we were elected by a common electorate we shall come into close contact." ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে র‍্যামজে ম্যাগডোনাল্ড মন্তব্য করেন যে, "···some of the far-seeing members of the Mohammedan community are already beginning to feel that they have made a mistake" ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুস্থান রিভিয়ু পত্রিকায় মন্তব্য করেন," "The attempt on part of my co-religionists to create an irreconciliable ulcer in India is not very laudable."

(৪) মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের মর্লি-মিন্টো সংস্কারের ফলে মুসলিম সম্প্রদায় কতকগুলো বিশেষ সুযোগ পেলেও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে নির্বাচিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সদস্যবৃন্দ বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। এমনকি ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে যখন ভঙ্গবঙ্গ আবার যুক্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ব্রিটিশ সরকার আইন পরিষদের মুসলিম সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করারও কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি। ব্রিটিশ সরকারের এইরূপ ব্যবহারে মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং দুই বঙ্গ পুনরায় যুক্ত করার প্রসঙ্গে নবাব মুস্তাক হোসেন ভিকর-উল-মুলক বাহাদুর যে মন্তব্য করেন তার মধ্যেই মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, "So far as the Musalmans are concerned, if may be understood to be the consensus opinion that this re-union is generally disliked. In face of the assurances repeatedly given by successive ministers of the Crown as to the partition being a 'settled fact', the amalgamation betrays the weakness of the Government and will in future, be regarded as one of the reasons for placing no trust in its utterances and actions." প্রকৃতপক্ষে সুযোগসন্ধানী-মুসলিম-নেতৃবর্গ ব্রিটিশ সরকারের নিকট যতটা সুযোগ প্রত্যাশা করেন তা পূরণ না হওয়ার ফলেই তাঁরা ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেন। ১৯১২-১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের মোহম্মদ আলির সমর্থকগণ নিখিলভারত মুসলিম লীগের

লক্ষ্নৌ অধিবেশনে ভারতীয়দের জন্য 'উপযুক্ত' স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সময় ভারতের গভর্ণর লর্ড হার্ডিঞ্জ Mr. Crewe-কে জানান "রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ হিন্দুদের সহিত ঐক্যবদ্ধ হতে সম্মত হয়েছে।" মুসলমানদের আনুগত্যের উপর নির্ভর করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে যে আর সম্ভবপর নয় সেকথাও তিনি অকপটে স্বীকার করেন। "We can no longer count on the loyalty of the Mohammedan community as a whole The extreme faction of the community will now join any other faction in opposition to the Raj"

(৫) **লক্ষ্নৌ চুক্তি**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেনের বিপক্ষে তুরস্ক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে ভারতীয় মুসলিমগণ ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে ওঠে। সুতরাং মুসলিম লীগ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করতে শুরু করে। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই লক্ষ্নৌ শহরে তাদের বার্ষিক সম্মেলনে মিলিত হয়। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের বিখ্যাত লক্ষ্নৌ চুক্তি অনুযায়ী কংগ্রেস মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকার করে নেয় এবং উত্তর প্রদেশে, বিহার, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আইন পরিষদের মোট আসনের যথাক্রমে ৩০, ২৫, ৩৩ ও ১৫ শতাংশ মুসলমানদের দিতে সম্মত হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে যথাক্রমে ৪০ ও ৫০ শতাংশ আসন মুসলিমদের দেওয়া হয়। তবে লক্ষ্নৌ চুক্তির উদ্যোক্তা ছিলেন বিশেষভাবে উত্তর প্রদেশের তরুণ মুসলিম নেতৃবর্গ। তাছাড়া মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের' জন্য একটি সংবিধানের খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করে, তবে মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা স্বীকার করে কংগ্রেস তার পূর্ববর্তী ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের নীতি পরিত্যাগ করে। গোঁড়া মতাবলম্বী মুসলিমগণ হিন্দু-মুসলিম প্রীতি ও লক্ষ্নৌ চুক্তি পছন্দ করতে পারেন নি। বিশেষতঃ কিছুদিনের মধ্যেই খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হলে ধর্ম পুনরায় ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ পায়।

Q. 7. What led to the repeal of the Partition of Bengal? Was the King Emperor in any way responsible for it?

Ans. (১) **দিল্লীর দরবারের প্রয়োজনীয়তা**

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজকীয় দরবারে ইংলণ্ডেশ্বর ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের এক ঘোষণা অনুযায়ী বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার করা হয়। এই ঘোষণার ফলে ভঙ্গ বঙ্গ আবার যুক্ত বঙ্গে পরিণত হয়। দিল্লী দরবারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের সঙ্গে ইংলণ্ডেশ্বরের সম্পর্ক পুনরায় সৌহার্দ্যপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা। ব্রিটিশ সরকারের ধারণা হয় যে দীর্ঘ কয়েক বছরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে ভারতীয়দের মনে ইংলণ্ডেশ্বরের প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন এবং ব্রিটিশ শাসন

সম্পর্কে তাঁদের ধারণা যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি পুরাতন আস্থা পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে দ্রুত কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অপরদিকে চরমপন্থী নেতৃবর্গ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বদাই কঠোর সমালোচনা মুখর এবং ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত কঠোর দমনমূলক নীতির দ্বারা রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ দূর করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে বাংলাদেশের মেদিনীপুর ও পূর্ববঙ্গে সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রচণ্ড অবনতি দেখা দেয়।

(২) মিণ্টোর নীতি

লর্ড কার্জনের উত্তরাধিকারীরূপে লর্ড মিণ্টো ভারতের শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ভারতে এসেই জাতীয়তাবাদী ও বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দমন করার জন্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেন। লর্ড কার্জনের অনুসৃত কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। নানারূপ রাজনৈতিক অশান্তির প্রধান উৎস বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যবস্থার রদ করারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করে শাসিতদের শুভেচ্ছা অর্জন করার চেষ্টা করেন। তবে ব্রিটিশ সরকারের কোন প্রকার দুর্বলতা অথবা স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি দেওয়ারও পক্ষপাতী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে লর্ড কার্জনের মতো তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তিকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেন যে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অনেক গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পায় এবং দমনমূলক নীতির পরিবর্তে রাজনৈতিক উপায়ে এই আন্দোলনের মোকাবিলা করাই ব্রিটিশ সরকারের একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি চরমপন্থীদের শক্তি খর্ব করার জন্য নরমপন্থীদের নানাভাবে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করার চেষ্টা করেন। বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই চরমপন্থীদের শক্তি ও জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং লর্ড মিণ্টো বঙ্গ ভঙ্গ রদ করে চরমপন্থীদের শক্তি হ্রাস করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

(৩) বঙ্গ-ভঙ্গ সম্পর্কে ইংলণ্ডের রাজনীতিবিদদের ধারণা

ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দল কখনও বঙ্গ-ভঙ্গ পছন্দ করতে পারে নি। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড মর্লি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, (the Partition) "was and remains undoubtedly an administrative operation which went wholly and decisively against the wishes of most of the people concerned." ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড মর্লি হাউস অফ লর্ডস-এ স্বীকার করেন যে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার না করার জন্য তাঁর বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। কিন্তু ভারতের ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় লর্ড মর্লি বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করতে ভয় পান। তাছাড়া তিনি মনে করেন যে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করা হলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের ধারণা জন্মাবে যে উদারনৈতিক দল ভারত

সম্পর্কে তাদের মত পরিবর্তন করতে প্রস্তুত। সুতরাং বঙ্গ ভঙ্গের প্রতিক্রিয়া সম্যক-রূপে উপলব্ধি না করে তিনি ব্রিটিশ সরকারের নীতি পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

(৪) ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দল

ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দল ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ থেকেই বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে সরকারী এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য তারা একটি উপযুক্ত সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে দীর্ঘ প্রত্যাশিত এই সুযোগ পাওয়া গেল। লর্ড হার্ডিঞ্জ নতুন ভাইসরয় হিসাবে ভারতের শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ইতিমধ্যেই মর্লি-মিণ্টো সংস্কার কার্যকরী করা হয় এবং বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনও বহুলাংশে স্তিমিত হয়ে পড়ে। সুতরাং ওই অনুকূল পরিবেশে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ ব্রিটিশ সরকারের দুর্বলতা অপেক্ষা ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক রূপেই ভারতীয়দের নিকট পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে। বঙ্গ ভঙ্গ প্রত্যাহারের সঙ্গেই কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মোগলদের রাজধানী দিল্লীতে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী স্থাপন করে ইংরেজ শাসকগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি বিধানের এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করেন।

(৫) হার্ডিঞ্জের নীতি

লর্ড হার্ডিঞ্জ গভর্নর জেনারেলরূপে ভারতে পদার্পণ করার পূর্বেই বঙ্গ-ভঙ্গ রদ ও রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত লণ্ডনে গৃহীত হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় লণ্ডনেই উপস্থিত ছিলেন। ভারতে পদার্পণ করার পর তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখীন হন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আন্দোলন স্থগিত রেখে ব্রিটিশ সরকারের নিকট একখানি স্মারকলিপি পেশ করতে পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের পঁচিশটি জেলার মধ্যে আঠারোটি জেলার প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরসহ যথারীতি একখানি স্মারকলিপি অবিলম্বে পেশ করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে এই স্মারকলিপিতে উপস্থাপিত অনেক যুক্তিই সরকার বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার ন্যায়সঙ্গত কারণরূপে স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

বঙ্গ-ভঙ্গ রদ ও দিল্লীতে রাজধানী পুনঃস্থাপন সম্পর্কে লর্ড হার্ডিঞ্জের বিবরণ থেকে থেকে প্রকৃত ঘটনার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হার্ডিঞ্জ বঙ্গ-ভঙ্গ সম্পর্কে নীতি পরিবর্তন করার জন্য ভারত সচিব Lord Crewe-র নিকট থেকে একটি বার্তা পান। বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ভারতীয় নেতাদের সন্তুষ্টি-বিধান করাই ছিল Lord Crewe-র প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁর প্রস্তাব ছিল ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হাতে বাংলাদেশের শাসনদায়িত্ব অর্পণ করা এবং কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভাইসরয়ের প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তন করা। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দায়িত্ব লর্ড ক্রুর প্রস্তাব অনুযায়ীই সম্রাট পঞ্চম জর্জের উপর অর্পণ করা হয়।

লর্ড হার্ডিঞ্জও মনে করেন যে অন্যায় এবং অসঙ্গতভাবে বঙ্গ-ভঙ্গ করে যে, রাজনৈতিক

অশান্তির সৃষ্টি করা হয় বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করেই তা দূর করা সম্ভব। বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের সর্বত্র চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং বাংলাদেশের সরকারের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বাংলাদেশে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপনের জন্যই কোন একটি দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার জন জেনকিনস্ ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জুন লর্ড হার্ডিঞ্জকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত করার অনুরোধ করে এক বার্তা পাঠান। তাঁর এই বার্তায় তিনি বলেন যে, "The transfer of the capital from Calcutta to Delhi would be a bold stroke of statesmenship which would give universal satisfaction and mark a new era in the history of India" লর্ড হার্ডিঞ্জ স্যার জেনকিনসের প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে জুলাই একান্ত গোপন রাখার শর্তে লর্ড ক্রুকে সমস্ত বিষয়টি বিশদভাবে জানান। ৭ই অগাস্ট লর্ড ক্রু ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রস্তাব কার্যকরী করার সম্মতি দেন এবং তাঁকে জানান, "entire support and full authority proceed."

ইতিমধ্যে লর্ড ক্রু পঞ্চম জর্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত পরিকল্পনা বিশদভাবে তাঁর কাছে প্রকাশ করেন। পঞ্চম জর্জও সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং তিনি স্বয়ং এই ঘোষণা করতে সম্মত হন। লর্ড ক্রু তারপর লর্ড মর্লি এবং লর্ড অ্যাসকুইথের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা উভয়ই ক্রুর পরিকল্পনার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। তবে এই পরিকল্পনার গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজন সম্বন্ধে সকলেই সম্মত হন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ্যে দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ কর্তৃক এই পরিকল্পনার কথা ঘোষিত হওয়ার পূর্বে ভারতের মাত্র ১২ জন ব্যক্তি এই পরিকল্পনার কথা জানতেন।

(৬) সমালোচনা

বঙ্গ-ভঙ্গ রদ ব্যবস্থা ভারতে ও ইংলণ্ডে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। লর্ড কার্জন এই নীতিকে সংবিধান-বিরোধী বলে বর্ণনা করেন। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য লর্ড মিন্টো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। তিনি মনে করেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের নিকট আত্মসমর্পণ করে ব্রিটিশ সরকার অনুগত মুসলিমদের স্বার্থ বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। হাউস অফ লর্ডসের সদস্যগণ বঙ্গ-ভঙ্গ রদের তীব্র সমালোচনা করেন। তবে লর্ড মর্লি ও লর্ড ক্রু সরকারী পক্ষ সমর্থন করে সমালোচকদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করতে সমর্থ হন। তবে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করা হলেও পুরাতন বঙ্গ দেশের সীমানা পুনরুদ্ধার করা হয় নি—নতুন করে বঙ্গদেশ নামে একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। এই প্রসঙ্গে P. E. Roberts-এর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। "These changes were striking and drama-

tic ... The re-union of Bengal was said to be not a reversal of the partition but a rearragement after experience—a statement hardly consistent with facts."

(৭) **পঞ্চম জর্জের দায়িত্ব**

ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জ বঙ্গ-ভঙ্গ রদের প্রস্তাবক বা উদ্যোক্তা নন। ইংলণ্ডের সংবিধান অনুযায়ী রাজা রাজত্ব করেন ; কিন্তু শাসন করেন না। শাসন বিভাগের তিনি প্রধান হলেও তিনি নামমাত্র ক্ষমতার অধিকারী। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে Royal Titles Act অনুযায়ী ইংলণ্ডের রাজা বা রানী ভারতের সম্রাট উপাধি লাভ করলেও শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে তাঁর ক্ষমতার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নি। ভারতের শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করারও তাঁর কোন অধিকার ছিল না। ভারতীয়দের মনে অহেতুক শ্রদ্ধা ও ভক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের রাজাকে ভারতে সম্রাট রূপে ঘোষণা করা হয়। রাজতন্ত্রের প্রতি অনুগত ভারতীয়গণ ও ইংলণ্ডের রাজাকেই নিজেদের প্রধান শাসকরূপে মনে করতে অভ্যস্ত ছিল। সুচতুর ব্রিটিশ সরকার নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও ভারতীয়দের মনস্তুষ্টির জন্য ইংলণ্ডের রাজার ব্যক্তিগত প্রভাব রাজনীতিতে ব্যবহার করে ভারতের অশান্তি ও শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা দূর করার চেষ্টা করে। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ অথবা রাজধানী স্থানান্তরিত করার বিষয়ে পঞ্চম জর্জের ব্যক্তিগত কোন ভূমিকাই ছিল না।

Q. 8. Give a critical review of the Moplah rebellion.

Ans. (১) ভূমিকা

দক্ষিণ কেরালার মালাবার অঞ্চলের মোপলা নামে পরিচিত আরবের সম্প্রদায়ভুক্ত একটি মুসলিম গোষ্ঠী দীর্ঘকাল যাবৎই বসবাস করে। এদের সংখ্যা প্রায় ছিল দশ লক্ষের মতো। মোপলা সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বভাবতই বিদ্রোহভাবাপন্ন ছিল এবং ধর্মীয় কারণে তারা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কয়েকবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ভূস্বামীদের বিরুদ্ধেও তাদের দারুণ অসন্তোষ ছিল। জেন্‌সি নামে পরিচিত স্থানীয় ভূস্বামীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা ১৮৩৬ ও ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে দুবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ঐ অঞ্চলে দারুণ অরাজকতার সৃষ্টি করে। এর পর আবার নতুন করে মোপলা কৃষকদের অসন্তোষ প্রকাশ পায় ১৮৭৩ থেকে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। এই সময়ে অন্ততঃ পাঁচবার তাদের বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু মোপলাদের বিদ্রোহ ব্যাপক হত্যালীলার আকার ধারণ করে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের সময়। ইসলাম ও খলিফার প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে খিলাফত আন্দোলনের নেতারা যে সকল সভা-সমিতির আয়োজন করেন তা মোপলাদের মনে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে অগাস্ট মাসে তারা শুধু মাত্র ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দু জনসাধারণের বিরুদ্ধেও সশস্ত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়। বিদ্রোহের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে মালাবার অঞ্চলের শাসনযন্ত্র অচল হয়ে পড়ে এবং সরকার সৈন্যবাহিনী তলব করে। ঐ বছরের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে সামরিক আইন জারী করা হয়

এবং কঠোর হস্তে বিদ্রোহীদের দমন ও নির্যাতন করা হয়। বছরের শেষ দিকে মালাবার অঞ্চলে শান্তি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) কারণ

মোপলা বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মত দেখা যায়। পূর্ববর্তী মোপলা বিদ্রোহের সময় ধর্মীয় কারণ এবং স্থানীয় জমিদারদের অত্যাচার মূলতঃ দায়ী হলেও ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে অবস্থার পরিবর্তন হয়। ব্রিটিশ শাসনের আসন্ন পতনের সংবাদে উৎসাহিত হয়ে মোপলারা দলে দলে বিদ্রোহে যোগ দেয়। সাম্প্রদায়িক মনোভাব অবশ্যই কার্যকরী ছিল কিন্তু তাকে অতিরঞ্জিত করে তোলার প্রবণতা ঐতিহাসিকদের মধ্যে দেখা যায়। জমির উপর কৃষকদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে একটি আন্দোলন ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ঐ অঞ্চলে ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের মঞ্জেরী সম্মেলনের পর খিলাফৎ-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিতে শুরু করেন। স্থানীয় খিলাফৎ সম্পর্কিত সভা-সমিতিতে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার কথা আলোচনা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। স্থানীয় নেতা আলি মুসালিয়ার প্রতিশ্রুতি দেন যে "আগামী দিনের মুসলিম রাষ্ট্রে কোন ব্যয়বহুল মামলা-মোকদ্দমার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকবে না। ···প্রয়োজনের অতিরিক্ত কারও কোন সম্পদ থাকবে না···বর্তমানে পুলিশী ব্যবস্থারও তখন কোন প্রয়োজন হবে না।" প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস দলের ও খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা কে, মাধবন নায়ার, ইউ. গোপাল মেনন, ইয়াকুব হাসান পি. মইদিন কয়া প্রভৃতি ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেপ্তার হলে অপরিণামদর্শী ব্যক্তিরা এক অভূতপূর্ব সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠনের আশ্বাস দিতে শুরু করেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ২০শে অগাস্ট তিরূরাঙ্গাদি মসজিদে সঞ্চিত অস্ত্রশস্ত্রের অনুসন্ধানে পুলিশবাহিনী প্রবেশ করলে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মনে সঙ্গে সঙ্গে ইন্ধনের কাজ করে এবং অনতিবিলম্বে বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। থানা,সরকারী দপ্তর, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভূস্বামীদের বাড়ী-ঘর প্রভৃতির উপর বেপরোয়াভাবে আক্রমণ শুরু হয়। দক্ষিণ মালাবারের এরনাদ এবং ওয়ালুভানাদ তালুকের উপর কয়েকমাসের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সকল কর্তৃত্ব লোপ পায়। বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় খিলাফৎ নেতৃবর্গের পরিচালনাধীনে খিলাফৎ প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। মোপলারা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ শুরু করলে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং গোলন্দাজ সৈন্যবাহিনী তলব করতে বাধ্য হয়। মোপলারা এই সময় প্রায় দশহাজার লোককে এই বিদ্রোহের সামিল করতে সমর্থ হয়।

ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদরাও মোপলা বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে একমত নন। সরকারী মহলেও বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। মালাবারের অস্থায়ী কালেক্টর মিস্টার ইনস্ মনে করেন যে ঐ অঞ্চলের শোচনীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জনসাধারণকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। অপরদিকে সরকারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী মিস্টার ইভান্স মনে করেন যে মোপলা বিদ্রোহ ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার স্বাভাবিক পরিণতি। মোপলা

বিদ্রোহ সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ প্রথমে নীরবতা পালন করেন কিন্তু পরে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর মোপলাদের অত্যাচারের কাহিনী বহুল প্রচারিত হলে কংগ্রেস এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে মোপলা বিদ্রোহের সঙ্গে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই। এই বিদ্রোহের ব্যাপকতার জন্য তাঁরা বৃটিশ সরকারের দমননীতিকে দায়ী করেন। কিন্তু অ্যানি বেসান্ত, হজরৎ মোহানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মতে মোপলা বিদ্রোহের চরিত্র ছিল রাজনৈতিক এবং অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন থেকে একে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়। আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিমলীগের ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে হজরত মোহানী মোপলা বিদ্রোহকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটি ধর্মযুদ্ধ বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে এই আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট লেখকগণ মোপলা বিদ্রোহকে একটি কৃষক বিদ্রোহরূপে গণ্য করেন। কারণ মালাবার অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষক ছিল মুসলমান ধর্মাবলম্বী আর ভূস্বামীরা ছিল হিন্দু। তাই শ্রেণীস্বার্থে মুসলমান কৃষকগণ হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তবে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিদ্গণ ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশশক্তি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করার সুযোগ পায়। অপরদিকে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মোপলা বিদ্রোহকে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারূপে আখ্যা দেন। কারণ মোপলা বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু সম্প্রদায়, ব্রিটিশ শাসকগণ নয়। তাঁর মতে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ দুটি রাজনৈতিক দলই বিদ্রোহীদের পাশবিক অত্যাচারের বিষয়টি যেভাবে লঘু করে দেখিয়েছেন তা সত্যিই আপত্তিকর। তাঁর মতে মোপলাদের অত্যাচার পাঞ্জাবের সামরিক শাসকদের বর্বরতার চেয়েও মর্মান্তিক। কিন্তু ডক্টর তারাচাঁদ মোপলা বিদ্রোহের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন যে এই বিদ্রোহ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় কারণের সংমিশ্রণে ঘটেছিল। অর্থনৈতিক দুর্দশার পাশাপাশি, খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি, রাজা গোপাল আচারি, ইয়াকুব হাসান প্রভৃতি নেতৃবর্গকে মালাবারে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা, বহু নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার প্রভৃতি ঘটনা জনগণকে বিদ্রোহের পথে ঠেলে দেয়। সাধারণ জনগণ এই সকল অত্যাচারের প্রতিবাদে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ধর্মান্ধতা এই ব্যাপারে সাহায্য করে।

(৩) বিদ্রোহ দমন

হিন্দুরা সাধারণভাবে ধর্মান্ধ মোপলা আন্দোলনের তীব্র নিন্দা শুরু করে। কারণ প্রায় ৬০০ জন হিন্দু বিদ্রোহী মোপলাদের হস্তে নিহত হয় এবং আর্য সমাজের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ২৫০০ জন হিন্দুকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। কিন্তু ধর্মান্তকরণের এই সংখ্যা খুবই কম মনে হয়, কারণ বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত ধর্মোন্মাদ মুসলমানগণ ব্রিটিশ সরকারের অনুগত এবং বহু অত্যাচারী ভূস্বামীসহ চারলক্ষ হিন্দুর দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চলের উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব করার সুযোগ পায়। প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারী ভূস্বামীদের উপর মোপলাদের তীব্র বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ থাকলেও সাধারণ হিন্দুর বিরুদ্ধে

তাদের মনোভাব সবসময় কঠোর ছিল না। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কিছু সংখ্যক হিন্দুও মোপলাদের সঙ্গে যোগ দেয়। মোপলা বিদ্রোহীদের প্রথম দলে রাজবন্দীদের মধ্যে একজন নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ ও তিনজন নায়ার সম্প্রদায়ের লোক ছিল। যাহোক, শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে এই বিদ্রোহ দমন করে। নেপাল, ব্রহ্মদেশ গাঢ়োয়াল প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সৈন্য আমদানি করে ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। বিদ্রোহীদের মধ্যে ২,২৩৭ জন সংঘর্ষে নিহত হয় ১৬৫২ জন আহত হয় এবং কমপক্ষে ৪৫,৪০৪ জনকে বন্দী করা হয়। ১৮৫৭ বা ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মতো ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের মোপলা বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সরকারের উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার মুখোস আবার উন্মোচিত হয় এবং শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য শাসকগোষ্ঠী পাশবিক শক্তির প্রয়োগে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। সিরাজ-উদ্-দৌলার তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীকেও ম্লান করে দিয়ে অবরুদ্ধ অবস্থায় রেলগাড়িতে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অবহেলায় ৭৬৬ জন মোপলা বন্দী শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা যায়।

(৪) উপসংহার

মোপলা বিদ্রোহের ফলাফল খুবই নৈরাশ্যজনক। মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দুদের উপর মোপলাদের অত্যাচারের কাহিনী চাপা দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু জনসাধারণের মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আবার দেখা দিতে শুরু করে এবং ভারতীয় রাজনীতিকে কলুষিত করতে শুরু করে। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের লক্ষ্ণৌ চুক্তির সময় থেকে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল তা আবার নষ্ট হতে শুরু করে। এমন কি যে সৌভ্রাতৃত্বের উপর ভিত্তি করে যে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল, মোপলা বিদ্রোহ সেই ভিত্তিকেও দুর্বল করে তুলতে সমর্থ হয়। মোপলা বিদ্রোহ প্রমাণ করে যে উভয় সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় নেতারা চেষ্টা করলেও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভবপর নয়। আঞ্চলিকভাবে স্বার্থের সংঘর্ষ ও আশু লাভের সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্য স্থাপনে বাধার সৃষ্টি করতে অসমর্থ হয়।

Q. 9. Critically examine the role of the Press in the anti-partition and the Swadeshi and boycott movements in Bengal during 1905-1906.

Ans. (১) ভূমিকা

প্রায় বিশ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র ছিল ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত দুটি দৈনিক পত্রিকা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দি বেঙ্গলি' এবং শিশির কুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ও মতিলাল ঘোষের দ্বারা সম্পাদিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। দি বেঙ্গলি পত্রিকা অধিকতর যুক্তিবাদী এবং ইয়োরোপের

শাসন পদ্ধতি ভারতে কার্যকরী করার পক্ষপাতী ছিল ও শিক্ষিত ভারতীয়দের উপর তার প্রভাব ছিল খুবই গভীর। কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকা সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংরক্ষণশীল মতবাদের পৃষ্ঠপোষক হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে ছিল সরকারের প্রতিটি নীতির বিরোধী এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসন সংস্কার প্রবর্তনের পক্ষপাতী। ভারতীয়দের দ্বারা সম্পাদিত অন্যান্য দৈনিক পত্রিকার মধ্যে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ধীরে ধীরে সরকারী নীতির সমর্থকে পরিণত হয়। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান নেশন' মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিল। নগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকা' বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম দিকে সরকারী নীতির বিরোধিতা করলেও ধীরে ধীরে এই আন্দোলনের বিরোধিতা শুরু করে।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে পত্র-পত্রিকার রূপান্তর শুরু হয় এবং কয়েক বছর পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। তারা আবেদনের পথ পরিত্যাগ করে নেতৃবৃন্দকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পরামর্শ দিতে শুরু করে। জাতীয় আন্দোলনের সময় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। গ্রামাঞ্চলেও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক চেষ্টা শুরু হয়। সঙ্গীত, নাটক, যাত্রা, দেশপ্রেমমূলক উৎসব এবং রাখী-বন্ধনের মাধ্যমে গ্রামবাসীদেরও জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত করে তোলার ব্যবস্থা করা হয়।

বিপিনচন্দ্র পাল 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা সম্পাদিত করতেন। এই সব পত্রিকা ছাড়াও ইঙ্গ-ভারতীয়দের সম্পাদনায় 'স্টেটসম্যান', 'এম্পায়ার', 'ইংলিশম্যান', 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হত। তবে এই সব পত্রিকার মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দি বেঙ্গলি'র প্রচার ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি।

(২) বাংলাভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল খুবই কম। তবে এই সময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক হিতবাদী ও সন্ধ্যা পত্রিকার যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। কিন্তু সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল আশ্চর্য রকম বেশি। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা ও বিভিন্ন স্থান থেকে ৫৬টি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। তার মধ্যে কলকাতা থেকে ১৮টি, বর্ধমান বিভাগ থেকে ১৩টি, ঢাকা বিভাগ থেকে ৮টি, প্রেসিডেন্সি বিভাগ থেকে ৭টি, চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে ৬টি, রাজশাহী বিভাগ থেকে ৫টি প্রকাশিত হত। কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদিত হিতবাদী পত্রিকা, জলধর সেন ও দীনেন্দ্র কুমার রায় সম্পাদিত বসুমতী, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সম্পাদিত বঙ্গবাসী এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত সঞ্জীবনী পত্রিকা সব চাইতে জনপ্রিয় ছিল। হিতবাদী ও সঞ্জীবনী পত্রিকা পূর্বে সামাজিক প্রশ্নে রক্ষণশীলতার মুখপাত্র রূপে পরিচিত হলেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ করে। সঞ্জীবনী পত্রিকাই সর্বপ্রথম বয়কট আন্দোলনের আহ্বান দিলে বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলন একটি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। সাপ্তাহিক পত্রিকার অধিকাংশই নরমপন্থীদের আন্দোলনের ধারার তীব্র সমালোচনা করে আন্দোলনের গতি পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা শুরু করেন। সরকারী নীতিরও তাঁরা তীব্র সমালোচনা করেন। বিশেষতঃ রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান কর্তৃক রাশিয়ার পরাজয় বরণের সংবাদ ভারতীয়দের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করে এবং পত্র-পত্রিকায় তার সার্থক প্রতিফলন দেখা দেয়।

চরমপন্থী নেতৃবৃন্দও নিজেদের মতামত প্রকাশের জন্য অতি দ্রুত পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করার চেষ্টা শুরু করেন। তাঁদের প্রকাশিত পত্র পত্রিকার বাধাবিঘ্নপূর্ণ আয়ুষ্কাল ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। প্রাক্তন সাব-ইনস্পেক্টর জ্যোতিলাল মুখার্জি সম্পাদিত 'প্রতিজ্ঞা' আবেদন-নিবেদনের নীতি পরিবর্তনের দাবি জানায়। তিনি 'ঘুষির আবেদন' শীর্ষক প্রবন্ধে পুলিশের গুপ্তচরদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তবে গুরুত্ব ও প্রভাবের দিক্ থেকে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ছিল সান্ধ্য দৈনিক 'সন্ধ্যা'। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। ভাষার চাতুর্য, প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, উগ্রজাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রভৃতির জন্য সন্ধ্যা অনতিবিলম্বে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'স্বরাজ' নামে একটি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছবি সহ বহু প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের কথা ব্রহ্মবান্ধবের প্রতি রচনায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেত। তিনি আত্মরক্ষার জন্য স্বদেশী থানা গঠনের কথাও বলেন। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নব শক্তি' পত্রিকায় চরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শের কথা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হত।

(৩) নতুন পত্রিকাসমূহ

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বিপিনচন্দ্র পালের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নিউ ইণ্ডিয়া' বাংলার চরমপন্থীদের রাজনৈতিক মতবাদ জনপ্রিয় করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিছুদিন পরেই বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'বন্দেমাতরম' প্রকাশিত হয়। প্রথমদিকে এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেন বিপিনচন্দ্র পাল। কিন্তু অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই পত্রিকা পরিচালনা করতে শুরু করেন। সুবোধচন্দ্র মল্লিক এই পত্রিকা প্রকাশনার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। এই পত্রিকা সাবলীল ইংরেজি ভাষায় ভারতের জাতীয়তাবাদের নতুন চিন্তাধারা প্রকাশ করতে শুরু করে। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদের জীবন আদর্শ এই পত্রিকায় বিশেষ স্থান পেলেও সন্ধ্যা পত্রিকার মতো উগ্রভাবে তা কখনও প্রকাশিত হয় নি। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই পত্রিকা জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করার সুযোগ পায়।

সন্ধ্যা, নবশক্তি, বন্দেমাতরম প্রভৃতি পত্রিকা নিয়মিত বিপ্লবাত্মক আদর্শ প্রচার করত। বিশেষতঃ অরবিন্দ ঘোষের বাংলাদেশের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিপ্লবাত্মক রচনার জন্য সব চাইতে বিখ্যাত ছিল বারীন্দ্রকুমার

ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'যুগান্তর'। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে অবিনাশ ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মাত্র চারশ টাকা মূলধন নিয়ে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এই পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁদের প্রয়োজনীয় পরামর্শদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমদিকে যুগান্তরের গ্রাহক সংখ্যা খুবই কম ছিল, কিন্তু ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাদণ্ড হলে জুলাই মাসে বিপ্লবী পত্রিকা প্রকাশনের অপরাধে এই পত্রিকার বিক্রি সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। যুগান্তর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে এবং প্রকাশ্য বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। "রক্তপাত ভিন্ন দেবীর পূজা সম্পাদিত হতে পারে না"—এই অভিমত যুগান্তর বারবার প্রচার করে। যুগান্তর আরও ঘোষণা করে যে, দেশের সাধারণ লোক সাধারণতঃ কখনও একযোগে বিপ্লবী হয়ে ওঠে না, কতিপয় ব্যক্তির আত্ম-উৎসর্গের মাধ্যমে জনসাধারণের মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। সেজন্য যুগান্তর শিক্ষিত ভারতবাসী সকলকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে আহ্বান জানায়।

কলকাতার বাইরে বিভিন্ন মফঃস্বল শহর থেকেও নানাধরনের পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত এবং আইনজীবী বৈকুণ্ঠনাথ সেন কর্তৃক সম্পাদিত চারুমিহির সাপ্তাহিক পত্রিকা বিভাগে প্রথম থেকেই সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করে। এই পত্রিকায় লিয়াকৎ হোসেন রচিত একটি প্রবন্ধের জন্য পুলিশ অফিসে হানা দেয়। অশ্বিনীকুমার দত্তের সহকর্মী এবং স্বদেশ বান্ধব সমিতির সদস্য দুর্গা সনের পরিচালনায় বরিশাল শহর থেকে 'বরিশাল হিতৈষী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মফঃস্বলে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে বরিশাল হিতৈষী পত্রিকাই সর্বপ্রথম সরকারী কোপানলে পতিত হয়। সরকার-বিরোধী রচনা প্রকাশের জন্য দুর্গামোহন সেনেক এক বছরের মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত রংপুর থেকে প্রকাশিত রংপুর বার্তাবহ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত পূর্ববাংলা, খুলনা থেকে প্রকাশিত খুলনাবাসী, খুলনার বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত পল্লীচিত্র প্রভৃতি পত্রিকা সরকারের নির্দেশে প্রকাশ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। গিস্পতি কাব্যতীর্থ সম্পাদিত হাওড়া হিতৈষী এবং যশোহর থেকে যশোহর পত্রিকাও চরমপন্থী রাজনীতি প্রচার করতে শুরু করে।

(৪) সরকারী দমন নীতি

১৯০৫ থেকে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলো সরকার বিরোধী বহুসংখ্যক রচনা প্রকাশ করলেও সরকার তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নি। সম্ভবতঃ সরকারের ধারণা ছিল যে, এই সব রচনা জনসাধারণের মনে কোন গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কিন্তু পাঞ্জাবের রাজনৈতিক ঘটনা সরকারকে সতর্ক করে দেয় এবং ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে বাংলাদেশের সরকার সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্ এবং যুগান্তর পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় সরকার

এই সময় প্রাদেশিক সরকারগুলোকে সরকার বিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী মতবাদের প্রচারক পত্রিকা সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়। যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম এই তিনটি পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও বিদেশী সরকারের বিচারালয়ের দেশপ্রেমিককে শাস্তি দেওয়ার অধিকার আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এককভাবে যুগান্তরের সব দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। সরকারী আইনের সুবিধা গ্রহণ করে অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তারের হাত থেকে অব্যাহতি পেলে অন্যান্য সম্পাদকগণও সেই সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে পত্রিকা প্রকাশনা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সরকার আবার নতুন আইন প্রণয়ন করে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে মুদ্রণযন্ত্র বাজেয়াপ্ত ও পত্রিকা প্রকাশনা স্থগিত রাখার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শুরু করে। ফলে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বন্দেমাতরম, সন্ধ্যা, যুগান্তর, নবশক্তি, নিউ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর অরবিন্দ বন্দেমাতরম এর আদর্শে বাংলা ভাষায় ধর্ম ও ইংরেজি ভাষায় কর্মযোগীন পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ায় উগ্র স্বাদেশিকতাবাদী ও বিপ্লবাত্মক পত্র-পত্রিকা প্রায় প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। একমাত্র পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নায়ক পত্রিকা তাঁর পূর্বসূরীদের কার্যকলাপের অনুকরণ শুরু করে।

(৫) উপসংহার

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করে। এই সব পত্রিকার রচনায় যুক্তির চেয়ে আবেগ বেশি গুরুত্ব প্রকাশ পেলেও জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সার্থকতা ও সাফল্য প্রমাণ করে। স্বল্পায়ু এই সব পত্রিকার প্রভাবেই বাংলাদেশ তথা ভারতের সর্বত্র বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সমধিক গুরুত্ব লাভ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি একটি বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠার ভিত্তি স্থাপিত হয়। বাংলার বিভিন্ন স্থানের উগ্র জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং নগরীর সীমানা অতিক্রম করে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র দূরবর্তী গ্রামেও বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ পায়।

Q 10. Critically examine the trends of the Muslim politics in India from 1912 to the Khilafat Movement and briefly outline Azad and Muhammed Ali's view on the Khilafat Questions.

Ans. (১) ভূমিকা

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের, বিশেষভাবে বাংলার মুসলমান সমাজের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার

সৃষ্টি হয়, বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান উচ্চবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনের সমর্থকে পরিণত হয় কিন্তু বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত বাতিল হওয়ার ফলে তাদের মনে হতাশা দেখা দেয়। ঢাকার নবাব সলিমউল্লা বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হন। কারণ সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নি। ইতিমধ্যে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি অংশের মনে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, ভারতের রাজনৈতিক বিকাশের স্বার্থে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল স্রোতের সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের জড়িত হওয়ার প্রয়োজন এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুরক্ত থাকা অযৌক্তিক। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সৈয়দ নসিবউল্লাহ মুসলমান সম্প্রদায়কে আত্মশক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পরামর্শ দেন। আরব দুনিয়ায় ইসলাম ভ্রাতৃত্বভাবের সৃষ্টি; বহুকাল যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের তুরস্কের খলিফার স্বার্থ বিরোধী নীতি এবং আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জাতির বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রভৃতি ভারতীয় মুসলিম সমাজের মনোভাবের পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। এই পরিস্থিতিতে মুসলমান সমাজ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সঙ্গে একত্র হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়। মৌলানা আজাদ, হাকিম আজমল খান, ডক্টর আনসারি প্রমুখ মুসলমান নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে সহযোগিতার পথে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে মৌলানা আজাদ ও মোহম্মদ আলি কর্তৃক সম্পাদিত 'অল হিলাল' ও 'কমরেড' নামক পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়, জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের নজরবন্দী করা হয়। এরূপ অবস্থায় সৈয়দ আহমেদ প্রবর্তিত হিন্দু বিরোধিতা ও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ বহাল রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হল না। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা, আগা খান প্রভৃতি নেতৃবর্গ মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন এবং জাতীয়তাবাদী মনোভাবসম্পন্ন তরুণ মুসলমানগণ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ফলে মোহম্মদ আলি জিন্না, মহম্মদ আলি প্রমুখ নেতৃবর্গ মুসলিম লীগের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। তা ছাড়া, ব্রিটিশ বিরোধী উলেমা সম্প্রদায়ও মুসলিম রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। এইভাবে ক্রমশঃ মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক চরিত্রে পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে মুসলিম লীগে উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর নেতৃত্বের অবসান ঘটে এবং সাংগঠনিক ভিত্তি আরও প্রসারিত হয়। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীনগরের অধিবেশনে লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের অধিবেশনে মুসলিম লীগের নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। তা ছাড়া, এই সময় মুসলিম লীগ দুটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে: (১) স্বায়ত্তশাসনের প্রচেষ্টা এবং (২) হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথ প্রয়াস। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইতে একই স্থানে উভয় সংস্থার অধিবেশন আহ্বান করা হয়। গান্ধীজী, সরোজিনী নাইডু, মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি নেতৃবর্গ লীগের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলে ব্রিটিশের তুরস্ক বিরোধী নীতির ফলে মুসলমানদের মনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব আরও বৃদ্ধি

পায়। তা ছাড়া, একই সময় ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়।

(২) লক্ষ্নৌ চুক্তি ১৯১৬

বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে স্থির হয় যে জাতীয় কংগ্রেস সংবিধান সংস্কারের একটি কর্মসূচী গ্রহণ করবে এবং এই বিষয়ে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবে। ফলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি লীগের কমিটির সঙ্গে যৌথভাবে একটি সংস্কার প্রস্তাব প্রস্তুত করে এবং ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে লক্ষ্নৌতে অনুষ্ঠিত লীগ ও কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে এই সংস্কার প্রস্তাব গৃহীত হয়। লক্ষ্নৌতে অধিবেশনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত সংস্কার প্রস্তাব 'লক্ষ্নৌ চুক্তি' নামে পরিচিত। লক্ষ্নৌ চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, (১) প্রতিটি প্রাদেশিক আইন সভায় মুসলমান সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হবে ; (২) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য-মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হবে : (৩) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যুগ্মভাবে ভারতীয় কাউন্সিলের বিলুপ্তির ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি করবে এবং (৪) মুসলিম-লীগ কংগ্রেসের স্বরাজ আদর্শ মেনে নিবে।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্নৌ চুক্তিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে গণ্য করা হয়। এই চুক্তি প্রমাণ করে যে, ধর্মের দিক থেকে পৃথক হলেও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় অভিন্ন জাতীয় আন্দোলনের অংশীদার হতে পারে। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর যে অলঙ্ঘনীয় তাও প্রমাণিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তি শিক্ষিত ও ধনী হিন্দু এবং শিক্ষিত ও ধনী মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি শর্তাধীন চুক্তি মাত্র। এই চুক্তিতে সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমানের কোন স্বার্থ জড়িত ছিল না। অপর দিকে এই চুক্তি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের পৃথক স্বার্থের ভ্রান্ত ধারণা ও উভয় সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্বের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। তা ছাড়া, ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ প্রসারের ক্ষেত্রে লক্ষ্নৌ চুক্তি মোটেই সহায়ক ছিল না, বরং এই চুক্তি সাম্প্রদায়িকতার পথ প্রশস্ত করে তোলে। তবে এইসব দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের লক্ষ্নৌ চুক্তি ভারতের প্রধান দুটি রাজনৈতিক সংস্থাকে পরস্পরের নিকট ঘনিষ্ঠতর করে তোলে এবং তারা যৌথভাবে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার সংস্কারের দাবি তোলে। স্বভাবতই কংগ্রেস-মুসলিম লীগ সংহতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। এই ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এক উত্তাল জাতীয় আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করে। এই হিন্দু-মুসলমান সংহতির উপর ভিত্তি করেই গান্ধীজী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করেন।

(৩) খিলাফত আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সেভরসের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই ভারতের মুসলিম সমাজের কয়েকজন নেতা তুরস্কের খলিফার সমস্যা ও খিলাফতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর-ভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় মুসলিম নেতৃবর্গ এই সম্পর্কে কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং গান্ধীজীর সহযোগিতা লাভ করতে সমর্থ হন। ইতিপূর্বে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর বোম্বাই শহরে খিলাফত কমিটি গঠিত হয় এবং ভারতীয় মুসলিম সমাজের অসন্তোষের প্রতি সহানুভূতি ও তাদের মনোভাবের প্রতি সমর্থন জানান লোকমান্য তিলক, মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহরু, গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবর্গ।

ভারতে খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন আলি ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত মোহম্মদ আলি ও সৌকত আলি। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে দেশের জনসাধারণের প্রতি একটি ইস্তাহার প্রচারের মাধ্যমে ভারতে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ধর্মের অন্যতম প্রধান ও অপরিহার্য নীতি অনুসারে ঐহিক ও পারত্রিক জগতের অধিকর্তা খলিফার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রাখার প্রচেষ্টা করা। তাঁদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মুসলমান নেতাগণ ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল এবং ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে, তুরস্কের সঙ্গে মিত্র পক্ষের সম্পাদিত চুক্তির শর্ত ভারতের মুসলমানদের সন্তুষ্টি বিধানে অসমর্থ হলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেন। তুরস্ক সম্পর্কে গ্রেট ব্রিটেনের নীতির তিনি কঠোর সমালোচনা করেন এবং ঘোষণা করেন যে, "England cannot expect a meek submission by us to an unjust usurption of rights which to Muslims means a matter of life and death."

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে মে মাসে মিত্র পক্ষের সহিত তুরস্কের চুক্তির শর্তসমূহ প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হয়। ইংলণ্ডের আচরণ ভারতের মুসলিমদের মনে গভীর অসন্তোষের কারণরূপে দেখা দেয়। অপরদিকে পাঞ্জাবের মর্মান্তিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হাণ্টার কমিশনের বিবরণীও এই সময় প্রকাশিত হয়। হাণ্টার কমিশনের বিবরণী ভারতীয়দের মনে পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে আরও শতগুণে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ফলে খিলাফতের প্রশ্ন নিয়ে যে প্রশ্ন পূর্বেই দেখা দেয় হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের ফলে ভারতের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই একযোগে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়। কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটিও গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি প্রস্তাব সমর্থন করে ইংরেজ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সম্মত হয়।

নানারূপ বাধা বিপত্তির মধ্যেও ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে যুগ্মভাবে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন পরিচালিত হয়। জনসাধারণও এই আন্দোলনে অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। কিন্তু ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের মালাবার অঞ্চলের মোপলাগণ স্বাধীন খিলাফত রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে হিন্দু-মুসলমানদের যৌথ আন্দোলনের অগ্রগতি মন্থর হয়ে ওঠে। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরি চৌরায় হঠাৎ হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠলে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের যুগ্ম আন্দোলনেরও অবসান ঘটে। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে মুলতানে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। পরবর্তী বছরে পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হিন্দু-মুসলমানের এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শর্তাধীনে গড়ে ওঠা সম্প্রীতির সম্পর্কও বিনষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে তুরস্কের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে খিলাফত আন্দোলনের শক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেভরসের চুক্তির পরিবর্তে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে মিত্রপক্ষ তুরস্কের সঙ্গে লজনের চুক্তি সম্পাদন করে। অপর দিকে তুরস্কের নবগঠিত গ্রাণ্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি আনুষ্ঠানিক-ভাবে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তুরস্কের রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করে। তবে এই সময় গ্রাণ্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি শিক্ষা ও চরিত্রের ভিত্তিতে অটোমান রাজবংশের কোন ব্যক্তিকে খলিফার পদে স্থাপন করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে খলিফার পদ চিরদিনের জন্য বাতিল করা হয়; কারণ কামালপাশা প্রবর্তিত বিপ্লবী রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে খলিফার পদ সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। ফলে খিলাফত আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের নিকট একেবারেই অর্থহীন রূপে পরিগণিত হতে শুরু করে।

(৪) আজাদ ও মোহম্মদ আলির মতবাদ

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও মৌলানা মোহম্মদ আলি তুরস্কের পক্ষে জনমত গঠন করার পক্ষপাতী হলেও তাঁরা গ্রেট ব্রিটেনের নীতিকে খুব কঠোরভাবে সমালোচনা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌দের সম্মুখে অনেক নতুন সুযোগ দেখা দেয়। মোহম্মদ আলির 'কমরেড' এবং মৌলানা আজাদের 'আল হিলাল' পত্রিকা প্রথম দিকে যুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের সাহায্য করার নীতি প্রচার করলেও তুরস্ক সম্পর্কে তাঁদের সহানুভূতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। উভয় পত্রিকার সম্পাদকই মনে করতেন যে, আবদুল হামিদ-ই প্রকৃত খলিফা এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাঁদের মতে পৃথিবীর সমস্ত ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার জন্যই খলিফার প্রতিষ্ঠান সযত্নে রক্ষা করা প্রয়োজন। ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে

তাঁরা মুসলমানদের খিলাফতের প্রতি সমর্থন করার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। মুসলমান সমাজের উপর মৌলানা আজাদ ও মোহম্মদ আলির প্রভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে কয়েক-জন উলেমার দ্বারা প্রচার করতে শুরু করেন যে, তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মুসলমানদের স্বার্থ কোনক্রমেই বিনষ্ট করবে না। ব্রিটিশের এই প্রচারের অন্যতম সহায়ক ছিলেন আগা খান। কিন্তু তাঁদের এই প্রচারের ফলেও মৌলানা আজাদ ও মোহম্মদ আলির প্রভাব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।

মৌলানা আজাদ ও মৌলানা মোহম্মদ আলি উভয়ই উলেমা সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও মৌলানা আজাদ ছিলেন তুলনামূলকভাবে উদারপন্থী এবং প্রয়োজনবোধে ধর্মকে রাজ-নীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী হলেও তিনি ধর্মীয় মনোভাবকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে সম্মত ছিলেন না। অপর দিকে মৌলানা মোহম্মদ আলি প্রকৃত পক্ষে ধর্মের উপর গুরুত্ব দিয়েই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তাঁর নিকট রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মের গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। তিনি বাস্তব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অপেক্ষা ধর্মীয় মনোভাবের ছায়ায় অধিকতরভাবে পরিচালিত হতেন। সেজন্য অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন যুগ্মভাবে পরিচালিত হওয়ার সময়ও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা দিতে শুরু করলে মৌলানা আজাদ গান্ধীজীকে এই আন্দোলন স্থগিত রাখার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু মৌলানা মোহম্মদ আলির দৃষ্টি তখন তুরস্কের খলিফার প্রতি নিবদ্ধ। সুতরাং তিনি ভারতের এই সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করতে রাজি হন নি। তাঁর এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও ব্যর্থতা নেমে আসে। অপরদিকে মৌলানা আজাদ জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

Q. 11. Discuss briefly the causes of the demand of Pakistan.

Ans. (১) পাকিস্তানের প্রস্তাব :

স্যার মোহম্মদ ইকবালই ভারতের মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেন যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিমদের জন্য অন্ততঃ স্বতন্ত্র উত্তর-পশ্চিম মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করার জন্য চেষ্টা করাই মুসলিমদের পক্ষে স্বাভাবিক কর্তব্য। তবে মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবি মোহম্মদ ইকবাল উত্থাপন করলেও তিনি কখনও স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তা ছাড়া, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হলে তা যে ব্রিটিশ সরকার, হিন্দু ও মুসলিম সকলের পক্ষেই ক্ষতিকারক হবে এ সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন, কারণ এ সম্পর্কে তিনি

ঐতিহাসিক এডোয়ার্ড টম্পসনকে বলেন, "The Pakistan plan would be disastrous to the British Government, disastrous to the Hindu community and disastrous to the Muslim community."

কিন্তু স্যার মোহম্মদ ইকবালের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল মুসলিম ছাত্র পাকিস্তান দাবি করার জন্য অনুপ্রাণিত হয়। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতীয় মুসলিম ছাত্র সমাজের নেতৃস্থানীয় রহমত আলী পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, বালুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান গঠনের পরিকল্পনা করেন। বাংলাদেশ ও আসাম নিয়ে 'বঙ্গ-ই-ইসলাম' গঠনের আশাও তিনি পোষণ করেন। তবে ছাত্র সমাজের এই পরিকল্পনা মুসলিম নেতৃবর্গের নিকট বিশেষ কোন গুরুত্ব লাভ করে নি। এমন কি, ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে স্যার জাফর উল্লা খান পাকিস্তান প্রস্তাবকে অদ্ভুত ও অবাস্তব বলে বর্ণনা করেন। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম লীগও পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি কোন সমর্থন জানায় নি। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ই পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করে ভারত বিভাগের দাবি করেন। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি ভারতের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি জাতিরূপে বর্ণনা করেন। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ দাবি করে যে, যে-সকল পরস্পর সংলগ্ন অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকল অঞ্চলগুলো নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা উচিত এবং এই রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয়, "Resolved that it is the considered view of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principles, namely, that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial re-adjustments as may be necessary, that the area in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern Zones of India should be grouped to constitute Independent States in which the constituent units shall be autonomous and sovereign."

(২) পাকিস্তান প্রস্তাবের কারণ :

স্যার সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে মুসলিম সম্প্রদায় যে স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে শুরু করে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাব তার শেষ পরিণতি। সিমলা বৈঠক, মুসলিম লীগ সংগঠন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রভৃতি মুসলিম সম্প্রদায়ের

স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে শক্তিশালী করে তোলে এবং ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের প্রবর্তিত ভারত শাসন বিধি তাকে বাস্তব রূপ দিতে সাহায্য করে। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস অধিকাংশ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সমর্থ হয়। মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় জাতীয় কংগ্রেস চূড়ান্ত সংখ্যাধিক্য পায় এবং বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আসাম ও বাংলাদেশে একক বৃহত্তম দলরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা স্থাপিত হয়। পরের বছর আসামে কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং সিন্ধু প্রদেশেও কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। শুধুমাত্র দুটি প্রদেশে—বাংলা ও পাঞ্জাবে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বাংলার মন্ত্রিসভা ছিল কৃষক প্রজা পার্টির এবং পাঞ্জাবে ছিল ইউনিয়নিস্ট পার্টির। সমগ্র ভারতের কোন প্রদেশেই মুসলিম মন্ত্রিসভা ছিল না। মুসলিম লীগের সহিত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোন প্রকার চেষ্টা করা হয় নি।

ইতিমধ্যে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং ভারতীয় রাজনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়। ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কোন প্রকার সাহায্য করতে কংগ্রেস অস্বীকৃত হলে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয় এবং অনেক প্রদেশে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলোর সাহায্যে মন্ত্রিসভা গঠন করে। অপর দিকে এই মুসলিম লীগ অতি উগ্র-সাম্প্রদায়িকতা প্রচারে নেমে পড়ে। মিস্টার জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বের সময় মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে নিছক একটি হিন্দুদের সংগঠন বলে বর্ণনা করেন এবং হিন্দু শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করতে শুরু করেন। কংগ্রেস যে অল্পকাল প্রাদেশিক শাসন পরিচালনার সুযোগ পায় সেই সময়ের মধ্যেই মিস্টার জিন্নাহ্ মুসলমানদের উপর কংগ্রেসের নানারূপ অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করতে শুরু করেন। যুদ্ধের প্রতিবাদে কংগ্রেস যখন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা পরিত্যাগ করে মিস্টার জিন্নাহ্ তখন রাজনৈতিক চাল হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়কে 'পরিত্রাণ দিবস' পালন করতে আহ্বান করেন। এই সময় থেকেই মিস্টার জিন্নাহ্ দাবি করেন যে, ভারতের মুসলিমগণ নিছক একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, তাদের সহিত সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের এতই পার্থক্য যে, মুসলিমদের একটি স্বাতন্ত্র্য জাতিরূপে গণ্য করা উচিত এবং তদনুযায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদান করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের জনসংযোগ স্থাপনের নীতিও মুসলিম লীগ পছন্দ করতে পারে নি। মুসলিম লীগ মুসলমান সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত বলে মনে করত। জাতীয় কংগ্রেসের অনুসৃত জনসংযোগ আন্দোলন সম্পর্কে স্যার মোহম্মদ ইকবাল ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মার্চ মিস্টার জিন্নাহ্‌কে জানান যে, নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রদত্ত ভাষণের

উপযুক্ত উত্তর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া, তিনি মিস্টার জিন্নাহ্‌কে এই সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে অনুরোধ জানান। নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলনের কয়েকমাস পরে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে লক্ষ্ণৌ শহরে মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ বলেন, "I want the Muslim to ponder over the situation and decide their own fate by having one, single, definite, uniform policy which should be loyally followed throughout India".

তৃতীয়তঃ, মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবির প্রধান সমর্থক ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। হিন্দুদের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়যুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, এ কথা তারা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। অখণ্ড ভারতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সুযোগের নতুন সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই তারা পাকিস্তানের দাবি অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করতে শুরু করে।

চতুর্থতঃ, জাতীয় কংগ্রেসের অনুসৃত ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা ও বিদ্যামন্দির পরিকল্পনাও মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে বিরক্তির সৃষ্টি করে। এইসব পরিকল্পনাকে তারা তাদের ধর্মনীতি বিরোধীরূপে বিবেচনা করতে শুরু করে এবং মনে করে যে, কংগ্রেসী শাসনে তাদের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হবে।

পঞ্চমতঃ, গোঁড়া মতাবলম্বী অনেক মুসলমানেরই ধারণা হয় যে, পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমেই তারা সমগ্র মুসলিম জগতের সহিত ঐক্য স্থাপন করার সুযোগ লাভ করবে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের পরাধীন মুসলিমদের স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনের পীঠস্থানরূপে পাকিস্তানকে পরিণত করার স্বপ্নও তারা দেখতে শুরু করে।

ষষ্ঠতঃ মুসলিমদের প্রতি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মনোভাবও মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। গোঁড়া হিন্দুগণ মুসলমানদের অস্পৃশ্য জাতিরূপেই বিবেচনা করত। ফলে মুসলমানদের মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, হিন্দুগণ তাদের হীনজাতি বলে গণ্য করে। অপরদিকে মুসলমানগণ নিজেদের হিন্দুদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে মনে করত। ফলে তাদের পক্ষে হিন্দুদের ঐরূপ মনোভাব সহ্য করা সম্ভব ছিল না।

সপ্তমতঃ, হিন্দু মহাসভার নেতৃবর্গের কার্যকলাপ ও বক্তৃতাও মুসলিমদের দাবি পেশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ভি. ডি. সাভারকার হিন্দু রাষ্ট্রের আদর্শ প্রচার করেন এবং জাতীয় কংগ্রেসকে হিন্দু বিরোধী ও মুসলমানদের প্রতি অনুরক্ত বলে ঘোষণা করেন। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের বিরোধিতা করার জন্য আহ্বান জানান এবং হিন্দুদের ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করার জন্য অনুরোধ করেন। বীর সাভারকার হিন্দু ও মুসলমানগণকে দুটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে বর্ণনা করেন। হিন্দু মহাসভার মুসলমান বিরোধী নীতির ফলে মুসলিম লীগ অত্যন্ত স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তারা পাকিস্তানের দাবি যত শীঘ্র সম্ভব আদায় করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

অষ্টমতঃ, চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতেন আন্দোলনও ভারতের মুসলিমদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

নবমতঃ, ব্রিটিশ সরকারের নীতির ফলেও মুসলিম লীগ তাদের দাবি জোরদার করে তোলার সুযোগ পায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকেই ব্রিটিশ সরকার মুসলমান-দের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে শুরু করে। ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ক্রিপসের পরোক্ষভাবে প্রস্তাবও পাকিস্তানের দাবিকেই স্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে ক্রিপসের প্রস্তাব ভারতের জাতীয় ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করে এবং হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্ক আরও তিক্ত করে তোলে।

Q. 12. What do you know of the schemes of partition advocated by (a) Dr Latif ; (b) Aligarh and (c) Raja Gopalachari.

(ক) ডক্টর লতিফের পরিকল্পনা ঃ

ডক্টর লতিফের পরিকল্পনার মূল বক্তব্য ছিল ভারতবর্ষকে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা এবং সকল বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। প্রত্যেকটি অঞ্চলকে সমশ্রেণীভুক্ত বা সমপ্রকৃতি করে তোলার জন্য তিনি লোক বিনিময়ের জন্যও একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলিমদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে ডক্টর লতিফ ভারতে আরও দুটি প্রদেশ গঠনের জন্য সুপারিশ করেন। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মুসলিম অধিবাসীদের একই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি পাতিয়ালা থেকে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করার জন্য প্রস্তাব করেন ; তবে এই সীমারেখা সামান্যভাবে তার গতি পরিবর্তন করে রামপুর অঞ্চলকেও এই প্রদেশের সহিত যুক্ত করবে। এই অঞ্চলের তিনি নতুন নামকরণ করেন দিল্লী-লক্ষ্ণৌ প্রদেশ। তারপর বিন্ধ্য সাতপুরা পর্বতের অপর পার্শ্বে বিভিন্ন স্থানের মুসলিম উপনিবেশসমূহে প্রায় এক কোটি বারো লক্ষ মুসলিম বসবাস করে। তাদের জন্যও একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল গঠন করতে হবে। দক্ষিণের কুর্নুল ও কুদ্দাপ্পা হয়ে মাদ্রাজ শহর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অপ্রশস্ত অঞ্চলের দ্বারা হায়দ্রাবাদ ও বেরারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে মুসলিম অধিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হবে। সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ মুসলিম নেতৃবর্গ বিজাপুরের মাধ্যমে পশ্চিম-ভারতের সমুদ্র উপকূলের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য প্রস্তাব করেন। তাঁদের প্রধান যুক্তি ছিল যে, করোমণ্ডল উপকূল ও মালাবার অঞ্চলে বহু বছর যাবৎ যেসব মুসলিমগণ বসবাস করে তাদের নতুন বসতি স্থাপনের জন্য বিজাপুর অঞ্চল অধিকার করা একান্তই প্রয়োজন। ডক্টর লতিফ কলকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরকেও মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে ডক্টর লতিফের প্রস্তাবের শর্তসমূহ অত্যন্ত জটিল বলে মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ এই পরিকল্পনার উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি।

(খ) আলীগড় পরিকল্পনা

অধ্যাপক জাফরুল হোসেন ও মোহম্মদ আফজল কাদরী ভারত বিভাগ সম্পর্কে আলীগড় পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সহিত বেরার ও কর্ণাটকের সংযুক্তির প্রস্তাব করা হয়। তা ছাড়া, পঞ্চাশ হাজারের অধিক সংখ্যক জনবসতি বিশিষ্ট প্রত্যেকটি শহর স্বতন্ত্রভাবে শাসিত হবে এবং এই সব শাসন-তান্ত্রিক সংস্থা প্রচুর পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করতে সমর্থ হবে। দেশ-বিভাগের পর হিন্দুস্তানে বসবাসকারী মুসলিমগণ স্বতন্ত্র জাতিরূপে স্বীকৃতি লাভ করার সুযোগ ভোগ করবে এবং তাদের জন্য স্বতন্ত্র শাসন-প্রণালী ও শাসনসংস্থা গঠন করা হবে।

আলীগড় পরিকল্পনা প্রসঙ্গে মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র কোন উৎসাহ ছিল না। কারণ তিনি জানতেন যে, এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করা কখনই সম্ভব নয়। তা ছাড়া, এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার চেষ্টা করা হলে ভারতের প্রতিটি প্রদেশ, শহর ও গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরামহীন সংগ্রামের সূত্রপাত হবে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের দ্বিজাতি-তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে জিন্নাহ্ ঐতিহাসিক এডোয়ার্ড টম্পসনকে বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ ব্যতীত ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। "Two Nations confronting each other in every province, every town, every village, that is the only solution....... It is a terrible solution. But it is the only one"

কিন্তু আলীগড় পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনার পূর্বেই বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম নেতৃবর্গের মধ্যে মতবিরোধিতা দেখা দেয়। নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অবিভক্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এইচ. এস. সুরাবর্দী স্থানীয় হিন্দু নেতাদের সহিত রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপন করে স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সার্বভৌম অখণ্ড বাংলাদেশ স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করেন। পাঞ্জাবের রাজনীতিতেও জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ উপলব্ধি করেন যে, বিনা রক্তপাতে পাঞ্জাব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না। বিশেষতঃ সামরিক শক্তির সাহায্য ব্যতীত মুসলিম লীগের পক্ষে বৃহত্তর পাকিস্তান লাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং উপায়ন্তরহীন হয়ে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ বাস্তবকে স্বীকার করেই ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভর করে যেসব অঞ্চল লাভ করা সম্ভব তা নিয়েই পাকিস্তান গঠন করতে সম্মত হন। ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান, অভিজ্ঞ ও কূটবুদ্ধি সম্পন্ন আইনজীবী মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ পাকিস্তান লাভের আশা সম্পর্কে একেবারে নিরাশ হয়েই 'কীটদষ্ট কবন্ধ পাকিস্তান' গ্রহণ করতে সম্মত হন।

(গ) রাজা গোপালাচারীর সূত্র

১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজীর সম্মতিক্রমে ভারত বিভাগ সম্পর্কে চক্রবর্তী রাজা গোপালা-

চারী একটি নতুন সূত্র পেশ করেন। মুসলমানদের দাবি মেনে নিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টাই ছিল এই সূত্রের মূল উদ্দেশ্য। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-পাকিস্তান-গঠনের প্রস্তাবও এই সূত্রে স্বীকৃতি লাভ করে। এই সূত্র অনুযায়ী জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ মুসলিম লীগের প্রতি তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে অনুরোধ করেন। তাছাড়া অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য প্রত্যেক প্রদেশে সরকার গঠনে মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানান হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোর সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হবে এবং এই কমিশন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমারেখা বৈজ্ঞানিকভাবে নির্দিষ্ট করবে। তারপর এই সব অঞ্চলে গণভোট গৃহীত হবে এবং এই গণভোটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই অঞ্চল হিন্দুস্তানের সহিত যুক্ত থাকবে অথবা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করবে তা চূড়ান্তভাবে স্থির করা হবে। এই সব অঞ্চল স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে প্রস্তুত হলে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুস্তান এবং নবগঠিত রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার চুক্তি সম্পাদিত হবে। তবে ব্রিটিশ সরকার ভারতের জনসাধারণের উপর সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার পরই এই সব চুক্তির শর্তসমূহ কার্যকরী করা হবে।

কিন্তু মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ রাজা গোপালাচারীর এই প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেন। তিনি এই প্রস্তাবকে 'বিকলাঙ্গ' অসম্পূর্ণাঙ্গ এবং কীটদষ্ট (maimed, mutilated and moth-eaten) পাকিস্তান রূপে আখ্যা দেন এবং তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। অপরদিকে তিনি ঘোষণা করেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বালুচিস্তান, বাংলাদেশ ও আসাম এই ছয়টি প্রদেশের উপর অধিকার স্থাপন করা ব্যতীত অন্য কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে তিনি সম্মত নন। তবে প্রয়োজন অনুসারে এই ছয়টি প্রদেশের সীমানা নির্দ্ধারণের বিষয়ে সামঞ্জস্য সাধন করা যেতে পারে। অপর দিকে তিনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের অমুসলিম অধিবাসীদের মুসলিমদের সহিত একসঙ্গে ভোট দেওয়ার নীতির বিরোধিতা শুরু করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র বিরোধিতার ফলে রাজা গোপালচারীর প্রস্তাব অবিলম্বে বাতিল হয়ে যায়।

Q. 13. Discuss in brief the political career of Jinnah. What partsdid he play for the creation of Pakistan ?

Ans. (১) রাজনৈতিক কার্যকলাপ :

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের বড়দিনের দিন মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ করাচি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিভাবান্ ছাত্র মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ মাত্র ষোল বছর বয়সে লণ্ডনে ব্যারিস্টারী পড়তে যান এবং সেখানে দাদাভাই নওরোজীর সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি দাদাভাই নওরোজীর একান্ত সচিব নিযুক্ত হন। ঐ সময় থেকে কংগ্রেসে

গান্ধীযুগের সূচনার পূর্ব পর্যন্ত জিন্নাহ্ কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রধান লক্ষ্য। অসহযোগ আন্দোলনের সময় জিন্নাহ্ গান্ধীজীর নীতির অন্যতম প্রধান সমালোচকে পরিণত হন এবং কিছুদিন পরে জাতীয় কংগ্রেসের সহিত মতবিরোধিতার জন্য তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তিনি কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলতে শুরু করেন এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হতে শুরু করেন। কিন্তু তখনও তিনি সামগ্রিকভাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও উন্নতির জন্য হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দেও তিনি বলেন "Foreign rule and its continuance is primarily due to the face that the people of India, Hindus and Muslims are not united and do not sufficiently trust each others.……I am also inclined to say that India will get Dominion responsible government the day Hindus and Muslims are United."

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে জিন্নাহ্ যোগদান করেন। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে মর্মাহত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অন্যান্য প্রাচীন পন্থী ও রক্ষণশীল মুসলিম নেতৃবর্গের সহিত মতবিরোধিতা দেখা দিলে তিনি ভারতবর্ষ ও ভারতের রাজনীতি ত্যাগ করে লণ্ডনে প্রিভি-কাউন্সিলে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ইতিমধ্যে ভারতের মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। সর্বভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকেই (ফজল-ই-হোসেন, আজমল খান, মোহম্মদ সাফী, ডক্টর আনসারী এবং মোহম্মদ আলী) মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশিষ্টদের মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, আসফ আলী প্রভৃতি নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতা দেখা দেয়। ফলে মুসলিম লীগের তরুণ নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে নেতৃত্বের পদে গ্রহণের জন্য উৎসাহ দেখা দেয় এবং নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খানের আমন্ত্রণে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। লণ্ডনে অবস্থানকালেই তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিন হন এবং তখন থেকে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ই ছিলেন মুসলিম লীগের অবিসংবাদিত নেতা।

(২) পাকিস্তান দাবি :

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এই নির্বাচনে রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করা মুসলিম লীগের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ফলে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ মুসলিমদের রাজনীতিকে সর্বক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে নবগঠিত কংগ্রেসী ও কোয়ালিশন সরকারের কার্যকলারের তীব্র সমালোচনা শুরু করেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে অস্বীকার করে বিভিন্ন প্রদেশের

মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে শুরু করে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পদত্যাগের দিবসটিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে পরিত্রাণ দিবসরূপে পালনের নির্দেশ দিয়ে জিন্নাহ্ ভারতের সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ সরকারও মিস্টার জিন্নাহ্‌র এই প্রচেষ্টায় ইন্ধন যোগায় এবং কংগ্রেসের বিরোধী পক্ষের সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করার ব্যবস্থা করে। ইতিমধ্যে স্যার মোহম্মদ ইকবালের পরিকল্পিত পাকিস্তান প্রস্তাব মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয় এবং লণ্ডনে অবস্থিত মুসলিম ছাত্রবৃন্দের অন্যতম নেতা রহমত আলীর প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগ লাভ করে। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ প্রকাশ্যে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগ সর্বসম্মতিক্রমে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের যে সকল পরস্পর সংলগ্ন অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকল অঞ্চল নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা হবে এবং এই রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে স্যার সৈয়দ আহমেদ মুসলিমদের স্বাতন্ত্র্যের দাবি করে যে আন্দোলন শুরু করেন মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র দাবিই তার চূড়ান্ত পরিণতি। কিন্তু এই পাকিস্তান দাবিই মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করে এবং ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মার্চ থেকে তিনি শুধুমাত্র মুসলিম লীগের নয়, ভারতের রাজনৈতিক জীবনেরও অন্যতম প্রধান ভাগ্যনিয়ন্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পান। ব্রিটিশ সরকারও জাতীয় কংগ্রেসের গুরুত্ব লাঘব করার জন্য মুসলিম লীগের উপর এবং তার অবিসংবাদিত নেতা মিস্টার জিন্নাহ্‌র উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করে। জিন্নাহ্‌র বক্তব্য থেকেই এই সময়ের ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব। "After the war was declared, the Viceroy naturally wanted help from the Muslim League. It was only then that he realized that the Muslim league was a power. For it will be remembered that up to the time of the declaration of the war the Viceroy never thought of me but of Gandhi and Gandhi alone. I believe that was the worst shock that the Congress High Command received,

because it challenged their sole authority to speak on behalf of India."

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ভারতীয় রাজনীতি অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করে। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর নতুন প্রস্তাব নিয়ে দিল্লীতে আগমন করেন। ক্রিপস্ প্রস্তাব জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই গ্রহণ করতে অসম্মত হয় এবং জাতীয় কংগ্রেস ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের আহ্বান জানায়। মুসলিম লীগ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা শুরু করলে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠে। ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতায় বিশ্বাসী তদানীন্তন ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের রাজনীতিতেও বিরাট পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে ইংলণ্ডের শ্রমিক দল মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেণ্ট এ্যাটলি অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই উদ্দেশ্যে একটি ক্যাবিনেট মিশন গঠিত হয় এবং মিশন সরজমিনে তদন্ত করার জন্য ভারতে এসে উপস্থিত হন। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবেই পাকিস্তান গঠনের দাবি সরকারের পক্ষ থেকে প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃতি লাভ করে।

ইতিমধ্যে ভারতে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় এবং মুসলিম লীগ এই সরকারে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে ও পাকিস্তান দাবি আদায়ের জন্য 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' আহ্বান জানায়। ফলে বাংলাদেশ, বিহার ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। এইরূপ জটিল পরিস্থিতির সময় লর্ড ওয়াভেলের পরিবর্তে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয়ের পদে নিযুক্ত হন। ভারতে উপস্থিত হয়ে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার পর ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জুন একটি সরকারী ঘোষণা প্রকাশ করেন। এই ঘোষণায় ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র গঠন করা হয়। ফলে স্বতন্ত্রবাদী মুসলিমদের দীর্ঘ দিনের আশা বাস্তবে পরিণত হয়। মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র বৃহত্তর পাকিস্তান গঠনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত না হলেও বিকলাঙ্গ ও কীটদষ্ট পাকিস্তানের উপর সর্বময় আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ তিনি লাভ করেন।

ভারতের ইতিহাস

অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর

Q. 1. What do you know of the long-term trends in agriculture with reference to stagnation ?

Ans. ভূমিকা : ভারতের ব্রিটিশ শাসকগণের মনোযোগ বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল কৃষিকার্যের বাণিজ্যিক কার্যকলাপের দিকে। দেশের কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য সাধন এবং অধিকতর মুনাফা প্রদানে সমর্থ কৃষি পণ্যগুলোর উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের মূলনীতি। এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চা, নীল এবং আফিমের চাষে উৎসাহ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কৃষি-উন্নতির কোন সাধারণ নীতির ফল হিসাবে এসব পণ্যের চাষে উৎসাহ দেওয়া হয় নি। ফলে সরকারী এই নীতি জনসাধারণের কোন উপকারে আসে নি এবং তাদের নিকট জনপ্রিয়ও হয় নি। নিজেদের বিনিয়োগ হতে দ্রুত মুনাফা লুণ্ঠনের আগ্রহে উৎপাদন এবং উন্নতির স্বাভাবিক নিয়মবিধিকে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ বহু ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করত।

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলা ও উড়িষ্যায় মন্বন্তর দেখা দেওয়ার পর ভারত সরকার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন একটি পৃথক কৃষি বিভাগ স্থাপন করার সুপারিশ করে। কিন্তু এই প্রস্তাব বিশেষ কোন সুফল আনয়ন করতে পারে নি। এদিকে ইংলণ্ডের তুলাজাত শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারীরা ভারতীয় কাঁচা তুলার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার সাধারণ নীতি হিসাবে প্রতিটি প্রদেশে একটি করে কৃষিবিভাগ স্থাপন করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারও রাজস্ব, কৃষি এবং বাণিজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে গভর্নর জেনারেলের পরিষদে একজন অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করে। দশ বছর পরে এই নতুন সচিবালয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বিভাগের প্রধান কাজ ছিল কৃষিসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ।

(২) **ব্রিটিশ সরকারের নীতি :** ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে দুর্ভিক্ষ কমিশন দুর্ভিক্ষ ত্রাণ প্রশাসনের নির্দিষ্ট এবং দীর্ঘস্থায়ী ভার গ্রহণ করার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগের প্রয়োজনীয়তার উপর সবিশেষ জোর দেয়। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রাদেশিক সরকারগুলোতে কৃষি বিভাগের সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু অর্থাভাব এবং শিক্ষিত কৃষি বিশেষজ্ঞদের অভাবে এই সকল বিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারীর সংখ্যা শোচনীয় ভাবে কম ছিল। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটেনের রয়্যাল এগ্রিকালচারাল সোসাইটির পরামর্শদাতা রসায়নবিদ ডক্টর জে. আর. ভয়েলকারকে ভারতীয় কৃষিতে কৃষি-রসায়ন প্রয়োগ করার এবং কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। ডক্টর ভয়েলকারের পরামর্শেই ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার কৃষি রসায়নবিদের একটি পদ সৃষ্টি করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ক'বছরে দুর্ভিক্ষ-পরিস্থিতি এরূপ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে, লর্ড কার্জন এবং তাঁর সরকার কৃষি উন্নতির প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিতে বাধ্য হন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে কৃষিতে মুখ্য তদন্তকারীর দুটি পদ এবং ছত্রাক বিজ্ঞানীর একটি পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে কৃষি বিভাগের সঙ্গে পতঙ্গ বিজ্ঞানীর একটি পদও সংযোজিত হয়। সেই বছর আমেরিকার শিকাগো শহরের মিস্টার হেনরি ফিপস্ বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে ব্যয় করার জন্য ভারত সরকারকে ৩০,০০০ পাউণ্ড দান করেন এবং সেই অর্থে বিহারের পুষাতে কৃষি গবেষণা সংস্থা স্থাপিত হয়। পরে পুনে, কানপুর, নাগপুর, লয়ালপুর এবং কোয়েম্বাটুরে কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পর কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কৃষি গবেষণাগারের কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রাদেশিক কৃষি বিভাগগুলোকে আরও শক্তিশালী করে তোলা হয়। এই কমিশন সমবায় সমিতি আইন প্রবর্তন করার পথকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় কৃষি-কৃত্যক গঠন করা হয় ও ১৯০৫ থেকে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সেচকার্যের উন্নতির গতিকেও ত্বরান্বিত করা হয়।

(৩) কৃষি সংক্রান্ত উন্নতির চেষ্টা : ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের সংবিধান সংস্কার অনুসারে কৃষি সমবায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য বিভাগের ভার প্রাদেশিক সরকারের উপর অর্পণ করা হয়। কৃষিসংক্রান্ত গবেষণা এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষক কর্মীর শিক্ষাদান বাবদ ব্যয় ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক বিষয়গুলোর আর কোন আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে অসম্মত হয়। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের পরে প্রদেশগুলি প্রায় পরিপূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ করে। কিন্তু অনতিবিলম্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ভারতে কৃষি-অনুসন্ধানের জন্য ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে রয়্যাল কমিশন গঠিত হয় এবং ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই কমিশনের অনুসন্ধানের কার্য শেষ হয়। এই কমিশনের প্রতিবেদন থেকে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় কৃষিসংক্রান্ত নীতির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক আলোচনা পাওয়া যায়। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কৃষি গবেষণার উন্নতি, নতুন নীতি উদ্ভাবন এবং সংহতি সাধনের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ এবং বিদেশী দেশসমূহের কৃষি গবেষণার সহিত ভারতীয় কৃষি-গবেষণার যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ বিভাগ স্থাপন করা হয়। এই সংস্থার প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন প্রাদেশিক কৃষিবিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিচালিত কৃষি গবেষণামূলক কার্যের মধ্যে সংহতি সাধন।

(৪) ভারতীয় কৃষির শোচনীয় অবস্থা : ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের বিশ্ব-ব্যাপী মন্দা ভারতীয় কৃষির বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। ভারত সরকার এই সময় এইরূপ মত ব্যক্ত করে যে, অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই মন্দার প্রভাব উপশম করা সম্ভব নয়, কারণ এই মন্দার সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তবে গম ও ময়দার উপর আমদানি সংরক্ষিত শুল্ক আরোপ করেই ব্রিটিশ সরকার তাদের দায়িত্ব শেষ করে দেয়। অপরদিকে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার মুদ্রার অবমূল্যায়ন নীতি গ্রহণ না করার জন্য দেশে মুদ্রাসংকোচনের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং দেশের

সাধারণ অর্থ নৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিনিয়োগের পরিমাণও হ্রাস পেতে থাকে। তবে এই সময় বাণিজ্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার চা এবং রবারের মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। পাটের ক্ষেত্রে সরকার পাট চাষের এলাকা সীমিত করার নীতি অবলম্বন করে। উত্তর প্রদেশের ইক্ষু উৎপাদকদের জন্য ইক্ষুর একটি ন্যূনতম মূল্য স্থির করা হয়। মন্দার সময় কৃষি ঋণের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের পর এই ঋণের বোঝা হ্রাস করার জন্য সরকারীভাবে একটি নীতি গৃহীত হয়।

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের রাজকীয় কৃষি কমিশনের সুপারিশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার অধীনে একটি কৃষি ঋণ বিভাগ স্থাপন করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কৃষিঋণ বিভাগ স্থাপন করে এবং এই বিভাগের প্রধান কাজ ছিল; (১) কৃষি ঋণ সংক্রান্ত সকল সমস্যা পর্যালোচনা করার জন্য একদল কৃষি ঋণ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা এবং কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারগুলোকে ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনমতো পরামর্শ দান এবং (২) কৃষি ঋণ সংক্রান্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নানাজাতীয় কার্যকলাপের মধ্যে সংহতি সাধন করা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে কৃষিঋণ ব্যবসায়ের ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক অথবা ব্যাঙ্ক সমূহের সম্পর্কের মধ্যে সংহতি সাধন করা।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনের পর প্রদেশগুলোতে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই সব মন্ত্রিসভা ঋণ সালিসী, মহাজনী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, প্রজাস্বত্ব সংস্কার এবং গ্রাম-উন্নয়নের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। সামগ্রিক ভাবে জাতীয় উন্নয়ন কার্যে নিযুক্ত বিভাগগুলোর মধ্যে সংহতি সাধনে গ্রাম-উন্নয়ন কার্যে নিযুক্ত বিভাগগুলোর প্রতিষ্ঠা করে এই কার্যের জন্য বর্ধিত হারে অর্থ মঞ্জুর করা হয়। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত মন্ত্রিসভাগুলো পদত্যাগ করলে প্রাদেশিক প্রশাসনের ভার আবার আমলাতন্ত্রের হাতে চলে যায়। যে কয়টি প্রদেশে নির্বাচিত মন্ত্রিসভা শাসনকার্য পরিচালনা করছিল তারাও যুদ্ধের প্রয়োজনে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে অসমর্থ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কৃষিজ সম্পদ বিদেশী বাজারে প্রেরণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে নতুন বাজারের সন্ধানও এই সময় শুরু হয়। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিলে নতুন নতুন যুদ্ধাঞ্চলগুলোতে সরবরাহ সমস্যার সৃষ্টি হয়। খাদ্য ও কাঁচামালের চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সুসংবদ্ধ মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবের ফলে গোপন মজুতদারগণ উৎসাহিত হয় এবং অন্যান্য মুনাফার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থার পরিণতি হিসাবে দেখা দেয় খাদ্য সঙ্কট এবং দুর্ভিক্ষ। কৃষিজ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী ও মহাজনগণ লাভবান হন সাধারণ কৃষকগণের কোন লাভ হয় নি। বিশেষত কৃষিজ পণ্যের মূল্য অপেক্ষা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সাধারণ লোকের দুর্দশা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই সময় খাদ্য শস্যের সংকট দূর করার জন্য অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা থেকেও ভারতে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়।

১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে ইক্ষু চাষের জন্য ব্যবহৃত জমির প্রায় আশি শতাংশে এবং পাট চাষের জন্য ব্যবহৃত জমির প্রায় পঞ্চাশ শতাংশে উন্নত ধরনের বীজ ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু খাদ্য ও অন্যান্য শস্যের ক্ষেত্রে উন্নতির গতি ছিল অপেক্ষাকৃত মন্থর। প্রাদেশিক কৃষি বিভাগগুলো এবং সর্বভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা কৃষির পক্ষে ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের উন্নত পদ্ধতি এবং রোগ প্রতিরোধে সক্ষম বীজ উদ্ভাবনে সাফল্য লাভ করে। অন্যদেশ থেকে ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ যাতে দেশে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেচ-সংক্রান্ত এবং সেচকার্য উদ্ভূত সমস্ত কৃষি সমস্যার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সেচকার্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করারও ব্যবস্থা করা হয়। মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ করার জন্যও বৈজ্ঞানিক উপায় গ্রহণ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত কৃষির উন্নতির জন্য আর কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি।

প্রকৃতপক্ষে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতের কৃষি উন্নতির জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করে নি। কয়েকটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র তৈরি করা এবং তাকাভি ঋণ দিয়ে কৃষকদের সাময়িক ভাবে সাহায্যের মধ্যেই তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল। তবে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং মাদ্রাজের কিছু অঞ্চলে খাল খননের দ্বারা সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়। এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অঞ্চল পূর্বভারতে কৃষির উন্নতির জন্য সরকারী কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। এরূপ অবস্থার মূল কারণ ছিল যে কৃষিকার্যের উন্নতির ফলে সরকারের কোনপ্রকার লাভের সম্ভাবনা ছিল না। তবে অনেক ঐতিহাসিক সেচব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেও এলিজাবেথ হুইটকম্বের সাম্প্রতিককালে উত্তর প্রদেশের কৃষিসংক্রান্ত গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে ইংরেজ শাসনকালে কর্তিত খাল অনুপযুক্ত ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই এই খালগুলো বিলে পরিণত হত এবং কোথাও কোথাও লবণাক্ত জল জমিতে সরবরাহ করে জমির ক্ষতি সাধন করত। তবে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে সেচখালগুলো কৃষিকার্যের প্রধান সহায়করূপে দেখা দেয়। জলসেচের ফলেই পাঞ্জাবের বহু শুষ্ক জমিতে সর্বপ্রথম ফসল উৎপন্ন হয়। ব্রিটিশ শাসন-কালে জলসেচের দ্বারা পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও মাদ্রাজ উপকৃত হলেও ভারতের অন্যান্য স্থানের কৃষির কোন উন্নতি হয়নি এই সময় ভারতের কৃষি স্থির, নিশ্চল এবং গতিহীন হয়ে পড়ে।

(৫) **সমালোচনা :** ঐতিহাসিক থর্নার মনে করেন যে ঔপনিবেশিক শাসনতান্ত্রিক কাঠামো কৃষিভিত্তিক ভারতীয় অর্থনীতিকে বলপূর্বক অনুন্নত রাখার চেষ্টা করে। তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম ও নবম দশকের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষগুলোর কথা উল্লেখ করেন। তাছাড়া প্লেগ ইনফ্লুয়েঞ্জা দুর্ভিক্ষের প্রকোপকে আরও অনেকাংশে বৃদ্ধি করে এবং বহুলোকের মৃত্যুর কারণ রূপে দেখা দেয়। অপরদিকে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল খুবই সামান্য ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ২৮২ মিলিয়ন, ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে এই সংখ্যা বেড়ে মাত্র ২৮৫ মিলিয়নে পরিণত হয়। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩০৩ মিলিয়ন এবং ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০৬ মিলিয়নে পরিণত হয়। সুতরাং ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্যের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায় সকলেই অতিরিক্ত লোকসংখ্যার কথা উল্লেখ

করেন। কিন্তু উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে সেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্যের কারণ অতিরিক্ত লোকসংখ্যা নয়, দারিদ্র্যের কারণ কৃষির উন্নতি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের চরম উদাসীনতা।

কৃষির উন্নতি-অবনতি সম্পর্কে দীর্ঘ দিনের পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণা করে জর্জ ব্লিন এই মতকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। ১৮৯৩ থেকে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে এই সময়ের মধ্যে কৃষি ব্যবস্থা শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ স্থির থাকার পরিবর্তে কোন কোন ক্ষেত্রে হ্রাস পেতে শুরু করে। ১৮৯৩-৯৬ খ্রীস্টাব্দকে গণনার মূল বছর রূপে স্থির করে দেখা যায় যে ১৯৩৬-৪৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতি দশ বছরের গড় হিসাবে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন ৯৩ শতাংশ, বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য ১৮৫ শতাংশ এবং অন্যান্য কৃষিজপণ্য ১১০ শতাংশে পরিণত হয়। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের পর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করলে মাথা পিছু উৎপাদনের হার হ্রাস পেতে শুরু করে। ১৯৩৬-৪৬-এর দশকে কৃষিপণ্যের সাধারণ গড় ৮০ শতাংশ হলেও খাদ্যশস্যের গড় ৬৮ শতাংশে পরিণত হয়। একর প্রতি শস্য উৎপাদনের পরিমাণও অনেকক্ষেত্রেই হ্রাস পায়। অপরদিকে মিস্টার এ. কে. বাগচির গবেষণা থেকে জানা যায় যে কৃষিপণ্যের দামও ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে। এই সময় বাণিজ্যিক পণ্যের দাম কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য বৃদ্ধি পেলেও খাদ্যশস্যের দাম কোনক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পায় নি। জর্জ ব্লিন তাঁর গবেষণার দ্বারা আরও প্রমাণ করেন যে ভারতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় পূর্বভারতের কৃষি সম্পদ ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা বিশেষ-ভাবে অবহেলিত হয়।

Q. 2. What do you know of the reorganisation of the Raj after 1857 ?

Ans. (১) ভূমিকা : ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলুপ্তি সাধন এবং ব্রিটিশ সিংহাসন কর্তৃক কোম্পানী অধিকৃত ভারতের শাসন দায়িত্ব গ্রহণ। রাজনৈতিক এই পরিবর্তনের জন্য ব্রিটিশ শাসকগণ বহুদিন যাবৎই প্রস্তুত ছিলেন, তাহলেও সিপাহি বিদ্রোহ এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে তোলে। ভারতের শাসনব্যবস্থার জন্য ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে একটি আইন বিধিবদ্ধ করে ভারতের শাসনভার একজন সেক্রেটারী এবং পনের জন সদস্যের দ্বারা গঠিত একটি কাউন্সিলের উপর অর্পণ করা হয়। এই সেক্রেটারী সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া অথবা ভারত সচিব নামে পরিচিত। এই সংস্থাটি ইংলণ্ডে স্থাপিত হয় এবং ইংলণ্ডের মহারানীর পক্ষে ভারতের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব এই কাউন্সিল ভারত সচিব গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক মহারানীর প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের গভর্নর-জেনারেল ভাইসরয় বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। নীতি হিসাবে ভারতের শাসন ব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ভারত সচিবের নির্দেশ অনুসারেই গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ভারতের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন।

(২) ভারত সচিব : ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের আইনের দ্বারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থলে

ও নৌবাহিনীর দায়িত্ব ব্রিটিশ সিংহাসনের উপর ন্যস্ত করা হয়। কোম্পানীর 'বোর্ড অফ কন্ট্রোল' এবং 'কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস' বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। এই দুটি সংস্থার সকল ক্ষমতাই ভারত সচিবের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। ভারত সচিবের প্রধান দায়িত্ব ছিল ভারতের শাসন ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রয়োজন অনুসারে নির্দেশ দেওয়া। তিনি পার্লামেন্টে বসার অধিকারী এবং ব্রিটিশ ক্যাবিনেটেরও সদস্য রূপে পরিগণিত হতেন। তিনি প্রতি বছর ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পার্লামেন্টের নিকট পেশ করতেন এবং ভারতীয় জনসাধারণের নৈতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতি সম্পর্কে পার্লামেন্টের সদস্যদের অবহিত করতেন। ভারত সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ আইনগুলোও তিনি হাউস অফ কমন্স-এর সামনে উপস্থাপিত করতেন। ভারতের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, কাউন্সিলের সদস্য প্রভৃতি নিয়োগের দায়িত্বও ভারত সচিব বহন করতেন।

(৩) ভাইসরয়ঃ ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের আইন প্রকৃতপক্ষে ভারতের শাসন কাঠামোর ও শাসন পদ্ধতির কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করে নি। ভাইসরয় উপাধিতে ভূষিত হওয়ার পর সরকারী ক্ষেত্রে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পেলেও বাস্তব ক্ষেত্রে অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। তখন থেকে সাধারণত সুদক্ষ রাজনীতিবিদ এবং অভিজ্ঞ প্রশাসকগণ ভারতে ভাইসরয় পদে নিযুক্ত হতে শুরু করেন এবং ইংলণ্ডের রাজনীতিতে বিশেষ কোন পরিবর্তন না হলে পাঁচবছর পর্যন্ত ঐ পদে তাঁরা অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ ভোগ করতেন। গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরদের নিযুক্ত করার ক্ষমতা ইংলণ্ডের সিংহাসন ভোগ করত। তবে লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের নিযুক্ত করার ক্ষমতা ভোগ করতেন গভর্নর জেনারেল। ভাইসরয়ের কর্ম পরিষদ গঠনে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের আইন কোন পরিবর্তন সাধন করে নি। তিন জন প্রধান রাজকর্মচারী ও একজন আইন সদস্য নিয়ে এই কাউন্সিল গঠিত হত এবং প্রধান সৈনাধ্যক্ষ অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে কর্ম পরিষদের সভায় যোগ দিতেন। তবে কর্মপরিষদের কার্যের সুবিধার জন্য ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ক্যানিং বিভিন্ন সদস্যের শাসন-তান্ত্রিক বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন ঐ বছরে একজন অর্থসদস্যও কর্মপরিষদে যোগ দেন। ক্যানিং-এর এই নীতি পরবর্তীকালে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল অ্যাক্টে সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত এই নীতি অব্যাহত থাকে। তবে এই নীতির কার্যকারিতা প্রশংসনীয় হলেও এই নীতির ফলেই কর্মপরিষদের সদস্যগণ ভাইসরয়ের সচিবে পরিণত হন এবং ভাইসরয়ের ক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তা সত্ত্বেও পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপন, অভ্যন্তরীণ শাসন প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতসচিব সর্বেসর্বা ক্ষমতার অধিকার লাভ করেন। অপরদিকে এই সময় দুটি কারণে ভারত সরকারের উপর ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। (১) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় এবং (২) উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এশিয়ায় ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে ভারত এশিয়ায় ব্রিটিশ সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতে নিজেদের ক্ষমতা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তান, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, ভুটান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হয়। ফলে ভারতের

অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠীর সর্বাত্মক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে ১৮৬১ ও ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে নতুন কাউন্সিল আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই দুটি আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা হলেও প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ব্রিটিশ শাসকদের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। শিক্ষিত ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে স্বায়ত্ত শাসনের সামান্য ক্ষমতা ভারতীয়দের উপর অর্পণ করলেও প্রকৃত ক্ষমতা ব্রিটিশ শাসকবর্গই কুক্ষিগত করে রাখার ব্যবস্থা করেন। ফলে শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতাই অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

(৪) **অর্থদপ্তর গঠন :** ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ অনুযায়ী ভারতের অর্থ বিভাগকে কেন্দ্রীয় সরকার পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ লাভ করে। ফলে প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী অর্থবরাদ্দ করতে অনেক সময়ই কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তুত হত না। সিপাহি বিদ্রোহের সময় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করে কেন্দ্রীয় সরকারও সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। এই সংকট দূর করার উদ্দেশ্যেই ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে জেমস উইলসনকে প্রথম অর্থমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর উইলসন ভারতের অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। তিনি মাত্র ন'মাস এই বিভাগের দায়িত্ব বহন করেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অর্থ দপ্তরের শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক সম্পর্কে নতুন নীতি গ্রহণ, আয়কর প্রবর্তন প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা ও একই সঙ্গে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করেন। বার্ষিক আয়-ব্যয় সুনির্দিষ্ট করার জন্য বাজেট তৈরি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং নানা প্রকার অর্থ নৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে তিনি সরকারের অর্থনীতিকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সমর্থ হন। সিপাহি বিদ্রোহের পর অর্থদপ্তরকে নতুন করে গঠনের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫) **প্রাদেশিক শাসন :** কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থারও অনেক পরিবর্তন করা হয়। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কয়েকটি প্রদেশের সীমানা পুনর্নির্ধারিত করা হয়। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে আসামকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি প্রদেশে পরিণত করা হয়। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যাকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে নতুন প্রদেশের নামকরণ করা হয় আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ। আবার ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী অঞ্চলকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে সাগর, নর্মদা এবং নাগপুর অঞ্চল যুক্ত করে মধ্যপ্রদেশ নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। আসাম, আগ্রা অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে এক একজন করে লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। প্রদেশের আয়তন ও গুরুত্ব অনুযায়ী প্রধান শাসকরূপে গভর্নর,

লেফটেন্যান্ট গভর্নর বা চীফ কমিশনার নিযুক্ত করা হত। কোন কোন আইন এবং কোথাও কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।

জেলাই ছিল শাসন ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি। জেলাগুলি আবার মহকুমা, থানা, তহশীল, তালুক প্রভৃতিতে বিভক্ত। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদযুক্ত জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের উপর জেলার পূর্ণ শাসন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শাসন ব্যবস্থার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীরা সাধারণত ইংলণ্ডের সিভিল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের স্ট্যাটুট অনুযায়ী প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগের নীতি সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয়। ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অধিকতর অংশগ্রহণের নীতিও গৃহীত হয়। ব্রিটিশ শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত ভারতীয় জনগণের কোন যোগাযোগ না থাকার জন্য এই বিদ্রোহ ঘটে --এই কথা স্মরণ রেখে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি গৃহীত হয়।

(৬) ব্রিটিশ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি : ভারতীয় সিপাহিদের সংখ্যার অনুপাতে অতি নগণ্য সংখ্যায় বৃটিশ সৈন্য রাখার বিপদ বুঝতে পেরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরও বহু ব্রিটিশ সৈন্য ভারতে আনয়ন করে ভবিষ্যতে সিপাহি বিদ্রোহের পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা করে। তাছাড়া সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তীকালে যাবতীয় দায়িত্ব মূলক কার্যে কেবলমাত্র ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগের নীতি অনুসৃত হতে শুরু করে। দেশীয় গোলন্দাজ বাহিনীকে ইয়োরোপীয় বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী নতুন করে গঠন করার জন্য কয়েকটি নীতিও গৃহীত হয়। দেশীয় সিপাহিদের সংখ্যা হ্রাস এবং ইয়োরোপীয় সৈন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশ রক্ষার খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হতে শুরু হয় এবং সামরিক বিভাগের অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য ভারতবাসীর উপর নতুন নতুন করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। সামরিক বিভাগের উচ্চপদে এবং সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে একমাত্র ইংরেজদেরই নিযুক্ত করা হয়। অপরদিকে ভারতীয় উচ্চবর্ণের লোকদের সামরিক বাহিনীতে গ্রহণ করা নীতিগতভাবেই বন্ধ করা হয়। পূর্বিয়া নামে পরিচিত পূর্বভারতের অধিবাসীদের এবং বাঙ্গালীদের সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করা প্রায় নিষিদ্ধ করা হয়।

বিদ্রোহের পরবর্তীকালে পুলিশবাহিনীরও সংস্কার ও পুনর্গঠন করা হয়। মাদ্রাজ পুলিশ বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা মিস্টার ডব্লিউ রবিনসনের উপর এই কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ভারতীয় নৌবাহিনীকে বিলুপ্ত করে সন্নিহিত সাগরে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব রাজকীয় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর উপর অর্পণ করা হয়।

(৭) বিচার বিভাগের সংস্কার : সিপাহি বিদ্রোহের পূর্বেই লর্ড হ্যারিংটন মেকলের দ্বারা ভারতের জন্য পেনাল কোড প্রণয়ন শুরু হয়। সিপাহি বিদ্রোহের পর তা প্রধান বিচারপতি স্যার কর্নেল পীকের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়ে আইনে পরিণত হয়। যথেচ্ছ বিচার ও শাস্তির হাত থেকে নতুন বিচার ব্যবস্থা ও নতুন আইন জনসাধারণকে বহুল পরিমাণে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। ফৌজদারী বিচারের পদ্ধতি পরিবর্তন করে এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট করে কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর প্রণীত হয়।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এক আইনের দ্বারা বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই তিনটি প্রেসিডেন্সীতে তিনটি হাইকোর্ট স্থাপন করেন। সুপ্রীমকোর্ট ও সদর আদালতের মধ্যেকার পার্থক্য দূর করা হয় এবং এই দুই আদালতের বিচার ক্ষমতা হাইকোর্টে কেন্দ্রীভূত করা হয়। এই সময় স্থির হয় যে হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ থাকবেন ইংরেজ ব্যারিস্টার এবং আর এক-তৃতীয়াংশ থাকবেন বিচার কার্যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সিভিল সারভেন্ট। যোগ্যতা সম্পন্ন ভারতীয়দের জন্য বাকি পদগুলো নির্দিষ্ট করা হয়। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে সিভিল সার্ভিস বিধি প্রণয়ন করে অনেকগুলো পদ ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

(৮) **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি :** সিপাহি বিদ্রোহের পূর্বেই ভারতে রেলপথ তৈরির কাজ এবং টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতির ব্যবস্থা শুরু হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম ছিল। সিপাহি বিদ্রোহের সময় দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা শাসকর্গ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। সুতরাং বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার পরই তাঁরা এদিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো রেলপথের দ্বারা যুক্ত করার জন্য এই সময় একটি বিরাট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। রেলপথ তৈরি ছাড়াও অন্যান্য রাস্তাঘাটের উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগের কাজের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(৯) **দেশীয় রাজ্য-সম্পর্কে নতুন নীতি :** ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকার ও দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্পর্কের মধ্যে একটি বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করে। লর্ড ডালহৌসির রাজ্য অধিকার নীতি বিদ্রোহের অন্যতম কারণরূপে চিহ্নিত হয়। ফলে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে মহারাণীর ঘোষণা পত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে দেশীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্পাদিত সকল চুক্তি অপরিবর্তনীয় ভাবে মেনে চলা হবে এবং ব্রিটিশ সরকারের ভারতে রাজ্য বিস্তৃতির আর কোন বাসনা নেই। কিন্তু ঐ বছরেই লড ক্যানিং ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ শক্তিই ভারতের একছত্র অধিপতি। সুতরাং প্রয়োজন অনুসারে দেশীয় রাজ্যগুলোর শাসনকার্য পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব তারা ভোগ করে। ফলে সিপাহি বিদ্রোহের পর দেশীয় রাজ্যসমূহের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে এবং নৈতিক ভাবে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যসমূহে বসবাসকারী ভারতীয়দের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

(১০) **ভারতীয়দের সম্পর্কে নীতির পরিবর্তন :** ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহের কারণগুলোর মধ্যে ব্রিটিশ শাসনাধীনে সতীদাহ প্রথা বন্ধ, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি সংস্কার কার্যকরী করা অন্যতম কারণরূপে দেখা দেয়। এই কথা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সংস্কার কার্যাদি গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে শুরু করে। অপরদিকে সিপাহিদের সশস্ত্র বিদ্রোহের পশ্চাতে আর একটি কারণও বিদ্যমান ছিল; তা হল ভারতীয় রক্ষণশীলতার সঙ্গে ইয়োরোপীয় উদারনীতির সংঘর্ষ। সিপাহি বিদ্রোহের ফলে ভারতীয় সংরক্ষণশীলতার কাছে সামরিক ভাবে পশ্চিমী উদার নীতি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ফলে সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার তাদের পূর্বতন উদার নীতি পরিত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে সংরক্ষণশীল এবং ভারতীয়দের সামাজিক ও ধর্মজীবনে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করে।

Q. 3. How far the political ideology of Bankimchandra helped the growth of extremism ?

Ans. (১) ভূমিকা : সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শনের প্রধান কীর্তি স্বদেশ। কিন্তু তাঁর এই স্বদেশ প্রীতির স্বরূপ স্পষ্টভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন। নিজের অজ্ঞাত মনে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীনতা কামনা করতেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অনিবার্যতাও স্বীকার করতেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের অনিবার্যতা স্বীকার করতেন বলেই আনন্দমঠের আখ্যান বস্তু সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। সাধারণ পাঠক ছত্রে ছত্রে লেখকের অজ্ঞাত মনের সেই উদ্দেশ্য দেখে আনন্দমঠকে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী বলেই গ্রহণ করেছে। আনন্দমঠ ব্যতীত বঙ্কিমের স্বাজাত্যবোধের প্রধান দুই কীর্তি আনন্দমঠের অন্তর্ভুক্ত 'বন্দেমারতম্' এবং কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব'। বঙ্কিমকে 'বন্দেমাতরমের' ঋষি বলা চলে; দেশমাতৃকার কল্পনামূর্তির উদ্ভাবক ও উদ্গাতা বলা চলে।

(২) বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি : ব্যক্তিগত জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমদিকে রাজনৈতিক লেখায় ও আলোচনায় যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে রাজনীতিতে যোগদান করা নিষিদ্ধ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসনের সদস্য ছিলেন। এই অ্যাসোশিয়েসন ছিল উচ্চবিত্তদের সংগঠন। উচ্চশিক্ষা অপেক্ষা নিম্নশিক্ষায় অর্থব্যয়ে সরকার প্রস্তাব করলে, উচ্চবিত্তরা স্বভাবতই সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কিন্তু বঙ্কিম লোকশিক্ষার পক্ষে ছিলেন এবং তিনি স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের প্রচেষ্টার সমর্থন করেন। সম্ভবত এই মতান্তরের জন্যই তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসনের সদস্যপদ ছেড়ে দেন। আর কোন রাজনৈতিক সমিতিতে তিনি কোনদিন যোগদান করেন নি। হিন্দুমেলা অথবা জাতীয় কংগ্রেসেও তিনি যোগ দেওয়া পছন্দ করেন নি। বঙ্কিম ছিলেন 'সাহিত্যের কর্মযোগী' সুতরাং তিনি রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন কি-না তা বড় প্রশ্ন নয়। আসল কথা হল বঙ্কিমের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তা দেশের রাজনৈতিক ভাবনায় কতটা সহায়ক হয়েছে।

বঙ্গদর্শন-এর প্রথম দিকে তাঁকে রাজনীতি সম্পর্কে বিমুখ দেখা যায় নি। তবে তার অনেকখানিই ঐতিহাসিক তাড়নায় এবং স্বদেশ চিন্তার প্রণোদিত। বাঙ্গালীর 'বাহুবল,' 'ভারতকলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', 'প্রাচীন ভারতের রাজনীতি', 'বাংলার ইতিহাস','বাংলার কলঙ্ক', 'জাতিবৈর' প্রভৃতি বহু রাজনৈতিক রচনা। অনেকগুলো লেখা আবার সমাজতাত্ত্বিক চিন্তায় ও পরোক্ষভাবে স্বদেশ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ। 'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক,' এবং কমলাকান্তের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উক্তি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম শ্রেণীর লেখাগুলোতে যে মূল রাজনীতি-ভাবনার ও চেতনার সূত্রপাত্র বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন তা শিক্ষিত শ্রেণীকে স্বদেশ বিষয়ে সচেতন করে তোলার কথা—পরাজিত বাঙ্গালী ও ভারতবাসীকে কিছুটা উৎসাহদানেরও কথা। অন্যান্য অনেক লেখাই জাতীয়তার উদ্বোধন হিসাবে রাজনীতি সম্পর্কিত। 'কমলাকান্তের পত্রে'র পলিটিক্স্ বিশ্লেষণ, কুক্কুর জাতীয় ও বৃষজাতীয় পলিটিক্সের ব্যাখ্যা একদিকে যেমন উপভোগ্য তেমনি অপরদিকে বাস্তব রাজনৈতিক বোধের প্রমাণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি বিশিষ্ট কীর্তি হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা। বারে বারে তিনি হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আনুগত্য জন্মগত। যুগশিক্ষায় সুশিক্ষিত-যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তায় তিনি হিন্দুধর্মের পক্ষে যা করেন তা তাঁর প্রতিভার পরিচয়। হিন্দুধর্মের সমস্ত শাস্ত্রকে আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী পরীক্ষা করে, বিচার করে, যুক্তির পর যুক্তির সাহায্যে গীতায় উক্ত নিষ্কাম ধর্মকেই একমাত্র হিন্দুধর্মরূপে ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণকে আদর্শ মনুষ্যরূপে স্থাপন, জন্মগত বিশ্বাসকে যুগসঙ্গত যুক্তির ধারাতেই পুষ্ট করে তিনি একটি নতুন দিকের উন্মোচন করেন। বঙ্কিমের এই প্রচেষ্টা সমকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা থেকে তা জানা যায়। তিনি বলেন যে আধুনিক যুগ-গ্রাহ্য হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুসমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রথম বঙ্কিমই অগ্রণী হন। সংক্ষেপে বলা যায় যে বঙ্কিমের মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মের পুনর্জীবনের আভাস দেখা যায়। সমাজ সংস্কার অপেক্ষা সংরক্ষণের দিকে তাঁর বেশি ঝোঁক থাকলেও তিনি কট্টর গোঁড়াপন্থী ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন জীবননিষ্ঠ এবং মানবতাবাদী সুতরাং তিনি মানবীয় বৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে সর্বাঙ্গীণ পুরুষার্থ লাভের কথা বলেছেন। ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণ চরিতের মাধ্যমে তিনি হিন্দুধর্মের নানাদিক সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করেন। বঙ্কিম কায়মনোবাক্যে হিন্দু-ধর্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাস করতেন। সেজন্য তিনি বলেন, "যেদিন ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প ও ভারতের নিষ্কাম কর্ম একত্র হইবে সেদিন মনুষ্য দেবতা হইবে।"

(৩) চরমপন্থীদের উপর প্রভাব : বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হলেও তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ভারতীয়, বিশেষভাবে বাংলার রাজনীতির উপর তাঁর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর দেশপ্রেম রাজনৈতিক-দর্শন বহু রাজনীতি-বিদকেই উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি স্বদেশ প্রেমকে ধর্মের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিন্তাধারাকে স্বদেশ প্রেমের ধর্ম বলে বর্ণনা করেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রায় অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেন যে তিনি স্বদেশ প্রেমকে ধর্ম এবং ধর্মকে স্বদেশ প্রেমে পরিণত করতে সমর্থ হন। কিন্তু স্বদেশ প্রেম ও ধর্ম বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সমার্থক ছিল সেকথা মনে করলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অবিচার করা হবে। তাঁর মানবপ্রেম সমাজ, কাল ও দেশের গণ্ডী অতিক্রম করে এক বিশ্বজনীন মানবতাবাদে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মানবপ্রেম স্বদেশপ্রেম অপেক্ষাও অনেকবেশী গভীর ছিল। তিনি পাশ্চাত্য দেশে অনুসৃত স্বাজাত্যবোধ ও দেশপ্রেম সম্পর্কে খুব উচ্চধারণা পোষণ করতেন না এবং ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে স্বদেশপ্রেমের নতুন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন বঙ্কিমচন্দ্র তাও পছন্দ করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমস্ত প্রাণীকে সমভাবে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কিন্তু মানব সভ্যতার অপূর্ণতার জন্য সমস্ত প্রাণীকে সমভাবে ভালাবাসা অসম্ভব—সুতরাং স্বদেশ প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করা উচিত। তাঁর নিজের ভাষায় 'সকলধর্মের উপর স্বদেশ প্রীতি।' তাঁর এই স্বদেশ প্রীতির চিন্তাধারা ভারতের চরমপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে তুলতে অনেকাংশে সাহায্য করে। বিশেষত এই ব্যাপারে আনন্দমঠ ও

তার অন্তর্ভুক্ত বন্দেমাতরম ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের নিকট গভীর অনুপ্রেরণা রূপে দেখা দেয়। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীগণ অর্থাৎ সন্তানদল চরমপন্থী আন্দোলনকারীদের নিকট আদর্শরূপে পরিগণিত হতেন। ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে আনন্দমঠ ছিল প্রেরণার প্রতীক—নিষ্কাম স্বদেশ প্রেমের দীক্ষায়, স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ। সমগ্র আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রাণবাণী 'বন্দেমাতরম' ছিল চরমপন্থীদের মহাসঙ্গীত এবং মাতৃমন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে তাঁরা যে কোন দুঃসাহসিক কর্মে আত্মনিয়োগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না।

আনন্দমঠের সন্তানদলের কাছে দেশই ছিল মা। এই গ্রন্থে মায়ের ত্রিমূর্তি প্রদর্শিত হয়েছে। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ভারতবর্ষ—'মা যা ছিলেন।' স্বৈরাচারী শাসনে মা হৃতসর্বস্বা, দেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছে, মা অন্ধকারাচ্ছন্ন কালী কালিমাময়ী—'মা যা হইয়াছেন।' দেশপ্রেমিক সন্তানদলের ধ্যাননেত্রে স্বপ্ন-সাধনা ও কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মায়ের এক ঐশ্বর্যময় মূর্তি—বিদ্যা, বুদ্ধি, সামরিক বল, ধনৈশ্বর্য এবং গণশক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে গড়া আগামীদিনের নতুন ভারতবর্ষ—'মা যা হইবেন।' অন্ধকারাচ্ছন্না কালিমাময়ী মাকে হৃত-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল আনন্দমঠের সন্তানদের একমাত্র ধর্ম, লক্ষ্য, সাধনা, কামনা ও বাসনা—এই লক্ষ্যেই ধাবিত হত তাঁদের সকল কর্ম-প্রয়াস। চরমপন্থীদের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের এই বর্ণনা গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং তাঁরা কালীমূর্তির আরাধনার দ্বারা শক্তি ও সাহসকে উদ্দীপ্ত করে তোলার চেষ্টা করেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে আনন্দমঠ ব্যতীত অন্য কোন উপন্যাস তরুণ বাঙালীদের উপর এরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। **"No other Bengali book—or, for the matter of that no book written in any language—so profoundly moved the Bengali youths."**

চরমপন্থীদলের অন্যতম প্রধান নায়ক অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর সম্পাদিত বন্দেমাতরম পত্রিকায় লেখেন, যে নতুন শক্তি জাতিকে পুনরুত্থান ও স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করতে সমর্থ হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁর উৎসাহদাতা এবং রাজনৈতিক গুরু। অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে 'নবভারতের স্রষ্টাদের' মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে অরবিন্দ ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' অভিধায় ভূষিত করেন। তিনি বলেন বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে বন্দেমাতরম মন্ত্রদান করেছেন সেজন্যই তিনি ঋষি। কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইলের রচয়িতা শিল্পী ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র নন—দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ কৃষ্ণচরিত এবং ধর্মতত্ত্বের রচয়িতা জাতিসংগঠক ও ঋষি বঙ্কিমই নব ভারতের স্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম। জাতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আবেদন-নিবেদন নীতির অসারতা উপলব্ধি করেন এবং 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তিনি এর বিরুদ্ধে বিদ্রূপ বাণ বর্ষণ করেন।

অরবিন্দের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানদৃষ্টিতে প্রতিভাত মাতার দ্বিসপ্তকোটি হস্তে উন্মুক্ত তরবারি বিদ্যমান—ভিক্ষাপাত্র নয়। দেশের মুক্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন নৈতিক বল, যার ভিত্তি হল পূর্ণ আত্মনিবেদন, সংগঠন, নিয়মানুবর্তিতা এবং দেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়। অরবিন্দের মতে বঙ্কিম রচনাবলীর মূল কথাই হল স্বদেশপ্রেম ধর্ম

এবং এটাই আনন্দমঠের প্রাণবাণী। যে বন্দেমাতরম আজ অখণ্ড ভারতের জাতীয়সঙ্গীত সেই মহাসঙ্গীতের মধ্য দিয়েই ঐ প্রাণবাণীর অনবদ্য ছন্দোময় প্রকাশ।" অন্যত্র অরবিন্দ বলেন যে "জাতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল এই যে তিনি আমাদের মাতৃমূর্তি দিয়ে দিয়েছেন। "The supreme service of Bankimchandra to his nation was that he gave us the vision of our Mother." বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনাতে যে ভাবে মাতৃমূর্তি দর্শন করেন, সেভাবেই তা দেশবাসীর নিকট চিত্রিত করার চেষ্টা করেন। তাঁর আদর্শেই সমগ্র জাতি মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১১ই আশ্বিন 'ধর্ম' পত্রিকায় তিনি লিখেছেন, "স্বদেশ প্রেমের ভিত্তি মাতৃ পূজা। যেদিন বঙ্কিম-চন্দ্রের বন্দেমাতরম গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগিল, মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।" দেশ অরবিন্দের নিকট নিছক একটি জড় পদার্থ নয় মাঠ, ক্ষেত, বন, পর্বত বা নদী নয়—"আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।" বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব নিঃসন্দেহে তাঁকে এই রূপ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের 'ধর্ম' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'দুর্গাস্তোত্রে' তাঁর স্বদেশ প্রেম ও মাতৃ চিন্তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। কমলাকান্তের মতোই তিনি দেবী দুর্গাকে বলদায়িনী, প্রেমদায়িনী, জ্ঞানদায়িনী, শক্তিরূপিণী ভীমে, সৌম্য রৌদ্র-রূপিণী বলে আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের দুর্গতিনাশের জন্য মায়ের কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন। "মাতঃ দুর্গে! তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করিব না ; শ্রদ্ধাভক্তি প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিব।" তাঁর রচিত 'ভবানী মন্দির' এবং 'The Mother' এর মধ্যেও অনুরূপ চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে।

চরমপন্থীদলের অপর একজন বিশিষ্ট নেতা বিপিনচন্দ্র পালও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করেন, **"Durgesh-nandini quickened my earliest partriotic sentiments. Our sympathies were all entirely with Birendra Singh, and the court scene where the Muslim invader was stabbed through his heart by Vimala made a profound impression upon my youthful imagination."**

(৫) **উপসংহার :** ডক্টর অমলেশ ত্রিপাঠি বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শন এবং চরমপন্থীর রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন যে আনন্দমঠের মাতৃমন্দির ছত্রপতি শিবাজীর ভবানী মন্দিরের এবং পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রীকদের প্রেরণার উৎস পার্থেননের এথেনার মন্দির আদর্শের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে চরম-পন্থীদের মতবাদ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু সুমিত সরকার মনে করেন যে, **"The greatest single influence was Bankimchandra, with his historical novels climaxed by Anandamath (1882) with its Band Matarm hymn. Through essays as well as novels, Bankimchandra sought to evoke a new interest in the history of the country, striking a note typical of nationalism all over the world."**

Q. 4. What do you know of the British policy towards Oudh Talukdars ?

Ans. (১) ভূমিকা : ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যা ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই সময় অযোধ্যায় তালুকদার নামে পরিচিত ভূস্বামীগণই রাজ্যের অধিকাংশ ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। বৃহৎ বা ক্ষুদ্র প্রতিটি গ্রামেই একটি করে স্থানীয় অধিবাসীদের সংস্থা ছিল কিন্তু তাদের ক্ষমতা ও কার্যকলাপ খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু অযোধ্যা অধিকার করার পর ব্রিটিশ সরকার উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই তালুকদারদের দাবি অগ্রাহ্য করে এবং তেইশ হাজার গ্রামের মধ্যে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে মাত্র তের হাজার গ্রাম সম্পর্কে তালুকদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে। ঐ সময় ন' হাজার গ্রাম সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার গ্রামে জমির মালিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে। ব্রিটিশ সরকারের এই নীতিতে তালুকদারগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং জমির রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করার ফলে সাধারণ প্রজাগণও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। ফলে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের সময় অযোধ্যার সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অযোধ্যার তালুকদারগণ এই বিদ্রোহ এবং অযোধ্যায় ব্রিটিশ শাসনের অনুপস্থিতির সুযোগে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত তাদের জমি পুনরায় উদ্ধার করার ব্যবস্থা করেন। নতুন মালিকদের জমি থেকে উৎখাত করা তাঁদের পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না, কারণ তাঁদের অস্ত্রশস্ত্রের কোন অভাব ছিল না এবং প্রত্যেক তালুকদারই বন-জঙ্গল ও পর্বতদ্বারা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত দুর্গ সদৃশ অট্টালিকায় বাস করতেন। বিদ্রোহ দমন করার সময় ইংরাজ সৈন্যদের প্রায় ১৫৭২টি তালুকদারদের দুর্গ অধিকার করতে হয় এবং ৭১৪টি কামান তারা তালুকদারদের নিকট থেকে উদ্ধার করে। তালুকদারদের বিরুদ্ধে অযোধ্যার সাধারণ লোকদের মনে বিদ্বেষের ভাব থাকলেও তারাও ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিল। সুতরাং সিপাহি বিদ্রোহের সময় অযোধ্যার সকল শ্রেণীর লোকই এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। এমনকি কৃষক শ্রেণীর লোকেরা তখনও তালুকদারদের তাদের সামন্তরাজ বলে মনে করত এবং তালুকদারদের আহ্বানে তারাও সাড়া দেয়।

অপরদিকে লক্ষ্ণৌ ইংরেজ কর্তৃক পুনরায় অধিকৃত হওয়ার পর গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর ঘোষণা অযোধ্যার তালুকদারদের মনে প্রচণ্ড আশঙ্কার সৃষ্টি করে। এই ঘোষণায় বলা হয় ব্রিটিশের প্রতি অনুগত কয়েকজন তালুকদার ব্যতীত অবশিষ্ট সকলের ভূ-সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করবে। ফলে অযোধ্যার তালুকদারদের মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং তাঁরা দলবদ্ধ ভাবে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। ভূ-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে মর্যাদাহীন জীবন যাপন অযোধ্যার তালুকদারদের নিকট অসহনীয় পরিস্থিতি বলে মনে হয়েছিল। সুতরাং একসময় যেমন তাঁদের পূর্বপুরুষ নবাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা করেছিলেন এবারও তেমন ভাবেই তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বজায় রাখার চেষ্টা করেন। জেনারেল আউটরাম লর্ড ক্যানিং-এর ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করেন এবং তিনি বিদ্বেষের পরিবর্তে সহৃদয়তার দ্বারা বিদ্রোহীদের পুনরায় ব্রিটিশ সরকারের অনুগত করে তোলার চেষ্টা করেন। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি ছিলেন লর্ড এলেনবরো। তিনিও ক্যানিং-এর ঘোষণার

তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাঁর মতেও ক্যানিং-এর ঘোষণার ফলেই অযোধ্যার তালুকদারগণ ব্রিটিশ সরকারের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করতে রাজী হন। যা হোক, শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সৈন্যগণ আযোধ্যার বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়।

(২) **ব্রিটিশ নীতি :** বিদ্রোহ দমন করার পর ব্রিটিশ সরকার অযোধ্যার তালুকদারদের সম্পর্কে নতুন নীতি গ্রহণ করার ব্যবস্থা করে। তালুকদারদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে একটি বিশেষ কমিশন নিযুক্ত করা হয়। উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্ত বিষয়টিকে পর্যালোচনা করাই ছিল এই কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে তালুকদার অধিকার সম্পর্কে অনেক নতুন নীতি গৃহীত হয়। সিপাহি বিদ্রোহ দমিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার জায়গীরদার, তালুকদার ও পেন্সন প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে একটি স্থির নীতি গ্রহণ করার ব্যবস্থা করে। অযোধ্যার নবাব পরিবারের অনেক ব্যক্তির পেন্সনের পরিমাণ হ্রাস করা হলেও নতুন নতুন ব্যক্তিদের জন্য পেন্সন মঞ্জুর করতেও ব্রিটিশ সরকার আপত্তি করে নি। কিন্তু এই সময় মুয়াফিদার অর্থাৎ নিষ্কর জমির মালিকগণসহ তালুকদারগণ ভূ-সম্পত্তির ব্যাপারে নানাপ্রকার জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। অনেকে মনে করেন যে, সিপাহি বিদ্রোহের জন্য ইংরেজ সরকার মুসলমানদের প্রধানত দায়ী মনে করত বলে তাঁদের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণের নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু বিদ্রোহ-উত্তর যুগে ইংরেজ শাসকবর্গ যে নীতি গ্রহণ করেন তা থেকে এইরূপ সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ দেখা যায় যে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার একই ধরনের কঠোর নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ই নভেম্বরের সরকারী নির্দেশ থেকে জানা যায় যে মীরাটের কমিশনার ৩৯১টি তালুক বাজেয়াপ্ত করেন। তাদের মধ্যে ৩০৫টি তালুক ছিল হিন্দুদের। মীরাটের মুসলমানগণ সিপাহি বিদ্রোহে প্রায় অংশ গ্রহণ করে নি বললেই চলে। সুতরাং বিদ্রোহের পর তাঁদের শাস্তি দেওয়ার কোন প্রয়োজন ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে নি। প্রকৃতপক্ষে যেখানে মুসলমানগণ বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে, সেখানে তাঁদের শাস্তির পরিমাণও বেশি সহ্য করতে হয়। আবার যেখানে হিন্দুরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে সেখানে তাঁরাই বেশি শাস্তি ভোগ করেন। এই কারণেই দেখা যায় যে, রোহিলাখণ্ডে মুসলমানদের ৩১৫টি তালুক বাজেয়াপ্ত হলেও হিন্দুদের তালুক বাজেয়াপ্ত হয় মাত্র ছটি। রোহিলাখণ্ডে অধিক সংখ্যক মুসলমান তালুকদার ছিলেন এবং বিদ্রোহের সময় তাঁদের অনেকেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বুলান্দশহর জেলার শিকারপুর পরগণার বাহাত্তর জন মুসলমান এবং বিয়াল্লিশ জন হিন্দুর জমি বাজেয়াপ্ত হয়। হিন্দুদের তালুকদারীর অধিকাংশই ছিল নিষ্কর জমি। ঝাঁসি, জব্বলপুর প্রভৃতি জেলারও তালুকদারের অনেক জমি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। বেনারসের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। যদিও পরবর্তীকালে অনেকের তালুকদারী ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তথাপি এই অঞ্চলের তালুকদারদের মন থেকে ব্রিটিশ বিরোধিতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজগণ যখন অযোধ্যা অন্যায়ভাবে অধিকার করে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে তখন থেকেই অযোধ্যার তালুকদারদের ব্রিটিশদের প্রতি বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। অযোধ্যা অধিকার করার কিছুদিন

পূর্বে পাঞ্জাবের উপর ব্রিটিশের অধিকার স্থাপিত হয়। কিন্তু পাঞ্জাবের সামগ্রিক উন্নতির জন্য ব্রিটিশ শাসকগণ যেসব নীতি গ্রহণ করে অযোধ্যায় তা গৃহীত হয় নি। ফলে অযোধ্যার তালুকদারগণ মনে করতে শুরু করেন যে ব্রিটিশ সরকার তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করে। ফলে অযোধ্যার তালুকদারগণ প্রথম থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন এবং পরেও তার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।

(৩) উপসংহার: তালুকদারী ব্যবস্থা অনুযায়ী তালুকদারগণই ভূ-সম্পত্তির মালিক বলে স্বীকৃতি লাভ করতেন তবে ভূ-সম্পত্তির মালিক হিসাবে কৃষক ও অন্যান্য লোকদের প্রতি তাদের কয়েকটি দায়িত্ব বহন করতে হত। তালুকদারদের অধীনস্থ ব্যক্তিরাও জমির উপর অধিকার ভোগ করত অর্থাৎ জমির উপর তাদের অধিকার আইনতই স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যা অঞ্চলের জন্য প্রথম টেনান্সি আইন বিধিবদ্ধ করা হয় এবং এই আইনে স্থির হয় যে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দেব পূর্ববর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে যাদের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়েছে তারা উপযুক্ত দলিল-পত্র উপস্থাপিত করতে সমর্থ হলে তাদের জমি পুনরায় প্রত্যর্পণ করা হবে। এই আইন ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের ১৯ সংখ্যক রেন্ট অ্যাক্ট নামে পরিচিত। কিন্তু এই আইন কার্যকরী করতে গিয়ে কয়েকটি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার ফলে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে ২২ সংখ্যক রেন্ট অ্যাক্ট বধিবদ্ধ করা হয়। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই আইনকে কার্যকরী করা হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে এই আইন অনুসারে পূর্বতন আইনের দোষ-ত্রুটি দূর করে কৃষকদের জমির উপর অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

Q 5. What were the special features of Bengal politics in the last decade of the 19th century?

Ans. (১) ভূমিকা: ১৮৩৭ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ জমিদারের সমিতি জাতীয় কংগ্রেসের উত্থান পর্যন্ত কলকাতায় যে কয়েকটি রাজনৈতিক বা অন্যান্য প্রকারের সংস্থা গড়ে ওঠে তাদের প্রত্যেকটিতেই পাশ্চাত্ত্যের উদারনৈতিক চিন্তাধারার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেখা যায়। ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থায়িত্বলাভ করুক এরূপ মনোভাব তাঁরা পোষণ করতেন এবং তাঁদের অনেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় ভিত্তির উপর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষিত হয়ে অখণ্ড ভারত গড়ে উঠুক এইরূপ চিন্তা তাদের কল্পনায় স্থান পেলেও সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে স্বাধীনতা ও সমতার প্রকৃত অর্থ তাদের নিকট সুস্পষ্ট ছিল না। তবে রাজনৈতিক মতবাদের তুলনায় তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা অনেক বেশী সুস্পষ্ট ছিল। তাঁরা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে স্বাধীনভাবে বিকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্য বারবার দাবি করতে শুরু করেন। দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও উন্নতির জন্য তারা সরকারকে শিল্পসংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করা এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য যত্নবান হতে অনুরোধ করেন।

(২) ব্রিটিশের নীতির প্রতিক্রিয়া: ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকারের কয়েকটি নীতির ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। নীলকর

সাহেবদের অত্যাচারে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক নেতা এই আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত সরকারকে নীলচাষ সম্পর্কে নতুন আইন বিধিবদ্ধ করতে বাধ্য করেন। এই আন্দোলনে শিশির কুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ প্রমুখ নেতৃবর্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। নীলচাষীদের বিদ্রোহ শেষ হতে না হতেই ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলন শুরু হয়। ভারতের জাতীয় চেতনা সৃষ্টির ব্যাপারে ইলবার্ট বিলের গুরুত্ব অপরিসীম। শাসক ও শাসিতদের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধানের নীতি ব্রিটিশ সরকার অনুসরণ করতে শুরু করে এই বিলের প্রতিটি ধারা তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার্থীর বয়ঃসীমা কমিয়ে দেওয়ার ফলে ভারতবাসীদের মনে ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে আরও বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতির স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সার্ভিস থেকে পদচ্যুত হয়ে বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেন। কৃষ্ণদাস পাল, আনন্দমোহন বসু, শিশির কুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ শুধু বাংলাদেশ নয়, বাংলার বাইরেও বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে ও বক্তৃতা দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার চেষ্টা করতে শুরু করেন। কিন্তু এই সময় বাংলাদেশের নেতৃবর্গ ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য যতটা আগ্রহী ছিলেন স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভের জন্য ততটা আগ্রহী ছিলেন না। কৃষ্ণদাস পাল তাঁর হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় হোমরুলের দাবি জানালেও সেই দাবির মূল কথা ছিল ব্রিটিশ সরকারের শাসনব্যবস্থার মধ্যে ভারতীয়দের অনুপ্রবেশের সুযোগ মাত্র।

অপরদিকে এই সময় বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত মুসলিম সমাজ সরাসরিভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ না করলেও বিভিন্ন সংস্থা গঠন করে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে। আমীর আলি ন্যাশনাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই সময় থেকে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা দিতে থাকে।

(৩) **পরবর্তী অবস্থা :** জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও তদানীন্তন নেতৃবর্গের চিন্তাধারার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। ব্রিটিশ সরকারকে আরও প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠন, সরকারী চাকুরীতে অধিকসংখ্যক ভারতীয়দের যোগদানের পথ উন্মুক্ত করা প্রভৃতি বিষয়েই তাঁদের কার্যকলাপ মোটামুটি সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলাদেশে চিন্তা খাতে একটি বিরাট পরিবর্তন শুরু হয় এবং এই পরিবর্তনের পথ-প্রদর্শক ছিলেন সাহিত্যসেবীগণ। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দী পরে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারার বিশেষ কোন

পরিবর্তন হয় নি। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই বাংলার জনজীবনে এক নতুন চিন্তার সৃষ্টি করেন। রাজনীতিবিদগণ তখন পর্যন্ত আইন সভার সদস্যপদ লাভের চাইতে বেশি কিছু পাওয়ার আশা করতে পারতেন না কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি মানুষকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হয়। অপরদিকে বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক আবহাওয়াকে কলুষিত করে তুলতে শুরু করলে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন গোষ্ঠী চিরাচরিত রাজনীতির উপর বিশ্বাস হারাতে শুরু করে। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, লালমোহন ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য এত বেশি চেষ্টা করতেন যার ফলে জনসাধারণের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার কথা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং রাজনৈতিক আদর্শের এই শূন্যতাকে পূরণ করার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেন সাহিত্যিকগণ।

(৪) **চিন্তাজগতের পরিবর্তন ঃ** বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ধর্ম ও দেশপ্রেম প্রায় সমার্থক ছিল। তিনিই স্বদেশবাসীর রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং চিন্তাজগতে এক বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করতে সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে বাংলার তাদানীন্তন রাজনীতিবিদ্গণ চিরাচরিত গণ্ডী এবং পরিচিত পথ অতিক্রম করে দেশবাসীকে নতুন কোন পথের সন্ধান দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সাহিত্যসেবীগণ সেই দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর পরবর্তী রাজনীতিবিদগণ পশ্চিমের উদার নীতির প্রবক্তা ছিলেন এবং ঐ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই ভারতের রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বেকন, রুশো, কান্ট, হিউম, বেন্থাম, মিল, ডারউইন, কোঁৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্যের মনীষীদের রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে যুগোপযোগী নতুন একটি চিন্তাধারা প্রচার করার চেষ্টা করেন। আনন্দমঠ, ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি এই সমন্বয়ী মতবাদ প্রকাশ করেন।

আনন্দমঠ, ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত, বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদের চেতনাকে এক নতুন স্তরে উত্তীর্ণ হন। তাঁর রচিত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত জাতির মনে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তবে তাঁর এই জাতীয়তাবাদ হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত বলে কেউ কেউ তাঁকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করেন। তা সত্ত্বেও সকলে স্বীকার করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয়তাবাদ তরুণ সমাজকে প্রবল ভাবে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র যে নতুন জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেন স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভার স্পর্শে তা মহীরুহে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায়। অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের অপূর্ব সংমিশ্রণ করে, বিবেকানন্দ সমগ্র জাতিকে একটি নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সাধারণ মানুষ সামান্য স্থান পেলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে

উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যই বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সামাজিক বা রাজনৈতিক বিপ্লব সম্পর্কেও তিনি ইয়োরোপের মানবতাবাদীদের মতোই বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদের আহ্বান সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করে আপামর জনসাধারণকে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিদেশী শাসকদেরও তিনি সমাজের সমস্ত শ্রেণীর সক্রিয় সাহায্যে বিতাড়িত করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তিনি সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর উন্নতি জন্য চেষ্টা করেন।

বংকিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ ছাড়াও রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিদের রচনা জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা উদ্ভবের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে। নতুন জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত তরুণদের মনের উপর জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পাবে নি। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বাংলার তরুণদের আকৃষ্ট করতে পারে নি, কারণ তাদের ধারণা হয় যে, জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব নয়। তরুণেরা মনে করে যে, জাতীয় কংগ্রেস আবেদন-নিবেদন করার একটি সংগঠন মাত্র এবং ব্রিটিশ সরকার তাদের এই আবেদনের প্রতি প্রচণ্ড ঔদাসীন্য দেখিয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদকে শুধুমাত্র উপেক্ষা করার চেষ্টা করে নি, তাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের সংস্কার আইন তাদের এই মতকে আরও জোরালো করে তুলতে সাহায্য করে। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে জনসাধারণের যে কোন যোগাযোগ নেই তাও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গেও এই সংগঠনের কোন সম্পর্ক ছিল না। কারণ এই সময়ের জাতীয় কংগ্রেসের কাজ খুব সংক্ষেপে বলা যায় যে, সরকারী চাকুরী ভারতীয়করণ, আইন পরিষদের সম্প্রসারণ, মুদ্রাযন্ত্রের উপর বাধা-নিষেধ পরিহার এবং বিচার বিভাগীয় শাসন বিভাগের পৃথকীকরণের দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে বিক্ষুব্ধ জাতীয়তাবাদীগণ কংগ্রেসের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে অরবিন্দ ইন্দুপ্রকাশে লেখেন, "The Congress in Bengal is dying of consumption ; annually its proportions sink into greater insignificance, its leaders, the Banarjis and Banerjis and Lal Mohan Ghoses have climbed into the rarefied atmosphere of the Legislative Council and lost all hold on the imagination of the youngmen. The desire for a nobler and more inspiring patriotism is growing more intense." ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে অশ্বিনীকুমার দত্ত কংগ্রেসের অধিবেশনকে 'তিন দিনের তামাশা' বলে অভিহিত করেন।

(৫) **উপসংহার ঃ** কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত নেতাই তখন ইংলণ্ডের উদারতার উপর গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে চরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা

হিসাবে পরিচিত বিপিনচন্দ্র পালও বিশ্বাস করতেন যে, ইংরেজ শাসকগণ ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত করে দেবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তাছাড়া, জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ সর্বভারতীয় সমস্যা ব্যতীত অন্য কোনসমস্যা কংগ্রেসের অধিবেশনে আলোচনা করতে সম্মত ছিলেন না। সুতরাং বাংলাদেশের উদারপন্থী নেতৃবর্গ প্রাদেশিক সম্মেলনে আঞ্চলিক সমস্যাগুলো আলোচনা করার পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। ১৮৯৫ থেকে প্রতি বছর বিভিন্ন জেলায় এইসব সম্মেলন শুরু হয়। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে নাটোর সম্মেলনে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। এই বিরাট পরিবর্তন সাধনের সমস্ত কৃতিত্বই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাপ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কবি রবীন্দ্রনাথঠাকুরও তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতীয়দের নতুন জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর এই জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র ছিল আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস। স্বদেশীসমাজ শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি তাঁর এই মত সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করেন। বঙ্গদর্শন, সাধারণী, বান্ধব, সমদর্শী, ভারতী, সঞ্জীবনী, হিতবাদী, সাধনা, অমৃতবাজার, নিউইণ্ডিয়া, বন্দেমাতরম প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা এই নতুন আদর্শ ও চিন্তাধারা প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শ্রমিক ও কৃষকদের যুক্ত করার জন্যও প্রচেষ্টা শুরু হয়। আসাম ও উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হয়। তা, ছাড়া এই নতুন চিন্তাধারা সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গ্রহণ করার পদ্ধতি অবলম্বন করে। আবেদন-নিবেদনের নীতি তাঁরা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন। স্বরাজ লাভের জন্যও তাঁরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পদ্ধতি গ্রহণ করতে সম্মত হন। মানবিক অধিকার সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন। নতুন এই চিন্তাধারার অন্যতম পুরোধা বিপিনচন্দ্র পাল ঘোষণা করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার ভারতীয়দের মানবিক অধিকার মেনে নিতে রাজী হবে ভারতীয়রাও ততক্ষণ তাদের আইন মেনে চলবে। কিন্তু সরকার মানবিক অধিকার স্বীকার না করলে ভারতীয়দেরও আইন মেনে চলার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। নিষ্ক্রিয় ও প্রতিরোধ পদ্ধতির অন্যতম প্রবক্তা অরবিন্দ ঘোষ বলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতি,তাদের বণিক-সুলভ মনোভাব, ভারতীয়দের শিক্ষার প্রতি তাদের ঔদাসীন্য প্রভৃতি ভারতীয়দের স্বার্থের পরিপন্থী। সুতরাং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে এগুলোর প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের এই তরুণ রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করায় বাংলার তরুণ সমাজ বিপ্লববাদের পথে অগ্রসর হতে শুরু করে।

ভারতের ইতিহাস
(সংযোজনী)

Q. 1. Analyse the character of Rowlatt Satyagraha and account for its short comings.

Ans. (১) ভূমিকা :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অনাবৃষ্টি, যুদ্ধে যোগদানের ফলে বহু পরিবারের রোজগারী মানুষের মৃত্যু, মহামারী ও ব্যাধির প্রাদুর্ভাব প্রভৃতির ফলে ভারতবাসীর জীবনের অসন্তোষ ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া, ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটেনের প্রতি ভারতবাসীর আস্থাও খুব ক্ষীণ হয়ে পড়ে। অপরদিকে তুরস্কের প্রতি ব্রিটেনের এবং মিত্র পক্ষের অবিচার ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়কে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলোতে, বিশেষতঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার ভারতবাসীর মনে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রকোপ ও তার সম্ভাব্য প্রতি-রোধ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার জন্য বিচারপতি রাওলাটের সভাপতিত্বে পাঁচ জনের একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি সিডিশন কমিটি বা রাওলাট কমিটি নামে পরিচিত। এই কমিটি ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে রিপোর্ট দাখিল করে। এই রিপোর্টে একদিকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈপ্লবিক আন্দোলনের গতিধারা আলোচনা করা হয়, অপরদিকে সম্ভাব্য বৈপ্লবিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে। রাওলাট কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ভারত সরকার শীঘ্রই সকল প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের জন্য বিশেষ আইন প্রবর্তনে অগ্রসর হয়। এই আইনের দ্বারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হল এবং যথেচ্ছভাবে বিনাবিচারে কারাদণ্ড ও নির্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই মার্চ এই নির্যাতনমূলক আটক আইন বিধিবদ্ধ হয়।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজী সর্বভারতীয় রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। রাওলাট আইন সংক্রান্ত রিপোর্ট সম্পর্কে ইতিপূর্বে গান্ধীজী অবাহিত ছিলেন। তিনি এই সময় মন্তব্য করেন যে, "এই আইনের সুপারিশগুলো আমাকে বিস্মিত করেছে।" প্রকৃতপক্ষে এতদিন তিনি ছিলেন ব্রিটিশ শাসনের একজন অনুগত নাগরিক, কিন্তু রাওলাট আইন তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলল এবং তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে 'শয়তানবাদের' পরিচায়ক বলে মন্তব্য করেন, "The British Empire to day represents Satanism and they who love God can afford to have no love for Satar." ডক্টর তারাচাঁদের মতে গান্ধীজীর এই মানসিক পরিবর্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নৈতিক ভিত্তির ধ্বংস সুনিশ্চিত করে তোলে। গান্ধীজীর বিদ্রোহী মনোভাব ভারতে যে বিদ্রোহের সূচনা করল তা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটালো।

(২) সত্যাগ্রহ আন্দোলন ঃ

রাওলাট বিল আইনে পরিণত হওয়ার পর গান্ধীজী প্রতিবাদস্বরূপ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানান। প্রথমে ৩০শে মার্চ ধর্মঘটের দিন ধার্য হয়, পরে তা ৬ই এপ্রিলে পিছিয়ে দেওয়া হল, গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করে। সমস্ত দেশে এক নতুন উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস দেখা দেয়। কোন কোন স্থানে ধর্মঘটকারীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ শুরু হয়। দিল্লী ও পাঞ্জাবে সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে। দিল্লীতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় যৌথভাবে আন্দোলনে অংশ নেয় এবং আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বিখ্যাত জামা মসজিদে এক মুসলমান সমাবেশে ভাষণ দেন। দিল্লী ও পাঞ্জাবে সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করায় দিল্লীর নেতৃবর্গ পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লী ও পাঞ্জাবে গান্ধীজীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে এক আদেশ জারী করে। এই আদেশ অমান্য করে গান্ধীজী দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। পথে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বোম্বাইতে নিয়ে গিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদে দেশব্যাপী এক তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাওলাট সত্যাগ্রহই প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলনের মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু রাওলাট আন্দোলন বোম্বাই ও গুজরাটে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক আকার ধারণ করে। গান্ধীজীর ব্যক্তিগত পরিচালনায় বোম্বাইয়ে এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়। মুসলমানগণও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, রাওলাট আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে প্রসারলাভ করলেও তা শহরাঞ্চলে অধিকতর সক্রিয় রূপ গ্রহণ করে। রাওলাট আন্দোলনের সর্বপ্রধান গুরুত্ব হল যে, গান্ধীজী এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে যেভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পেরেছিলেন তা ইতিপূর্বে কেউ পারেন নি। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এই আন্দোলন গান্ধীজী সর্বভারতীয় রাজনীতির শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম করে তুললেন।

ডক্টর জুডিথ ব্রাউন এই মত প্রকাশ করেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, গান্ধীজীর রাওলাট সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ এর দ্বারা রাওলাট আইন নাকচ হয় নি, এমন কি আন্দোলন সর্বাত্মক শান্তি বজায় রাখতে পারেন নি। তথাপি ডক্টর ব্রাউন মনে করেন যে, সর্বভারতীয় নেতৃত্বের পথে গান্ধীজীর এই প্রথম পদক্ষেপ গান্ধী রাজনীতির শক্তি ও দুর্বলতা উভয় দিকই তুলে ধরেছিল। শুধুমাত্র রাওলাট আইনের প্রতি বিক্ষোভ জানাতে অথবা গান্ধী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে জনগণ এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে নি। এই আন্দোলনে প্রকৃতপক্ষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের আঞ্চলিক বিক্ষোভগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। "But the power behind that agitation was neither antagonism to the

Rowlatt legislation not loyalty to a new leader, but local discontents, which found a focus and a means of expression in Gandhi's call for hartal." যা হোক্, রাওলাট সত্যাগ্রহের মাধ্যমে গান্ধীজী প্রমাণ করলেন যে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব গ্রহণের প্রকৃত যোগ্যতা ও কর্মপন্থা তাঁর আছে এবং তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণী, বর্ণ ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সুসংহত আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন।

(৩) আন্দোলনের প্রকৃতি ও দুর্বলতা :

রাওলাট সত্যাগ্রহকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা হয় তার চরম পরিণতি ঘটে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিলের পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে. জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার যে দমন নীতি অনুসরণ করে তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি এই নির্মম অমানুষিক হত্যাকাণ্ড। ভারতের সর্বত্র বিক্ষুব্ধ জনগণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। শুধুমাত্র অমৃতসরে নয়, লাহোর ও কসুরে শোভাযাত্রীদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। কিন্তু পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সরকার প্রচণ্ড দমন নীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও ঐ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। গুজরাট এবং বাঙলাদেশেও নতুন করে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় গান্ধীজী মর্মাহত হন এবং ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি এই আন্দোলন অবসানের নির্দেশ দেন।

রাওলাট সত্যাগ্রহ ভারতের বিভিন্ন স্থানের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে পারলেও এই আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ নগর কেন্দ্রিক, গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে এই আন্দোলন কোন গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় নি। এই আন্দোলনকে সর্ব-ভারতীয় করে তোলার জন্য শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু গান্ধীজী সময়ের অভাবের জন্যই হোক অথবা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবের জন্যই হোক সেরূপ কোন ব্যাপক সংগঠন গড়ে তুলতে সমর্থ হন নি। সত্যাগ্রহের সাফল্যের জন্য গান্ধীজী তিন প্রকার রাজনৈতিক-সংগঠন তৈরি করেন। হোমরুল লীগ ও ঐস্লামিক সংগঠনগুলোকে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। তা ছাড়া, এই সত্যাগ্রহের কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তিনি ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি বোম্বাই শহরে সত্যাগ্রহ সভা গঠন করেন। এই সময় মুসলিম লীগ আবদুল বারী, মোহম্মদ আনসারী প্রমুখ নেতৃবর্গের প্রভাবে গান্ধীজীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে রাওলাট সত্যাগ্রহের প্রতি সমর্থন জানায়। এই আন্দোলনের মুখ্য সংগঠন সত্যাগ্রহ সভা প্রচারমূলক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এই আন্দোলনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে এবং সত্যাগ্রহ অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে শুরু করে। গান্ধীজী স্বয়ং মার্চ ও এপ্রিল মাসের

প্রথমদিকে বোম্বাই, দিল্লী, এলাহাবাদ, লক্ষ্মৌ এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন শহরে উপস্থিত হয়ে এই আন্দোলনের সমর্থনে জনমত গঠন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের সামগ্রিক সংগঠন এই আন্দোলনের পটভূমিকা তৈরি করার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করে নি। প্রকৃতপক্ষে এই সময় ভারতের অনেক স্থানেই আন্দোলনমূলক রাজনীতি পরিচালনা করার মতো উপযুক্ত সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসের ছিল না। তা ছাড়া, বাংলাদেশ ও মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক সংগংঠন থাকলেও গান্ধীজির সত্যাগ্রহের নীতিকে তারা সমর্থন করতে সম্মত ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের রাওলাট সত্যাগ্রহ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক সর্বভারতীয় আন্দোলন। কিন্তু এই আন্দোলনকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য গান্ধীজী যে সংগঠন গড়ে তোলেন তা ছিল অত্যন্ত দুর্বল, সীমিত এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সত্যাগ্রহ অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষরকারীদের মোট সংখ্যা ছিল ৯৮২। এদের মধ্যে বোম্বাই শহরে ছিল ৩৯৭, সিন্ধু দেশের গুজরাটে ৪০০, এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বাইরে মাত্র সিন্ধু প্রদেশে ১৫১ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বাইরে মাত্র ৮৪ জন। পাঞ্জাব প্রদেশই এই সময় ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা সবচাইতে বেশি নির্যাতিত হয়, কিন্তু সেখানে হোমরুল লীগের সংগঠন ছিল দুর্বল এবং সত্যাগ্রহ শুরু হওয়ার পূর্বে গান্ধীজী পাঞ্জাবে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পান নি।

হাণ্টার কমিশন এবং কংগ্রেস পরিচালিত পাঞ্জাব অনুসন্ধান কমিটি রিপোর্ট (১৯২০) এবং ডক্টর রবীন্দ্রকুমারের সাম্প্রতিক প্রকাশিত গবেষণাপত্র থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের অর্থনৈতিক সংকট, গান্ধীজীর শক্তি ও প্রভাব সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ও অস্পষ্ট ধারণা, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দমনমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ জনসাধারণকে আন্দোলনে আকৃষ্ট করে তোলে। কিন্তু নগরকেন্দ্রিক এই আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক, কারিগর এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয়ে পড়লেও কৃষক শ্রেণী এই আন্দোলন সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। প্রচারের অভাব কিংবা সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য গান্ধীজী কৃষক শ্রেণী ও গ্রামের মানুষদের এই আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারেন নি। যদিও ৩০শে মার্চ এবং ৬ই এপ্রিল গান্ধীজীর আহ্বানে ভারতের প্রায় সমস্ত শহরেই হরতাল পালিত হয় তথাপি রাজনৈতিক অশান্তি অমৃতসর, লাহোর, গুজরানওয়ালা ও পাঞ্জাবের অন্যান্য শহরে, গুজরাটের আহমেদাবাদ, বীরমগাম ও নদিয়াদ শহরে, এবং দিল্লী ও বোম্বাই এবং সামান্য ভাবে কলকাতা নগরীতে দেখা দেয়। গ্রামাঞ্চলের কোথাও রাজনৈতিক কোন গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয় নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, রাওলাট সত্যাগ্রহ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে ব্যাপক আন্দোলন রূপে দেখা দিলেও পূর্ব ও দক্ষিণ-ভারতে তার প্রভাব ছিল খুবই সীমিত।

সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত হতে ব্যর্থ হওয়ার ফলেই রাওলাট সত্যাগ্রহের সাফল্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

Q. 2. Make a detailed analysis of the U. P. peasant movement between 1919 and 1922. Would you agree that it was betrayed by the Congress leadership ?

Ans (১) ভূমিকা :

১৯২০-২১ খ্রীস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চলের প্রতাপগড়, রায়বেরিলি, সুলতানপুর, ফৈজাবাদ প্রভৃতি জেলায় কৃষক আন্দোলন দেখা দেয়। এইসব অঞ্চলে তালুকদারগণ ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ বিরোধী নীতি খুব সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেন। ফলে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে উত্তর-প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর হার্টকোর্ট বাটলার অযোধ্যা অঞ্চলের তালুকদারদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ব্যবহার করেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, হার্টকোর্ট বাটলার অযোধ্যার তালুকদারদের প্রজাদের সঙ্গে চুক্তি করার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন। প্রকৃতপক্ষে এই নীতির ফলে কৃষকদের প্রজাস্বত্ব ভোগেরনীতি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, পার্শ্ববর্তী আগ্রা অঞ্চলে কৃষকগণ প্রজাস্বত্ব অধিকার ভোগের সুযোগ লাভ করত। ফলে অযোধ্যার তালুকদারগণ ধীরে ধীরে ভূমি বৃদ্ধি করার সুযোগ গ্রহণ করে প্রজাদের উপর করের বোঝা উত্তরোত্তর চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। ফলে ১৯২১-২২ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যা অঞ্চলের কৃষকগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশের কৃষকদের মাথা প্রতি করের পরিমাণের প্রায় চার গুণ কর দিতে বাধ্য হত। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে বিধিবদ্ধ আউধ রেণ্ট অ্যাক্ট প্রজাসত্ত্বের কোন অধিকারই স্বীকার করে নি। এই আইন অনুযায়ী সাত বছরের জন্য তালুকদারদের সঙ্গে প্রজাদের জমি সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদিত হত এবং সাত বছর পরে নতুন করে উভয় পক্ষের চুক্তির সময় তালুকদারগণ সর্বোচ্চ পরিমাণ ৬ৡ হারে কর বৃদ্ধি করার সুযোগ পেতেন। কিন্তু চুক্তিবদ্ধ প্রাক্তন কৃষকদের জমি থেকে বঞ্চিত করার একটি অভিনব ব্যবস্থা তালুকদারগণ উদ্ভাবন করেন। পুরাতন প্রজাদের সঙ্গে সাতবছর পরে নতুন করে জমি বন্দোবস্ত করার সময় তাঁরা 'নজরানা' অর্থাৎ চুক্তি নবীকরণের মাশুল আদায় করতে শুরু করেন। অনেক সময় এই নজরানার পরিমাণ ভূমিরাজস্বের পরিমাণের চেয়েও বেশি দাবি করা হত। আবার নজরানা দিতে অস্বীকার করলে কৃষকদের 'বেদখলী' অর্থাৎ জমি থেকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করতেন। ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও কৃষকদের অন্যান্য নানা প্রকার কর দিতে হত। তালুকদারগণও বিভিন্ন ভাবে তাদের শোষণ করত। প্রয়োজন হলেও তালুকদারদের খাস জমিতে তাদের বেগার দিতে হত—তাদের গরু-মহিষ-লাঙ্গল প্রভৃতিও তালুকদারগণ নিজেদের জমি চাষের জন্য বিনামূল্যে ব্যবহার করার সুযোগ পেতেন। অপরদিকে উচ্চ শ্রেণীর প্রাধান্যের ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর উপর 'যজমানী' পদ্ধতি সদ্ব্যবহার করার

সমস্ত সুযোগ তালুকদারগণ ভোগ করতেন। যজমানী প্রথাই হল শোষণের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র। নিচুজাতের কিষাণরা উঁচুজাতের তালুকদারদের, এমন কি, বাঁধক্ষু কিষাণদের বিনামূল্যে অথবা বাজারদর থেকে কম দামে ঘি, কাপড়-চোপড়, গরু-মহিষের চামড়া প্রভৃতির যোগান দিতে বাধ্য হত। মূল্যবৃদ্ধির ফলে এসব জিনিসের যোগান দেওয়া ক্রমশই অধিকতর কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তারপর আবার জোর করে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা এবং লড়াই-চাঁদা অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহের ফলে তালুকদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়।

(২) কৃষক সংগঠন ঃ

মদনমোহন মালব্যের সহকর্মী ইন্দ্রনারায়ণ দ্বিবেদী ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরপ্রদেশে একটি কিষাণ সভা গঠন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই এলাহাবাদের হোমরুল লীগ এবং কংগ্রেস নেতৃবর্গের দ্বারা প্রধানতঃ আগ্রা অঞ্চলে এই কিষাণ সভার প্রায় ৪৫০টি শাখা স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে 'কাউন্সিল বয়কট' প্রশ্ন কেন্দ্র করে কিষাণ সভার সংগঠনে ভাঙন দেখা দেয়। ইন্দ্রনারায়ণ দ্বিবেদী প্রগতিশীল প্রার্থীদের জন্য কৃষকদের ভোট সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন এবং তাঁর সহকর্মী গৌরশংকর মিশ্র অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এই সময় প্রতাপগড় রায়বেরিলি অঞ্চলে যে কিষাণ সংগঠনগুলো গড়ে ওঠে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করতে শুরু করেন। এইসব কিষাণ সভার সংগঠক ছিলেন প্রতাপগড় অঞ্চলের ক্ষুদ্র তালুকদার গোষ্ঠীর বিক্ষুব্ধ নেতা ঝিঙ্গুরি সিংহ এবং ফিজি থেকে প্রত্যাগত শ্রমিক নেতা সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত বাবা রামচন্দ্র। বাবা রামচন্দ্র রামায়ণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং জাত-পাতের কথা উল্লেখ করে সাধারণ কৃষকদের মধ্যে একতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রতাপগড়ের অন্তর্গত রুর গ্রামে প্রথম কিষাণ সভা আহ্বান করেন, কারণ তুলসীদাসের রাম-চরিত মানসে এই গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। সম্প্রতি আবিষ্কৃত বাবা রামচন্দ্রের ব্যক্তিগত নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি পরবর্তী-কালে কুর্মি-ক্ষত্রিয় সভা নামে একটি কিষাণ সভাও গঠন করেন। বাবা রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত কিষাণ সভার দাবিগুলো ছিল খুব সাধারাণ। অতিরিক্ত কর আদায়ের রীতির বিলোপ সাধন অথবা করের পরিমাণ হ্রাস করা, বেগার প্রথার অবসান, বেদখলী জমি চাষ-বাস করা নিষিদ্ধকরণ, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অত্যাচারী তালুকদারদের সামাজিকভাবে বয়কট করা প্রভৃতি কর্মসূচী এই কিষাণ সভা গ্রহণ করে। কিন্তু কিষাণ সভার প্রকৃত শক্তি স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যখন মিথ্যা চুরির দায়ে অভিযুক্ত বাবা রামচন্দ্রকে মুক্ত করার জন্য ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতাপগড়ে শান্তিপূর্ণভাবে বিরাট কিষাণ জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে গৌরীশংকর মিশ্রের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং বাবা রামচন্দ্র কয়েক শ কৃষক নিয়ে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে এলাহাবাদে উপস্থিত হয়ে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁকে অবিহিত করেন। জওহরলাল নেহরু এই সময়

কৃষক আন্দোলনের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন এবং উত্তর প্রদেশের কৃষক সমাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য প্রতাপগড় অঞ্চলে উপস্থিত হন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে জওহরলাল নেহরু, বাবা রামচন্দ্র এবং গৌরীশঙ্কর মিশ্রের পরিচালনায় আউধ কিষাণ সভা স্থাপিত হয়। প্রতাপগড়, রায়বেরিলি, সুলতানপুর ও ফৈজাবাদে এই সভার তিনশ ত্রিশটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। জওহরলাল নেহরু ও গৌরীপ্রসন্ন মিশ্রের প্রচেস্টায় কিষাণ সভার উপর গান্ধীজী পরিচালিত কংগ্রেসের গভীর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩) কৃষক বিদ্রোহ ঃ

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে উত্তর প্রদেশের ছোট-বড় প্রায় প্রতিটি শহরই এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এই সময় উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহও ব্যাপক আকার ধারণ করে। অযোধ্যা অঞ্চলের তালুকদারগণ ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি বিশেষ ভাবে অনুগত ছিলেন বলে উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসের নেতৃবর্গ এই কৃষক বিদ্রোহের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। কিন্তু খুব সংযতভাবে তাঁরা কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু বাবা রামচন্দ্রের প্রতি অনুগত কৃষকগণের নেতৃত্বে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অযোধ্যায় বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে এবং রায়বেরিলি, প্রতাপগড়, সুলতানপুর, ফৈজাবাদ প্রভৃতি স্থানে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী থেকে মার্চ মাসের মধ্যে কৃষি সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়। কৃষকগণ শুধু মাত্র তালুকদারদের বাড়ী-ঘর জমির ফসল প্রভৃতি আক্রমণের মধ্যেই তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখে নি, ব্যবসায়ীদের দোকানপাট, সম্পত্তি, বাজার প্রভৃতিও তারা আক্রমণ করতে শুরু করে। ৬ই জানুয়ারী প্রায় দশ হাজার কৃষক রায়বেরিলির ফুরসৎ গঞ্জ বাজার আক্রমণ করে এবং কাপড়-চোপড় ও খাদ্যশস্যের অতিরিক্ত মূল্যের কথা উল্লেখ করে সমস্ত ব্যবসায়ীদের চার আনা দামে প্রতিগজ কাপড় এবং টাকায় আটসের করে আটা বিক্রি করার দাবি জানায়। ফরাসী বিপ্লব শুরু হওয়ার পূর্বে এবং বিপ্লব শুরু হওয়ার পর ফরাসী জনসাধারণ যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করে উত্তর প্রদেশের এই আন্দোলনের সঙ্গে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। এই বিদ্রোহের সময় পুলিশের সঙ্গে কৃষকদের কয়েকবার সংঘর্ষ ঘটে এবং কৃষকদের পরিচালিত বিচারসভা স্থানীয় বিচার কার্যের দায়িত্বও গ্রহণ করে। শাহ নৈম আতা নামে জনৈক ব্যক্তি নিজেকে রাজা বলে পরিচয় দেন এবং ফৈজাবাদে জনৈক জাল রামচন্দ্র কর দেওয়া বন্ধ করা এবং ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তবে এই আন্দোলনের সঙ্গেই গান্ধীজীর নাম সংযুক্ত করা হয়।

ইতিপূর্বেই গান্ধীজী দরিদ্র কৃষকদের এইরূপ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে জওহরলাল নেহরু গান্ধীজীর সঙ্গে অভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি

আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, ফৈজাবাদের একটি জনসভায় তিনি হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের হাত তুলতে নির্দেশ দেন কিন্তু তিনি জানতেন যে পুলিশ কর্মচারিগণ সেখানে উপস্থিত রয়েছে এবং অপরাধী ব্যক্তিদের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। কিষাণ বিদ্রোহ দুর্বল করে দেওয়ার জন্য খিলাফৎ আন্দোলনের এবং কংগ্রেসের নেতৃবর্গ বাবা রামচন্দ্রকে বিদ্রোহী অঞ্চল থেকে দূরে থাকার জন্য অনুরোধ করেন এবং ১০ই ফেব্রুয়ারি তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মতিলাল নেহরু এবং গৌরীশঙ্কর মিশ্র একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে ঘোষণা করেন যে, "এই ঘটনায় আমরা দুঃখিত হই নি এবং তাঁকে মুক্ত করার জন্যও আমরা কোন চেষ্টা করব না।" ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বাবা রামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি কংগ্রেসকে প্রতারক বলে উল্লেখ করেন, কিন্তু ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছায়ই কংগ্রেস নেতৃবর্গের নির্দেশ মেনে নিতে সম্মত হয়েছিলেন।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে অসহযোগ আন্দোলন কিষাণ আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলে এবং কৃষকদের সুনির্দিষ্ট দাবিগুলো অবহেলিত হতে থাকে। অপর দিকে কিষাণ আন্দোলনে সন্ত্রস্ত হয়ে উত্তর প্রদেশের সরকার ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের আউধ রেণ্ট অ্যাক্টের দ্বারা জমির উপর তালুকদারদের কৃষকদের আজীবনের স্বত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করে। কিন্তু ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে এবং ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে উত্তর অযোধ্যার হরদয়, বহরৈচ, বড়াবাঁকি ও সীতাপুর জেলায় আবার কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেখানে কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী 'একা' আন্দোলন শুরু করেন এবং পরে মাদারি পাসির নেতৃত্বে এই আন্দোলন আরও বিপ্লবাত্মক হয়ে ওঠে। শস্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য বাতাই অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের নির্দিষ্ট একাংশের পরিবর্তে কৃষকগণ নগদ অর্থে কর দেওয়ার দাবি উত্থাপন করে। এই আন্দোলনের সময় নানাপ্রকার মন্ত্র-তন্ত্র, পুজার্চনাও কৃষকগণ সম্পাদন করতে শুরু করে। পুলিশের সাহায্যে উত্তর প্রদেশের সরকার এই আন্দোলন দমন করতে সমর্থ হয় এবং ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে মাদারি পাসি গ্রেপ্তার হন।

এই সময় উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে পার্বত্য উপজাতির মধ্যেও প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়। কুমাওন বিভাগের হাজার হাজার একর সংরক্ষিত বনে তারা আগুন লাগিয়ে দেয়। অযোধ্যার বিভিন্ন স্থানে কয়েকবার কিষাণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত জমি থেকে বহিষ্কৃত ও ভূমিহীন কৃষকগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, গান্ধীজী তাদের সকলকেই চাষবাসের উপযোগী জমি দিতে সমর্থ হবেন। কিন্তু একা আন্দোলন অথবা কিষাণ সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কোন যোগসূত্র না থাকলেও চৌরি-চৌরার হত্যাকাণ্ড একদিকে অসহযোগ আন্দোলন এবং অপর দিকে কিষাণ বিদ্রোহের সমাধি রচনা করে।

(৪) উপসংহার :

উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা এবং অন্যান্য অঞ্চলের কিষাণ সভাগুলো বৃহত্তর সংগঠন

জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার নীতি গ্রহণ না করলে সম্ভবতঃ আরও সাফল্য অর্জন করার সুযোগ পেত। কারণ জাতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা গঠিত এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করে চলার জন্য চেষ্টা করত। এই সংগঠনের পক্ষে কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করে ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করে নিজেদের সংগঠনের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা কখনই সম্ভবপর ছিল না। তা ছাড়া, বরদোলি সিদ্ধান্ত থেকে এরূপ আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের স্পষ্ট মতামত জানা যায়। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, কৃষকদের পক্ষে জমিদারদের কর না দেওয়ার নীতি কংগ্রেসের আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জমিদারদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে, তাদের আন্দোলন কখনই কোন ব্যক্তির আইনসম্মত অধিকারকে আক্রমণ করবে না। তা ছাড়া, গান্ধীজী বারবার উল্লেখ করেছেন যে তিনি সুনির্দিষ্ট কারণের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত গণ-আন্দোলন পরিচালনা করার প্রতিশ্রুতি দিলেও কখনও শ্রেণী সংগ্রামে বা সামাজিক বিপ্লবে আগ্রহী নন। সুতরাং জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থে গান্ধীজীর প্রভাবকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করে এবং তাদের আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য গান্ধীজীর মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে। কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে বিপ্লবাত্মক কোন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব ছিল না। এমন কি, মতিলাল নেহরু, সি. আর. দাশ, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গ অনেক সময় গান্ধীজীর নীতির তীব্র সমালোচনা করলেও, সামাজিক বিপ্লবের প্রতি সমর্থন জানাতে তাঁরাও সম্মত ছিলেন না। বাবা রামচন্দ্র কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে কৃষক স্বার্থের ধ্বংসকারী, প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করলেও কংগ্রেসের পক্ষে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করে কৃষকদের স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে কিষাণসভা কংগ্রেসের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেছিল তা পূরণ করা কংগ্রেসের মতো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত সংগঠনের পক্ষে কখনই সম্ভব ছিল না।

Q. 3. What extent did 'Government impulse' shape India politics in the last quarter of the 19th century.

Ans. (১) শাসনতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলতা :

ব্রিটিশ সরকারের আঘাত ও প্রেরণার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ভারতের রাজনীতি যে নতুন রূপ লাভ করার সুযোগ পায় তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে, বিশেষতঃ ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের নগ্ন চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শোষণ ও শাসনতান্ত্রিক দমন-নীতির পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য বিকট আকার ধারণ করে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহা-বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী অন্ধ সাম্রাজ্যবাদের মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে

উগ্র বর্ণবিদ্বেষ ও সামাজিক বৈষম্য অনুসরণ করতে থাকে এবং ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিভেদের ব্যবধান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। এমন কি, সাধারণ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারিগণও সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয়দের প্রতি দাম্ভিক ও অশালীন আচরণ শুরু করেন এবং এই ব্যবস্থার কোন প্রতিকার ছিল না। ট্রেভেলিয়ান, গ্রাহাম অ্যাবট প্রভৃতির রচনায় ইংরেজদের দ্বারা অনুসৃত বৈষম্যমূলক আচরণের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শাসকশ্রেণীর এই ঘৃণ্য বৈষম্যমূলক নীতি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ভারতীয়দের বীতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্য অনেংকাশে দায়ী।

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের পর বিশেষতঃ লর্ড লিটনের শাসনকালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন এক জঙ্গী আকার ধারণ করে। এই সময় একদিকে যখন অর্থনৈতিক শোষণের ফলে দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত হয় সেই সময় ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে প্রসিদ্ধ দিল্লী দরবার আহ্বান করে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের মহিমা কীর্তন করেন। এই দরবারে ভারতের শোষিত জনগণের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য একটি কথাও উচ্চারিত হয় নি, বরং ব্রিটিশ সরকারের স্তাবকতা করেন দেশীয় রাজন্যবর্গ ও বড় বড় ভূস্বামীগণ। লর্ড লিটনের শাসনকাল দমনমূলক নীতির জন্য কুখ্যাত হয়ে আছে। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয়গণ যাতে সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ার সুযোগ না পায় সেজন্য পরীক্ষার্থীদের ঊর্দ্ধতম বয়ঃসীমা ২৩ থেকে কমিয়ে ১৯ নির্দিষ্ট করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের এই নীতি ভারতীয় মনে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করে। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলোর জনপ্রিয়তা ও প্রভাব লক্ষ্য করে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইন (Vernacular Press Act) পাশ করা হল এবং দেশীয় সংবাদপত্র-গুলোর উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হল। লিটনের এই নীতি জনমতের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং জাতীয় আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে তোলে। লর্ড লিটনের অপর একটি জনবিরোধী কুখ্যাত কীর্তি ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের 'অস্ত্র-আইন'। এই আইনের দ্বারা ভারতবাসীদের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখাও নিষিদ্ধ হল। কিন্তু বিদেশীরা এই আইনের আওতার বাইরে রইল। অস্ত্র-আইন ভারতবাসীর জাতীয় সম্মান ও মর্যাদাকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করে এব' ব্রিটিশ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিদ্বেষ ও ব্যবধান প্রসারিত হয়। তবে লর্ড লিটন উপরি-উক্ত আইনগুলো প্রণয়ন ও কার্যকরী করেই ক্ষান্ত হন নি। ভারতীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তোলার জন্য তিনি বিদেশী পণ্যদ্রব্যের উপর ধার্য অধিকাংশ আমদানি শুল্কই তুলে দেন। এই ব্যবস্থায় ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের উল্লাসের যথেষ্ট কারণ ঘটলেও, ভারতীয় অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড আঘাত দেওয়া হয়। লর্ড লিটনের শাসনকালের প্রতিক্রিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় মন্তব্য করেন যে, "লর্ড লিটন তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপের দ্বারা ভারতের জনমত গঠনে সহায়তা করেন এবং তাঁর এই অবদানের জন্য আমাদের দেশ তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।"

শাসনতান্ত্রিক নীতির দ্বারা ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের মনে যেমন গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করে, ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত অর্থনীতিও ভারতবাসীর মনোভাবকে ক্রমশ ক্ষুব্ধ করে তুলতে থাকে। পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকেই ব্রিটিশ শাসকগণ বেআইনী ভাবে ভারতের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতে শুরু করে এবং পরে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে শোষণের মাত্রা তাঁরা আরও বৃদ্ধি করতে সমর্থন হন। ভারতের সমস্ত শিল্পকে তাঁরা ধ্বংস করেন এবং শিল্পজাত সমস্ত প্রকার পণ্যদ্রব্যের জন্যই তাঁরা ভারতবাসীদের ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী করে তোলেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে শিল্পপ্রধান ও সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ কৃষির উপর নির্ভরশীল দরিদ্র দেশে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক এই বিপর্যয়ের ফলে ভারতবাসিগণ ব্রিটিশ শাসন বিরোধী হয়ে ওঠে।

(২) **প্রেরণা :**

অপর দিকে ব্রিটিশ শাসনের অনিবার্য ফলশ্রুতি রূপে ভারতে জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ করে। এই জাতীয়তাবাদ প্রথমে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নবজাগরণকে কেন্দ্র করে উন্মেষ লাভ করে। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাজনৈতিক চরিত্র গ্রহণ করে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষের মূলে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটায়। ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ভারতের সামাজিক জীবনেও এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার লাভ করায় তাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পুঁজিবাদী দর্শনের প্রভাব পাকা হয়ে ওঠে এবং আত্মসচেতনাও বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত পক্ষে নবজাগরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ধর্মসমাজ, সাহিত্য, সংবাদপত্র, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নতুন জাতীয়তাবাদী চিন্তার উন্মেষের সময় ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত নীতিও ভারতবাসীর মনে নতুন আশার সৃষ্টি করে। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই ব্রিটিশ সরকার শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয়দের যুক্ত করার চেষ্টা শুরু করে।

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ব্রিটিশ সরকারের শাসন নীতির পরিবর্তনের ফলে ভারত-বাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন পরিষদগুলোতে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বেসরকারী সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় ভারতবাসী প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেল। কিন্তু ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন ভারতীয়দের সংকীর্ণ ও সীমিত ক্ষমতা দান করে। অপরদিকে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক চেতনা

প্রসারের সঙ্গে শিক্ষিত ভারতবাসী দেশের শাসনকার্যে অধিকতর অংশগ্রহণের দাবি উত্থাপন করতে শুরু করেন। ডক্টর এস. আর. মেহরোত্রের মতে ১৮৭৬-৭৭ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত দিল্লী দরবারের সময় থেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে সংগঠিত রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ সর্বভারতীয় রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। লিটনের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মনে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপনের শাসনকালে ইলবার্ট বিল নামক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ অগ্নিশিখার রূপ ধারণ করে। এই বিলের মাধ্যমে বিচার বিভাগে প্রচলিত ঘৃণ্য বর্ণবৈষম্য নীতি বিলোপ করতে চাওয়া হয়। পূর্বে কোন দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচার করতে পারতেন না। এই ব্যবস্থা বিলোপের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সদস্য মিস্টার ইলবার্ট এই মর্মে একটি বিল আনেন যে, বিচারালয়ে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবেনা এবং ভারতীয় বিচারকগণ শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচার ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে পারবেন। মিস্টার ইলবার্ট-এর এই বিল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে লর্ড রিপন ইয়োরোপীয়দের দাবি মেনে নিয়ে সংশোধিত আকারে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে বিলটি পাশ করেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত ঘটনার বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই ঘটনায় ব্রিটিশ ও ভারতীয়-দের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ভারতবাসী বুঝতে সমর্থ হয় যে, সংখ্যায় বিপুল হওয়া সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষিত ভারতীয়গণ বুঝতে পারেন যে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকার সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া আদায় করতে হলে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। এই পরি-স্থিতিতে সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার এলবার্ট হলে একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। ডক্টর তারাচাঁদের মতে এই সম্মেলন ছিল ইলবার্ট বিল সম্পর্কে ইয়োরোপীয়দের আন্দোলনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত ভারতবাসীর সমুচিত প্রত্যুত্তর (It was the reply of educated India to the Ilbert Bill agitation)। সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় সম্মেলনকে (National Conference) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রূপে গণ্য করা যেতে পারে এবং এই সম্মেলন প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সূচনা করে।

(৩) **উপসংহার :**

১৮৮৫-খ্রীস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ছিল কিনা তা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিউমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি সেফটি

আয়োজনের ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষিত ভারতীয়দের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ নিরাপদে বহিঃপ্রকাশের সুযোগ পায়। মৃদু ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি আসলে চেয়েছিলেন সেই আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণের গণ্ডীর মধ্যে রাখতে। অপর ভারতীয় নেতৃবর্গও ভেবেছিলেন হিউমের মতো একজন অবসর প্রাপ্ত রাজকর্মচারীর সক্রিয় সাহায্য যদি পাওয়া যায় তা হলে সরকারীমহলে তাঁদের সম্পর্কে সরকারের সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না। ব্রিটিশ সরকার হিউমকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনপ্রকার বাধা না দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভারতবাসীদের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই সম্পর্কে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলেন যে, "কোনও ভারতীয়ের পক্ষে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। এই ধরনের সর্বভারতীয় আন্দোলনে কোনও ভারতীয় যদি অগ্রণী হতেন, তা হলে সরকার নিশ্চয় তাঁর বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিতেন। রাজনৈতিক আন্দোলন তখন এত তীব্র ছিল যে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা যদি একজন বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত প্রাক্তন ইংরেজ রাজকর্মচারী না হতেন, তা হলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যে কোন উপায়ে এই উদ্যোগ দমন করতেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা না করলেও, পরে কংগ্রেসকে দুর্বল করার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা শুরু করে। এই সময়ই তারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত করার জন্য ভারতীয় রাজনীতিতে বিভেদ নীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ছিল। লর্ড ডাফরিন ঘোষণা করেন, "ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি। কংগ্রেস মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে না।" বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশ শাসকদের উৎসাহ ও প্ররোচনায় স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের বিকল্প সংস্থা রূপে ইউনাইটেড প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। ব্রিটিশ শাসকদের সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতি ভারতের ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের পথে সর্বাপেক্ষা প্রধান অন্তরায় রূপে দেখা দেয়।

Q. 4. To what extent did the politics of Bombay moved the early Congress ?

Ans (ক) ভূমিকা :

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্বেই ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশনের বিশিষ্ট সমস্যবৃন্দই জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। এদের মধ্যে ছিলেন কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাং ; ফিরোজশাহ মেহতা, বদরুদ্দিন তয়েবজি, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, দাদাভাই নওরোজি, দীনশা ওয়াচা প্রমুখ ব্যক্তিগণ। বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশনের রাজনীতিতে এঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং পরে জাতীয় কংগ্রেসে

যোগদানের পরও এই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবভাবে রূপদানের ব্যাপারে তাঁরা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। সুতরাং এঁদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং জাতীয় কংগ্রেসের উপর তার প্রভাব বিশ্লেষণ করার জন্য এইসব নেতৃবৃন্দের মানসিক প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন। কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাং ছিলেন বোম্বাই নগরীর বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালী সম্প্রদায়ের অন্যতম কর্ণধার। ফিরোজশাহ মেহতা বোম্বাইর পার্সী সম্প্রদায়ের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি ছিলেন বোম্বাই শহরাঞ্চলের স্বায়ত্ত শাসন সংক্রান্ত আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। বদরুদ্দিন তায়েবজি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পরে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদেও উন্নীত হন। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার নীতির তিনি সমর্থক ছিলেন। মহাদেব গোবিন্দ রানাডে সরকারী কর্মচারী হলেও তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ্ ও বুদ্ধিজীবী পরবর্তীকালে তিনিও বোম্বাই-হাইকোর্টর বিচারপতি নিযুক্ত হন। পার্সী সম্প্রদায়ভুক্ত দাদাভাই নওরোজি রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ছিলেন নরমপন্থী এবং ব্রিটিশ ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতের দাবি-দাওয়া আদায়ের তিনি পক্ষপাতি ছিলেন। দীনশা ওয়াচা ছিলেন বোম্বাইর জনপ্রিয় পার্শী জাতীয়াবাদী নেতা। তিনি বোম্বাইর সুতিবস্ত্র শিল্পের অন্যতম প্রধান সংগঠকও ছিলেন। তিনি উদারপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

বোম্বাই-এর রাজনীতিতে আর যেসব ব্যক্তি সুপরিচিত তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতেন বালগঙ্গাধর তিলক এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলে। এঁরা দুজনেই ছিলেন পুনের সার্বজনিক সভার সদস্য, শিক্ষাবিদ্ এবং পুনের ফার্গুসন কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বোম্বাই-এর প্রাদেশিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকলেও পুনের রাজনীতিবিদ্দের সঙ্গে বোম্বাইর রাজনীতিবিদ্দের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে খুবই পার্থক্য ছিল। অপরদিকে রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন চরমপন্থী, কিন্তু গোখলে ছিলেন নরমপন্থী। তবে দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের দিক থেকে বোম্বাই প্রদেশের নেতৃবর্গের মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য থাকলেও জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পর্বে এই নেতৃবর্গ গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বোম্বাই প্রদেশের বেশী সংখ্যক সদস্যই ছিলেন অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ, উচ্চশিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন।

(২) দৃষ্টিভঙ্গি :

জাতীয় কংগ্রেসের আদিপর্বে বোম্বাইর নেতৃবর্গ বিশ্বাস করতেন যে, দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অনুকূল ঐতিহাসিক পরিস্থিতি তখনও সৃষ্টি হয় নি। তা ছাড়া, তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের উদারনৈতিক মনোভাবে আস্থাশীল ছিলেন এবং মনে করতেন

ভারতের স্বার্থেই ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত থাকা প্রয়োজন। ভারতবাসীর উন্নতি সাধনের জন্য কংগ্রেসের নেতৃবর্গ আইনানুগ, শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে দাবি-দাওয়া উত্থাপনের পক্ষপাতি ছিলেন এবং আন্দোলনধর্মী কার্যকলাপের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, ব্রিটিশ শাসকগণ ভারতবাসীর দাবি-দাওয়া সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন এবং ভারতের উদারনৈতিক সংস্কারাদি প্রবর্তিত হবে।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সর্বসমেত ৭২ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। কিন্তু এই কলকাতায় তখন জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন আহূত হওয়ার ফলে বাঙলাদেশ থেকে খুব কম সংখ্যক প্রতিনিধি যোগ দেন। ফলে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে বোম্বাই অঞ্চলের প্রতিনিধিদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলেই জাতীয় কংগ্রেসের চারটি উদ্দেশ্যের কথা প্রস্তাবাকারে এই অধিবেশনে গৃহীত হয়। এগুলো হল ঃ (১) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব কর্মী দেশের মঙ্গলের কাজে লিপ্ত আছেন তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন ঃ (২) এই সকল কর্মীর মধ্যে জাতি, ধর্ম ও প্রাদেশিক সংকীর্ণতা দূর করে জাতীয় ঐক্যের সংহতি সাধন ; (৩) ভারতের শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমসাময়িক গুরুতর জাতীয় সমস্যাগুলোর সমাধান নির্ণয় এবং (৪) পরবর্তী বছরগুলির রাজনৈতিক কর্মসূচী নির্দ্ধারণ। এই চারিটি প্রস্তাবই প্রধানতঃ জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী বিশ বছরের কর্ম-পদ্ধতির গতি নির্দ্ধারণ করে।

(৩) **বিভিন্ন দাবি ঃ**

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগে যে সমস্ত দাবি-দাওয়া উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলোকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সাংবিধানিক সংস্কার, অর্থনৈতিক সংস্কার, প্রশাসনিক সংস্কার ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন। জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দ এই চারটি দাবির উপরই যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন, কিন্তু বোম্বাইর নেতৃবৃন্দ অর্থনৈতিক দাবির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে ব্রিটিশ সরকার যে ভারতীয়দের স্বার্থ বিনষ্ট করে নিজেদের শোষণের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে, বোম্বাইর নেতৃবর্গ সে বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। দাদাভাই নওরোজি ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে বলেন, "ভারতীয়দের অবস্থা নিতান্তই ভূমিদাসের মতো। আমেরিকান দাসদের চেয়েও তাদের অবস্থা শোচনীয়, কারণ আমেরিকান প্রভুরা অন্তত নিজের সম্পত্তির মতো দাসদের যত্ন নেয়।" ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র সম্পর্কেও তিনি বলেন, "এ যেন এক চিরস্থায়ী বৈদেশিক আক্রমণ, কর পরিধি দিন দিন বেড়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত গতিতে এর হাতে দেশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে।" বিদেশী পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধেও তাঁরা স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করেন। তাঁরা জানতেন, যে বিদেশী পুঁজিপতিগণ

স্বাধীনভাবে পুঁজি খাটাবার অধিকার লাভ করলে দেশের শিল্পপতিদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হবে, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর আরও শক্ত হয়ে উঠবে ব্রিটিশের শাসনের মুঠি। সুতরাং তাঁরা বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ করার দাবি উত্থাপন করেন। তাঁদের দাবির ফলেই জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা শুরু করে।

তাঁদের মত ছিল যে, দেশে দারিদ্র্য দূর করার প্রধান উপায় সর্বক্ষেত্রে দেশকে আধুনিক করে গড়ে তোলা। বোম্বাই অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের অনেকেই ইয়োরোপের আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। দ্রুত শিল্প প্রভাবের জন্য এবং সক্রিয় রাষ্ট্রীয় সাহায্যের জন্যও তাঁরা জাতীয় কংগ্রেসে প্রস্তাব আনয়ন করেন। ভারতীয় শিল্পের স্বার্থে তাঁরা স্বদেশী ভাবধারাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যও চেষ্টা শুরু করেন। প্রকৃত-পক্ষে জাতীয় কংগ্রেস তার প্রথম দিকে বিশ বছরের মধ্যে যেসব অর্থনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করে তার অধিকাংশই ছিল বোম্বাই-এর সদস্যদের প্রভাবের ফল।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও বোম্বাই অঞ্চলের সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন দাবি পেশ করেন। ভারতীয় স্বার্থে তাঁরা শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে ভারতীয় করণের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারেও তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করার জন্যও তাঁরা দাবি তোলেন। জাতীয় কংগ্রেস এই সব প্রস্তাবগুলোই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে বোম্বাইর নেতৃবৃন্দ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের নীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারেও তাঁরা একটি বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থের প্রতি তাঁরা বিশেষ দৃষ্টি দেন। তাঁদের চিন্তাধারা সর্বভারতীয় হলেও বোম্বাই অঞ্চলের সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি তাঁরা খুব সতর্ক দৃষ্টি দিতেন। কলকাতা ও মাদ্রাজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এখানে তাঁদের বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু কংগ্রেসের সংগঠনের উপর তাঁদের প্রভাবও ছিল খুবই গভীর, ফলে তাঁরা প্রথম দিকের নীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে সমর্থ হন।

Q. 5. To what extent was British administration in the second half of the 19th century Orientalised ?

Ans. (১) ভূমিকা :

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ভারতের মতো বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনদায়িত্ব একটি বণিক কোম্পানীর বহাল রাখা শুধুমাত্র অযৌক্তিক নয়, বিপজ্জনকও বটে। ফলে মহাবিদ্রোহের পরেই ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীর দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটে এবং ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ভারত-শাসন আইন বলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার সরাসরি নিজ হস্তে গ্রহণ করে। যদিও ভারত শাসন আইন বলে ভারতের প্রশাসন ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের হাতে দেওয়া হয়, কিন্তু ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্দের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য কার্যক্ষেত্রে ভারত সচিবই এককভাবে এই ক্ষমতা ভোগ ও প্রয়োগ করার সুযোগ লাভ করেন।

(২) প্রথম পদক্ষেপ :

ভারতের শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। শুধুমাত্র গভর্নর জেনারেলকে রানীর প্রতিনিধি হিসাবে ভাইসরয় উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর ভারত সরকারের উপর ভারত সচিবের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র সম্পর্ক, যুদ্ধ বা শান্তির নীতি গ্রহণ আভ্যন্তরীণ প্রশাসন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত সচিব সর্বেসর্বা ক্ষমতার অধিকারী হন। দুটি কারণে ভারত সরকারের উপর ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রথমতঃ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এশিয়ায় ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং ভারত এশিয়ায় ব্রিটিশ সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের মূলকেন্দ্রে পরিণত হয়। সুতরাং, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভারতের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সর্বাত্মক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

কিন্তু অপরদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকেই ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়গণের বিকেন্দ্রীকরণের নীতির সূচনা হয়। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের সনদের একটি ধারা অনুসারে ভারতের আইন সভার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই আইন সভায় কোন ভারতীয় সদস্যকে গ্রহণ না করার ফলে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয়দের মনোভাব জানা সম্ভব ছিল না। বিশেষত, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের ফলে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয়দের মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আইন সভায় কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় জন্য মহাবিদ্রোহের পূর্বে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের মনোভাব সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে নি। শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রের এই অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে একটি নতুন কাউন্সিল আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন ব্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত শাসন ব্যবস্থার সমূহ পরিবর্তন সাধন করে। আইন পরিষদে কিছু সংখ্যক ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করার ফলে ও প্রাদেশিক সরকারগুলোর উপর আইন প্রত্যার্পণ করায় ভারতীয়করণ ও বিকেন্দ্রীকরণের নীতি কিছুটা কার্যকরী করা হয়। তা ছাড়া, আইন পরিষদগুলোতে বেসরকারী সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় ভারতবাসী এই প্রথম প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়।

কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বিবর্তনের পথে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল আইনকে কোনক্রমেই সন্তোষজনক বলা যায় না। আইন পরিষদে সরকারী সদস্যদের সংখ্যাধিক্য থাকায় বেসরকারী সদস্যদের মতামতের কোন মূল্য ছিল না। তা ছাড়া, বেসরকারী সদস্যদের অধিকাংশই সরকারের মনোনীত হওয়ায় তাদের পক্ষে সরকার বিরোধী মতামত প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। বেসরকারী ভারতীয় সদস্যদের প্রায় সকলকেই দেশীয় রাজন্যবর্গ ও ভূস্বামী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে মনোনীত করা হত। এই সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে সাধারণ ভারতবাসীর কোন সংযোগ ছিল না। আইন পরিষদের সদস্যদের প্রশাসন, কর ধার্য, ব্যয় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের কোনও ক্ষমতা ছিল না। সর্বোপরি ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল আইনে গভর্নর জেনারেলকে অর্ডিন্যান্স জারি করার যে ক্ষমতা দেওয়া হয় তার ফলে স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করা একেবারে বন্ধ হয়ে পড়ে। এমন কি, আইন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন গভর্নর জেনারেলের সম্মতি না পেলে কার্যকরী হতে না পারায় শাসনতন্ত্র ভারতীয়করণ ও বিকেন্দ্রীকরণের যে নীতি গৃহীত হয় তা সর্বাংশে মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে দীর্ঘ ত্রিশ বছরকাল শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে তেমন কোনও সংস্কার সাধিত হয় নি। ইতিমধ্যে ভারত সচিব এবং গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে আইন পরিষদগুলির কার্যকলাপ ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। অপর দিকে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী তিনদশকে ভারতীয় জনমানসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। রাজনৈতিক চেতনা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ভারতবাসীগণ দেশের শাসনকার্যে অধিকতর অংশ গ্রহণের দাবি উত্থাপন করতে শুরু করেন। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক সমিতি, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে এই সব দাবিদাওয়া প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে লর্ড রিপণ নির্বাচনের মাধ্যমে আইন পরিষদগুলোতে সদস্য গ্রহণের নীতি প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু রিপনের উদারনৈতিক মতবাদ ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠীর মনঃপূত হয় নি। ১৮৮৬ ও ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাফরিন আইন পরিষদের সংস্কারের পক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু ভারত সচিব লর্ড ক্রস ডাফরিনের প্রস্তাব নাকচ করেন। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হলে ভারত ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে 'বিপজ্জনক' হয়ে উঠবে এই অভিমতও তিনি প্রকাশ করেন।

কিন্তু ভারতীয়দের শাসনকার্যে অধিকতর অংশগ্রহণের দাবি ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনগুলোতে বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে সরকারী নীতির সমালোচনা পরিলক্ষিত হয় এবং শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের জন্য ব্যাপক প্রচার কার্য পরিচালিত হতে থাকে।

এই সময় লর্ড ডাফরিন আইন পরিষদের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে ভারত সচিব লর্ড ক্রস ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় কাউন্সিল আইন পেশ করেন।

(৩) দ্বিতীয় পদক্ষেপ :

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলোর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যসংখ্যা হয় ষোল এবং বড় ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রাদেশিক পরিষদগুলোর সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে কুড়ি ও পনেরোতে ধার্য করা হয়। প্রাদেশিক আইন সভাগুলোর বেসরকারী সদস্যসংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত নতুনতম বেসরকারী সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল—মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে আটজন, বাংলা ও উত্তর প্রদেশে যথাক্রমে কুড়ি ও পনেরো জন। সদস্য নিয়োগের ব্যাপারে যদিও সরাসরিভাবে নির্বাচনের নীতি গৃহীত হয় নি। কিন্তু জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, বিশ্ববিদ্যালয়, চেম্বার অফ কমার্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করার অধিকার দেওয়া হয়। প্রাদেশিক কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্যগণ চারজন সদস্যকে কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচন করার অধিকার পান। বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভার অতিরিক্ত আটজন বেসরকারী সদস্য পৌরসভা, জেলাবোর্ড, বণিকসভা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে বাজেট ও জনসাধারণের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করার অধিকার দেওয়া হয়।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল আইন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে নির্বাচন প্রথার আংশিক প্রয়োগ করে এবং সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সুযোগ দিয়ে আধুনিক ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তবে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের আইন পূর্বেকার বিধিব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক উন্নতমানের হলেও এই আইন ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে নি। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় কাউন্সিলেই সরকার মনোনীত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। দ্বিতীয়ত, আইন পরিষদগুলোর সদস্যগণ—অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে মতামত প্রকাশের বা প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার পেলেও, বাজেট সম্পর্কে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকেন। ফলে, সদস্যদের পক্ষে সরকারী নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব ছিল না। তাসত্ত্বেও বলা যায় যে, ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন ভারতের শাসনব্যবস্থা জাতীয় করণের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

(৪) উপসংহার :

বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থাকে ভারতীয়করণের প্রচেষ্টা করা হলেও ভারতের ব্রিটিশ শাসকবর্গ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন। শাসক ও

শাসিতদের পার্থক্য তাঁদের পক্ষে মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হত না। সুতরাং আইন পরিষদে সদস্যরূপে গৃহীত হলেও অথবা সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত হলেও ভারতীয়দের ইংরেজগণ সর্বদাই হেয় নজরে দেখতেন। ফলে শাসনতন্ত্র ভারতীয়করণের বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হলেও ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাজপ্রতিনিধির মতো উচ্চপদে আসীন লর্ড মেয়ো ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে লিখেছিলেন: "আপনার অধীনস্থ কর্মচারীদের এই শিক্ষা দেবেন যে, আমরা সবাই ব্রিটিশ ভদ্রলোক এবং একটি নিকৃষ্টতর জাতিকে শাসন করার মতো মহৎ কাজে আমরা নিযুক্ত।" বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের মনোভাবের নির্লজ্জ ও স্পর্ধিত ধারণায় পুষ্ট ইংরেজ জাতির কাছ থেকে শাসনতন্ত্রকে সীমিতভাবে ভারতীয়করণের ফলেও ভারতবাসীর পক্ষে কোন ব্যাপক শাসন-তান্ত্রিক পরিবর্তন বা সুবিচার প্রত্যাশা করা নিরর্থক ছিল।